Duke H01971-2-P36140
P36,140

নার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা নাই। আমি আপনাকে একটি সামান্য শয্যা দিতে পারি। আর বোধ হয়, আপনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; কিন্তু এখানে আর কিছুই নাই, কেবল সক্তীরোরী * আছে, তাহাও বড় ভাল নয়। আপনি ইচ্ছা করিলে খাইতে পারেন।

পথিক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন; গৃহস্বামিনীর আতিথ্য আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। যুবতী কিঞ্চিৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কয়েকটি পাত্রে সক্তীরোরী প্রস্তুত করিয়া অতিথির সম্মুখে রক্ষা করিলেন, এবং খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট নয় বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। যুবতীকে সকল কথার উত্তর প্রদান করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটি কথা কহিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কথোপকথন হইতে একেবারেই বিরত হইলেন। আহারসময়ে পথিক বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—ক্ষুদ্র গৃহটি এরূপ পরিষ্কৃত যে, তথায় কোনও প্রকার মলিন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল তৈজস পত্রে তাঁহার খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হইয়াছিল, সে সকলও সুপরিষ্কৃত। তথায় যে কয়েকটি গৃহসজ্জা ছিল, সেগুলি অতি সুন্দর। গৃহমধ্যে যে কয়েকটি যবনিকা ছিল, সেগুলি কেবল শুভ্র কাগজে নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাতে কবি এবং চিত্রকরদিগের প্রথম সারে বসন্ত, কুসুম, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রীষ্মবারি, আকাশ, নক্ষত্র, শারদীয়-চন্দ্র, নদীজল ও শারদীয় বায়ু, এই কয়েকটি পদার্থের স্মারক * চীনদেশীয় অক্ষরসমূহে শোভিত। গৃহের একাংশে একটি স্বল্পোচ্চ বেদী, এবং সেই বেদীর উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত থাকায়, তন্মধ্যে বন্যপুষ্পপরিশোভিত একটি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নির্ম্মিত স্তম্ভ পরিদৃষ্ট হইল। এই গৃহ-দেবতা মূর্ত্তির উপরিভাগে এক খানি সুন্দর চিত্রপট লম্বমান ছিল। চিত্রপটে কৃপাদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত, দেবী মুকুটোপরি চন্দ্রকে ধারণ করিয়া আছেন।

পথিকের ভোজন শেষ হইলে পর যুবতী বলিলেন, আমি আপনাকে উৎকৃষ্ট শয্যা প্রদান করিতে পারিব না, এখানে একটিমাত্র কাগজের মশারি আছে। শয্যা এবং মশারিটি আমার, কিন্তু অদ্য আমার অনেক কাজ আছে, নিদ্রা যাইবার সময় নাই। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি উহাতে বিশ্রাম করুন। অবশ্য আমি আপনাকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিলাম না।

---

* বৌদ্ধগণের এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য, ইহাতে কোনরূপ মাংস মিশ্রিত থাকা নিষিদ্ধ।

পথিক তখন বুঝিলেন যে, কোনও গুপ্ত কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকটি এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী বাস করিতেছেন, এবং তিনি দয়া করিয়া স্বীয় শয্যায় আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। রাত্রিকালে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই; উহা কেবল ছলনামাত্র। তজ্জন্য তিনি রমণীর অনুরোধ-পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, আমি স্বচ্ছন্দে ভূমিশয্যায় নিদ্রা যাইতে পারিব; সুতরাং তাঁহার জন্য আমার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী যেরূপ কনিষ্ঠ সহোদরকে সস্নেহে কোনও বস্তু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে, তিনিও সেইরূপ ভাবে বলিলেন, আমি বলিতেছি, তোমাকে ইহা করিতে হইবে। বাস্তবিকই আমার কোন কার্য্য আছে; যত শীঘ্র পারি, শয়নের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করি। দেখুন! আপনি এক জন সৎলোক; আশা করি, আপনি আমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে বাধা দিবেন না। এ অবস্থায়, অতিথি আর কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না; অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন গৃহস্বামিনী শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া, একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বালিকামূর্ত্তি আনয়ন করিলেন, এবং কাগজনির্ম্মিত মশারি টাঙ্গাইয়া দিলেন। তাহার পরে শয্যার শেষাংশে—ধর্ম্মমন্দিরকে ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য, একটি বড় পরদা টাঙ্গাইয়া দিয়া আগ্রহের সহিত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। অতিথি অবশ্য অনিচ্ছাসহকারে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্য অবশ্যই গৃহস্বামিনীকে কষ্ট পাইতে হইবে। পথিক যুবক যদিও গৃহস্বামিনীর নিজের কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া, তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে সুনিদ্রা লাভ করিবার কোনও বাধা হইবে না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং যেমন উপাধানে মাথা রাখিলেন, অমনই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইবার পর একটি শব্দ হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইহা অবশ্যই পদসঞ্চালনের শব্দ, কিন্তু ভ্রমণকালে যেরূপ পায়ের শব্দ শুনা যায়, ইহা সেরূপ নহে। সোল্লাসে বেগের সহিত ধাবমান হইলে যেরূপ পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। তখন তাঁহার মনে হইল যে, গৃহমধ্যে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে তাঁহার নিজের কোনও ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ তাঁহার সমভিব্যাহারে কিছুই নাই। কিন্তু দয়াশীলা গৃহস্বামিনী, যিনি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়াছেন, তাঁহার কি হইবে, এই ভাবনায় তিনি

অধীর হইলেন। কাগজের মশারীর চারি কোণে সছিদ্র নেটের কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। তিনি ঐরূপ একটি কোণ দিয়া, বাহিরে কি হইতেছে, দেখিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সম্মুখে পরদা থাকায় কি হইতেছে, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিবেন, এরূপ মনে করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোনও বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ঐ বিপদ হইতে গৃহস্বামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিবেন কি না, পূর্ব্বে তাহা স্থির না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা সঙ্গত নহে, এই ভাবিয়া মনের আবেগ সংযত করিলেন। ক্রমে শব্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেন ঐ শব্দ হইতেছে, অতিথি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, নবীনা গৃহস্বামিনীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিব। তিনি হঠাৎ বদ্ধপরিকর হইয়া নিঃশব্দে মশারীর বহির্ভাগে গমন করিলেন, এবং পরদার নিকট গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দেখিলেন, যুবতী সুন্দর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, চৈত্য অর্থাৎ চিতামন্দিরের সম্মুখে একাকিনী নৃত্য করিতেছেন। তিনি নর্ত্তকীর ন্যায় বেশ পরিধান করিয়াছেন। এই পরিচ্ছদ অর্থাভিলাষিণী নর্ত্তকীরা যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাও বহুমূল্য। নির্জ্জন স্থান, দীর্ঘরাত্রি ও সুপরিচ্ছদ, এ সমস্তই তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। অতিথি এপ্রকার মনোহর রূপ কখনও দর্শন করেন নাই। কিন্তু যুবতীর হৃদয়োন্মাদক নৃত্য অতিথির চক্ষে আরও অধিক বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। প্রথমে এই ঘটনাটি তাঁহার চক্ষে ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হইল। কুহকগণের অলীক বিশ্বাস, কৈবর্ত্ত রমণীগণের গল্পকথা, তাঁহার শ্রুতিপথে উদিত হইল। কিন্তু পরক্ষণে যখন তিনি দেখিলেন, সম্মুখে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান ও ভিত্তির উপরি তাঁহার পবিত্র চিত্রপট লম্বমান, তখন তাঁহার সে ভাবনা দূর হইল। তিনি ভ্রান্তির জন্য লজ্জিত হইলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারটি দেখিতে পান, গৃহস্বামিনীর তাহা অভিপ্রেত নহে। তিনি যখন রমণীর অতিথি, তখন তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে পরদার নিকট হইতে অপসৃত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বোত্তমা নর্ত্তকীর অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া আনন্দ ও বিস্ময় রসে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি যতই তাহা দেখিতে লাগিলেন, গৃহস্বামিনীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে ততই মোহিত

করিতে লাগিল, সহসা গৃহস্বামিনী নৃত্য হইতে বিরত হইলেন। তিনি নৃত্যোপযোগী পরিচ্ছদ উন্মুক্ত করিয়া যেমনি অতিথিকে সম্মুখে দেখিলেন, অমনি লজ্জায় কাঁপিতে লাগিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন, দ্রুতপদসঞ্চালনের শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; শব্দ শুনিয়া আমার মনে ভয় হইয়াছিল, আমি আপনার বিপদাশঙ্কায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলাম, কারণ ঐ সময় রাত্রি অধিক ও স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করিলেন। অতিথি বলিলেন, আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন। আপনি কে, কি প্রকারেই বা এরূপ সুন্দর নৃত্য অভ্যাস করিলেন, তাহা না জানিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আমি শৈক্যনগরীর অনেক নর্ত্তকীর নৃত্যনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছি; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সেই সকল নর্ত্তকী বালিকারাও আপনার সমান নহে। আমি যখন একবার আপনার নৃত্য দর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম, আর তাহা হইতে নেত্র অপসারণ করিতে পারিলাম না।

প্রথমে যুবতী একটু কোপভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতিথির এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার সে ভাব দূর হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন, এবং বলিলেন, আমি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হই নাই, কিন্তু আপনি আমার নৃত্য দর্শন করিয়াছেন বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কারণ, আপনি আমাকে একাকিনী ঐ প্রকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া পাগলিনী ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, আপনি যাহা দেখিলেন, তাহার কারণ আপনাকে জানাইতেছি।

২

গৃহস্বামিনী তাঁহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই বাল্যকালে আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমার উপজীবিকানুসারে আমার সুপ্রসিদ্ধ নাম শিরোর্ব্বশী। আমি রাজধানীর সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলাম। আমি আমার যৌবনে যখন খ্যাতি ও সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় উপনীত হই, তখন হঠাৎ লোকালয় হইতে দূরে চলিয়া আসি। কোথায় আসি, বা কেন আসি, তাহা কেহই জানে না। আমি বিপুল অর্থ ও সৌভাগ্য পরিত্যাগ করিয়া, একটি যুবকের সহিত পলাইয়া আসি। তিনি আমায় ভাল বাসিতেন। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যাহাতে স্বচ্ছন্দে

ও সুখে আমরা পল্লীগ্রামে কাটাইতে পারি, আমাদের এরূপ সঙ্গতি ছিল। আমরা পর্ব্বতমধ্যে এই ক্ষুদ্র গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এবং এখানে কতিপয় বৎসর সুখে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আমায় যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এবং আমার নৃত্য দর্শন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন; প্রতিদিন সায়ংকালে তিনি একটি করিয়া সুমধুর গীত গান করিতেন, আমি তাঁহার সন্তোষবিধানের জন্য নৃত্য করিতাম। পরে এক দিন সুদারুণ শীতকালে তাঁহার পীড়া উপস্থিত হইল। আমি প্রাণপণে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিলাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তদবধি আমি এই স্থানে তাঁহার ধ্যানে জীবন যাপন করিতেছি। মৃতব্যক্তিকে পূজা করিতে হইলে, যে সকল প্রেম ও ভক্তিসূচক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক, আমি সেগুলি যথাবিধি করিয়া থাকি। আমি প্রতি দিবস এই স্থানে তাঁহার সেবার্থে ভোজ্য দ্রব্য রক্ষা করি, এবং রাত্রে পূর্ব্বে যেমন তাঁহাকে নৃত্য করিয়া সন্তুষ্ট করিতাম, সেইরূপ করিয়া থাকি। আপনি যাহা দেখিলেন, এই উদ্দেশেই আমি তাহা সম্পাদন করিতেছিলাম। গৃহস্বামিনী আরও বলিলেন, পরিশ্রান্ত অতিথির নিদ্রাভঙ্গ করা গৃহীর পক্ষে অভদ্রোচিত কার্য্য। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলাম; যখন দেখিলাম, আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, তখন ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আপনি নিদ্রাভঙ্গরূপ দোষের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি নাই।

এই সকল কথা বর্ণনা করিবার পর রমণী একটু চা প্রস্তুত করিলেন; এবং উভয়ে উহা পান করিলেন।

তৎপরে তিনি পথিককে বার বার এই বলিয়া অনুরোধ করিলেন,—আপনি যদি পুনরায় নিদ্রা যান, তাহা হইলে আমি আপ্যায়িত হই। পথিক তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, কাগজনির্ম্মিত মশারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সুখে নিদ্রিত রহিলেন। তাঁহার শয্যা হইতে উত্থানের পূর্ব্বে, সূর্য্যদেব আকাশমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভোজনার্থে খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে। পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময়ের খাদ্য যেরূপ সামান্য দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু কম খাইলেন। ভাবিলেন, যুবতী হয় ত নিজের জন্য কিছু না রাখিয়াই তাঁহাকে সমস্ত খাদ্যগুলি প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত

হইলেন। তখন তিনি গৃহস্বামিনীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলেন। গৃহস্বামিনী এই বলিয়া উহা লইতে অস্বীকার করিলেন, "আমি যাহা আপনাকে দিয়াছি, তাহা অর্থের জন্য নহে। আমি ভূতানুকম্পাবশতঃ আপনার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আপনি আমার গৃহে যে কষ্ট পাইয়াছেন, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনাকে দিবার যোগ্য আমার কোনও বস্তু না থাকিলেও, যাহাতে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য হয়, আমি তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।"

পথিক তথাপি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ লইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে যখন দেখিলেন যে, তিনি যতই অনুরোধ করিতেছেন, গৃহস্বামিনী ততই দুঃখিত হইতেছেন, তখন আর কিছু না বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায়কালে গৃহস্বামিনীর ভদ্রতার বিষয় ভাবিয়া কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইলেন। গমনকালে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এরূপ রূপমাধুরী ও ভদ্র ব্যবহার তিনি কখনও দর্শন করেন নাই। গৃহস্বামিনী পথিককে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং যে-পর্য্যন্ত না পথিক দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা পরে, পথিক তাঁহার পরিচিত একটি রাজপথে আসিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, "আমি তাঁহাকে নাম বলিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছি।" কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত চিরকালই দরিদ্র থাকিব।" তৎপরে তিনি গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

৩

এই ঘটনার বহুবর্ষ পরে চিত্রকর যখন বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর সুখ্যাতির সীমা ছিল না। নানাদেশীয় রাজপুত্রগণ তাঁহার শিল্পবিদ্যায় মোহিত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি রাজধানীতে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন; চিত্রবিদ্যাশিক্ষাভিলাষী যুবকগণ নানা দিগ্দেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে লাগিল; এবং তাঁহার গৃহে বাস করিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করতঃ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। জাপান দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার নাম বিখ্যাত হইল।

এই সময় একদিন এক বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁহার গৃহে আসিয়া বলিল, আমি চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। ভৃত্যগণ দেখিল, স্ত্রীলোকটির বেশভূষা

নির্জ্জন পর্ব্বতগৃহ, গৃহস্বামিনীর আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা, তৎপরিবর্ত্তে অর্থগ্রহণে অস্বীকার, কাগজনির্ম্মিত মশারি, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তিসমীপে মন্দ মন্দ প্রজ্জলিত দীপালোক, এবং নিশীথে নৃত্যকারিণীর অসামান্য রূপরাশি পুনঃ পুনঃ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইলেন। তখন সেই রাজপুত্রগণের প্রিয় চিত্রকর, বৃদ্ধার সমীপে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, আমার এই দুষ্কার্য্য ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রথম মুহূর্ত্তে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দেখুন, চল্লিশ বৎসর হইল, আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখন আমি আপনাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছি। আপনি এক সময় আমাকে আপনার গৃহে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। আপনার একমাত্র শয্যা শয়নার্থে আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার সেই সুন্দর নৃত্য দর্শন করিয়া আমি প্রীত হইয়াছিলাম, এবং আপনি আমার নিকট আপনার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলেন। আপনি এক জন নর্ত্তকী ছিলেন; আমি আপনার নাম বিস্মৃত হই নাই। চিত্রকর তাঁহার নাম বলিলে পর, বৃদ্ধা বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন তিনি জরাজীর্ণ; তাঁহার শরীরে তখন নানাপ্রকার কষ্ট ও যাতনা; তাঁহার স্মৃতি-শক্তির লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চিত্রকর তাঁহার সহিত আরও স্নেহময়ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এবং গৃহস্বামিনী তৎকালে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিলেন। যে গৃহে একাকিনী তিনি বাস করিতেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। পরিশেষে বৃদ্ধার মনে সমস্ত কথাই জাগরূক হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে উত্তর করিলেন, ভগবান আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া আমাকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে সময় আপনি আমার সেই সামান্য কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এখন আমার সে অবস্থা নহে। আমার বোধ হইতেছে, ভগবান বুদ্ধদেবের প্রভাবেই আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। পরে তিনি চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, কয়েক বৎসর মধ্যে দারিদ্র্যোপহত হইয়া আমাকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই বৃদ্ধাবস্থায় আমি আবার নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। নগরবাসীগণ এখন আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। কুটীরটি নষ্ট হওয়ায় আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ, কুটীরমধ্যস্থ ধর্ম্ম-বেদী সম্মুখে আমার প্রণয়ীর আত্মার পরিতোষার্থে আর প্রতিদিবস সন্ধ্যা সময় নৃত্য করিতে পাই

না। সে জন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, আমি তাঁহার একখানি আলেখ্য চিত্রিত করাইতে অভিলাষী। আমার ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে এইরূপ অঙ্কিত থাকিবে যে, আমি উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নৃত্য করিতেছি। আমি ঐ ছবিখানি ধর্ম্মস্তম্ভের উপর টাঙ্গাইয়া দিব। আমি ত আর এখন নৃত্য করিতে পারি না, সুতরাং এই চিত্র কার্য্যের প্রতিনিধি হইবে। এই মনোরথ সিদ্ধির জন্য আমি নামম দেবের আরাধনা করিয়াছি। আপনার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে চিত্রের জন্য আসিয়াছি, ইহা সামান্য নহে; কারণ, ইহা মৃত ব্যক্তির আত্মার পরিতুষ্টির জন্য অভিপ্রেত। আপনাকে ইহা বিশেষ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে তিনি তাঁহার সেই নর্ত্তনকালীন পূর্ব্ব কালের পরিচ্ছদ বাহির করিলেন; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, চিত্রকর ঐ পরিচ্ছদে তাঁহাকে অঙ্কিত করিবার বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন। চিত্রকর তাঁহার সমস্ত কথা প্রীতিপূর্ণ বদনে শুনিয়া উত্তর করিলেন, আপনি যে চিত্র অঙ্কিত করিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তাহা আমি সানন্দে অঙ্কিত করিব। অদ্য আমাকে একখানি চিত্র শেষ করিতে হইবে, তাহা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, আপনি যদি কল্য এখানে আসেন, তাহা হইলে যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করাইতে আপনি ইচ্ছা করেন, আমি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা অঙ্কিত করিব। বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, আমি এপর্য্যন্ত আপনাকে একটি কথা প্রকাশ করিয়া বলি নাই; আমি আপনার কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ এই পরিচ্ছদটি ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারিব না, যদিও পরিচ্ছদটি পূর্ব্বাবস্থায় মূল্যবান ছিল, এক্ষণে উহা কিছুই নহে। কিন্তু আমি ভরসা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিবেন। কারণ এই পরিচ্ছদটি এখনকার কালে অদ্ভুত বস্তু। এক্ষণে আর শিরোর্ব্বশীগণের মধ্যে কেহই নাই; আর এখনকার নর্ত্তকীগণ এরূপ পরিচ্ছদ আর পরিধান করেন না। চিত্রকর বলিলেন, সে জন্য আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি এক্ষণে পূর্ব্ব ঋণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিশোধ করিবার একটি সুযোগ পাইলাম। আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপেই আপনার চিত্র অঙ্কিত করিব। তাঁহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমার আপনাকে আরও কিছু বলিবার আছে। এক্ষণে আমার আকৃতি প্রকৃতি যেরূপ, সেরূপে আমাকে

চিত্রিত করিলে চলিবে না। আপনি আমাকে যুবতী অবস্থায় যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আমাকে সেইরূপে চিত্রিত করিতে হইবে। চিত্রকর বলিলেন, আমার বেশ মনে আছে, আপনি সে সময় বড়ই সুন্দরী ছিলেন। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহার কৃশ অঙ্গযষ্টি আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—তবে আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইবে। আপনি যখন আমার তরুণাবস্থা বিস্মৃত হয়েন নাই, তখন আমার একান্ত অনুরোধ যে, আমায় এই বর্ত্তমান অবস্থায় চিত্রিত না করিয়া, সেই নবীনাবস্থায় চিত্রিত করেন। আমি যে সে সময়ে কুরূপা ছিলাম না, তাহা ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিজেই বলিলেন। প্রভো! আমাকে পুনর্ব্বার যুবতী করুন। পুনর্ব্বার আমাকে সুন্দরী করুন। এই হতভাগিনী যাঁহার প্রীতির জন্য চিত্র অঙ্কিত করাইতেছে, সেই মৃতব্যক্তির আত্মা যেন ইহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে করে। তিনি আপনার অসামান্য চিত্র-কৌশল দর্শন করিয়া, আমি নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া আমার যে দোষ হইতেছে, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

চিত্রকর তাঁহাকে পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন। কহিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনাকে যেরূপ যুবতী ও সুন্দরী দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপই অঙ্কিত করিব। আমি জাপানদেশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির চিত্র যেরূপ যত্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়া থাকি, আপনারও সেইরূপ করিব। আপনি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, কল্য আসিবেন।

পরদিন যথাসময়ে বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্রকর তাঁহাকে সেই রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া চিত্রিত করিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ দেখিলেন যে, তাঁহারা সম্মুখে যে বৃদ্ধাকে দেখিতেছিলেন, ইহা তাঁহার অনুরূপ নহে। কারণ তিনি তাঁহার স্মৃতিপথে যে যুবতী মূর্ত্তি প্রতিভাত ছিল, তাহাই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। লিখিত মূর্ত্তির চক্ষুর্দ্বয় খঞ্জনযুগলের ন্যায়। চীনাংশুক-পরিহিত অপ্সরার ন্যায় সুন্দর আকৃতি, চিত্রকরের অসামান্য শিল্প কৌশলে তাঁহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার রূপমাধুরী আবার বিকশিত হইল। পরে তিনি সেই প্রতিমূর্ত্তি একটি বাক্স মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। ইহার সহিত কিছু টাকা দিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে উত্তর করিল, আর তাহার কিছু প্রয়োজন নাই। আমি কেবল প্রতিমূর্ত্তিটির জন্য আপনার

নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন; এ জীবনে আমি আর কোনও বস্তুর কামনা করিতে পারি না, যদি আমি আর কোনও বস্তুর কামনা না করিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে বৌদ্ধমার্গ লাভ করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে না। আমি এই পুরাতন পরিচ্ছদ ব্যতীত আপনাকে আর কিছু দিতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ রহিল। যাহা হউক, আপনি যেরূপ আমার প্রতি অসামান্য দয়া দেখাইয়াছেন, সেই পুণ্যবলে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন যেন সুখময় হয়। চিত্রকর বলিলেন, আমি আপনার কিছুই উপকার করি নাই, তবে পরিচ্ছদটি গ্রহণ করিলে আপনি যদি সুখী হন, তবে আমার গ্রহণ করিবার আপত্তি নাই। আপনি এক্ষণে কোথায় বাস করেন, বলুন; আমি সেই স্থানে গিয়া চিত্র খানি টাঙ্গাইয়া দিয়া আসি। চিত্রকরের মনে মনে এরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তথায় গিয়া তাঁহার আরশুকীয় দ্বিতীয় পদার্থ প্রদান করিয়া আসিবেন। কিন্তু বৃদ্ধা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন চিত্রকর তাঁহার এক জন ছাত্রকে অলক্ষিত ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিলেন। ছাত্র বহু দূর বৃদ্ধার অনুসরণ করিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয়! স্ত্রীলোকটি নগরীর বহুদূরে নদীতীরস্থ একটি বধ্যভূমিতে সামান্য কুটীরে বাস করে, সেটি অত্যন্ত জঘন্য। চিত্রকর বলিলেন, সে যাহাই হউক, কল্য প্রত্যূষে সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে; আমি জীবিত থাকিতে বৃদ্ধা যে অন্ন কষ্ট পাইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। পর দিন প্রাতে চিত্রকর ছাত্রসমভিব্যাহারে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলেন। কোনও উত্তর না পাইয়া, অবশেষে তিনি সজোরে আঘাত করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, গৃহস্বামিনী এক খানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে ধর্ম্মবেদী ও তাহার উপরিস্থিত স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও একটি সামান্য আলমারী মধ্যে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ঐ ধর্ম্মবেদীর সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় একটি দীপালোক ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল। তিনি স্বকৃত আলেখ্য, ভিক্ষোপযোগী দণ্ড ও পিণ্ডপাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চিত্রকর নিদ্রিত বৃদ্ধাকে জাগরিত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কোন উত্তর না পাইয়া বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা

লোকান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন, কৈ, এখন ইহার মুখের ভাব তো বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত দেখিতেছি না, যৌবনের সৌন্দর্য্য যেন সর্ব্বাঙ্গে পুনর্বিকশিত হইয়াছে! কুঞ্চিত, বিশীর্ণ, জীর্ণ কলেবর পুনর্ব্বার নবভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া চিত্রকর বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী কোনও গুণবান শিল্পীর হস্ত বৃদ্ধার কলেবর স্পর্শ করিয়া তরুণী করিয়া দিয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

সাংখ্য স্বরলিপি।

বিরহ।

রাগিণী কালাংড়া বাহার—তাল পটতাল।

কোয়েল পাপিয়া পুলকে মাতিয়া
ডাকিছে চাঁদিনী রাতে,
কোথায় সে হৃদয়ের আছি তায় ভেসে
বহিয়া তাতে আমাতে।
আজি কি বাহার, বিরহে তাহার
হয়ে আছি আত্মহারা,
এ মধু রজনী কোথা সে সজনী
মুখ সে মধুর পারা।
সে বিনে আমার লাগিছে অসার
এ সুধা জোছনা ধারা—
বহে পরিমল মলয় বিমল
বিরহে পরাণ সারা।

তালি। ১ ২ । ০ । আরম্ভ। স্থা। স্থ। ভো।
মাত্রা। ৪ । ৪ । তালি। ১ । ১ । ১ ।

(স্থা)। "পুনি" ধুনি" পা পা' ।
(স্থা)। কো — যে ল ।

২
অথবা। 'ন্সা সা নি" ধা" । পা পা
। কো — যে ল । পা পি

গা —পধা । মা পা পা —পধা । মা পা
ক — গু ল কে — । মা তি

না —মৃগাঁ । গাঁ "গাঁ" বা "—গৃপা" পা
— — । ডা — — কি

পা । মা "মা" বা "—মৃপা পা পা । রে
ছে । চাঁ — — দি নী । রা

রে রে —রৃগাঁ । সা সা সা সা । সা সমা
— — — । তে — — — । কো থা

মা মা । মা মা মা মা । মা পা পা "পা"
—য়্ সে । মো — — —ব্ । আ ছি তা —য়্

বা "—পৃধা" । মৃপা —মা —মৃগাঁ গাঁ । গাঁ
—য়্ । ভো — — —রু । ব

গাঁ গৃপা পা । মা —পা পা পা । রে
— হি ব । তা — তে আ । না

রে রে —রৃগাঁ । সা সা সা সা । (স্ত) । মা
— — — । তে — — — । (স্ত) । আ

মা ধা২ — নিং২ — সা । নি ২—সা সা সা ।
ঞ্জি কি — — । বা — হা —ব্ ।

। নি ২ন্‌রে রে২ — সা২ সা । ২ন্‌সা সা —নিং
। বি ব হে — তা । হা — —

—ধা । ধ্‌নিং২ নিং২ পা২ পা২ পা পা ।
—ব্ । হ' রে অ ছি আ ম্ব ।

। মা২ — গা২ — মা পা পা । পধা ধা ধা ধা । ধা
। হা — — বা — এ — ম ধু । ব

ধা ধা —নিং । ২সা মা গা —রে । সা নি
জ নী — । কো থা সে — । স জ

২ সা সা । স্‌রে সা নিং ধা । নিং নিং
নি — । মু —খ্ সে — । ম —

২ সা সা । ২ন্‌সা নিং নিং নিং । ধা ধা ধা ধা ।
ধু ব । পা — — — । বা — — — ।

। ধ্‌নিং নিং নিং নিং । ধা ধা ধা নিং । ২সা গা
। এ — ম ধু । রু জ নি — । কো থা

গা গা । গ্‌মা রে সা সা । স্‌রে সা
সে — । স জ নি — । মু —খ্

২ সা সা । নিং ধা পা মা । পা পা সা
সে — । ম — ধু ব । পা — —

২ নি । সা সা সা সা । (ভো) । সা সা
— । বা — — — । (ভো) । সে —

সা সা । সমা মা মা মা । মা মা মা
বি নে । আ — মা —ব্ । লা গি ছে

মা । মা মা মা মা । মা মা মা মা । মাঃ — পাঃ
— । অ — সা —ব্ । এ — সু ধা । জো —

২
ধা ধা ধা । ধা — নিঁ — ধা — নিঁ । নঁসা সা সা
ছ না । ধা — — — । বা — —

সা । সগা গা গা গা । গা গা গা গা ।
— । ব হে প বি । ম — ল — ।

। মা মধা পা পমা । মা গা গা — গা ।
। ম ল য বি । ম — — ল ।

। গা মা গা রে । রে সা সা সাঃ — ধাঃ ।
। বি ব হে প । বা — ণ — — ।

২ ...
। ধ্সা সা নিঁ নিঁঃ — ধাঃ । ধা ধা — পা — ধা ॥
। সা — — — — । রা — — — ॥

২
ধ্সাঃ ।
কো ।

চেতন্য।

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালি।

ভাঙিল আমার কে সুখের স্বপন।
দিয়েছি হৃদয় যারে সে নহে আপন।
বুঝিয়াছি এতদিনে তাহার ছলনা মাখা,
আর কথায় ভুলিনে সে রে ছলনার ছায়া
(শুধু) ছলনারই ছায়া।

তালি। ১। ২। ৩। ০। আবর্ত্ত। স্থা। স্থা।
মাত্রা। ৪। ৪। ৪। ৪। তালি। ০। ০।

(স্থা)। বগা "গা" বা "গাঃ — মাঃ'
(স্থা)। ভা ঙ্গি ঙ্গি —

রে রে । সা রেঃ — সাঃ — সাঃ পা গা ।
ল আ । মা — — —ব্ কে — ।

২ ...
। গা গ্সা সা নি । পাঃ — ধাঃ — গাঃ
। সু খে —র্ স্ব । প — — —

—মাঃ — পা — গা । বগা গা রে রে ।
— — —ন্ । ভা ঙ্গি ল আ ।

২
। সা রে গা গা । গা গ্‌সা সা নি ।
। মা —ব্‌ কে — । সু খে —ব্‌ স্ব ।

। ধ্‌পা পা ∧মা গা । গা ∧মা ∧মুনি
। প — — —ন্‌ । দি য়ে ছি

ধা । পাঃ — ∧মাঃ — পা পা পা । গাঃ — ∧মাঃ
ক্ষ । দ — —য়্‌ যা রে । সে —

পাঃ ধাঃ ধা ধা । পা পাঃ ∧মাঃ ∧ন্‌পা
ন — হে আ । প — — —

গা । (স্থা—পু) গা গা রে রে । সাঃ
—ন্‌ । (স্থা—পু) ভা ভি ল আ । মা

২
—রেঃ — সাঃ — রেঃ গা গা । গা গ্‌সা
— — —ব্‌ কে — । সু পে

সা নি । ধ্‌পা পা ∧ন্‌পা গা ।
—ব্‌ স্ব । প — — —ন্‌ ।

২
(স্ত) । গা গা পা ধা । ধ্‌সা সা
(স্ত) । বু ঝি যা ছি । এ ত

না । সা স্‌গা রে র্‌মা । গা
নে । তা হা —ব্‌ ছ । ল

২
রে সা সা । সাঃ — নিঃ — রেঃ নি
না মা যা । আ — —ব্‌ ক

২
নিঃ — সাঃ । ধা ধা ধা ধা । ধ্‌নি নি
ধা —য্‌ । ভু লি নে — । সে রে

ধা ধা । ∧মাঃ — পাঃ — ধাঃ — পাঃ
ছ ল । না — — —ব্‌

পা পা । পা পা পা পা ।
—ব্‌ ছা । য়া — — — ।

২
। পা পা প্‌নি নি । নি ন্‌সা নি
। — — শু ধু । ছ ল না

নি । পাঃ — ধাঃ — পাঃ — ∧মাঃ — পা
ব্‌ই । ছা — — — য়া

সাঃ — গাঃ । (স্থা পু) ব্‌গা
— — । (স্থা পু) ভা

গা রে রে । সা রে গা গা । গাঃ
ভি ল আ । মা —ব্‌ কে — । সু

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশ্বানরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

গত আষাঢ়ের "সাহিত্যে", লাভেরিয়ে ও বৈশ্বানর শীর্ষক প্রবন্ধে একটি নূতন গ্রহাবিষ্কারের বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবন্ধের শেষভাগে ইহা উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ঐ গ্রহের অস্তিত্ব এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। তাহার কারণবিচারের পূর্ব্বে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আরও ২।১ স্থলে যে উক্ত গ্রহাবিষ্কারের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ, ম্যাঞ্চেষ্টার নিবাসী Lummis নামক জনৈক জ্যোতিষী, একদা প্রাতে সৌরবিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, তদুপরি একটি গোলাকার কালিমা (Sunspot) অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ একটি কালিমার সৌরবিম্ব অতিক্রম করিয়া যাইতে ১৪ দিবস অতীত হয়, কিন্তু উপরি-উক্ত কালিমা যেরূপ দ্রুত চলিতেছিল, তাহাতে ইহা অনুমিত হইল যে, তাহার সৌরবিম্ব অতিক্রম করিতে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মাত্র লাগিতে পারে। Lummisকে ঐ সময় কার্য্যান্তরোধে স্থানান্তর যাইতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যত দূর পারা যায়, ইহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ইহার পূর্ণগোলত্ব অনুমান করিলেন, এবং ব্যাসপরিমাণ ৭ বিকলা নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-ফল প্রকাশিত হইলে পর, অনেকেই তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, কারণ Lummis একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। ঐ সময়ে দুই জন ফরাসী গণিতবেত্তা পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে, Lummisএর পর্য্যবেক্ষণ-ফল হইতে গ্রহফলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ফলদ্বয় প্রকাশিত হইলে পর, তাহাদিগকে একত্র মিলাইয়া, লাভেরিয়ের সাধিত বৈশ্বানর-ফলের সহিত তুলনা করিলেন। ইহাতে লক্ষিত হইল যে, Lummis যে কালিমা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বানর গ্রহ হওয়া অতীব সম্ভবপর। নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

	Lummisএর গ্রহফল	বৈশ্বানর ফল।
সূর্য্য হইতে মধ্যদূরত্ব	১২,৬০০,০০০	১৩,০৮২,০০০
গ্রহের আবর্ত্তন কাল	১৮ দিন, ১৮ ঘণ্টা	১৯ দিন, ১৭ ঘণ্টা
" দৈনিক গতি	১৯° ২০′	১৮° ১৬′

সিদ্ধান্ত করিলে) ঐ কালিমারূপী গ্রহের আবর্ত্তনকাল ১৯ দিন, ১৮ ঘণ্টা সপ্রমাণ হয়। ইহার সহিত লাভেরিয়ের গণনার সৌসাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে, তাহাতে বৈশ্বানরের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কিছুই থাকে না। কিন্তু উপরোক্ত গণনফলপ্রচারের পর, অনেকানেক জ্যোতিষী একত্রিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে যে সময়ে বৈশ্বানরের সৌরবিম্বাতিক্রম (বা বৈশ্বানর কর্ত্তৃক সূর্য্যগ্রহণ) সম্ভাবিত হইতে পারে, সেই সেই সময়ে বিশেষ অবধানতার সহিত সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তদনুসারে বহু লোক ঐ কার্য্যে কালক্ষেপ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু এ যাবৎ আর কদাপি কোনও ধরাবাসীর ভাগ্যে বৈশ্বানরসন্দর্শন ঘটে নাই। লাভেরিয়ে ইহাও প্রচার করিয়াছিলেন যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের আরম্ভে একবার বৈশ্বানর কর্ত্তৃক সূর্য্যগ্রহণ ঘটিবে; তাহা পৃথিবীর নানা স্থানে দৃষ্টিগোচর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তদনুসারে বহু আয়াস ও অর্থব্যয় করিয়াও, কেহ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত গ্রহ দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। এমন অবস্থায় অনেকেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, যদি বৈশ্বানরের অস্তিত্ব সত্য হয়, তবে নির্দ্ধারিত সময়ে তাহা দূরবীক্ষণগোচর হইতেছে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে লাভেরিয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পুনরায় গণনারম্ভ করিলেন, এবং ক্রমাগত বুধের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইলেন, কোনও অদৃষ্ট শক্তি যে বুধের গতিতে কার্য্য করিয়া তাহার কক্ষবিচলন ঘটাইতেছে, তাহা স্থির নিশ্চয়; এবং উক্ত বিচলন এত সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, তাহাকে আর কোনওরূপ উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি Comptes Rendus কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইহা প্রচার করিলেন যে, 'যত সিদ্ধান্ত ও গণনা প্রয়োগ করা যাউক না কেন, বুধকক্ষের মন্দোচ্চে প্রতিশতবর্ষে ৩১ বিকলা অধিক গতি আরোপ না করিলে, কিছুতেই বুধের গতিফল প্রত্যক্ষ ফলের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। এবং পদার্থবিজ্ঞানবলে ইহার কারণ এই মাত্র অনুমিত হইতেছে যে, সূর্য্য এবং বুধকক্ষের অন্তর্ভাগে, উক্ত কক্ষের সহিত সমতলভাবে পদার্থনিচয় অবস্থিতি করিতেছে।' (এ স্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, ঐ পদার্থনিচয় কক্ষসমতল ভিন্ন অন্য কোনও সমতলে অবস্থিতি করিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে তদাকর্ষণ হেতু কক্ষতলের সম্পাতকোণেরও বৈষম্য লক্ষিত হইত।) যাহা হউক ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত যে, বুধের সান্নিধ্যে, সৌরবিম্ব বেষ্টন করিয়া,

পদার্থ, খণ্ড অথবা পদার্থমালা বিচরণ করিতেছে; ইহা এক কিম্বা একাধিক গ্রহ, অথবা পিণ্ডীকৃত, কিম্বা রেণুকাকারে অবস্থিত পদার্থমালা হইতে পারে, সমস্যা দ্বারা ইহা নির্ণীত হইতে পারিতেছে না! কিন্তু জড় জগতের কার্য্য-দৃষ্টে জড়পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ অবশ্যম্ভাবী ও স্থির সিদ্ধান্ত!' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লাভেরিয়ে মানবলীলা সংবরণ করেন, তৎপর কিছুকালের জন্য বৈশ্বানরতত্ত্ব বিরাম লাভ করিয়া অবস্থিতি করে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা প্রদেশে কয়েক জন জ্যোতিষী মিলিয়া এই স্থির করিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈশ্বানরের দর্শনলাভে নানা অন্তরায় ঘটিতে পারে; কারণ, লাভেরিয়ের গণনাকে অভ্রান্ত মনে করিয়া লইবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না; অতএব, কেবল মাত্র বৈশ্বানর কর্ত্তৃক সূর্য্যগ্রহণের প্রতীক্ষা না করিয়া, অন্যত্র তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। কিন্তু তাহাতেও এক বিষম অন্তরায় এই ঘটিতে পারে যে, সূর্য্যালোকের প্রাখর্য্য হেতু তন্নিকটস্থ গ্রহ অবলোকিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব Watson * এবং Swift নামক জ্যোতিষীদ্বয় পরামর্শ করিয়া ইহা স্থির করিলেন যে, অতঃপর যখনই সূর্য্য-গ্রহণকালে পূর্ণগ্রাস ঘটিবে, সেই সময়ে তাঁহারা বৈশ্বানরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

১৮৭৮ খৃঃ অঃ ২৯শে জুলাই এক সূর্য্যগ্রহণ হয়; উত্তর আমেরিকাতে তাহার পূর্ণগ্রাস লক্ষিত হইয়াছিল। এই গ্রহণকালে Watson স্থির করিলেন যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া, তন্মধ্যে যাহা কিছু অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, তাহা সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। পূর্ণগ্রাস আরম্ভ হইবামাত্রই তিনি সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার পশ্চিম ভাগে (তখন সূর্য্য কর্কট রাশিতে অবস্থিত ছিল) কর্কট রাশির একটি নাতিক্ষুদ্র নক্ষত্রের অতি সন্নিকটে, একটি লোহিত বর্ণের

* Watson এক জন অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "Theoretical Astronomy" ইংরাজি ভাষাতে জ্যোতিষের উচ্চাঙ্গ বিষয়ে একমাত্র গ্রন্থ। তিনি ২১টি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং জীবিতকালে যত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ঐ গ্রহদিগের গতিবিচারাদিবিষয়ক কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য, 'উইল' করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, ঐ ২১টি গ্রহ Watsonএর সন্ততিরূপে তাঁহার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে, এবং তাহাদের (বৈজ্ঞানিক) ভরণপোষণের জন্যই তিনি স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষ বিরাজ করিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদিগকে এত সন্নিহিত অনুভূত হইয়াছিল যে, ঐ দৃষ্ট জ্যোতিককেই উক্ত নক্ষত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বর্ণ-বৈচিত্র্য তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করাতে, তিনি আরও বিশেষ মনোযোগসহকারে দৃষ্টি করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ জ্যোতিষ্ক এবং নক্ষত্রের মধ্যে ব্যবধান লক্ষিত হইতেছে। বর্ণ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়াও দেখিতে পাইলেন যে, ইহার কিরণ প্রতিফলিত রশ্মির মতন অনুভূত হইতেছে। গ্রহণ অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইবে, অতএব তিনি যত সত্বর পারেন, ঐ জ্যোতিষ্কের পর্য্যবেক্ষণ সমাধা করিয়া, আরও কিছু অভিনব দৃশ্য নয়নগোচর হয় কি না, তদুদ্দেশে দূরবীক্ষণ ফিরাইতে লাগিলেন, কিন্তু দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কিঞ্চিৎ দূর ফিরাইবাই উপরোক্ত জ্যোতিষ্কের ন্যায় আর একটি জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাইলেন। ইহা ঔজ্জ্বল্যে পূর্ব্ব জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষীণ, কিন্তু ইহার আলোক প্রথম জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতিফলিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এই উভয় জ্যোতিষ্কের স্বরূপ তাঁহার চিত্তকে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট করিল যে, তিনি কিছুতেই ইহাদিগকে নক্ষত্রশ্রেণীর অন্তর্ভূত করিতে পারিলেন না, অতএব স্থির করিলেন যে, ইহারা বুধকক্ষাভ্যন্তরবাসী দুইটি নূতন গ্রহ হইবে।

লাভেরিয়ে বহুবার ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, বুধকক্ষাভ্যন্তরে একাধিক গ্রহ অথবা উল্কামালা বিচরণ করা একান্তই সম্ভবপর। পরন্তু ইহাও লক্ষিত হইয়াছিল যে, লেকার্বেরীর পর্য্যবেক্ষণফল হইতে সাধিত বৈশ্বানরফলদ্বারা, বুধের কক্ষবিচলন সম্যক্ মীমাংসিত হইতে পারে নাই; অতএব Watson সহজেই বৈশ্বানরের সহযোগী অপর একটি গ্রহের অস্তিত্ববিষয়ে আস্থাবান হইলেন।

উপরোক্ত সূর্য্যগ্রহণের সময়, Swift কালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ এক মানমন্দিরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও Watsonএর ন্যায়, বৈশ্বানরের অনুসন্ধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু সমুজ্জ্বল সৌরমুকুটমালা নীল আকাশ-পটে কালিমামণ্ডিত সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে এত মনোরম দেখাইতেছিল যে, গ্রহানুসন্ধান ভুলিয়া, তিনি ঐ সকল মুকুটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বর্ণ-বৈচিত্র পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। (যিনি কখনও রঙ্গিণী রমণীর রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তিনিই উপরি-উক্ত অবস্থার সৌর মুকুটমালা দর্শন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের মনে কি ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সৌন্দর্য্যে লাবণ্য মাধুরী কিছুরই অভাব থাকে না; তবে

* Vide 'Recherches Astronomique' Tome V, par U—J. J. Leverrier.

উভয় রূপে পার্থক্য এই যে, রমণীর রূপ কবির কল্পনা অথবা দর্শকের ভাবেতেই রূপে দিক আলো করে, কিন্তু সৌরমুকুটমালা প্রকৃত পক্ষে স্বভাবেই দিক্ আলো করিয়া বিরাজ করিতে থাকে!) সূর্য্যগ্রহণকালেই ঐ সকল মুকুট-মালার মনোহারিত্ব অধিক অনুভূত হয়। কিন্তু Swift অধিকক্ষণ এই মনো-মুগ্ধকর দৃশ্যে চিত্ত স্থাপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দূরবীক্ষণকে যথাস্থানে স্থির রাখিবার জন্য তিনি একগাছি শৃঙ্খল ব্যবহার করিতেন; উক্ত পর্য্যবেক্ষণ কালে দৈববশে ঐ শৃঙ্খল বিচলিত হওয়াতে তাঁহার দূরবীক্ষণ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিচলন তাঁহাকে বিরহীর বেদনা অনুভব করাইবার উপক্রম করিতে না করিতেই, অপূর্ব এক নূতন প্রণয়িণী তাঁহার দৃষ্টিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সৌরমুকুটের পশ্চিম-প্রান্তে দুইটি জ্যোতিষ্ক পরস্পর পাশাপাশি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা-দের আকৃতি প্রকৃতি অপরাপর জ্যোতিষ্কের সহিত এত বিসদৃশ অনুভূত হইল যে, তিনি উভয়কেই কেবল নবাবির্ভূত জোতিষ্ক মনে করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাদিগের স্থিতি ও গতি যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং পরদিন পুনরায় ঐ নির্দ্দিষ্টস্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি স্বস্থানে রহিয়াছে, এবং অপরটি স্থানচ্যুত হইয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার আর কোনও নির্দ্দেশ না পাইয়া, তাহাকে গ্রহ, এবং স্বস্থানস্থিত জ্যোতিষ্ককে কেবল নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্ররূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। Watsonএর আবিক্রিয়া প্রকাশিত হইলে পর দেখা গেল যে, Swiftএর দৃষ্ট গ্রহ Watsonএর গ্রহদ্বয়ের মধ্যে কোনটার সহিত এক প্রতি-পাদন করা গেলেও ইহাদের স্থিতি গণনা বৈশ্বানরের গণনার সহিত মিলি-তেছে না। উপর্য্যুক্ত গ্রহ সকল সূর্য্যের পশ্চিমভাগে দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু লেকার্ব্বের পর্য্যবেক্ষণফল হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সময় বৈশ্বা-নর সূর্য্যের পূর্ব্বভাগে অবস্থিতি করা বিধেয় ছিল। ইহা হইতে অনেকেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, এই সকল গ্রহের অস্তিত্ব মানিতে গেলে, তাহারা সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র গ্রহ হইয়া পড়ে। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈশ্বানরের গতিনির্দ্দেশ একমাত্র লেকার্ব্বের পর্য্যবেক্ষণফলের উপর নির্ভর করিতেছে, অতএব তাহাতে যদি কোনও ভ্রম থাকে, তবে তাহা অবশ্যই গ্রহ-ফলে পর্য্যবসিত হইবে।

P 36,140

Watson এবং Swift স্ব স্ব আবিক্রিয়া প্রচার করিলে পর, জ্যোতির্ব্বিদ-

ঈপ্সিত মিলন।

জানিনেক কভু সুধার আস্বাদ, ধরায় কোথায় সুধা,
মর্ত্ত্যের মানবে কোথা পাবে তাহা, দেবে যাহে হরে ক্ষুধা ;
তবু, কথার কথায় সুধার তুলনা কখন না দিয়ে থাকি ?
সুধা-মাখা কথা, সুধাময় রাতি, সুধামুখী প্রিয় সখী!
যা'র
দরশন সুধা, পরশন সুধা, স্মৃতি যার সুধামাখা,
সারা নিশি শেষে শুকতারা মত, সে আজি দিয়েছে দেখা!
কি সুধার মোহ সিঞ্চিত পরাণে, মুছে না আঁখির ঘোর!
পরাণে পরাণে একি রে পরশ ? হরষে অবশ ভোর।
বুঝি,
শত দিবসের আকুল-বাসনা গ্রন্থি বাঁধি পরে পরে,
অতি অতি দূর সুদূর হইতে এনেছে টানিয়া তারে ?
আকুল নিশ্বাস, এমন করিয়া, কে জানিত হবে দূর,
অনন্ত বিরহ দীর্ঘ রজনী, মুহূর্ত্ত মিলনে চুর!
ওগো,
প্রাণের আবেগ কোথায় না যায় ? সাধিতে না পারে কিবা ?
ভাবি তাই সদা গূঢ় এ রহস্য,— কেবলই যামিনী দিবা।
সুখ স্বপ্ন হৃদি, স্বপন মূরতি, স্বপ্নময় দুটি আঁখি,
বারেক দেখাযে পলাইল নিশি, সুধামাখা মোহ বাখি।
ভাল এই ভাল, চাহি না অধিক, স্মৃতিময় থাক্ প্রাণে।
চির-নব রোক প্রণয় কাঞ্চন, অতৃপ্তির রসাষনে :—
সদা এমনি করিযা পবিত্র মিলন হউক প্রণয়ী জনে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বন্য মধুপের স্বপ্ন।

এক জননী, মুক্ত বাতায়নপথে একাকিনী বসিয়াছিলেন। বাবলা-তলায় শিশুগণ খেলা করিতেছিল, গবাক্ষ দিয়া তাহাদের মধুস্বর ও মধ্যাহ্ন মারুতের উষ্ণ নিশ্বাস গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। মধুপেরা গৃহের ভিতরে বাহিরে উড়িতেছিল,—তাহারা আরণ্য মধুকর—অনবরত গুন্ গুন্ করিতে করিতে পুষ্পপরাগপীত চরণে বাবলা-গাছে উড়িয়া যাইতেছিল, আবার আসিতেছিল। তিনি টেবিলের সম্মুখে এক খানি অনুচ্চ চেয়ারে বসিয়া সীবন করিতেছিলেন। টেবিলের উপর ঝাঁপিতে সূচিকার্য্যের যে উপকরণ ছিল, তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন;—কতক তাঁহার জানুর উপর পড়িয়া রহিল, এবং ক্রোড়স্থিত বহিখানিকে অর্দ্ধাচ্ছাদিত করিল। তিনি সূচীর প্রবেশ ও নির্গম নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বিষণ্ণ ভ্রমর গুঞ্জন ও শিশুকণ্ঠের উচ্চ রব মিশ্রিত হইয়া, তাঁহার কর্ণকুহরে কলতানের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল, এবং ক্রমে ক্রমে কার্য্যে তাঁহার শৈথিল্য জন্মিতেছিল। তখন কতকগুলি দীর্ঘপদ বোলতার মত মৌমাছি,—তাহারা কখনও মধুসঞ্চয় করে না;—তাঁহার মস্তকের নিকটে,—অতি নিকটে, গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িতেছিল। এই সময় তাঁহার খুব তন্দ্রা আসিল,—তিনি টেবিলের ধারে হস্ত বিস্তৃত করিয়া দিলেন, এবং তাহার উপর মস্তক বিন্যস্ত করিলেন। বাহিরের শিশুকণ্ঠরব স্বপ্নবৎ—আরও স্বপ্নবৎ হইয়া উঠিল,—এই দূরে যায়,—এই কাছে আসে। তাহার পর তিনি আর সে রব শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্মুখভাগে অবনত হইয়া তিনি নিদ্রামগ্ন; মাথার উপর ভ্রমরপুঞ্জ উড্ডীয়মান; এই অবস্থার এক অনৈসর্গিক ছবি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইতেছিল। তাঁহার বোধ হইল, মধুকরগুলি ক্রমে দীর্ঘ—দীর্ঘতর হইয়া, মানব রূপে পরিণত হইয়াছে, এবং তাঁহার চারি দিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর, তাহাদের মধ্যে এক জন ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "যেখানে গর্ভশয্যায় তোমার শিশুটি ঘুমাইতেছে, সেই স্থান আমায় স্পর্শ করিতে দাও। যদি আমি তাহাকে স্পর্শ করি, সে আমার মত হইবে।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি স্বাস্থ্য। আমি যাহাকে স্পর্শ করিব, সর্ব্বদাই তাহার শিরায় শিরায় লোহিত রুধির নাচিয়া বেড়াইবে; সে কখনও অবসাদ বা যাতনা জানিতে পারিবে না; জীবন তাহার পক্ষে চিরন্তন হাস্য বলিয়া বোধ হইবে।"

আর এক জন বলিল, "না, আমায় স্পর্শ করিতে দাও। কারণ, আমি ঐশ্বর্য্য; আমি যদি স্পর্শ করি, পার্থিব উদ্বেগ তাহাকে জীর্ণ করিতে পারিবে না। সে তাহার সমানধর্ম্মা মানবের পেশী ও কধিরে জীবন ধারণ করিবে; তাহার নয়ন যাহার কামনা করিবে, পাণি তাহা প্রাপ্ত হইবে। অভাব কি,—সে কখনও জানিতে পারিবে না।" শিশু সীসের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

অন্য এক জন কহিল, "আমায় উহাকে স্পর্শ করিতে দাও। যে আমা দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহাকে আমি উচ্চ শৈলশিরে লইয়া যাই,—সেখানে সকল লোকে তাহাকে দেখিতে পায়। যখন সে মরিয়া যায়, তখনও কেহ তাহাকে বিস্মৃত হয় না, তাহার নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া ধ্বনিত হয়, প্রত্যেক শতাব্দী, তাহার নাম মানব-মণ্ডলীতে প্রতিধ্বনিত করিয়া দেয়। ভাবিয়া দেখ—চির যুগ ব্যাপিয়া লোকের মনে থাকা!"

শয়ান রমণীর স্থির নিশ্বাস পড়িতেছিল, কিন্তু সেই মস্তিষ্কচিত্রে, বন্য মধুপেরা যেন তাঁহার আরও সন্নিহিত হইয়া আসিতেছিল।

এক জন বলিল, "আমায় বালকটিকে স্পর্শ করিতে দাও। আমি প্রেম। আমি যদি স্পর্শ করি, তাহাকে কখনও জীবন-পথে একাকী ভ্রমণ করিতে হইবে না। ঘোরতর অন্ধতমসে যখনই সে হস্তপ্রসারণ করিবে, তখনই আর এক জনের কর খুঁজিয়া পাইবে। যখন সমস্ত পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, তখন আর এক জন বলিবে—তুমি আর আমি।" শিশু কম্পিত হইয়া উঠিল।

আর এক জন সন্নিহিত হইয়া আসিল এবং কহিল, "আমায় স্পর্শ করিতে দাও; আমি প্রতিভা। আমি পুরাতনকে নূতন করিতে পারি। যে সকল সৈনিক, রাজমন্ত্রী, চিন্তাশীল ও রাজনৈতিক, জীবনে সফলতা লাভ করিয়াছেন, যে সকল লেখক কখনও তাঁহাদের কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী নহেন,—আমি তাঁহাদের স্পর্শ করি। যদি আমি এই শিশুকে স্পর্শ করি, ইহাকে কখনও অকৃতকার্য্যতার জন্য কাঁদিতে হইবে না।"

ভ্রমরেরা জননীর মস্তকের চারি দিকে উড়িতে উড়িতে তাহাদের ক্রমসূক্ষ্ম দীর্ঘ অঙ্গ দিয়া তাঁহাকে ছুঁইয়া যাইতেছিল। প্রকোষ্ঠের ছায়া হইতে, এক

জন তাঁহার মস্তিষ্কচিত্রে আবির্ভূত হইল—তাহার গভীররেখাঙ্কিত পাণ্ডুর মুখ, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মুখে হাস্য-রেখা কম্পিত হইতেছে। সে হস্ত প্রসারণ করিল। জননী পশ্চাতে সরিয়া আসিল, চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি কে?" সে কোনও উত্তর দিল না। জননী, তাহার কুঞ্চিত অক্ষিপুটের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি শিশুকে কি দিতে পার—স্বাস্থ্য?" সে কহিল, "আমি যে মানবকে স্পর্শ করি, তাহার রক্তে জ্বলন্ত জ্বর জাগিয়া উঠে,—সেই জ্বর অগ্নির মত তাহার সমস্ত রক্ত লেহন করে। আমি যে জ্বর দিব, জীবনের অবসান নহিলে তাহা আরোগ্য হইবে না।"

"তবে তুমি কি ঐশ্বর্য্য দিবে?"

সে মাথা নাড়িল। "যাহাকে আমি স্পর্শ করি, সে যখন কাঞ্চন তুলিতে নত হয়, তখন সহসা তাহার মস্তকের উপর,—আকাশমণ্ডলে আলো দেখিতে পায়। যখন সে আলো দেখিতে ঊর্দ্ধে চাহে, তখন তাহার অঙ্গুলি গলিয়া-স্খলিয়া পড়িয়া যায়, অথবা কখনও কখনও আর কোনও পথিক তাহা লইয়া যায়।"

"যশ?"

সে উত্তর করিল, "বোধ হয—নয়। বালুকার উপর অঙ্গুলিচিহ্ন-অঙ্কিত এক পথ আছে—কোনও মানুষ তাহা দেখিতে পায় না,—আমি যাহাকে স্পর্শ করি, সে অবশ্যই সেই পথে যাত্রা করিবে। সেই পথ বাহিয়া কখনও কখনও সে প্রায় শিখরদেশে উপনীত হয়, এবং তাহার পর সহসা উপত্যকায় নামিয়া আসে। যদিও আর কেহ সেই পথচিহ্ন দেখিতে পায় না,—কিন্তু তাহাকে সেই পথের পথিক হইতে হইবেই।"

"প্রেম?"

সে বলিল, "সে প্রেমের জন্য লালায়িত হইবে, কিন্তু প্রেম খুঁজিয়া পাইবে না। যখন সে প্রেমের কামনায় বাহু বিস্তার করিবে, এবং একান্ত অনন্যমনে বাঞ্ছিতের কামনা করিবে, তখন সে বহু দূরে—দিক্‌চক্রবালের কোলে এক আলোকলীলা দেখিতে পাইবে। সে নিশ্চয়ই তদভিমুখে ধাবমান হইবে। তাহার প্রেমাস্পদ বস্তু তাহার সঙ্গে যাইবে না; তাহাকে একাকী ভ্রমণ করিতে হইবে। যখন সে 'আমার, আমার, আমার আপনার!' বলিয়া কাহাকেও হৃদয়ে চাপিয়া ধরিবে, তখন সে এক স্বর শুনিতে পাইবে—'পরিত্যাগ কর! পরিত্যাগ কর! ও তোমার নয়!' "

"সে কি কৃতকার্য্য হইবে?"

সে কহিল, "বিফল হইবে। যখন সে অন্য লোকের সঙ্গে ছুটিবে, তখন অপরে তাহার অগ্রে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবে। কারণ, অদ্ভুত স্বর তাহাকে আহ্বান করিবে, অদ্ভুত আলো তাহাকে ইঙ্গিতে করিবে, এবং সে নিশ্চিতই অপেক্ষা করিবে ও শুনিবে। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে; বহু দূরে, জ্বলন্ত বালুকারাশির অপর পারে, যেখানে লোকে কেবল অনুর্ব্বর মরু দেখিবে—সে তথায় সুনীল সাগর দেখিতে পাইবে। সেই সাগরের উপর সদাই সূর্য্যরশ্মি দেদীপ্যমান, তাহার জল জ্বলন্ত বেগুনী মণির মত নীল, এবং সৈকতে শুভ্র ফেণমালা। সাগরগর্ভ হইতে এক বিস্তীর্ণ দেশ উদ্গত,—সে তদুপরি পর্ব্বতশিখরে জ্বলন্ত কনকরাশি দেখিতে পাইবে।"

জননী জিজ্ঞাসিলেন, "সে তথায় যাইতে পারিবে ত?"

সে সকৌতুকে হাসিল।

রমণী পুনরায় কহিলেন, "একি প্রকৃত?"

সে বলিল, "কি প্রকৃত?"

জননী, তাহার অর্দ্ধমুকুলিত অক্ষিপুটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "স্পর্শ কর।"

সে অগ্রসর হইয়া আসিল, নত হইয়া ঘুমন্ত শিশুর উপর হস্ত স্থাপন করিল, এবং সস্মিতমুখে কাণে কাণে কি বলিল; জননী কেবল এইটুকু শুনিতে পাইলেন—"এই তোমার পুরস্কার—তোমার 'মানস' সত্য হইবে।"

বালক কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু মাতা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে এই অদ্ভুত ছবি খানি তিরোহিত হইয়া গেল। গর্ভস্থ শিশু, সেই সময় একটি স্বপ্ন দেখিল। যে নয়ন কখনও দিবসের আলো দেখে নাই, সেই নয়নে, সেই অর্দ্ধ বিকশিত মস্তিষ্কে, একটা আলোকের অনুভূতি হইয়াছিল। আলো—যাহা সে কখনও দেখে নাই। আলো—সম্ভবতঃ সে কখনও যাহা দেখিবে না। আলো—যাহা কোথাও বর্ত্তমান ছিল।

ইতিমধ্যেই সে তাহার পুরস্কার পাইয়াছিল। তাহার "মানস" (Ideal) প্রকৃত হইয়াছিল। (১)

---

(১) Olive Schreinerএর Dreams হইতে অনুবাদিত।

শিশু-মঙ্গল।

খুকির আদর।

১

আবশি-ভাঙুনি, চেয়ার-নাশিনি,
পুস্তক-ছিঁড়ুনি, কাগজ-গ্রাসিনি,
সর্ব্বত্রগামিনি, সুন্দর ডাকিনি,
মোর খুকুমণি!

২

দুই করে ধরি মোর পিঠ্ ছড়ি,
পীঠে তার চড়ি ঘোড়া দড়বড়ি,
গৃহ আরব্যের অশ্বারোহী সবি,
মোর খুকুমণি!

৩

পোকা-ধরা-ব্রতে ব্রতী অনুক্ষণ,
বোন্‌তার সাথে বন্ধুত্ব কারণ,
সদানন্দ-মনে পশ্চাৎধাবিনী,
মোর খুকুমণি।

৪

আঙ্গুরেতে মাখা চুম্বন-লোহাগ,
পীচ্ ফলে সিক্ত অধরের রাগ,
শিরীষ-কোমল, শিশির বিমল,
চন্দ্রমা-উজল, দেবতা-রূপিণি,
মোর খুকুমণি।

৫

বুকে ভরপুর মাতোয়ারা সুখ;
মাঝে মাঝে কিন্তু ফুলে উঠে মুখ,
দুধ হ'তে হেরি দুধ ও ঝিনুক,
মোর খুকুমণি!

শিশুর স্তন্যপান।

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজোন বোধে,
দেখ দেখি ভাল করে,
বোঝা যায় কার কত উপমার গরিমা।
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব্ব গর্ব্ব হয়ে গেল সর্ব্ব কবি মহিমা।

২

"ওই দেখ প্রজাপতি বসে আছে সুখে—
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, কবরীর মুখ চুমে নিরুমে!
কারো ঠাঁই, কোনো ঠাঁই,
ইহার তুলনা নাই;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল ভূমে?"

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না।
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য লোভি,
আমি গো সর্ব্বত্যাগী;
বিবাগী বৈরাগী সাথে কোরো না রে ছলনা!
রেখে তব রঙ্গ ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অন্তঃপুরে গিয়ে, দেখে এস সুষমা!
শুভ্রতারা ক্রোড়ে লয়ে বসে আছে চন্দ্রমা!

৪

চুপ! চুপ! চুপে এসে, ঐখানে থাক বসে;—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে;
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত-সৌরভে।
অনুপম, অপরূপ! দেখিছ না? চুপ! চুপ!
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে!
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি!—ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে।
ফুল্ল বুক!—রাজা যেন বৈভবের গরবে!
আত্মহারা!—প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে!
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক বসে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে!—
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পুরবে।

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজোন করে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে,
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা।
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব্ব গর্ব্ব হয়ে গেল সর্ব্ব কবি মহিমা।

জননী-উৎসঙ্গে শিশু।

১

ওরে শিশু, মার কোলে উঠি,
(বুঝিবারে নারি তোর ধারা)
একেবারে হেসে কুটিকুটি—
শিশুর হর্ষের বুঝি
নাহি কোন কূল ও কিনারা?

২

আকাশ-গম্বুজে যথা উঠি,
জ্যোৎস্না-রাশি মাখি সর্ব্ব অঙ্গে,
মেঘে মেঘে করে লুটাপুটি,
ক্ষুদ্র পাখী মাতি কত রঙ্গে,
তেমতি রে তোর এ আনন্দ
উঠি এই সুন্দর উৎসঙ্গে!

৩

তীর হ'তে ঝাঁপাইয়া জলে,
রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া,
আনন্দে উধাও হয়ে চলে
তরঙ্গ-তুরঙ্গে আরোহিয়া,
আনন্দ উথলি উঠে তোর
তেমতি এ উৎসঙ্গে উঠিয়া।

৪

প্রজাপতি মাধবীর ঝাড়ে
প্রসারিয়া স্বর্ণপাখা দুটি,
সঞ্চারিণী মাধুরী যেন রে,
করে যথা হর্ষে ছুটাছুটি;
তেমতি রে তোরো আঁখি
হাসে নাচে, সিংহাসনে উঠি।

৫

রক্ত কমলের কুঞ্জে পশি,
নিরালায় গুঞ্জরি গুঞ্জরি,
ভুলে গেল আপনা পাশরি
পদ্মের বাহিরে আছে
আন্ বিশ্ব, আন্ কোন্ পুরী।

৬

ওরে শিশু, শিশুবাক্য মাঝে,
রসন্তের নাহি কি রে সীমা?
ইন্দ্রধনু স্বর্ণবর্ণে রাজে
নিশিদিন প্রকাশি গরিমা?
মুনি-কণ্ঠে দিন দিন
গাঢ়তর হয় কি বক্তিমা?

৭

পুষ্পদের আপনার ভাই!
পাখীদের জীবনের সখা!
ধূপধূনা কিছুই না চাই,
দেবালয়ে তুমি দিলে দেখা—
দেবতার অর্চ্চনার বস্তু,
ওহে শিশু, তুমি মাত্র একা!

৮

সুস্থকায়, প্রফুল্লহৃদয়,
উষাকালে, প্রসন্ন বিধাতা,
চারি ধারে শশী সমুদয়,
নীহারিকা, লতা, পুষ্প, পাতা,
সৃজি তোরে, ভাবমুগ্ধ,
নেত্রজল মুছিলা বিধাতা!

৯

কথা যদি কহিত গোলাপ,
অশোক গাহিত যদি গীত,
তবু তোর মধুর প্রলাপ
তাদের কবিত পরাজিত:
সজীব রাগিণী মরি,
তোর ওই অস্ফুট সঙ্গীত!

১০

নন্দনে অপ্সরীদের গান
মগ্ন প্রাণে শুনিতে শুনিতে,
ঘুমঘোরে হলি ম্রিয়মাণ—
দেবদূত অমনি ত্বরিতে
ক্রোড়ে তোরে তুলে লয়ে,
হরিয়ে আনিল আচম্বিতে।

১১

এ বিদেশে সুরপুর-সুর
আভু আছে প্রাণে তোর গাঁথা;
তাই তোর হর্ষ ভরপুর,
ছুঁতে নারে নৈরাশ্যের ব্যথা;
অলি-মুখরিত আর কোকিল-
কূজিত যেন বাসন্তী কবিতা!

১২

মন্দাকিনী-তরঙ্গ-শীতল,
পারিজাত-সৌরভেতে ভরা,
তাই তোর বদনমণ্ডল—
হে অমর, শোক তাপ জরা
নাহি তোর হাসি মাঝে,
তুই যেন শান্তির ফোয়ারা।

১৩

হে বিধাতঃ! আমাদের প্রতি
কেন সে কৃপা তব নাই?
যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধের মূরতি
আন্ মনে সৃজিলে গোসাঁঞি—
অশান্তি ঢালিয়া দিলে;
রক্ষ প্রভু, তোমার দোহাই।

১৪

চেয়ে দেখ, দেখ গো বিধাতা,
অশরীরী আত্মার মরমে,
ঘোর এই সংসারের জাঁতা,
ঘোরতর তাহার পেষণে
বাঁধুনি খুলিয়া গেছে;
কি কহিব শরীরের কথা!

১৫

হে বিধাতঃ! তোমার দোহাই,
শিশু কর, শিশু কর মোরে;
যযাতি-যৌবন নাহি চাই,
চাহি মাত্র জননীর ক্রোড়ে
আবার নাচিতে নাচ,
মাতাইয়া জগত সংসারে!

মাতাল।

"মাতাল"!—

সহসা শুনি এই সম্বোধন,
একেবারে হইলাম বিস্ময়ে মগন!
ঘুম হ'তে উঠিয়াও আমাদের আঁখি
হয় না'ক লাল কভু, সাবধানে থাকি,
ধীরে করি পদক্ষেপ বিষম দুর্দ্দিনে!
খাই নি আছাড় কভু এ দীর্ঘ জীবনে!
তবে আজি মা আমার, কাহারে লক্ষিয়া
করিছেন তিরস্কার "মাতাল" বলিয়া?
এতেক আন্দোলি চিত্তে, হয়ে অগ্রসর,
জানিতে বিশেষ তথ্য, চলিনু সত্বর
বাবাজীর দিকে;—তথা নয়নের সুখ,
হেরিলাম মাতালের বিচিত্র কৌতুক!
টল টল, চল চল, জুতা পায়ে দিয়া,
চলেছেন খোকা বাবু হেলিয়া দুলিয়া!
কবে কোন্ কালে, সেই বাসবের পাশে,
সুধা-brandy খেয়েছিলি মন্দারের গ্লাসে,
এখনো গেল না নেশা, হায় রে কপাল,
না জানি কেমন সুরা। কেমন মাতাল।

মা যশোদার প্রতি রাখালবালকদিগের উক্তি।

ওগো মা জননী, ওগো নন্দরাণি,
(একবার) বল্ বল্ বল্ ওরে নাচ্‌তে।
(একবার) তেম্‌নি করে, নূপুর পরে নাচ্‌তে!

ছোট বাহু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
কণ্ কণ্ কণ্ নূপুর বাজায়ে,
হাসায়ে কাঁদায়ে, কাঁদায়ে হাসায়ে,
তেমনি করে বল্ ওরে নাচ্‌তে!
সখাদের মাঝ, সেজে রাখালরাজ,
বিপিনে বিপিনে, সাজি কত সাজ,
কৌমার গোষ্ঠেতে নাচিয়াছে নাচ,
(একবার) বল্ ওরে বাল্য নাচ নাচতে!
গোপীদের মাঝ, সাজি রসরাজ,
যৌবননিকুঞ্জে সাজি কত সাজ,
নাচিয়াছে নাচ লাজে হানি বাজ—
(সে সব) নাচুনি কুঁদুনি, অঙ্গের দোলনি,
হেরিয়া হেরিয়া, ওগো নন্দরাণি,
ক্লান্ত দু নয়ন, করে আকিঞ্চন,
(তোর) গোপালের বাল্যখেলা দেখ্‌তে!
(সে গো) নয় অসম্ভব, ওগো নন্দরাণি,
যমুনার জল (ভালরূপে জানি)
বহে গো উজান বাঁশীরব শুনি!
ওরে বল্ বল্ (একবার) ভাল করে বল্
তোর গোপালেরে, তেম্‌নি করে নাচতে।
দু' বাহু ঘুরাতে, নূপুর বাজাতে,
নাচাতে, কাঁদাতে, হাসাতে মাতাতে,
সারা ব্রজজনে পাগল বানাতে,
ওরে বল্ বল্, তেমনি ক'রে নাচ্‌তে!

মাতুলালয় হইতে রাণীর প্রত্যাগমন।

"ওমা শোন্ শোন্, কাণ পেতে শোন্,
দুয়ারে থামিল গাড়ী!
খুকিরে লইয়ে, বউরে লইয়ে,
দাদারা ফিরিল বাড়ী,—
এই কথা বলি, ধায় সরোজিনী,
(সরোজিনী ভগ্নি মোর)
মাথার কাপড়, ভূমে লুটোপুটি,
নাহিক ভ্রূক্ষেপ ওর।
অসামাল দেহ, অসামাল প্রাণ,
সিঁড়ি দিয়া ছোটে বোন্!
আপন বাসায়, উল্কা বেগে ধায়,
যেন কোন বিহঙ্গম!
"ওই কাঁদে খুকি, বল্ বল্ বুকি,
কে তোরে কাঁদালে বল্?
মিছামিছি কান্না ভাল ত লাগে না;
উপরেতে চল্ চল্।"
পিসির দরশে, পিসির পরশে,
ঠাণ্ডা হ'ল খুকুমণি;
মন্ত্রমুগ্ধ যথা সাপুড়িয়া করে,
হয়ে যায় দুষ্টফণী!
বলে সরোজিনী, হর্ষে আটখানা—
"কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি।
তিন মাস ছিল, মামার বাড়ীতে,
তবু কোলে এল খুকি!
দেখ মা আমারে, চিনিয়াছে খুকি,
মোরে বড় বাসে রাণী;
এত বুদ্ধি ওর এক বস্তি পেটে
কোথা থাকে নাহি জানি!
দেখ মা খুকির ডাগোর ডোগোর
হইয়াছে চক্ষু দুটি!"—
কোলে লয়ে তারে, সুখী সরোজিনী
গৃহে করে ছুটাছুটি!
মায়েরে দেখায়, দাদারে দেখায়,
চট্‌কায় জোরে তারে।
মার তিরস্কার নাহি শোনে কাণে,
জোরে টেপে বারে বারে।
হাসিয়া হাসিয়া বলে সরোজিনী—
"উহারে টিপিতে বেশ;
ফুলের মতন দেহের গঠন,
রেশমের মত কেশ!
এত ওরে টিপি, মুখ টিপে টিপে
খুকি তবু হাসে কেনে?

মোর কোলে আছে, তাই তোমাদের
হিংসা বুঝি জাগে মনে ?"
এই কথা বলি ভাইঝির কাণে
চুপি চুপি বলে পিসি—
"তো বিনে লো রাণি, আঁধার আঁধার
হেরিতাম দশ দিশি !
বামুন ঠাকুর আলুনি ব্যঞ্জন
রাঁধে যথা ক্রমাগত,
তো বিনে লো রাণি. সকলি আলুনি,
সুখ সাধ বোধ হ'ত।
রাত দিন মোরা গণিতাম দিন,
কবে ফিরিবেক বাণী ;
আমাদের জন্যে, হ'ত কি উদাস
তোরো কি ও ক্ষুদ্র প্রাণী ?
বল্ বল্ বাণি, চুপি চুপি বল্,
চুপি চুপি মোর কাণে,
তিন মাস পরে কেমনে চিনিলি ?
ছুটে এলি মোর পানে ?"
পিসিমার কাণে কহে খুকুমণি,
বিস্ফার করিয়া আঁখি ;
কবি কর্ণে আমি শুনিতে পেলাম,
নিভৃতে লুকায়ে থাকি।
বালক যেমন, কাণ পাতি শোনে,
হয়ে মহা কুতূহলী,
ভোম্‌রার চাকে, মৃদু গুঞ্জরণ,
অলিদের বলাবলি।
কিম্বা যথা কেহ, সমুদ্র পুলিনে,
ঝিনুক্ তুলিয়া করে,
সোঁও সোঁও শব্দ, শোনে মন দিয়া,
কাণে লাগাইয়া ধীরে,
সেইরূপ আমি, শুনিতে পেলাম
পিসিরে চিনিল যথা,
অমৃত কাহিনী, বহস্যের গাথা,
পিসি ভাইঝিতে কথা।

মাধুরী।

(গাজিপুরে অবস্থিতিকালে কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "মাধুরী" নামক কন্যাটিকে দেখিয়াছিলাম। তাহার মাতৃদত্ত নাম "বেলা"। কন্যাটি সাক্ষাৎ মাধুরী। এই কবিতাটি তাহার ক্ষুদ্র করকমলে উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।)

রূপ-চম্পকের তুই অস্ফুট কলিকা,
অস্ফুটন্ত উষা তুই ; অলকে ঝলকে
ঝল মল স্বর্ণ-বিভা নয়ন-পলকে
চুমো খায় চুপি চুপি স্বপন-বালিকা !
মল্লিকার সাথী তুই ; কৌমার-কোরকে
কি সৌন্দর্য্য,—প্রজাপতি তোরো অঙ্গে রঙ্গে
নাচে মরি রূপ-ভঙ্গে ;—তুই তার সঙ্গে
পাতাইলি "বেলা-যুঁই" ভায়ের চমকে।
হাসিয়ে গোলাপ-বালি, মল্লিকার মাসী,
দু-কপোলে লালে লাল দিল রূপরাশি,
হাসি ফুল্ল মৃণালিনী, "মাধুরী" বলিয়া,
সৌরভে ভরিয়া দিল চুমিয়া চুমিয়া।
আনন্দ-মদিরা কবি, পিয়ে আঁখি ভরি,
দুহিতার নাম করি রাখিল "মাধুরী"।

উমা।

(এই কবিতাটি কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বাবুর "উমা" নামক কন্যার কর-কমলে উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল।)

তোরে দেখিলে পরে,
শুনিবি মেয়ে ?
এ হৃদি-বাগানেতে,
সহসা ফুটে উঠে,
সুরভি, আলো-করা,
বকুল ফুল ;
বকুল তরু-তলে,
বালক বালিকারা

করিছে হুড়াহুড়ি.
হর্ষে আকুল,
কাহারো কেশ বাশি
আননে উড়ে পড়ে,
কারো বেশর নাচে,
কাহারো দুল।
কাহারো আঁখি-কোণে
স্বপন-বালা ভণে
"শিশু-সুষমা-হুদে
নাহি গো কুল",
কারো চিবুক ধরি,
দেবের শিশু মরি,
বসায় লালে লাল
অধরে "গুল"।
কাহারো অভিরামে
হেরে অলক দাম,
কবে তারকাময়
এলান চুল,
সেই ভাবার মাঝে,
তুই শশীর সাজে,
(কবির প্রাণ-আঁখে
হয় কি ভুল?)
নাশিয়ে অমানিশি
ছড়াস্ আলো রাশি,—
চকোর চুমে আসি
বকুল-মূল।
প্রকৃতি হেসে বলে,—
"রক্ত শতদলে
কিরণ, অলি জালে,
নাহি রে তুল।
গলেতে হেঁসো হার,
এলান কেশভার,
উমা তেমতি মোর,
বিশ্বে অতুল।"

মণি-কুণ্ডলা।

(কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের মাতৃহারা কন্যা, মণিকুণ্ডলার করকমলে এই কবিতাটি উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।)

১

যেন, কাঙাল কবির একমাত্র ধন,
কল্পনা সুষমা,
যেন, হৃতসর্ব্বস্বের লুকান' যতন,
আশা নিরুপমা,
যেন, বসন্তবিধুর হিমানী-প্রদেশে
একমাত্র ফুল,
যেন, আঁধার আঁধার লুপ্ত-চন্দ্র রাজ্যে
তারকা অতুল।

২

যেন, চৈত্রসংক্রান্তির বিদায় সাঁঝেতে
মলয়া হিল্লোল,
যেন, রাজপুতানার সাহারা-অরণ্যে
জলের কল্লোল,
যেন, হৃত পরাজিত দেশহিতৈষীর
আত্মার মর্য্যাদা,
যেন, ধর্ম্মদেবতার 'বিজয় পতাকা'
কর্ত্তব্য-সমাধা।

৩

যেন, প্রবীণ কবির প্রতিভার চিহ্ন
দুইটি সঙ্গীত,
যেন, লক্ষ্মীপূজা-অন্তে ইন্দিরার ঝাঁপি
যতন রক্ষিত,
সত্য, চিলাই-সবসী চির-রূপসীর
স্মৃতির মুকুর,
তাহে, পলকে পলকে এখনো ঝলকে
মণি কহিনুর!

৪

না রে, মা-হারা বালিকা, তুইরে মণিকা,
নয়, কভু নয়;
তোর, জনকের বক্ষে সোহাগের দুগ্ধ
অবিরাম বয়,
আহা, আমরা বিদেশী, আমরা গো পর,
তবু, তোরে গরবিনি,
ভাবি, রূপেগুণে ধন্যা আমাদেরি কন্যা
নয়ন-নন্দিনী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রকৃতির মূর্ত্তি।

সাংখ্যদর্শনে যে অর্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার হয়, এখানে প্রকৃতি বলিতে তাহাই বুঝিব। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অর্থ লইয়া যথেষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা তুলিয়া একটি সুবৃহৎ ও সুপুষ্ট প্রবন্ধ লেখা চলিতে পারে। সেরূপ বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া, ব্যক্ত প্রকৃতি অর্থে মোটের উপর সকলে যাহা বুঝেন, তাহাই ধরিয়া লইব।

গত ভাদ্রের সাধনায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, প্রকৃতির ও প্রকৃতির অভিব্যক্তির সাংখ্যমতানুযায়ী তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় অধিক দেখিয়াছি, বোধ হয় না।

একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ লইয়া; ব্যক্ত প্রকৃতির মূলে অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা এখানে তুলিব না। সাংখ্যদর্শন ইহার অস্তিত্বে বড় সন্দিহান নহেন। বেদান্তের সহিত এইখানে সাংখ্যের বোধ করি মূলগত প্রভেদ। আজি কালি অজ্ঞেয় বলিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখাই পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয় মতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাহা বলা যাইতে পারে, স্থানান্তরে তাহার একরূপ আলোচনা করিয়াছি। (১)

ব্যক্ত প্রকৃতি—অর্থাৎ জগৎ আমার নিকট যে ভাবে প্রতীয়মান হয়। জগতের একটা রূপ আছে,—আমাকে ছাড়িয়া আছে বলিতেছি না; আমার কাছে একটা রূপ আছে—ইহা স্বীকার্য্য। এই রূপটা গন্ধস্পর্শশব্দাদিময়। যে কাগজখানার উপরে কালির আঁচড় দিয়া লিখিয়া যাইতেছি, গন্ধস্পর্শাদি পাঁচটা বিষয় তাহা হইতে বাহির করিয়া লইলে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—কথাটা বোধ করি সম্পূর্ণ ঠিক হইল না। কেন না, রূপরসাদি আমার বর্ত্তমান, এই মুহূর্ত্তের লক্ষ্যমাণ জগতের সম্পত্তি। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগৎ ছাড়াইয়া আরও খানিকটা অংশ আছে, সেটাও প্রকৃতির অংশ। সেটা বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ নহে, এই মুহূর্ত্তে তাহাকে আমি ছুইয়া নাই; কিন্তু বস্তুতঃ এককালে হয় ত আমার সহিত তাহার স্পর্শ ঘটিয়া

(১) সাধনা—'জগতের অস্তিত্ব' প্রবন্ধ।

ছিল কখন তাহা আমার প্রত্যক্ষ বিষয় ছিল; অথবা ভবিষ্যতে আমার প্রত্যক্ষ বিষয়ের মাঝে আসিতে পারে। হয় ত আমার প্রত্যক্ষীভূত কখন হয় নাই বা হইবে না; কিন্তু তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়া তাহার সত্তা স্বীকার করিয়া লই। সম্প্রতি এডাম্‌স্‌ ও লাভেরিয়ে কর্ত্তৃক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নেপ্‌চুন্‌ গ্রহের স্থানগণনা তুলনা করিতেছিলাম। নেপ্‌চুন্‌ গ্রহ কখন আমার প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে নাই; তাহার রূপ রস গন্ধ (?) কখন আমার ভোগে আইসে নাই। ইতিমধ্যে যে কখন আসিবে, তাহার সম্ভাবনাও দেখি না। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া তাহাকে আমার জগতের বাহির বলিতে পারি না। জানালা দিয়া ঐ যে সান্ধ্য গগনের পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল পূর্ব্বাকাশে এখনি দেখিতেছি, ঐ চন্দ্রও আমার পক্ষে যে ভাবে যে অর্থে অস্তি, আমার পুঁথিগতনামা নেপ্‌চুন গ্রহও আমার নিকট সেই অর্থে অস্তি। চন্দ্র ও নেপ্‌চুন্‌ উভয়েরই দূরত্ব, ব্যবধান আকার প্রকার সম্বন্ধে কতকগুলা পরস্পর তুলনীয় ভাব, একই সঙ্গে আমার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করিতেছে। গল সাহেবের দূরবীণ প্রয়োগের আগে উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয়ের মানস চক্ষের সমক্ষে নেপ্‌চুন্‌ গ্রহ যেমন আবির্ভূত ছিল, সম্প্রতি আমারও মনশ্চক্ষু কতকটা সেইরূপ সেই দিকে ধাবিত হইতেছে।

ফল কথা, জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যে টুকু, তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের অর্থাৎ কতিপয় অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। আর প্রত্যক্ষের বাহিরে বাকী যে টুকু, সে টুকু বর্ত্তমানের অনুভূতি নহে; সেটাকে স্মৃতি বা অনুমান, কল্পনা বা যুক্তি, বিশ্বাস বা স্বপ্ন, এই সকলের মধ্যে ফেলিতে পার। স্মৃতি, অনুমান, যুক্তি, যাহাই বল, কাহারও না কাহারও কোন না কোন কালের অনুভূতি হইতে তাহার উৎপত্তি, সে বিষয়ে দ্বিধা করিও না। সেরূপ দ্বিধা করিতে গেলে একালে আর চলিবে না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, সমগ্র ব্যক্ত প্রকৃতির মানচিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে; সেইটা আমাদের বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারি পাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোর আধ আঁধারে, আরও খানিকটা স্থান ঈষৎ পরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সামগ্রী নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটার নাম দূরগত ও দর্শনাতীত, আর খানিকটার নাম সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতি ও শ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন; ও আর

খানিকটার নাম আশা ও ভয়। সম্মুখস্থ এই টেবিল, কালি ও কাগজ, দীপাধার, প্রদীপ ও দীপশিখা, বাসবার সমেত গৃহপ্রাচীর, রান্নাঘরের ধোঁয়া সমেত ভৃত্যমুখনিঃসৃত ধ্বনি, জানালার বাহিরে নারিকেল গাছ ও তদুপরি নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র, উৎকট গ্রীষ্ম ও রাস্তা ও চতুঃপার্শ্ব হইতে আগত উৎকটভব কলরব—ইত্যাদি মিলিত হইয়া আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে, ইহা ছাড়িয়া গল সাহেবের গ্রহ ও মিকলা তেস্‌লার তাড়িত তরঙ্গ, ক্লিকোর্ডের কীট ও মাক্সবেনের ভূত, মধুসূদন দত্তের জীবনলীলা (যাহা সকালে যোগীন্দ্র বাবুর পুস্তকে পড়িতেছিলাম) ও আগামী তারিখের অন্নচেষ্টা, বেঞ্চের উপরি কাতার দিয়া ছাত্রের শ্রেণী ও তৎসঙ্গে সাহিত্যসম্পাদকের তাগাদা, এই কয়টা ও ইহা সেওগায় আরও কত কি লইয়া আমার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবশিষ্ট জগৎ।—ইহাদের মধ্যে কোনটা আমার শক্তি, কোনটা আমার স্মৃতি, এবং শেষোক্তটা বোধ করি ভয়; কিন্তু কোনটাই বর্ত্তমান শব্দস্পর্শাদিময় অনুভূতি নহে। গোচর অগোচর উভয়ই আমার পক্ষে ব্যক্ত প্রকৃতির অঙ্গীভূত। গোচর ও অগোচর উভয়ের মাঝে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভবে না। গোচর গিয়া অজ্ঞাতসারে অগোচরে লীন হইতেছে; অগোচর আসিয়া অজ্ঞাতসারে গোচরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আবার প্রকৃতির মানচিত্রেরও সীমানা টানিতে পারি না। তখনি সেই সীমানা রেখা বিস্তার লাভ করিয়া মানচিত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিতেছে; তখনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া আমার নিজের অস্তিত্বের ভিতর মিলাইয়া যাইতেছে। কেন না, আমার নিজের অস্তিত্ব এক অর্থে এই মানচিত্রখানার সমব্যাপী। আমি এই মানচিত্রখানা জড়াইয়া আছি; ইহাই আমার মরণ কাঠি ও জীবন কাঠি। ইহার পরিধির ভিতরেই আমার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, এবং ইহার পরিমাণেই আমার অস্তিত্বের পরিমাণ।

প্রকৃতি অর্থে আমার নিকট কি বুঝায়, তাহা এক রকম বুঝা গেল; এই প্রকৃতির স্বরূপনির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। প্রকৃতি আমার নিকট যে রূপ লইয়া বিদ্যমান, তোমার নিকটেও ঠিক্ সেইরূপে বর্ত্তমান কি না, প্রথমে দেখিতে হইবে। পাঁচ জনের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তি পাঁচ রকম কি এক রকম; যদি পাঁচ রকম হয়, তবে সেই পাঁচ রকমের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য আছে কি না, ইত্যাদি বিচার করিতে হইবে।

যাহা মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির সহিত আমার সম্বন্ধ ঘটায়, যাহার মধ্যবর্ত্তি-

তায় প্রকৃতিকে আমি ছুঁইতে পারি; চলিত ভাষায় তাহার নাম ইন্দ্রিয়। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ভাগটাকে আমার সংস্পর্শে আনিবার জন্য আমার পাঁচটা মোটা মোটা জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্ত্তমান। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা যাহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারাও এই অর্থে ইন্দ্রিয়শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি বস্তুতঃ জ্ঞানের আহরণব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে আনুকূল্য করে, তাহার সংশয় নাই। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই মুখ্যভাবে জ্ঞানাহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু এই জ্ঞানাহরণ,—জ্ঞানের উপার্জ্জন, বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। এই সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের পরিধি অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিত, সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাদিগকেও ইন্দ্রিয়পর্য্যায়ে স্থান দিলে বিশেষ অপরাধ না হইতে পারে। ইন্দ্রিয় বলিলে যে শরীরের অবয়ববিশেষ বুঝিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই; মনের সেই শক্তি, ধর্ম্ম বা বৃত্তি, যাহার বলে ঐ ঐ জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, অথবা ঐ ঐ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। অন্ততঃ, দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয় অর্থে বোধ করি ইহাই বুঝিতেন। ইংরাজীতে বলিলে ইন্দ্রিয় অর্থে Senses মাত্র, Organ of senses নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ছাড়া হিন্দু দার্শনিকেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটিকে অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যেমন প্রত্যক্ষ জগতের সহিত সম্বন্ধ; এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সেইরূপ প্রত্যক্ষের পরিধির বাহিরস্থ জগতের সহিত সম্বন্ধ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যেমন জগতের খানিকটা খুঁজিয়া বেড়ায় ও কুড়াইয়া আনে, অন্তরিন্দ্রিয় তেমনি সেই আহরিত অংশটাকে ভাণ্ডারগত করে ও জগতের বাকী অংশটাকে লইয়া নাড়া চাড়া করে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা বা কর্ম্মবিভাগ লইয়া সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনার এখানে দরকার নাই। ইন্দ্রিয় দশটাই থাক্ আর একটাই থাক, তাহাতে কিছু যায় আসে না; এখানে এই পর্য্যন্ত বলা উদ্দেশ্য যে, জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথগামী, এবং সেই ভাবে ইন্দ্রিয়গণের অবস্থার ও বিকারের বশবর্ত্তী। যাহার ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অবস্থা যেমন, প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ তাহার সম্মুখে তদনুযায়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমান। এই কথাটি অবলম্বন করিয়া আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। ইন্দ্রিয়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও দুই মানুষে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। স্থলে স্থলে মানুষে মানুষে দারুণ ব্যবধান। অন্ধ, মূক,

বধির, পঙ্গু, খঞ্জ, ইহাদের ত কথাই নাই; সুস্থ সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরস্পর কত প্রভেদ। কে সুস্থ, কে অসুস্থ, বলাই দুষ্কর। রঙ্-কাণা মানুষের অধিকাংশেই আপনার অবস্থা অবগত নহে। রঙ্-কাণা মনুষ্যের সহিত সুস্থ মানুষের তুলনা করিলে, প্রকৃতি কিরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে উভয়ের সমীপে প্রতীয়মান, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। সুস্থ মানুষ তিনটা রঙ্ দেখে, ও সেই তিনটা রঙ্ বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া আরও নানা রকম রঙ্ দেখিয়া লয়। রঙ্-কাণা মানুষ সচরাচর দুইটার বেশী রঙ দেখিতে পায় না; সাধারণতঃ তাহাদের নিকট লাল রঙের অস্তিত্ব বা উপলব্ধি নাই। সেই দুইটা মিশাইয়া যত রকম রঙ্ হইতে পারে, তাহাদের রঙের বৈচিত্র্য সেই পর্য্যন্ত। পীত ও অরুণ-বর্ণ তাহাদের চোখে সমান; ঘোরাল লোহিতকে তাহারা সবুজ দেখে, এবং আমাদের কাছে যাহা নীলাভ সবুজ, তাহাদের কাছে তাহা শাদা। বলা বাহুল্য, আমরা যত রকম বর্ণবৈচিত্র্য উপভোগ করি, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত, আমাদের মত বিবিধ সৌন্দর্য্যভোগে তাহারা অধিকারী নহে। বোধ করি, আমরা যাহা নির্ম্মল অকলঙ্ক শ্বেত বর্ণ দেখি, তাহা তাহারা রঞ্জিত দেখে। নিত্য সংসারযাত্রায় তাহাদের বড় বিশেষ অসুবিধা না ঘটিতে পারে, কিন্তু সময়ে সময়ে বড় উদ্ভ্রান্ত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ডাল্টন্ সাহেবের সম্বন্ধে গল্প আছে, তিনি একদিন বৃদ্ধাবস্থায় লাল কোর্ত্তা গায়ে দিয়া সহরের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। সময়ে সময়ে ঠকিতেও হয়। ষ্টীমার বেলওয়ে বিস্তারের কল্যাণে এমন রঙ্-কাণা অনেক ধরা পড়িয়াছে। রঙ্-মাত্রে কাণা, এমন ব্যক্তি আছে কি না, ঠিক্ জানি না; যদি থাকে, সে বড় দুর্ভাগ্য জীব সন্দেহ নাই। এক-রঙা, একঘেয়ে জগতে বাস করা চলিতে পারে কি না, সহজে আমাদের ধারণায় আসে না।

বিস্তারে, পরিমাণে, সূক্ষ্মতায়, তোমার আমার ইন্দ্রিয় ঠিক্ সমান নহে। সুতরাং প্রকৃতির মূর্ত্তি তোমার নিকট যেমন, আমার নিকট ঠিক্ তেমন; আবার যাহাদের ইন্দ্রিয়ের দুই একটার অভাব বা অসম্পূর্ণতা, তাহাদের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষ ছাড়িয়া ইতর জীবে নামিলে আরও বৈষম্য দেখা যায়। পাখীর দৃষ্টি আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ; কুকুরের ঘ্রাণ আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ; সুতরাং তাহাদের কাছে প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থলবিশেষে অধিক ফুটিয়া আছে। আমরা দুইটা চোখে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি; আবার এমন জীব বিরল নহে, যাহাদের বত্রিশ গণ্ডা চোখ। অনেক

কীটের নিকট পৌরাণিক সহস্রলোচন হারি মানেন। আমরা কাণে শুনি আর চোখে দেখি, এমন জীবের কথা শুনা যায়, যাহারা চামড়ায় দেখে, আর চুলে শোনে। আমাদের জগতের সহিত এই উৎকট সম্প্রদায়ের জগতের তুলনা করিতে কেহ সাহসী হইবেন, বোধ করি না।

ইহার পর প্রকৃতির মূর্ত্তি কিরূপ, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক না হইতে পারে। গজাজিনালধি চুকূলধারি, বা কে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন? আমি যেমন দেখি, আমার জগৎ তেমনি। সহস্রলোচন কীট যেমন দেখে, তাহার জগৎ তেমনি। তাহার জগতে ও আমার জগতে আকাশ পাতাল ভেদ। আমার যাহা, তাহা আমার; তোমার যাহা, তাহা তোমার। দুইয়ে তুলনা নাই। তোমার শারীরিক গঠনে আর আমার শারীরিক গঠনে যেমন কতকটা মিল, কতকটা গরমিল; সেইরূপ তোমার জগতের রূপে আর আমার জগতের রূপে কতকটা মিল, কতকটা গরমিল। আসল কোন্‌টা কোন্ বিধাতা বলিয়া দিবেন?

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড পাঠাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়াছিলেন। গল্পটি এখানে উল্লেখযোগ্য। কোনও মহাসমুদ্রের গভীর জলভাগে এক জাতীয় প্রাণী সমাজ বাঁধিয়া ঘরকন্না করিত। সেই মহাসমুদ্রের উপরিভাগে যে আর একটা জলহীন বিস্তৃততর জগৎ বিদ্যমান আছে, কেহই তাহার অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা সুখ ও শান্তির সহিত আপনাদের জলময় সংসারে বাস করিত। চির অন্ধকারে বাস করিয়া তাহারা দিবা রাত্রির প্রভেদ জানিত না। একদিন দৈবগত্যা এক ব্যক্তি গভীর জলতল ছাড়িয়া উপরে ভাসিয়া উঠে, এবং উপরে দীপ্ত সূর্য্যালোকভাসিত নূতন জগতের পরিচয় পায়। স্বস্থানে গিয়া সে বন্ধুবর্গকে কহিল, আমাদের জগৎ ছাড়া আর একটা নূতন জগৎ আছে, সেখানে সবই আলো, আর সেখানে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মত অবিসংবাদে গ্রহণ করিল। কালক্রমে আর এক ব্যক্তি সেইরূপ উপরে আসিয়া রাত্রিকালে তারকাখচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিল। ফিরিয়া বলিল, আর একটা নূতনতরো জগৎ আছে বটে, কিন্তু সেটা সবই আঁধার, তবে অনেকগুলা প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মতও গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই অবধি সেই জীবসমাজ দুই বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অনেক মারামারি রক্তারক্তি করিয়া আসিতেছে। তদবধি আর তাহাদের শান্তিলাভ ঘটে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল সর্ব্বত্রই বিষাদময়।

প্রকৃতির মূর্ত্তি লইয়া আমরাও হাতাহাতি রক্তারক্তি করিতে পারি। কিন্তু এরূপ বিবাদে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যাহার যেমন ইন্দ্রিয়গত অবস্থা, তাহার নিকট প্রকৃতির তেমন রূপ; যাহার যেমন অনুভূতি, প্রকৃতিরও তদনুরূপ মূর্ত্তি। আমি যেরূপ দেখি, তোমাকেও যে ঠিক্ সেইরূপই দেখিতে হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। ঠিক্ অবিকল সেইরূপ তুমি যে দেখিতে পাও না, তাহা স্থির। সৌভাগ্যক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক নহে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতাও বড় প্রবল নহে। নতুবা প্রকৃতি হয় ত সম্পূর্ণ বিসদৃশ, সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইত। প্রাকৃতিক শক্তি সবগুলা আমাদের জ্ঞানোৎপাদনে প্রযুক্ত হয় না। হইলে কি হইত, বলা যায় না। ঈথর বা আকাশের ভিতর দিয়া যে ঢেউগুলি যায়, তাহার মধ্যে যে গুলি ইঞ্চির ভাগ অথবা তার চেয়েও কম লম্বা, তাহারা আমাদের চোখে পড়িলে আলোর জ্ঞান হয়। ছোট বড় তারতম্য অনুসারে আলোকের রঙের তারতম্য জন্মে। যে ঢেউগুলি তার চেয়ে কিছু বড়, তাতে দৃষ্টিকার্য্য একবারেই চলে না, তবে একটু তাপানুভূতি হয় মাত্র। কিন্তু তার চেয়ে কত লম্বা, দু দশ ইঞ্চি হইতে দু দশ মাইল লম্বা ঢেউ যদি আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে না দৃষ্টি, না স্পর্শ, কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। এখন বড় বড় কত ঢেউ আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমরা তাহা টের পাই না।* উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে। উপযুক্ত ইন্দ্রিয় থাকিলে, না জানি কি রকম নূতন জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারিত। না জানি, প্রকৃতির কি নূতন ধরণের মূর্ত্তি হইত। অন্য কোনও জীবের সে রকম ইন্দ্রিয় আছে কি না, ঠিক্ বলা যায় না; মানুষের তাহা থাকিলে সুবিধা হইত কি অসুবিধা হইত, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে নাই এই পর্য্যন্ত। থাকিলে প্রকৃতির মূর্ত্তি এমন না অন্যরূপ হইত, এই পর্য্যন্ত।

দাঁড়াইল এই। প্রকৃতির মূর্ত্তি কেমন এ কথার উত্তর নাই; কেন না, প্রশ্নটার ঠিক্ অর্থ হয় না। আমার কাছে প্রকৃতির যেমন মূর্ত্তি, তোমার কাজে ঠিক্ তেমন নহে। আবার কুকুর, বিড়াল পাখীর কাছে অন্য রকম; আবার কীট

---

* সাধনা—আকাশতরঙ্গ প্রবন্ধ।

পতঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি ঘটনাক্রমে আমার মানসিক ভাবের অকস্মাৎ ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ দুই চারিটা ইন্দ্রিয় বিকৃত বা লুপ্ত, কিংবা দুই চারিটা ইন্দ্রিয় নূতন উদ্গত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মত প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান ছবিখানাও উল্টাইয়া বদলাইয়া যাইবে। তখন হয় ত কমলাকান্তের ন্যায় মনুষ্যকে পতঙ্গ দেখিতে থাকিব। অগ্নিশিখার সহিত কোর্টশিপে প্রবৃত্ত হইব। বীণার ঝঙ্কারে গাত্র-জ্বালা ঘটিবে। সূর্য্যের আলোতে কর্ণ বিদীর্ণ হইবে। চন্দ্রলোকে বিহারার্থ প্রাণ ব্যাকুল হইবে। কিন্তু প্রকৃতির সে মূর্ত্তিটা ঠিক্ নহে, আর এইটাই ঠিক্, ইহা বলিবার কোনও অধিকার দেখিতে পাইতেছি না।

তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। আমার জগতে ও পিঁপীড়ার জগতে বড় সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তোমার জগৎ ও আমার জগৎ সম্পূর্ণ এক না হইলেও; উভয়ে কতকটা মিল আছে। যেমন শারীরিক ও মানসিক গঠনে তোমাতে আর আমাতে সম্পূর্ণ এক না হইলেও, এতটা মিল আছে, যাহাতে উভয়কেই সজাতীয় বলা যায়; সেইরূপ তোমার জগৎ ও আমার জগৎ এই মিলের দরুণ অনেকটা এক রকম ও সজাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ মিল কতকটা আছে বলিয়াই, তোমার সহিত আমার আহার বিহার চলিতেছে। নতুবা তোমার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিত না। নতুবা নরাদ্বির সৃষ্টি ঘটিত না।

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়, তোমার ও আমার অনেকাংশে সদৃশ। দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ (যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়) আর তার বহিঃস্থ অপ্রত্যক্ষ ভাগটা (যাহা অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়), এই দুইএর আকার প্রকারেও সুতরাং তোমায় আমায় কতকটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রত্যক্ষ ভাগটায় যত খানি মিল, অপ্রত্যক্ষ ভাগটায় মিল ততখানি নহে। বাহ্য জগতের সহিত (প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, উভয়ের সহিত) সম্বন্ধনির্ণয়ে ও তৎপ্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে [১] সুতরাং তোমার আমার ধর্ম্মজ্ঞানে কতকটা বৈষম্য থাকিলেও, নেকটা সাম্য রহিয়াছে।

এই সাদৃশ্যটুকু কেন? ইহার উৎপত্তি কিসে? ইহাতে তোমার আমার লাভ কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই আইসে। সঙ্গত উত্তর দিতে হইলে—পাঠক মার্জ্জনা করিবেন—পুনরায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাছে দৌড়িতে হয়। সমাজ

---

[১] সাহিত্য, 'জীবন ও ধর্ম্ম' প্রবন্ধ দেখ।

বদ্ধ না হইলে মনুষ্যের মঙ্গল নাই। পাঁচটাকে লইয়া সমাজ। পাঁচটার কাছে প্রকৃতির মূর্ত্তি পাঁচ রকম হইলে, পাঁচটার ধর্ম্মজ্ঞান পাঁচ রকম হইলে, পাঁচ জনের আচার ব্যবহার ক্রিয়াপ্রণালীর ভাব গতি বিসদৃশ হইলে, তাহাদের সম্বন্ধবন্ধন ঘটে না। আমি ক বলিলে তুমি যদি খ বুঝ, দ্বিতীয় বার বলিলে ঙ বুঝ, এবং তৃতীয় বারে বুঝ ক্ত, তাহা হইলে আমি স্বতঃই তোমাকে পরিহার করিব। সাম্যে সম্মিলন, সম্মিলনে কল্যাণ; আর যাহাতে কল্যাণ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারই অভিব্যক্তি। সুতরাং তুমি আমি, শ্যাম, হরি জগৎটাকে যে কতকটা একই ভাবে দেখিতেছি; এবং কতকটা একই ভাবে দেখিয়া জগতের প্রকৃত ভাব, প্রকৃত মূর্ত্তি, সেই রকম একটা কিছু, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মপ্রতারণার পরাকাষ্ঠা পাইতেছি;—ইহা এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলস্বরূপ হিসাব করিলে বুঝা যায়।

বস্তুতঃ মানব সাধারণের মধ্যে পরস্পর একটা মিলন আছে। আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি জীবনসংগ্রামে টিকিয়া আছে। দুই একটা মানুষ এই সাধারণ পংক্তির বাহিরে কিরূপে ছট্‌কিয়া পড়ে। দুই একটার সহিত সাধারণের মিশ খায় না। তাহাদিগকে আমরা দুটি চক্ষে দেখিতে পারি না, অথবা তাহাদিগকে আমরা বিষ দেখি। তাহাদিগকে আমরা বিকারগ্রস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যাহারা জগৎটাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখে, তাহাদিগকে আমরা জোর করিয়া একটা জায়গায় আবদ্ধ রাখি। জায়গাটার নাম পাগলা গারদ। তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় আমাদের মতে বিকারগ্রস্ত। যাহাদের বাহ্য জগতের প্রতি আচরণ আমাদের আচরণ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিভিন্ন, তাহাদিগকেও একটা জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখি। এই জায়গাটার নাম জেল। এবং সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাদের স্বতন্ত্র অভিধান ও নামকরণ করিয়া থাকি; যথা চোর, জালিয়াত, নাস্তিক ইত্যাদি। স্থলবিশেষে কাহাকেও বা পোড়াইয়া মারি—যথা জিয়র্ডানো ব্রুণো। মনুষ্যের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক সাধারণের অভ্যস্ত পথ হইতে একটু বিচলিত হইয়াছেন, কিন্তু ব্রুণো হইতে বড়ই নারাজ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

বিগত কয়েক মাসের, য়ুরোপীয় এবং এ দেশীয় একটি প্রধান রাজনৈতিক আলোচনা, ফরাসী-শ্যামের সীমাসংক্রান্ত বিবাদ, এবং সেই বিবাদসূত্রে ফরাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ। ফ্রান্স পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় শক্তি, শ্যাম এসিয়ার এক ক্ষুদ্র জনপদ,—দুর্ব্বল দেশীয় রাজ্য। সবলে এবং দুর্ব্বলে, বিলাতী দেশীতে বিবাদ, মৃণ্ময় পাত্রের সহিত কাংস্যময় পাত্রের কলহেরই কলহের কারণ উত্থাপন এবং কলহ, কাংস্যময় পাত্র 'গা-পড়া' হইয়া করেন, মৃণ্ময় পাত্র বিনা দোষে মারা পড়ে। তবে যদি মৃণ্ময় পাত্রের পার্শ্বে, মৃণ্ময় পাত্রের মুরুব্বি আর কোনও কাংস্যময় পাত্র থাকে, তাহা হইলে কলহ কতক কাল চলে বটে, একই আঘাতে কাংস্যময় পাত্র মৃণ্ময় পাত্রকে পঞ্চে পঞ্চীকৃত করিতে পারে না। কিন্তু সে বিষয়ে কাল মাত্র। মৃণ্ময় পাত্র অগ্রেই হউক, আর কিছু পশ্চাতেই হউক, মারাই পড়ে, শত্রুতাতেই হউক, আর মিত্রতাতেই হউক, কাংস্যময় পাত্রের সংসর্গে এবং সংস্রবে, মৃণ্ময় পাত্রের পরিণাম, কোনও অংশে, পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। মৃণ্ময় পাত্রের শত্রুকেও ভয়, মিত্রকেও শঙ্কা। সংস্পর্শ এবং সংঘর্ষ উভয়েরই সাংঘাতিক। সম্বন্ধ বড়ই কঠিন। দুই দিকে দুই কাংস্যময় পাত্র, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় পাত্র,—শ্যামের অবস্থা এই। এক দিকে শত্রু—ফরাসী, অপর দিকে মিত্র বা মুরুব্বি,—ইংরেজ, দুই কাংস্যময় পাত্র,—মধ্যস্থলে মৃণ্ময় পাত্র,—শ্যাম। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। অবিলম্বেই হউক, আর কাল বিলম্বেই হউক, মৃণ্ময় পাত্র ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। তাহার মাটীটুকু সম্ভবতঃ দুই কাংস্যময় পাত্রে ভাগযোগ করিয়া লইবেন; অথবা সেই মাটীটুকুর জন্য দুই কাংস্যময় পাত্রে শক্তি-পরীক্ষা হইবে।

ফরাসী ও শ্যাম; কাংস্যময় ও মৃণ্ময় পাত্র।

ইংলণ্ড শ্যামকে রাখিলেও রাখিতে পারেন, কিন্তু তিনি "হাম রাখি, কি কুল রাখি" নামস্থায় নিপতিত বলিয়াই বোধ হয়। য়ুরোপীয় পরাক্রান্ত প্রতিবেশী, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিরন্তন প্রবল প্রতিযোগী ফরাসিস্-শক্তির সহিত, শ্যামের জন্য প্রকাশ্য সংগ্রামে, সংঘর্ষে বা কোনও প্রকার বিবাদে, বিনা বহু বিচার বিবেচনা, পরিপক্ক মন্ত্রণা ও সবিশেষ আয়োজনে,—অচিরাৎ প্রবৃত্ত হওয়া ইংরেজ ব্যাপার নহে, প্রাজ্ঞোচিত রাজ-নীতিও নহে। এ বিবাদে সমগ্র য়ুরোপ এসিয়া আপাদমস্তক আলোড়িত হয়,—সপ্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হয়। ব্যাপার বিপদ্জনক, বিপুল এবং বিরাট। ইংলণ্ড এক কথায় ফ্রান্সের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। কিন্তু শ্যামে তাঁহার স্বার্থ অত্যন্ত বলবৎ। ফরাসী তথায় প্রবল হইলে সে স্বার্থের অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। বাণিজ্য-স্বার্থ, রাজকীয় স্বার্থ, সকল প্রকার স্বার্থেই আঘাত লাগে। এসিয়ার সুদূর পূর্ব্ব দিগ্‌দেশে নিজের প্রভুত্ব ও প্রেসটিজ্ নষ্ট হয়। ভাবী আশা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হইয়া রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে।

ফরাসী, শ্যাম ও ইংলণ্ড।

শ্যামে বৃটিশ-নীতি।

দুই দিকে দুই সমস্যা, ইংলণ্ডের উভয় সঙ্কট ;—সুতরাং "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" নীতি আপাততঃ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই উভয় কুল-রক্ষণ-নীতির হের-ফেরেই ফরাসীর সহিত শ্যামের সম্প্রতি ক্ষণ-ভঙ্গুর সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। নহিলে ফরাসী আজ কাল শ্যামকে উদরসাৎ করিবারই মানস করিয়াছিলেন, শ্যাম উপকূলে ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের বণতরী যাইয়া সারি সারি দাঁড়াইয়াছিল। কেবল সিংহের মধ্যবর্ত্তিতায়, ব্যাঘ্র, শিকারের কিয়দংশ আপাততঃ উদরস্থ করিয়া, এক পাদ পশ্চাতে সরিয়া "থাবা" পাতিয়া বসিয়াছেন।

ইংলণ্ডের "শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি" নীতি।

কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন টিকিতে পারে না। সিংহ ব্যাঘ্র উভয়ের মধ্যস্থলে, সিংহ ব্যাঘ্র উভয়েরই শিকার—শ্যামরূপী শশক—কত দিন বাঁচিতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক। শ্যাম ফরাসীর উপস্থিত সন্ধি টিকিবে না, সন্ধিপত্র লিখিত হইতে না হইতেই তাহার ক্ষণভঙ্গুরতা প্রমাণিত হইয়াছে।

য়ুরোপ একে একে এসিয়াকে গ্রাস করিবে, ইহাই বোধ হয়, অদৃষ্ট-লিপি,—এ যুগে জগৎ শাসননীতির স্বাভাবিক গতি,—একান্ত অপরিহার্য্য অভিব্যক্তি,—ইহাই হয় ত এসিয়ার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। এসিয়ার অনেকেই একে একে য়ুরোপের উদরে প্রবেশ করিয়াছে, এবার শ্যামের পালা। তবে য়ুরোপের কোন শক্তির শ্যামের অন্ত সমাধি হইবে, তাহাই হইতেছে কথা। ফ্রান্স, সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্র শক্তিতে বিলীন হইবে? এক কথায় এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে রাজনৈতিক লেখক-সিংহদিগের তর্কবিতর্কে সহযোগী বিনাতি সাহিত্যের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রনিচয় পরিপূর্ণ।

য়ুরোপে একে একে এসিয়া গ্রাস করিবে, ইহাই বোধ হয়, অদৃষ্ট-লিপি,—এ যুগে জগৎ শাসননীতির স্বাভাবিক গতি,—একান্ত অপরিহার্য্য অভিব্যক্তি,—ইহাই হয় ত এসিয়ার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। এসিয়ার অনেকেই একে একে য়ুরোপের উদরে প্রবেশ করিয়াছে, এবার শ্যামের পালা। তবে য়ুরোপের কোন শক্তির শ্যামের অন্ত সমাধি হইবে, তাহাই হইতেছে কথা। ফ্রান্স, সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্র শক্তিতে বিলীন হইবে? এক কথায় এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে রাজনৈতিক লেখক-সিংহদিগের তর্কবিতর্কে সহযোগী বিনাতি সাহিত্যের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রনিচয় পরিপূর্ণ।

য়ুরোপের উদরে, এসিয়া—অদৃষ্টলিপি।

এসিয়ায় য়ুরোপীয় সিংহ শক্তি সর্ব্বপ্রধান। এ প্রাধান্যের হেতু, সিংহের ভারত সাম্রাজ্য। অতএব ভারত সাম্রাজ্য সংরক্ষণের উপরেই এ প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ভারত রক্ষা করিতে হইলে কেবল ভারতাভ্যন্তরে বসিয়া থাকিলে চলে না; ভারতের বাহিরে যাইতেও হয়। ভারতের সহিত ভারত সীমান্তের ও ভারতবর্ষের বহির্ভাগের অনেক রাজ্য শাসন, সন্ধি, বাণিজ্য বা মিত্রতাদি সূত্রে অধিকারাধীন রাখিতে হয়। অতএব অন্য কিছুমাত্র কারণ না থাকিলেও, কেবল ভারত-রাজ্য রক্ষার্থে এসিয়ার আপনাপন রাজ্য আত্মবশে রাখা আবশ্যক। ভারতের বাহিরে না গেলে, ভারত রক্ষা হইতে পারে না। স্থিতিশীলতার অপর নাম উন্নতিশীলতা। উন্নতির অত্যন্ত অভাবে স্থিতি অসম্ভব। মধ্য কালের ভারতীয় আর্য্যেরা এই কথাটা বুঝিতে না পারাতেই আর্য্যত্ব হারাইয়াছিলেন। এখনকার আর্য্য ভাওয়ালারাও এই কথাটা না বুঝিয়া আমাদিগকে, অধঃপাতে প্রেরণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের উন্নতির পথে পুনরায় হাজার কোটি কুসংস্কারের অগণিত অন্তরায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতরক্ষার্থে ভারতের বাহিরে যাওয়া প্রয়োজন। অনন্ত কাল আপন বন্ধনশালায় বসিয়া অনবরত নির্ম্মাপিত চুরোটে ফুৎকার পাড়িয়া কেবল বড়াগ্রস্তি গণিলে চলে না। ভারতের বাহিরে না যাওয়াতেই ভারতবাসী ভারত-রক্ষ হারাইয়াছিল। তথাকথিত সনাতন শাস্ত্র যে মুহূর্ত্তে সাংঘাতিক শপথানি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাহির করিল, "ভাই রে ভারতের বাহিরে যাইও না, কালাপাণির পারে জুজু আছে, জুজুতে জাতি কাড়িয়া লইবে"—তাহার পর মুহূর্ত্তেই ভারত-রাজ্য পরের হাতে গেল, ভারতের স্বাধীনতা গেল, সম্ভ্রম গেল, সব গেল,—ভারতে জুজু আসিল,—জুজুর শুভাগমনে ভারতবর্ষীয়দিগের জাতি এবং জাতীয়তা নির্ম্মূল হইল, ভট্টাচার্য্য ঠাকুরদিগের শাস্ত্রোক্তি অনুসারে

বহির্গমন প্রয়োজন।

ভারত ও ভারতবাসী।

হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। ভারতরক্ষার্থে ভারতরক্ষক ইংরেজ অন্য লোকের রাজ্যের উপর লোলুপ-নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহা রাজনীতি, ইহা মানব-ধর্ম্ম-সংহিতা।

ফরাসী-শ্যাম ও রুষ-আফ্‌গান সমস্যায় ভারতের অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি আলোচনা করিয়া, নাইটিন্থ সেঞ্চুরিতে মিঃ কুর্জ্জন, কণ্টেম্পোরারি রিবিউতে মিঃ হেন্‌রি নরম্যান ও ফর্টনাইটলি রিবিউতে স্যর রিচার্ড টেম্পেল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিউতেও এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। লেখকগণ সকলেই মনস্বী রাজনৈতিক। এক এক জন এক এক দিক দিয়া উপস্থিত বিষয়ে উচ্চ রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা,—ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, অতএব চিন্তাশীল ভারতবাসীমাত্রেরই অধ্যয়নীয়।

নাইটিন্থ সেঞ্চুরী, মিঃ কুর্জ্জন। অন্যান্য পত্রে অন্যান্য লেখক।

এসিয়ায় য়ুরোপীয় শক্তিনিচয়ের মধ্যে বৃটিশ-সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা সবল। কিন্তু সিংহের পশ্চাতে পশ্চাতে ব্যাঘ্র চিরকালই আছেন। ভারতসাম্রাজ্যস্থাপনের সময় ফরাসী ব্যাঘ্র, সে কার্য্যে বৃটিশ সিংহের প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন। ভারত-রত্ন সিংহের কিম্বা ব্যাঘ্রের বক্ষ শোভিত করিবে বলিয়া, লোকে সে-সময়ে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছিল। ভারতে সিংহ-সাম্রাজ্যসংগঠনের পরেও ব্যাঘ্র সিংহের পশ্চাতে আছেন। উপরন্তু এখন আবার ভল্লুক জুটিয়াছেন। সিংহ-রাজ্যের এক সীমায় ব্যাঘ্র, অপর সীমায় ভল্লুক, ব্যাঘ্র বহুকাল হইতেই আছেন—কতক কাল হইল, ভল্লুক জুটিয়াছেন। নবাগত ভল্লুকই এত দিন ভয়ানক গর্জ্জিতেছিলেন; ব্যাঘ্র বরং আত্মবিক্রম সংযত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি ব্যাঘ্রও হুঙ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রান্তে ফরাসী-ব্যাঘ্র, পশ্চিম প্রান্তে রুষ-ভল্লুক; বৃটিশ-সিংহ-সঙ্কিত সিংহের অথবা সিংহ-সাম্রাজ্যের এই অবস্থা সূচিত করিতে আমাদের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট, মিঃ কুর্জ্জন তাঁহার এক প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন, "India Between Two Fires" অর্থাৎ ভারতের দুই দিকে দুই দাবাগ্নি;—দুই প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যস্থলে ভারতভূমি অধুনা অবস্থিত। সময়ে সতর্ক হইয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাপণের উপায় না করিলে, দুই দিকের দুই দাবানলে ভারতভূমি দগ্ধীভূত হইবে না, কে বলিল? মিঃ কুর্জ্জন কহিতেছেন,—

দুই দাবাগ্নি।

"শ্যামের প্রতি ফরাসীর এই দুর্ব্ব্যবহার ও মধ্য এসিয়ায় রুষের অত্যাচার,—এ উভয়ই ইংলণ্ডের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে উত্থিত ও অনুপ্রাণিত, এ উভয়ই ইংলণ্ডের প্রতি উহাদের অসখ্যতামূলক। আমি এক দিনে এক কথায় একটা ঘটনায় বা একই প্রকার অবস্থায় এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই। ফরাসী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, ফরাসী পার্লামেণ্টের আন্দোলন আলোচনা অধ্যয়ন করিয়া, কোচিন চীনে পর্য্যটন করতঃ ফরাসীদিগের কার্য্যাকার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং ফরাসী রাজপুরুষদিগের সহিত আলাপ করতঃ তাঁহাদের মতামত অবগত হইয়া ও ঐকার স্থানীয় সংবাদপত্রনিচয়ের সাধারণ উক্তি ও বাদানুবাদ পরীক্ষা করিয়া আমি উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি স্বতঃ পরতঃ সকল রকমেই বুঝিয়াছি যে,—

"The real feeling at the back of this Siamese business has been the desire to thwart and to vex England. Siam in fact, is one of the French retorts to Egypt. Ever since the French first set foot in Indo-china, a

century ago, there has been no concealment of this ulterior object on the part of their colonial administrators and pioneers."

"ইংলণ্ডকে বিপর্য্যস্ত ও বিরক্ত করাই ফরাসীর শ্যাম উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্য, উহা মিশরে ইংরেজ আধিপত্যের একটা মর্ম্মান্তিক উত্তর, সাংঘাতিক শ্লেষ। শতাব্দী পূর্ব্বে, যদবধি ফরাসীর কর্ত্তৃক ইণ্ডোচায়না অধিকৃত হইয়াছে, তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত ফরাসীর ঔপনিবেশিক শাসনিতা ও পররাজ্যে ফরাসী আধিপত্য স্থাপয়িতাদিগের সকলেই, ইংলণ্ডবিদ্বেষমূলক একই উদ্দেশ্য বিঘোষিত, এবং সেই একই উদ্দেশ্য সাধনার্থে কার্য্য করিয়াছেন।"

"আমি ফরাসীদিগের পুরাতন রাজনৈতিক লেখকদিগের লেখা হইতে উহা প্রমাণ করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই উহা এক বাক্যে এবং সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। টঙ্কিনের সংবাদপত্র সকল প্রতি সপ্তাহেই উহা পুনরুক্ত করিয়া থাকে।

"ভূতপূর্ব্ব রাজ্যচ্যুত ব্রহ্মরাজ থেবুর উত্তরাধিকারী মেঙ্গন সুরাব বৃটিশ রাজ্যে বন্দীভাবে ছিলেন, ফরাসীর সহায়তায় তিনি পলায়ন করেন, ফরাসী তাঁহাকে বার্ষিক ১৫ হাজার ব্রাঙ্ক পেন্সন দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, উদ্দেশ্য—সুযোগ উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ডের অনিষ্ট-সাধনার্থে তাঁহাকে ব্যবহার করিবেন।"

"পররাজ্যলুণ্ঠনাধিকার-নীতি সুনীতিসঙ্গত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। ইংলণ্ড কোথাও কোথাও এ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া যে শত্রুকেও সে নীতি অবলম্বন করিতে দিতে হইবে, ফরাসীকে শ্যাম লুণ্ঠন করিতে দিতে হইবে, এমনও কোনও কথা নাই। ইংলণ্ডই হউন, আর ফ্রান্সই হউন, পররাজ্যলুণ্ঠননীতি-সম্বন্ধে ইংরেজ বা ফরাসী লেখক, গম্ভীর ভাবে কে কি বলিতে পারেন, আমি তাহা শুনিবার প্রতীক্ষায় আছি।"

মিঃ কুর্জ্জনের এই উক্তিতে কিছু বিশিষ্ট বাহার আছে। কিন্তু তা যাউক। তিনি অপর-প্রাস্তস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা যাউক।

"মধ্য এসিয়া,—পামীর প্রদেশ বাদ এতই অগ্রাহ্য, তবে রুষ বিগত বিশ বৎসর হইতে প্রতি বর্ষেই তথায় সৈন্যাভিধীন প্রেরণ করিতেছেন কেন? রুষের যদি মধ্য এসিয়া হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া উদ্দেশ্য না হইত, তবে তিনি সুরগাবিতে চিরস্থায়ী বৃহৎ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন কেন? ইংলণ্ডের প্রতি রুষের যদি এতই প্রীতি, তবে তিনি ১৮৯১ সালে পররাজ্য পামীর অঞ্চল হইতে বৃটিশ রাজপুরুষদ্বয়কে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন কেন, এবং রুষ কর্ম্মচারীরা হিন্দুকুশ হইতে ইংরেজাধিকারের উপর দিয়া গিরিপথগুলি পরিমাপ করিয়াই বা গেল কেন? ভারতের প্রতি রুষের যদি লক্ষ্যই না থাকিবে, তবে রুষ আফগানের সহিত ষড়যন্ত্র করেন কেন? হিরাটের আফগান গবর্ণরের সহিত রুষ জেনারেল কিওরোগাউকিনের চিঠিপত্র চালাচালির কথা মধ্য এসিয়ায় প্রবল প্রচার,—সে কথা কাহারই অস্বীকার করিবার যো নাই।"

Concerning Russian intrigue with the Afghans * * I have to say that the communications maintained by General Kuropatkin the Governor General of Transcaspia with the Afghan Governor of Herat common talk in Central Asia and can not be denied

"পামীরে এবং শ্যামে চীনের স্বার্থ আছে বটে; কিন্তু তাহা যখন ইংরেজের স্বার্থের সহিত অল্প বিস্তর বিজড়িত, চীন সহজে নড়িবেন না। চীন অমিশ্রিত আত্মকার্য্য উদ্ধারে খুব উপযুক্ত বটে, কিন্তু যে স্থলে পরের সংস্রব আছে, যাহাতে পরের কার্য্য কিছুমাত্রও উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা, চীন সে কার্য্যে অগ্রসর হয় না। গত বৎসর টেইনসিন্ নগরে চীন "ভাইস্রয়" হাং চাংএর সহিত কথোপকথনে আমার এ সংস্কার দৃঢ় হইয়াছে।"

মিঃ কুর্জ্জন, তাঁহার The Siamese Boundary question (নাইটীন্থ সেঞ্চুরি) নামক প্রবন্ধে, মানচিত্র প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ফরাসী শ্যামরাজ্যভুক্ত যে সকল প্রদেশের দাবী করেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত অধিকার কিছুমাত্র নাই, তাহা শ্যামের চিরন্তন সম্পত্তি। But the French temper appears to prefer force to argument. কিন্তু ফরাসী বিচার বিবেচনার পরিবর্ত্তে বলপ্রয়োগ করিতেই প্রয়াসী।"

মিঃ কুর্জ্জন যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সবলমাত্রেরই হায়, স্ববলপ্রয়োগপ্রয়াস। এ বিষয়ে বিচার বিবেচনা, বল, কে কবে করিয়াছে?

সে যাহাই হউক, ইংলণ্ড শ্যামসম্বন্ধে "স্থানে রাখি-কি-কুল রাখি" নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ কুর্জ্জনেরও নিম্নোক্ত উক্তিতে তাহা প্রতিবিম্বিত।

But whilst we can with equanimity and even without suspicion regard the French in Indo-china from a distance, we have no desire to imperil our amicable relations by coming to closer quarters and we particularly desire to avoid them as neighbours. It is safe to say that the presence of a great European power, whose interests throughout the world, it is the merest cant to deny are hostile to our own, in close proximity to the Indian frontiers upon the east would more than duplicate the responsibility, anxiety and expense, entailed by the simultaneous approach of another great European power, similarly hostile to England, upon the west; and when it be remembered that those powers are animated not merely by a common antagonism, but by a reciprocal friendship, all but amounting to alliance, it will be obvious that no British or Indian Statesman can take legitimate shelter, behind an attitude of transcendental unconcern.

ইহার ভাবার্থ এই যে, ফরাসী ও রুষের সহিত ইংলণ্ডের হাতি কথা, সম্মুখ সংগ্রামে ভাগ্য-পরীক্ষা করা,—ইংলণ্ডের ইচ্ছা নয়, কারণ তাহা অনিষ্টজনক, তাহাতে পৃথিবী শুদ্ধ ওলোট পালোট হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু যখন ফরাসী ও রুষ দুই জনে দুই দিক দিয়া, বৃটিশ মুকুটের উজ্জ্বল মাণিক ভারত-ভূমিকে সুবিধামত আয়ত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং ফরাসী রুষে যখন আবার সম্পূর্ণ সদ্ভাব, সৌহৃদ্য ও সম্প্রীতি, তখন ইংরেজ রাজনৈতিকই বা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি করিয়া?

কিন্তু শ্যাম সম্বন্ধে ফরাসীর ইংরেজবিজড়িতা নীতি কিরূপ? ইহার আভাস মিঃ হেনরী নরম্যান লিখিত প্রবন্ধে (কনটেম্পোরারি রিবিউ, জুলাই) পাওয়া যায়। নরম্যান লিখেন,—

Several years ago the French ambassador proposed to Lord Salisbury imaginary line of demarcation should be drawn down the middle from north to south and that all to the east of it should be the sphere of influence" and all to the west the English one.

কয়েক বৎসর হইল, কোনও ফরাসীস্ দূত লর্ড সলিস্‌বারির নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শ্যামের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত এক কাল্পনিক রেখা টানিয়া, রেখার পূর্ব্বাংশের সমগ্র ভূভাগ ফ্রান্স লউন, আর তাহার পশ্চিমাংশের সমগ্র রাজ্য ইংলণ্ড গ্রহণ করুন।"

আপদ চুকিয়া যাউক। ইহা ফরাসীর মনের প্রকৃত কথা কি না, বলা যায় না। কিন্তু হইতে করিতে অবশেষে যে ইহাই হইবে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই।

মিঃ কুর্জ্জন শ্যাম রাজ্য ও শ্যামরাজকে সানুকূল নয়নে দেখিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্যাম-সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধে, শ্যামের সুশাসনের ও শ্যামরাজের সচ্চরিত্রের উৎকৃষ্ট আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ নরম্যানের চিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। মিঃ নরম্যান বলিতেছেন;—

শ্যামে স্বনজর ও কুনজর।

"সৌর জগৎ যেরূপ সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরে, শ্যাম রাজ্যের শাসনও সেইরূপ রাজার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, রাজাকে বেড়িয়া ঘুরে; রাজা সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজার নিরঙ্কুশ একাধিপত্য, তিনি সাধারণ লোকের নিকট ঈশ্বরস্বরূপ, স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি শ্যাম-রাজ্যের সরদার ও আমির ওমরাদিগের মহাপ্রভু, প্রতুল কর্ত্তা, প্রসাদ-দাতা, পরিত্রাতা। বর্ত্তমান শ্যামাধীশ্বরের নাম "প্রভাত সমদেহ প্রা পরমেন্দ্র মহা মুলালঙ্কর্ণ প্রা চুলা কম ক্লেও"; কিন্তু ইনি লোকটি কেমন, আর কিরূপ ভাবেই বা ইনি ইহাঁর অতুল অপরিসীম রাজ-শক্তি সঞ্চালন করেন? রাজা রূপে গুণে লোকটি মন্দ নয়—আমি অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা ও আলাপ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, রাজা মানুষটি বেশ মনোজ্ঞ; অনেক বিষয়ই তিনি জানেন শুনেন, অন্তঃকরণটিও তাঁর দয়ার্দ্র, প্রাচ্যদেশীয় লোক যতদূর দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে, ততটা দৃঢ়চিত্ততাও তাঁর আছে, আত্ম-সম্ভ্রমজ্ঞান ও রাজোচিত পদমর্য্যাদাবোধও তাঁর সম্পূর্ণ বিদ্যমান। শ্যামরাজ সর্ব্বত্রই সুপুরুষ ও ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। "কিন্তু প্রশংসা এইখানেই সমাপ্ত।" রাজার

শ্যামরাজ।

শ্যামরাজের ইন্দ্রিয়দোষ।

জীবন একটি ধারাবাহিক আত্ম অসংযম ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার স্রোত: ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় ও পরিতৃপ্তিতেই রাজ-জীবন নিয়ত নিয়োজিত। শ্যামরাজ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পার হইবার পূর্ব্বেই দুই কন্যার পিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী তদীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী। কোনও লেখক সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, রাজকীয় রক্তে রাজেতর স্ত্রীলোকের রক্ত মিশিয়া রাজরক্ত কলুষিত না করিতে পারে, এই জন্যই রাজকুমারের সহিত রাজকুমারীর, অর্থাৎ ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল।

রাজ-অন্তঃপুর।

এ কথা ঠিক নহে। এ উদ্বাহের কারণ অন্যরূপ। রাজ-অন্তঃপুরে অগণিত ও অজ্ঞানিতসংখ্যক গৃহিণী ও বাহিরিণী। ইহাদের আচার ব্যবহার সাধারণের অজ্ঞাত। শ্যামে এ সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তা কহা একেবারেই নিষিদ্ধ। বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক সুন্দরী কন্যার পিতা, স্ব স্ব সুন্দরী কন্যাদিগকে রাজান্তঃপুরে প্রেরণ বা প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। রাজান্তঃপুরে আধিপত্যলাভ-বাসনা ইহার কারণ। রাজার সন্তানসন্ততির সংখ্যা এক শতেরও অধিক। রাজান্তঃপুর কতকগুলি কক্ষবিশিষ্ট একটি অট্টালিকা, একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নহে—সে একটি সহর-বিশেষ। রাজার পরিবারবর্গ একটি গৃহস্থালী নহে,—একটি সমাজবিশেষ। রাজার প্রত্যেক পত্নী আপনাকে এবং আপন আপন সন্তানদিগকে মণিমাণিক্যে মণ্ডিত, খচিত ও ক্রান্ত করিয়া থাকেন। তাঁদের সকলেরই স্ব স্ব ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধনভাণ্ডার আছে। শ্যা অবস্থা, এমন কি, তাঁহার নিজের রাজধানীটির অবস্থা শ্যামরাজ নিজে অতি অল্পই অথবা কিছুই জানেন না। রাজা কালেভদ্রে যখন নগরে বাহির

লেফাফা দোরস্ত।

তখনি কেবল রাজপথ পরিষ্কৃত ও "লেফাফা দোরস্ত" করা হয়; সৈনি ও পুলিস প্রহরী 'শাফ সাফাই' রাজগোজ পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়; কেনাল ও খালের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাতে চিত্র বিচিত্র প্রহরী-নৌকা সারি গাঁথিয়া রাখা হয়; এক মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাঙ্কক নগর তাহার দিনা যুরোপীয় নগরের মূর্ত্তি ধারণ করে,—কিন্তু রাজা পথ পার হইয়া যাইবা মাত্রই যে-কি-সেই, সব অন্ধকার, মলিন ও দুর্গন্ধ-

ময়। রাজার ও রাজপরিবারবর্গের এবং রাজপুরুষদিগের এক একটা কার্য্যে, উৎসবে এবং ব্যসনে, অর্থের অপরিমিত অসদ্ব্যবহার হয়,—শ্যামের সকল দিকেই অর্থের শ্রাদ্ধ। পৃথিবীর কোনও রাজ্যেই অর্থের এরূপ অপব্যয় হয় না। ভূতপূর্ব্ব একটা রাজকীয় শ্রাদ্ধ সৎকারে ব্যয় হইয়াছিল ৮০ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকার অধিক। রাজমন্ত্রীর অনর্থক দেশভ্রমণে ব্যয় হইয়াছিল দুই লক্ষ টাকারও বেশী। রাজা অষ্ট প্রহর আমোদ প্রমোদ, বিলাস ও ব্যসনে ব্যস্ত, রাজকার্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার আদৌ সময়াভাব। মাসের বার মাস চলিয়া যায়; রাজা সৈনিকবিভাগ বা শিক্ষাবিভাগ, স্বরাজ্য ও পররাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক কথায় কর্ণপাত করেন না। ঘোর রাজা হইতে রাজবংশের নগণ্য মাছিটি পর্য্যন্ত অলস, অকর্ম্মণ্য ও বিলাসপরতন্ত্র। সকলেই রাজ্যের অর্থ অপব্যয় করেন। এত অপব্যয় কোনও রাজ্যই সহ্য করিতে অসমর্থ। শ্যাম সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম।"

অপরিমিত ব্যয়।

"রাজভ্রাতা ও রাজকুমারদিগের হস্তে অধিকাংশ শাসনকার্য্যের ভার; কিন্তু ইঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতার কেবল অসদ্ব্যবহারই করেন। সমস্ত দেশটা আপনারাই লুটিয়া খান, পাওনাদারের টাকা দেন না; অনেক য়ুরোপীয় মিনিষ্টার কাজ করিয়া টাকা পায় না; টাকার জন্য তাগাদা করিলে প্রকারান্তরে তাহাদের সর্ব্বনাশ করা হয়। ইঁহারা শ্যামপ্রবাসী য়ুরোপীয়দিগকে অবিশ্বাস করে। রাজ-পরিবারের অনেকেই য়ুরোপীয় শিক্ষা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা পাওয়া না পাওয়া সমান। তাহাতে করিয়া য়ুরোপীয় বিদ্বেষ কিছুমাত্রও কমে নাই। শ্যামরাজের অন্যতম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, যিনি য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন ও য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে দশ বৎসর যাবৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও শ্যামরাজ্যে যিনি এক জন সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী,—স্বয়ং তিনি য়ুরোপীয়দিগের পরম শত্রু,—তাঁহার মত শত্রু সমগ্র রাজ্য মধ্যে য়ুরোপীয়দিগের আর কেহই নাই। ইনি সংপ্রতি কোনও য়ুরোপীয় পররাষ্ট্রসচিবের স্ত্রীর প্রতি কুব্যবহার করিয়াছিলেন, ও তজ্জন্য সেই মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

শ্যামে দাসব্যবসায় চলিত আছে। দাসদিগের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। তাহারা প্রভুদিগের নিকট পশু অপেক্ষাও অধম। রাজ্যের এক জন প্রধান মন্ত্রী, নিরালয় স্থানে নরকরকে পেটে পিঠে বাঁধিয়া অতি কঠিন নির্য্যাতন করিতেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

শ্যামে দাসব্যবসায়।

"শ্যামের সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্র সৈন্য আছে, এ সৈন্য নেহাত মন্দও নহে, কিন্তু য়ুরোপীয় সৈন্যের সহিত যুঝিতে ইহারা আদৌ সমর্থ নহে।'

"মেকং নদের বাম উপকূল করাসীর হস্তগত হইলে ইংরেজের মহা মুস্কিল। কিন্তু ফরাসীর এ মতলব কি, কিছুই বুঝা যায় নাই। করাসী ব্যতীত জর্ম্মনেরাও শ্যামে আধিপত্য-স্থাপনে উৎসুক। কিন্তু ইংরেজই প্রাচ্য পৃথিবীতে সকলের প্রধান, শ্যাম অন্যের হস্তগত হইলে সে প্রাধান্যে প্রবল আঘাত লাগিবে। অতএব ইংরেজেরই উচিত শ্যাম গ্রহণ করা। 'সালউইন' সীমার সহজ ও সন্তোষজনক নির্দ্ধারণের জন্য, এক সময়ে বলা হইয়াছিল বটে যে, শ্যামের স্বাধীনতা রক্ষা করা হইবে; কিন্তু সীমানির্দ্ধারণ কার্য্য এখন উদ্ধার হইয়া গিয়াছে; অতএব শ্যামে এখন ইংরেজের অপেক্ষাকৃত সরলা নীতি অবলম্বন করা উচিত। শ্যামের ভবিষ্যৎ ভাগ্য প্রকৃতি দেবী নিজেই স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্যাম স্বভাবতই কোনও সুসভ্য য়ুরোপীয় শক্তিতে বিলীন হইবার উপযোগী হইয়াছে।"

শ্যামে ইংরেজ।

কিন্তু কেন? কি নৈসর্গিক কারণ তাহার? মিঃ নরম্যান সাধারণ ভাবে সে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

By some mysterious law the touch of civilised nation, even mere frontier touch—has a disintegrating effect upon an uncivilised one. China may seem to be an exception for the present, but she is the only one. Personal liberty, free movement of trade, the security of property and savings, the abolition of torture, the absence of imprisonment without trial and conviction, the power of the white man over the forces of nature—all these constitute a sort of contagion which makes its way with every individual traveller and trader across the frontier, and by-and-by permeates the life of the people. And it is as impossible for the one country to prevent the issue of this contagion, as it is for the other to resist its effect.

"প্রকৃতির কি এক অজ্ঞাত নিয়মে সভ্য জাতির সুদূর সংস্পর্শেও অসভ্য জাতির গঠনপ্রণালী বুলিয়া যায়। সভ্য শ্বেত জাতির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শাসনশৃঙ্খলা, স্বাধীন বাণিজ্য, সুবিচার এবং পঞ্চভূত বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য, সংক্রামক ব্যাধির বীজস্বরূপ সভ্যে অসভ্যে। হইয়া অসভ্যদিগের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে, ক্রমে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বপ্রোথিত পুরাতন কেন্দ্রভ্রষ্ট করিয়া নূতনের পক্ষপাতী করে। অসভ্য, সভ্যতার এ শক্তি নিবারণ করিতে সমর্থ নহে, সভ্যতা নিজেও নিজের সে শক্তি সম্বরণ বা সংযত করিতেও অসমর্থ। সুতরাং তাহার ফল,—সভ্য জাতির শরীর ও শক্তির অভ্যন্তরে অসভ্য জাতির মহানির্ব্বাণ। ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম।"

'শ্যাম এই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত,—সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গীভূত হইবার উপযোগী হইয়াছে, অঙ্গীভূত হইবেই।"

"অতএব আর বিলম্ব কেন?" নরম্যান প্রবন্ধের সারমর্ম্ম এই। আমরা ইহার সমালোচনা করিতে চাহি না। নরম্যান সাহেব উপসংহারে বলিতেছেন,—

France has certainly seized an Island off the Siamese coast as a basis for future operations. Our own China squadron, much stronger than any force France has there, should not be far off, in case of emergencies; for Bangkok must not under any circumstances be overawed by France. And if it comes to action, there is a group of Islands (which I will not mention) that we annex instantly. They belong practically to nobody and nobody would be injured by the seizure of them, while at such a moment, they might be of the greatest strategic importance.

মিঃ নরম্যানের এ উক্তি শ্যামের ভূতপূর্ব্ব আসন্নসংঘর্ষণসম্ভাবনার সময়ের। উহা এখনও একেবারে নিরর্থক নহে, কেন-না, সংঘর্ষণসম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তেই শ্যাম যাইতে পারে। উদ্ধৃত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ফরাসী-বেনামী দ্বীপ। সহিত সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, শ্যাম-উপকূলের অন্তরে এক-না একটি দ্বীপ অধিকার করিয়া, তথা হইতে শ্যামের উপর আক্রমণ চালাইতে হইবে। একপ অবস্থায়, এমন একটি দ্বীপপুঞ্জ আছে (এখন নাম করিয়া কাজ নাই) যাহা আমাদের (ইংরেজের) এখনই দখল করিয়া বসা উচিত, কারণ সে স্থান যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ পক্ষে বড়ই সুবিধাকর। এই বিনামী দ্বীপপুঞ্জ এখন কাহারও দখলে নাই, এবং তাহা দখল করিলে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না।"

এই বিনামী দ্বীপপুঞ্জ সম্ভবতঃ শ্যাম উপকূলের কোথায় হইতে পারে, ভূগোলজ্ঞ পাঠক অনুমান করিবেন।

বেসিডেন্টের মত।

শ্যামস্থ বৃটিশ রেসিডেন্ট (ত্রৈমাসিক) এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিউ পত্রে শ্যাম-ফরাসী বিবাদ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাঁর অভিমত মিঃ কুর্জ্জনের মতেরই মত। ইহাঁর বিবেচনায়, শ্যামের উপর ফরাসীর আঘাতে ইংরেজের বাধা দেওয়া উচিত; কিন্তু শ্যামের স্বাধীনতা হরণ করা বিধেয় নহে।

We have no desire or intention either now or at any future time, to annex Siam, but our interests, both political and commercial, require that the independence of the country shall be upheld. Commercially, any tampering with the kingdom by France will mean the certain loss to this country of a valuable and rapidly increasing trade and politically, since the occupation of the country by France would make our boundaries conterminous, will result in constant friction besides adding largely to the expenses of administering Burmah.

শ্যামের আশা।

"শ্যামকে বৃটিশ রাজ্যের অঙ্গীভূত করা আমাদের মানস নহে, বাসনাও নহে। এখনও নহে, ভবিষ্যতেও নহে। আমাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যঘটিত স্বার্থসিদ্ধিকল্পে শ্যামের স্বাধীন থাকা আবশ্যক, অতএব আমরা সে স্বাধীনতা নষ্ট করিব কেন? আমরা নিজে নষ্ট করিব না; ফরাসী কর্ত্তৃকও তাহা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কারণ, তদ্দ্বারা আমাদের এক দিকে বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্যের মহা ব্যাঘাত ঘটিবে, অপর দিকে রাজনৈতিক অনিষ্টও অত্যন্ত অধিক হইবে।"

বিবাদী সীমা।

শ্যাম-ফরাসী বিবাদের মূল সম্বন্ধে রেসিডেন্ট বাহাদুর লিখেন,—

"মেকং নদ ও পূর্ব্বদিকব্যাপিনী পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত ভূভাগ লইয়াই শ্যাম-ফরাসীতে বিবাদ। ৬০ বৎসরের অধিক কাল হইতে এই ভূখণ্ড অব্যাহত ভাবে শ্যাম রাজ্যের অধিকারভুক্ত আছে। কিন্তু শ্যাম তাহার এই অধিকারে কখনও তাদৃশ আধিপত্য স্থাপন করে নাই। ফরাসী আন্নামের কর্ত্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠভাব গ্রহণ করার পর হইতেই শ্যাম উক্ত ভূখণ্ডে কতকগুলি স্পেসাল কমিসনর প্রেরণ করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপ্রভুত্ব প্রদর্শন করেন। ফরাসী ইহাতে বিরক্ত হন ও উক্ত ভূভাগ তাঁহার নিজের বলিয়া বিবাদ বাধান। কিন্তু উক্ত রাজ্য ফরাসীর নহে, আনামের অন্তর্গতও নহে। আনামের পশ্চিম সীমা, এই ভূভাগের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতমালা। এ সীমা, ১৮৬৬-৬৮ ও ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ফরাসীর নিজের মানচিত্রেই অঙ্কিত।"

অথচ ফরাসী গা-পড়া হইয়া বিবাদ করিতে উদ্যত। রেসিডেন্ট এ বিবাদে ইংরেজের 'শ্যাম-ধি-কি-কুশ-রাখি" নীতির পক্ষপাতী নহেন, তিনি ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরেজের হস্তক্ষেপের পোষকতা করেন।

এই পোষকতা সম্বন্ধে এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিউর সম্পাদক স্বকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—

As regards British intervention in Siam, there are great difficulties in the way, more serious than any one can appreciate who is not aware of the unsettled questions between England and France in other parts of the world. * * * Indeed, it is to the policy initiated by Lord Dufferin in Kashmir and Burma that we owe both the Russian and the French approaches to our Indian Empire.

"ইংলণ্ড ফরাসী শ্যাম বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ফরাসী-ইংরেজের অনেক সমস্যা অদ্যাপি নিষ্পত্তি-অধীন। লর্ড ডফারিণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ গ্রহণ ও কাশ্মীরে কুনীতি অবলম্বন নিমিত্তই, অদ্য ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে ফরাসী ও পশ্চিম সীমান্তে রুষ অগ্রসর হইতেছে।"

ইংলণ্ডের হস্তবন্ধ; লর্ড ডফারিণের রাজনীতি।

যদি সত্য হয়, তবে লর্ড ডফারিণের রাজনৈতিক নামে ইহা নিশ্চয়ই নিদারুণ কলঙ্ক।

সমাজনীতি।

আমরা এ স্থলে যে সমাজনীতির কথা উত্থাপন করিতেছি, তাহা সাম্প্রদায়িক সমাজনীতি নহে, সামাজিক রাজনীতি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আদি ধর্ম্মসমাজের সমাজনীতি বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে; অথচ ইহা সকল সমাজেই বর্ত্তে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান আদি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসমাজে যেরূপ,—হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান আদি সংযুক্ত মিশ্রিত সমাজে ঠিক সেইরূপ প্রযুক্ত হয়,—এই সমাজনীতি। ইহা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসমাজের সমাজনীতি নহে;—অসংখ্য মানবসমাজের সমাজনীতি। এ সমাজনীতি সাম্প্রদায়িক নহে, সার্ব্বভৌমিক। সুন্নত, উপনয়ন বা ব্যাপটিজম্; সন্ধ্যাহ্নিক, নেমাজ বা প্রেয়ার;—শিখাবন্ধন, ক্রসধারণ, বা ফতোয়া-অর্পণ;—ধর্ম্মগত বা সাম্প্রদায়িক সমাজগত আচার অনুষ্ঠান ও আহারব্যবহারবিষয়ক সমাজনীতি নহে। পরলোক ও পারত্রিকের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সবিশেষ সম্বন্ধ নাই; ইহা ইহলৌকিক এবং ঐহিক সমাজনীতি। অথচ ইহলৌকিক ও ঐহিক অনেক অনুষ্ঠানের সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা গোরক্ষণে নিষেধ করে না, গোভক্ষণেও মানা করে না,—গোরক্ষক ও গোভক্ষক লাঠালাঠি কাটাকাটি, খুনাখুনী বক্তারক্তি না করে, দাঙ্গা হাঙ্গামা মারামারি করিবা না করে, ইহাই নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। গোরক্ষণ করিবে কর,—সে ত অতি উত্তম কার্য্য; কিন্তু, দেখিও, তাহাতে যেন গোভক্ষকের গোভক্ষণে বাধা না পড়ে, গোভক্ষণ করিবে কর, বেশ, তাহাতে সবিশেষ কোনও কথা কহিতে চাহি না, কেন না, তাহা তোমার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম,—তোমার আহার্য্য; কিন্তু সাবধান, তোমার গোভক্ষণে ও গোভক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে গোহত্যার দ্বারা গোরক্ষকের প্রাণে যেন আঘাত করিও না;—এ সমাজনীতি ইহাই বলে, ইহাই চায়, ইহাই শিক্ষা দেয়। এ সমাজনীতির উদ্দেশ্য,—গোরক্ষক ও গোভক্ষক উভয়ই একই সমাজে থাকিয়া, একে অপরের ধর্ম্মানুষ্ঠানসংরক্ষণে আসে, একে অপরের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করিয়া সমাজশান্তিভঙ্গ না করে। এক অপরের প্রতি ব্যবহারিক সন্ত্রম প্রদর্শন করতঃ ধর্ম্মগত ও সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্রতা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক কুক্ষিমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, অর্থাৎ তাহাদের গোপন অনুষ্ঠান করিয়া, উভয়ে উভয়ের সাধারণ স্বার্থ একত্রে সংরক্ষণ করে। পারস্পরিক প্রীতিই এ সমাজনীতির মূলমন্ত্র। ইহা চায় শৃঙ্খলা, শান্তি, সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য, সুবিধা, সুখ,—এবং সংরক্ষণ। স্বধর্ম্মের অর্থ শুনিয়াছি ধারণ করা। এ সমাজনীতির অর্থও ঠিক তাই। ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, অথচ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের প্রতি ইহার সমান,

গোরক্ষণ ও গোভক্ষণ।

মূলমন্ত্র।

অসাম্প্রদায়িক সমাজনীতি।

রকম সহানুভূতি, সকল ধর্ম্মকেই ইহা শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে চায়।

শৃঙ্খলা, শান্তি ও স্বাধীনতা।

ধর্ম্মমাত্রই ইহার ধারণীয়, কর্ম্মমাত্রই ইহার ধারণীয়, বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কর্ম্মও ইহার ধারণীয়। ইহা ধারণ ও সমর্থন করে না কেবল সেই সকল কর্ম্ম, যাহাতে করিয়া মনুষ্যসমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ হয়, শান্তিভঙ্গ হয়, সুখ, সুবিধা ও সংরক্ষণ নষ্ট হয়। নহিলে আর সবই ইহা ধারণ, সমর্থন ও রক্ষণ করে। এ সমাজনীতিকে সমাজের না বলিয়া, সাম্রাজ্যের বলিলেই বোধ হয় উপযুক্ত হয়। ইহা স্বদেশ, স্বনগর ও স্বপল্লীরক্ষার সমাজনীতি। ইহা সর্ব্বসাধারণের কার্য্য, সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির কার্য্য,—তোমার জন্য আমার, আমার জন্য তোমার, স্বদেশস্থ, স্বনগরস্থ ও স্বপল্লীস্থ সকল লোকের জন্য, তোমার, আমার এবং তাঁহার, সকলেরই কার্য্য। তুমি, আমি, তিনি থাকিলেই এ কার্য্য করিতে বাধ্য। তুমি, আমি, তিনি, সকলেরই এই সমাজ-নীতি-সূত্রে, এই সাধারণ সার্ব্বভৌমিক নীতি অনুসারে চলা, কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা মহাপাপ। ইহা স্বদেশের ও স্বনগরের বিরুদ্ধে পাপ, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও মনুষ্যসমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে পাপ, রাজা প্রজা উভয়েরই বিরুদ্ধে পাপ। এ পাপে, স্বদেশ, স্বনগর, স্বপল্লী, সাধারণ মনুষ্যসমাজ উৎসন্নে যায়, রাজা প্রজা উভয়েই উৎসন্নে যান। ইহাকে সমাজনীতি বলিতে হয় বল, স্বদেশনীতি, স্বনগর-নীতি বলিতে হয় বল, ইহাকে রাজনীতি ও প্রজানীতিও বলিতে পার। ইহার এক নাম স্বদেশহিতৈষিতা, অপর নাম স্বনগরহিতৈষিতা, অপর নাম সাধারণের কার্য্য, ইহার নামান্তর আত্মশাসন। ইংরেজী ভাষায় Social এবং Civic নামে যে দুইটা কথা শুনা গিয়া থাকে, তাহার Socialএর নহে, Civicএর কথাই আমরা কহিতেছি। Social অর্থে সামাজিক,—সমাজ-সম্বন্ধীয়,—Civic অর্থে নাগরিক,—নগরসম্বন্ধীয়। সমাজ অপেক্ষা নগর বৃহৎ, কারণ, নগর বহু সমাজের সমষ্টি। বহু সমাজ বা বহুবিধ সমাজ-ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমন্বিত দেশ, নগর, রাজধানী, গ্রাম বা পল্লীর সংরক্ষণ বা শাসনই Civic বা নাগরিক কর্ত্তব্য। Civic বা নাগরিক কর্ত্তব্য Citizen বা নাগরিকমাত্রেরই শিক্ষণীয় ও পালনীয়। পূর্ব্বকালে এ দেশে এ কার্য্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা নগর-সমাজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত;—ইদানীং স্থানীয় আত্মশাসন বা Local Self Governmentএর উপর এ কার্য্য কতক পরিমাণে ন্যস্ত। লোকাল সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় আত্মশাসন, এ কার্য্যের কতক অংশ মাত্র বহন অধুনা নানা আকারে ও লঘু গুরু অধিকার অনুসারে, আত্মশাসনের নানা নাম,—ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী, পল্লী-পঞ্চায়েৎ ইত্যাদি। ইহারা ব্যষ্টিভাবে আপন আপন কেন্দ্রে কার্য্য করে বটে, কিন্তু ইহাদের কার্য্যসমষ্টির ফলাফলের উপর সমগ্র দেশের ভালমন্দ নির্ভর করে। আত্মশাসনের উপর বক্ষ্যমাণ কার্য্যভার বিন্যস্ত বটে, কিন্তু আত্মশাসনে নগরসমাজস্থ সকলেরই অধিকার, সমাজ-ধর্ম্মানুসারে সকলেই সে কার্য্য করিতে বাধ্য। আত্মশাসন স্বাভাবিক। স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন ও সংরক্ষণ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে সকলে মিলিয়া সর্ব্বসাধারণের সাধারণ কার্য্য করাও স্বাভাবিক, কারণ, তাহা স্ব স্ব কার্য্যেরই রূপান্তর।

শব্দ ব্যুৎপত্তি,—সোসিয়াল ও সিবিক্।

কেবল অধিকার নহে, কর্ত্তব্য।

সার্ব্বজাতিক দায়িত্ব।

সামাজিক কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনে মহাপাপ।

কিন্তু স্বাভাবিক কার্য্যও অনেক সময়ে লোকে করে না। অনেক লোকই তাহাতে অজ্ঞ

ও অসম্মত। সভ্য ও অসভ্য সমাজ ভেদে সমাজধর্ম্মের স্বাভাবিক কার্য্য সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

স্বাভাবিক কার্য্যে উদাসীনতা।

বলা বাহুল্য যে, আমরা এস্থলে Civic (civilised) অর্থাৎ সভ্য সমাজের সমাজ-ধর্ম্মানুমত স্বাভাবিক কার্য্যের কথাই বলিতেছি। কিন্তু সভ্য সমাজেও অনেকে এ কার্য্যে অজ্ঞ ও অতৎপর। ইহার কারণ দূরদর্শিতার অভাব, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অনিষ্টোৎপাদন ও অকিঞ্চিৎকর স্বার্থপরতা,—অকারান্তরে অসভ্যতা। এই অসভ্যতার অত্যন্তর হইতে অস্মদ্দেশের প্রচলিত প্রবাদ "সাজার মা গঙ্গা পায় না', এবং বিদেশীয় প্রবাদ "That which is everybody's work, is nobody's work" উৎপন্ন হইয়াছে।

"সাজার মা গঙ্গা পায় না"।

লর্ড রিপন এ দেশে আত্মশাসন আইন পাস করিয়া যান। আত্মশাসন কার্য্য, তদবধি আমাদের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, আমাদের নিজের হাতে চলিতেছে। খুব ভাল করিয়া চলিতেছে, এমন কথা বলি না;—কেমন করিয়া বলিব? বরং বলি, বিকলাঙ্গ, বে-আড়া, কুৎসিৎ, কদাকারভাবে কোনওরূপে চলিতেছে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি আমরা আত্মশাসনের অনধিকারী? আত্মশাসনে অনধিকারী সংসারে কেহই নহে, কেহই হইতে পারে না। অনধিকারী কেহই নহে, অনেকেই অনুপযুক্ত ও অশিক্ষিত। আমরাও অনুপযুক্ত, অশিক্ষিত; কিন্তু অধিকারী বটে।

আত্ম-শাসন আইন, লর্ড রিপন।

শরীরের কয়েকটা মাত্র ক্রিয়া ব্যতীত স্বাভাবিক কাজ সকলও শিক্ষণীয়। শরীরের যে কয়েকটা কাজ না শিখিলেও আপনাআপনি আসিয়া জুটে, তাহাও সভ্য সমাজের উপযোগী সুন্দর ও সুমার্জ্জিত করিতে শিক্ষা প্রয়োজন হয়। স্বভাব-সুগঠিত শরীরকেও বজায় ও বলিষ্ঠ রাখিবার জন্য ব্যায়ামশিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষা ব্যতীত সংসারের কোনও কাজই সম্পন্ন হইতে পারে না। আত্মশাসনেও শিক্ষার প্রয়োজন,—শিক্ষার এবং বাল্যকাল হইতে শিক্ষার প্রয়োজন।

স্বায়ত্তশাসনও শিক্ষণীয়।

ক, খ, গ শিক্ষার মত, লিখন ও পঠনশিক্ষার মত, আত্মশাসনও শিক্ষণীয়। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ও গণিত পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশাসনবিষয়ক গ্রন্থের পাঠও শিক্ষা করা উচিত। আত্মশাসনশিক্ষা স্কুল হইতেই আরম্ভ হওয়া আবশ্যক।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা।

আমরা ইদানীং আত্মশাসনে অশিক্ষিত, অক্ষম ও অতৎপর। ইহা অসীম পরিতাপের বিষয় বটে, কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিলে ইহা আশ্চর্য্যের ও আমাদের তাদৃশ লজ্জার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। সভ্য, স্বাধীন, আরোহমান কাল হইতে আত্মশাসনে অধিকারপ্রাপ্ত যুরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যেও অদ্যাপি অনেক লোক আত্মশাসনের নিয়মাবলীতে অজ্ঞ ও তাহা করিতে অলস ও অতৎপর। অতএব আমরা পরপদপ্রপীড়িত চিরপরাধীন জাতি আত্মশাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত আছি, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি,—সবিশেষ বা কি?

ইংলণ্ডের অবস্থা।

কিন্তু অতঃপর আমরা আত্মশাসনাধিকারের এক আধ কণা প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমাদের উহা সম্বন্ধে শিক্ষা করা উচিত। যে ইংরেজ গবর্মেণ্ট আমাদিগকে উহা দিয়াছেন, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য আমাদিগকে উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে শিখান। কারণ শিক্ষাবিভাগ তাঁহাদেরই হস্তে। পরন্তু, আত্মশাসনানুরাগী, এ দেশীয় যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই উচিত, দেশমধ্যে আত্মশাসনশিক্ষা বিস্তার করা। আপাততঃ এ শিক্ষা

শিক্ষা প্রয়োজন,—সরকারের কর্ত্তব্য।

যেরূপ ভাবে অল্পবিস্তর প্রচারিত হইতেছে, তাহা সন্তোষজনক নহে। শৈশব হইতেই এ শিক্ষা হওয়া চাই। স্কুল পাঠশালাতেই এ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। দেশীয় সংবাদপত্রদিগেরও এ শিক্ষার প্রচার করা প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের অনেকেই কেবল খুঁত ধরিতে ব্যস্ত,—খুঁত ধরা ও অন্ধকার আবরণে দেশটাকে ঢাকিয়া রাখাই তাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা হায়! অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অজগর আহম্মকদিগের হস্তের যষ্টিস্বরূপ হইয়াছেন।

সংবাদপত্রের পাপ।

বিগত জুলাই-সংখ্যক কন্‌টেম্পরারি রিবিউতে "The Teaching of Civic Duty' নামধেয় একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি বৃটিশ পার্লামেণ্টের মাননীয় মেম্বর মিঃ জেম্‌স ব্রাইল কর্ত্তৃক লিখিত। আমরা এই প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া উপরি-উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছি। কন্‌টেম্পরারির এই প্রবন্ধে সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও স্বদেশানুরাগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতঃ, সরকারী ও বে-সরকারী স্কুল পাঠশালায় আত্মশাসনশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করি।

মিঃ জেম্‌স ব্রাইল।

এরূপ শিক্ষা ফ্রান্সে আছে, জর্ম্মনীতে আছে, ইতালি ও সুইজরলণ্ডেও আছে, আমেরিকা, ইউনাইটেডষ্টেট্‌সে ত আছেই। ইংলণ্ডে স্কুলে আত্মশাসনশিক্ষার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু স্কুলে এ শিক্ষা কিরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে? মিঃ ব্রাইল বলেন;—

য়ুরোপীয় দেশে।

You may ask me in what the habits of civic duty consist, which the Schoolmaster may seek to form in his pupils; and by what methods he is to form them. The habits are, I think, these three—To strive to know what is best for one's own country as a whole. To place one's country's interest, when one knows it, above party feeling, or class feeling or any other sectional passion or motive. To be willing to take trouble for the well-governing of every public community one belongs to, be it a township or parish, a ward or a city, or the nation as a whole. And the methods of forming these habits are two, methods which of course cannot in practice be distinguished but must go hand in hand,—giving of knowledge regarding the institutions of the country—knowledge sufficient to enable the young citizen to comprehend their working and the inspiring of a love for the nation, an appreciation of all, that makes its true greatness, a desire to join in serving it.

ইংলণ্ডের এবং এখানকার আত্মশাসনে অবশ্য তফাৎ অনেক। মিঃ ব্রাইল ইংলণ্ডের কথাই বলিতেছেন,—তাঁহার সকল কথা এ দেশে প্রযুক্ত হইতে পারে না; তা না হউক, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা সার্ব্বভৌমিক, সুতরাং সকলেরই শিক্ষণীয়।

শিক্ষাপ্রণালী।

মিঃ ব্রাইল বলিতেছেন, "স্কুলে বালকদিগকে সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসনের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি শিখান কর্ত্তব্য; এ অভ্যাস, এ প্রবৃত্তি, তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—সমগ্র দেশের পক্ষে, সমগ্র জাতির পক্ষে উন্নতির সর্ব্বোত্তম উপায় বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নতি কি, ইহা জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা। দ্বিতীয়,—তাহা জানা হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর জাতি, জ্ঞাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সংস্থাপন

করিবার চেষ্টা। তৃতীয়,—যিনি যে নগরসমাজের, পল্লীর, সহরের বা রাজধানীর অধিবাসী হয়েন, তাঁহার আত্ম-অধিবাসস্থলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নতিসাধনে স্বকীয় শারীরিক ও মানসিক শ্রমে কার্য্য করিতে তৎপর হওয়া।"

ছাত্রের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতার ও আত্মশাসনের এই তিন বীজ বপন করিয়া, সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর শিক্ষা দ্বারা তাহা অঙ্কুরিত, সবল ও সুকুমার বৃক্ষে পরিণত করিতে হইবে; বালকের নিজের কল্পনা, স্বভাবতঃই এই বৃক্ষ পত্রে পুষ্পে পরিশোভিত করিবে। পরে বালক যখন মানুষ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সংসারের প্রকৃত ব্যাপারে লিপ্ত হইবে, তখন বিদ্যালয়ের রোপিত সেই সুকুমার তরু ক্রমে এক মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া, স্বদেশের ও সমাজের সেবার্থে কতই সুফল প্রদান করিতে পারে, কিন্তু কোমল ভূমিতে বীজ রোপিত না হইলে, বিদ্যালয়ে বাল্যাবস্থায় আত্মশাসনশিক্ষা না দিলে, সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

স্বদেশহিতৈষিতা।

স্বতন্ত্র ভাবে ও স্বদেশীয় ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যের সহিত এই সার্ব্বভৌমিক সমাজ-নীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্বদেশীয় ইতিহাসে ও কাব্যসাহিত্যে, স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্ব্ব-কীর্ত্তি ও পূর্ব্বগৌরব সিঞ্চিত আছে। ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যের এমন ভাবে অধ্যাপনা করা আবশ্যক যে, তদ্দ্বারা স্বজাতির কীর্ত্তি ও স্বদেশের গৌরব ও স্বদেশপ্রেম বালকের মনে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মন প্রাণ পূর্ণ করে, তাহার কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে। সচরাচর ইতিহাস ও কাব্যাদির যেরূপ রীতিতে পাঠনা হয়, তাহাতে উহা সিদ্ধ হয় না।

ইতিহাসে ও কাব্যে।

আত্মশাসনের নিয়মাবলীর জটিল খুঁটিনাটিতে বালকের মন ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক রাখে না। যাহা উহার বিসংবাদী তত্ত্ব ও অতিশয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব, তাহাও বালককে শিখাইবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। যাহা সহজ, সরল এবং শরীরী, তাহাই কেবল শিখাইতে হবে। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে, জাতি কি, আইন কি, রাজা কে, রাজা প্রজার মৌলিক সম্বন্ধ কি, এই সকল তত্ত্বের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা শিক্ষা দিতে হইবে না। ইহা অদ্যাপি বড় বড় পণ্ডিতদিগের কূট তর্কের বিষয়ীভূত। কূট তর্ক সর্ব্বথা পরিহার করিয়া, ছাত্রকে দেশের শাসননীতির স্থূল তাৎপর্য্য বা শরীরী গঠন শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

সবল শিক্ষা চাই।

পঞ্চায়েত কাহাকে বলে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থ কি, মিউনিসিপালিটীর গঠন কিরূপ, আত্ম-শাসনের অভিপ্রায় কি, নির্ব্বাচন কাহাকে বলে, ভোট দেওয়ার তাৎপর্য্য কি, স্থানীয় ব্যবস্থা-পক সভা কোথায়, এবং তথায় কি হয়, সুপ্রিম লেজিস্লেটিব কৌন্সিল কি করেন, ইহাদের গঠন, গতি ও প্রকৃতি কি প্রকার, পুলিস কি, পূর্ত্ত কি, উহাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ সার ও সহজ সহজ নিয়ম কি কি, এই সকল সজীব বিষয়ের সজীব শিক্ষা, পৌরাণিক কি সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত। কূট তর্ক ও জটিল সমস্যা উপস্থিত না করিয়া, ছাত্রদিগকে এ অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে। আত্মশাসন কেবল একটা অধিকার নহে, উহা সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, ইহাও অল্পে অল্পে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেবল মাত্র সাধারণ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় এ শিক্ষা হইবে না, কোনও দেশেই হয় না; এ দেশেও হইবে না। স্বতন্ত্র ভাবে সাধারণ শিক্ষার সহিত এ শিক্ষা দিতে হইবে। এ শিক্ষা দ্বারা বালকের মনে সমাজনৈতিক জ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দিলেই, তবে সে বালক ভবি-ষ্যতে মানুষ হইয়া সাধারণের কাজে আসিবার সম্ভাবনা। নহিলে, এ জ্ঞান এক দিনের মধ্যে

শিক্ষা-সঙ্কেত।

আকাশ হইতে পড়িয়া লোকের মনে ঢুকিয়া কার্য্য করিবে না। প্রাইমারি পাঠশালা হইতে উচ্চ শ্রেণীর স্কুল কালেজে পর্য্যন্ত এ শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। ছাত্রবৃত্তি ও এনট্রান্স পরীক্ষায় এ বিষয়ের একটা প্রশ্ন-পত্র থাকা উচিত।

"স্বাধীনতা স্বাধীনতা" করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ কাল লম্ফ ঝম্প দিয়া থাকেন। ইহা একেবারেই যে মন্দ, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি, তাহা তাঁহাদের বুঝা উচিত।

স্বাধীনতা কাহাকে বলে?

যাহা খুসি তাই করার অধিকারের নাম স্বাধীনতা নহে, এরূপ অধিকার মনুষ্যসমাজে নাই, থাকা অসম্ভব। সাধারণতন্ত্রের ন্যায় রাজতন্ত্রে, এমন কি বিদেশীয় শাসনেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা সম্ভবে, এবং সময়ে তাহা সম্যক বিকাশলাভও করিতে পারে। এ দেশ বিদেশীয় রাজতন্ত্রে শাসিত হইলেও, কে বলিতে পারেন, স্বাধীনতার ন্যায্য স্বত্বাধিকার আমাদের একেবারেই নাই,

আমাদের স্বাধীনতা আছে।

আমরা একেবারেই তাহা পাই নাই। কে বলিতে পারেন, আমরা যতটুকু পাইয়াছি, তাহা ক্রমে প্রসৃত হইবে না? আজ কাল অনেকে স্বাধীনতা অর্থে যাহা বুঝেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু তাহা নহে। শিক্ষিতদিগের এ ভ্রম নিরাকৃত হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ইহাও জানা উচিত যে, স্বাধীনতার সহিত সকলেরই কতকগুলি করিয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য সংশ্লিষ্ট আছে। স্বাধীনতার স্বত্বাধিকারটি চাই, কিন্তু কর্ত্তব্যটি করিতে পারিব না, এ কেমন কথা? কিন্তু এই কথাই আজকাল অনেক স্থলে শুনা গিয়া থাকে; আর এই জন্যই আত্মশাসনের অবমাননা হইতেছে।

Liberty also has its duties as well as its rights and will begin to be in danger if it forgets them. The tie of [illegible] to the State, though it cannot be as close as that which binds us to family and friends, ought to be just as clearly recognised to be a tie of absolute force. স্বাধীনতা ও স্বদেশহিতৈষিতার

ম্যাটসিনির মত।

কর্ম্ম-বীর স্বয়ং ম্যাটসিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও উচিত, এ উপদেশ বুঝিয়া যথাসম্ভব তদনুরূপ কার্য্য করা। রাজা এবং রাজ্যের সহিত প্রত্যেক প্রজাই রাজনৈতিক ও প্রজানৈতিক সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ; সেই সূত্র পারিবারিক সূত্রের মত ঘনিষ্ট না হইলেও, সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক ও সবল;—এ কথা এ দেশীয় লোক যত দিন না বুঝিবে, স্বাধীনতা-সংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে তৎপর না হইবে, তত দিন দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না; ইহা নিশ্চয়।

Civic শব্দটির বিশুদ্ধ বাঙ্গালা প্রতিবাক্য কই? ফরাসী civisme শব্দের অনুরূপ শব্দ রাজ্ঞীতেও নাই। মিঃ ব্রাইস লিখিয়াছেন;—

The French are fortunate in possessing a word civisme, for which there is no precise English equivalent, since "patriotism" has received a slightly different sense. *Civisme* is taken to include all the qualities which make up the good citizen—the love of country and of liberty, respect for right and justice, attachment to the family and the community. This is perhaps not too wide an extension to give to civic duty. Or we may describe it as one aspect or side-domestic side of the love of country, a virtue generally thought of as displaying itself in services rendered to,

and sacrifices made for one's father-land in struggles against external enimies, but which ought to be extended to cover the devotion to all that can subserve her inner welfare.

স্বদেশভক্তি সাধারণতঃ দুই ভাগে কল্পিত করা যাইতে পারে। দুই ভাগেই স্বদেশপ্রেম সমভাবে বিদ্যমান। এক বিভাগের স্বদেশপ্রেমে লোকে বুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া, নানারূপ আত্মত্যাগ ও প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করে, অপর বিভাগের স্বদেশপ্রেমে লোকে আত্মশাসনকার্য্যে পরস্পরে সংলিপ্ত হইয়া ও শ্রম করিয়া, দেশমধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া স্বদেশের অর্থ,—আপনার আপনার,—(কেন না সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। প্রথম বিভাগের দেশহিতৈষিতায় আমরা অসমর্থ,—আমাদের সে সুবিধা নাই, সুতরাং সে স্বত্বাধিকারও নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের দেশভক্তি পরিচালনা করিবার আমাদের অবসর আছে, অল্পবিস্তর অধিকারও প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক দিকে রাজভক্তি ও সার্ব্বভৌমিক সমাজবাৎসল্য প্রদর্শন ও অপর দিকে আত্মরক্ষা করা আমাদের উচিত নহে কি? আমরা এ বিষয়ে সকল কথা এক দিনে পরিস্ফুট করিতে পারিলাম না। আশা করি, সাহিত্যের সহৃদয় পাঠকবর্গ এই গুরুতর অত্যাবশ্যক বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।

স্বদেশভক্তির দুই ভাগ।

ধর্ম্ম।

পাপাশয় বা পরিহাসপ্রিয় লোকে পলাণ্ডুর সহিত ধর্ম্মকে উপমিত করে। পলাণ্ডুর যেরূপ খোসার পর খোসা,—খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কেবল খোসাই বাহির হয়; বহির্ভাগ হইতে গর্ভকোষ পর্য্যন্ত সমস্তই নিরবচ্ছিন্ন খোসাময়; ধর্ম্মেরও নাকি তেমনি খোসার ভিতর খোসা, তদ্ভিতর ছাড়াও, তদ্ভিতরই খোসা দেখা দেয়। ইহা পাপের ও পরিহাসের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুণ্যাত্মা লোকেও ধর্ম্মের ভিতরের ভাবের আভাস দিবার জন্য সময়ে সময়ে এ উপমা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—হাঁ, তা বটে,—ধর্ম্মের পলাণ্ডু প্রকৃতি বা পলাণ্ডুর পরদা-প্রকৃতি আছে বটে; কিন্তু পলাণ্ডুতে যেরূপ প্রায় সবই খোসা, ধর্ম্মে তাহা নহে, ধর্ম্মের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে অবশেষে এমন এক স্থল বাহির হয়, সেখানে খোসা দেখা যায় না। সেখানে সবই শাঁস,—আঁশ বা আবর্জ্জনা মাত্র নাই। এই শাঁস ধর্ম্মের সার সত্ত্বা। এই শাঁস বা সার সত্ত্বার নাম এসোটেরিক (esoteric) বা আভ্যন্তর অংশ। কিন্তু, এ অংশ সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। অসাধারণ সাধু, মহাত্মা, যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরাই ধর্ম্মের "এসোটেরিক" অংশ দেখিতে পান। ইংরেজী esoteric শব্দের অর্থ আমরা বাঙ্গালায় "আভ্যন্তরিক" করিলাম, আধ্যাত্মিক করিলাম না; ভ্রম হইল কি না, বলিতে পারি না।

ধর্ম্ম ও পলাণ্ডু,—পাপ উপমা।

ধর্ম্মের খোসা।

ধর্ম্মের সার সত্ত্বা; esoteric ধর্ম্ম।

আজ কাল এসোটেরিকের 'আমদ-রপ্তি' কিছু বেশী বেশী হইয়াছে বলিয়া বোধ

হয়। এ দেশে প্রথমতঃ উহা থিওসফি কর্ত্তৃক আনীত হয়। থিওসফির মুখে আমরা Esoteric Buddhism আভ্যন্তরিক বা আধ্যাত্মিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা শুনি।

এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্ম।

সংপ্রতি ডাক্তার লিট্‌নার আমাদিগকে "এসোটেরিক" মুসলমান ধর্ম্মের কথা শুনাইয়াছেন। গত জুলাই সংখ্যা এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিউতে তিনি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,—নাম The Kelam-i--Pir And Esoteric Mahomedanism.

ডাক্তার লিটনার প্রাচ্যভাষাবিদ্, প্রাচ্যপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রবীণ পণ্ডিত। এদেশে শিক্ষাবিভাগে বহু কাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এখন স্বদেশে পেন্সন ও পাণ্ডিত্য ভোগ করেন। ইনি এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিউর নিয়মিত লেখক; কোয়ার্টার্লির প্রত্যেক সংখ্যাতেই বহুসংখ্যক করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি, এসিয়া ও বৃটিশ উপনিবেশবিষয়িণী ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

ডাক্তার লিটনার।

এসিয়ার ও উপনিবেশনিচয়ের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ভাষা, সাহিত্য,—পঞ্চ শস্তের আলোচনা ইহাতে হইয়া থাকে। স্যর লেপেল্ গ্রিফিন কর্ত্তৃক ইহা প্রথমতঃ সংস্থাপিত হইয়া এখন অন্য হস্তে গিয়াছে। আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, প্রাকৃত,—হিন্দু ও যাবনিক বহু ভাষার গবেষণা ও সমালোচনা ইহাতে হইয়া থাকে; হইতে কেবল তত দেখা যায় না বাঙ্গালা ভাষার। কোয়ার্টার্লির প্রাচ্যভাষাবিদ্ লেখকমণ্ডলীর বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় বোধ বড় একটা নাই; অথবা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-পর্ব্বত-শৃঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোনও পদার্থ নাই।

এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি।

আরবী, পারসী, উর্দ্দুর উপর ডাক্তার লিটনারের শুনিয়াছি নাকি কিছু দখল আছে, অতএব মস্‌লেম সাহিত্য ও মস্‌লেম ধর্ম্মের গবেষণায় তিনি অধিকারী, তবে স্বধর্ম্মের সমালোচনামাত্র অসহিষ্ণু মস্‌লেম মহাশয়েরা, তাঁহার গবেষণায় সন্তুষ্ট হইবেন কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ডাক্তার মহোদয় কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখিতেছেন,—

ডাক্তারের গবেষণা।

It is not my wish to satisfy the idle curiosity by describing the contents of a book, concealed for nine hundred years, the greater portion of which accident has placed in my hands after years of unsuccesful search in inhospitable regions.

"এক খানি গ্রন্থ, নয় শত বৎসর পর্য্যন্ত অন্ধকারে (?) আবৃত, মনুষ্যদৃষ্টির (?) অগোচর ছিল। অতি অনাতিথেয় রাজ্যে বহু বৎসর বৃথা অন্বেষণের পর, হটাৎ আমার হাতে আসিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের মর্ম্ম বর্ণিত ও প্রকাশিত করিয়া আমি লোকের অলস কৌতূহল তৃপ্ত করিব না, তাহা আমার নয়।"

ডাক্তার লিটনার গ্রন্থ।

বাং পাঠক, সর্ব্বাগ্রে আপনার 'অলস' কৌতূহলকে সিন্দুক-জাত করুন। তাহা তৃপ্ত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার সাহেব তদীয় প্রবন্ধের প্রথম অক্ষরেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। তদাবিষ্কৃত গ্রন্থের নামটি কি? নামটি কি বলিতে কোনও আপত্তি করেন নাই বটে,—কিন্তু এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া তাহা কিছু বলেনও নাই। তাহা এসোটেরিকের অভ্যন্তরেই আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে গবেষণাতৎপর। প্রথমতঃ গবেষণা করিয়া দেখা যাউক, গ্রন্থের নাম কি? আমরা দ্বিতীয়তঃ গবেষণা করিব, সে গ্রন্থ ডাক্তার লিট্‌নার পাইয়াছেন কোথায়?

মর্ম্ম বলিবেন না।

আমাদের গবেষণার যে পরিমাণে বোধগম্য হইতেছে, তাহাতে আমরা আঁচিতে পারি যে, পণ্ডিতবর ডাক্তার লিটনারের আবিষ্কৃত গ্রন্থের নাম,—তাঁহার প্রবন্ধ-হেডিঙের প্রথম শব্দ, অর্থাৎ "কেলামি—পীর"। কারণ ডাক্তার সাহেব ইহা হইতে প্রমাণ "কোট" করিবার সামর্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেলামি-পীর কথাটির অর্থ কি? আমরা আরবী পারসী জবান জানি না; কাজেই এ "লব্জের" মানে ও মতলব কি, কেমন করিয়া বুঝিব? লেখক নিজে বলিতেছেন, I take the "Kalami-Pir" to be a collective name like "Homer." অতএব আমরা বুঝিলাম, কেলামি-পীর কাহারও নাম,—তা মানুষেরই হউক, আর গ্রন্থেরই হউক। যদি মানুষের বা দেবতার নাম হয়, তাহা হইলেও অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ব্যক্তির নামেও বহি নাম প্রাপ্ত হইতে পারে; অতএব উহা বহি, উহাই গ্রন্থের নাম,—কেলামি-পীর এক খানি কেতাব।

গ্রন্থের নাম ও নামের অর্থ।

কিন্তু এ কেতাব কোথায় ছিল? প্রবন্ধকর্ত্তা সে কথাও কিছু কহেন নাই। অতএব পুনর্ব্বার কল্পনা-দেবীর অর্চ্চনা আবশ্যক। আমরা অনুমান করি, আফগান সীমান্তে, হনজা নাগর রাজ্যে এ কেতাব ছিল। কারণ, হনজা নাগর রাজ্য অসভ্য ও অনাতিথের রাজ্য এবং মস্‌লেম রাজ্য, এবং সে রাজ্যে ডাক্তার লিট্‌নার পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অতএব সেইখানেই এ কেতাব, Kelami-Pir=Logos of the Ancient তিনি পাইয়াছেন। কেলামী-পীরের দ্বিতীয় অর্থ "পুরাতনের লোগ্"।

কেতাব ছিল কোথায়?

এই গ্রন্থের কোনও এক জন (?) লেখকের নাম প্রবন্ধে বিজ্ঞাপিত আছে। খ্যাতনামা কবি, ঐতিহাসিক এবং গণিতজ্ঞ, সা'দি খসক, এ কেতাবে কন্ট্রিবিউট করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯৬৯ অব্দে খাঁ নাজির খোসরু জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পবিত্র পুণ্যাত্মা, নিষ্ঠাবান ও অধ্যবসায়ী মস্‌লেম ছিলেন। নাজির খেসরু একে একে অনেক ধর্ম্ম পরীক্ষা ও পরিবর্জ্জন করেন। পরীক্ষায় যাহা প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন না হইত, সা সাহেব তাহা পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে অনেক ধর্ম্মের পরীক্ষা ও অনেক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর, তিনি এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং সে বিষয়ে (বোধ হয়) কেলামী-পীরে প্রবন্ধ প্রকটিত করেন। অতএব কেলামী-পীর হইতেই ডাক্তার লিট্‌নার Esoteric Mahomedaism নিষ্কাশন করিয়াছেন, ইহাই সম্ভব।

কেতাবের কন্ট্রিবিউটর।

নাজির খসরু।

কিন্তু নিষ্কাশিত পদার্থ "এসোটেরিক"; অতএব দৃষ্টির অগোচর। এসোটেরিক শরীরী অংশ স্বল্প সপ্রকাশ আছে। এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্মের বর্ত্তমান গুরু পুরোহিত প্রধান আচার্য্য বা পোপ His Highness আগা সুলতান মহম্মদ। ইনি মুসলমান পেগম্বর আলির বংশধর। আলি, হজরত মহম্মদের জামাতা। ডাক্তার লিট্‌নারের মতে ইনি, এসোটেরিক মুসলমানের নিকট বিষ্ণুর দশম অবতার বলিয়া পরিচিত। মুসলমানী মতের এসোটেরিক অংশই নাকি এই অবতারত্ব প্রতিপন্ন করে। Even when confronter by Hinduism, the new creed could represent that Ali the son-in-law of the prophet Muhammed, was the 10th incarnation of Vishnu.

প্রধান পুরোহিত।

এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্মের এখনকার আধ্যাত্মিক অধিনায়ক (spiritual head)

H. H. আগা সুলতান মহম্মদ শাহা ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে করাচি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব ইনি তরুণ যুবক। আরবী, পারসী ব্যতীত ইনি ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজীও পড়িয়াছেন। ইংরেজী উত্তম রকম শিখিয়াছেন। আগা সাহেবের যে সকল ইংরেজী বই সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে ও যে সব বই পড়িতে তিনি ভাল বাসেন, তাহাতেও ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ শিক্ষক তাহারও নাম করিয়াছেন; যথা পারস্য, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, "রুলার অব ইণ্ডিয়া সিরিজ," History of our own Times. ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত রেখাগণিত, বীজগণিত ও গণিত পড়িয়াছেন; রসায়ন ও জ্যোতিষও কিছু কিছু শিখিয়াছেন। সেক্সপীয়র, মেকলে, স্কট্ পড়িয়াছেন। বিলাতি ডাকে বিলাতি কাগজপত্রও ইহাঁর কাছে আসে। ইহাঁর বিলাতে যাইবারও বাসনা আছে। ডাক্তার লিটনার কিন্তু, এ দেশীয় লোকের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বিলাতগমনের ভয়ানক বিরোধী। আগা সুলতান সাহেবের আজও বিবাহ হয় নাই। সম্ভবতঃ শীঘ্রই বিবাহ ও সন্তানসন্ততি হইবে, ডাক্তার লিটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁর পিতার নাম H. H. আগা আলি সা। মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর পিতা পিতামহ সীপাই মিউটিনির সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন।

গুরুর শিক্ষা।

এই আলি বংশাবতংশ আগা সুলতান মহম্মদ সা, এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্মের পরিচালক। ডাক্তার লিটনার বলেন, ক্যাথলিক পোপ অপেক্ষাও ইহাঁর প্রভাব বেশী; ইনি আলির জীবন্ত অবতারস্বরূপ প্রপূজিত। লেবেনান হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত ইহাঁর এসোটেরিক (?) ধর্ম্মাধিকার বিস্তৃত। বোম্বাই খোজা সমাজ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। জগতের যেখানে যত মুসলমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে ইহাঁর এসোটারিক শিষ্যসম্প্রদায় আছে। এমন কি, অন্ধকারভূমি আফ্রিকাতেও আছে; আফ্রিকার এক সম্প্রদায় মুসলমানের (?) কথা ডাক্তার লিটনার উল্লেখও করিয়াছেন। ইহাদের নাম makarama. মাকারামাদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বড় ভয়ানক। ইহারা বলে, "পরমেশ্বর অজ্ঞেয়, দিবা এবং রাত্রি, অষ্ট প্রহরই অদৃষ্ট। অতএব তাঁহার বিষয় ভাবিয়া মাথা ঘামাইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। স্বর্গও নরক উভয়েরই অস্তিত্বাভাব।" এই মর্ম্মে ইহাদের একটি আরবী বয়াতের ইংরেজী অনুবাদ এই;—

প্রবল প্রভাব।

মাকারামা সম্প্রদায়।

God is unknown—by day or night,
Why trouble about him, there is no heaven and no hell.

এই ভয়ানক ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষাও ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান আরও ভয়ানক। ভয়ানক বিশ্বাস হইতেই ভয়ানকের ভয়ানক অনুষ্ঠান উৎপন্ন হয়। ইহাদের একটি অনুষ্ঠানের বিষয় ডাক্তার লিটনার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুষ্ঠান।

"They hold an annual nightly feast with closed doors and lights in the house, in which they practise incest; and that they annually practise the ceremony of driving a scape goat into the mountains.

আমরা এ ইংরেজীর বাঙ্গালা অনুবাদ করিব না; কারণ স্ত্রীলোক ও বালকেও বাঙ্গালা পড়িতে পারে। উপরি উক্ত বাৎসরিক বীভৎস ব্যাপার নিশীথ উৎসবের পর, মাকারামা-সম্প্রদায় ছাগলশৃঙ্গে তাহাদের বৎসরের পাপ অঙ্কিত ও অর্পিত করিয়া, ছাগলটাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেয়। পাপনাশের ইহা একটা পৌরাণিক রীতি।

ছাগল-শৃঙ্গে পাপক্ষয়।

আমরা আশা করি, আফ্রিকার এই মাকারামা সম্প্রদায় ডাক্তার লিটনারের কথিত এসোটেরিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দলভুক্ত নহে। মাকারামাগণ তাহাদের ধর্ম্মের কথা কাহাকেও বলে না, ফ্রিমেসনদের মত তাহাদের সবই গোপনীয়;—এইটাই বোধ হয় এসোটেরিকত্ব।

এসোটেরিক ও আরবী।

আরবী না পড়িয়া কেহ এই এসোটেরিক ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ডাক্তার মহাশয়ের এমন ইচ্ছা নয়। কারণ আরবী না হইলে এসোটেরিক উদ্ঘাটন করা যায় না। পণ্ডিতবর বলিতেছেন :—Nothing could be more distressing to me than the formation of a band of esoteric Mahommédans' unacquainted with Arabic which is the only key to the knowledge of Islam.

ডাক্তার লিট্‌নার আরবীতে মৌলবীবিশেষ; অথচ এই এসোটেরিক মুসলমানত্বের বিষয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সবিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়কে ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন। বলিতেছেন,—যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, পালি জানেন না, তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি বুঝিবেন? এসোটেরিক কথাটার তাঁহারা ভয়ানক অপব্যবহার করিয়াছেন। না বুঝিয়া সুঝিয়া, সাদা সিধা বৌদ্ধ ধর্ম্মটিকে এসোটেরিক করিয়া বসিয়াছেন, অথচ তাহাতে আসলেই এসোটেরিকত্ব নাই।" জানি না, থিওসফিষ্টরা এ আক্রমণের উপযুক্ত কি না? কিন্তু এই প্রবীণ পণ্ডিতটি স্বয়ং বুদ্ধকেই ছাড়েন নাই। বলিতেছেন যে, বুদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আক্ষেপ করিতেন যে, "নির্ব্বাণের পথ এত সোজা করিয়া দিয়া ভাল করেন নাই।

থিওসফি ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

তা যাউক। ডাক্তার লিট্‌নারপ্রোক্ত এই এসোটেরিক মুসলমান ধর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে পদার্থটি কি? ইহা সাংখ্যমত কি বেদান্ত মত, দ্বৈত বা অদ্বৈত মত? ডাক্তার লিটনার যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা এই;—

This system elaborates the principle that all truths except one are relative. It treats each man as it finds him leading him through stages, complete in themselves, to the final secret.

এক ভিন্ন সংসারের আর সবই পারস্পরিক সম্বন্ধসংশ্লিষ্ট পদার্থ,—প্রোক্ত এসোটেরিক প্রণালী, এই কথাই ব্যাখ্যা করিয়াছে। উহা যে যেমন লোক, তাহাকে ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহার সাধনার জন্য ঠিক তেমনি রকম-ব্যবস্থা করে,—সে সকল ব্যবস্থা—সাধনার সে সব পর্য্যায়ই—আত্মাধিকারে পূর্ণ; মনুষ্য, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে গরিশেষে শেষ গম্য স্থানে যাইয়া পৌঁছে।"

সাধকবিশেষে সাধনা।

কিন্তু এই শেষ গম্যস্থান, আখের-আশা কি এবং কোথায়? উহা বেদান্তের বিলয়, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ বা বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ, উহা মুসলমানের ভেস্ত অথবা গুপ্ত প্যারাডাইস? সে গুপ্ত স্থান কোথায়, সে গুপ্ত কথা কি? লিটনার কহেন, তাহা এসোটেরিক,—অনধিকারীর অজ্ঞ. সহস্র রকমে সপ্রকাশ করিলেও তাহা তোমাদের কাছে প্রকাশ পাইবে না; ধরাইয়া তোমরা তাহা ধরিতে পারিবে না।

আখের-আশা কোথায়?

What that secret is, no amount of divulging will impart to any who is not fit to receive it.

অতএব আর কথা কি? ডাক্তার সাহেবের প্রবন্ধই বা কেন, আর আমাদের এই কর্ম্মভোগই বা কেন? তবে এই হুজুকপেয়ারা বঙ্গ দেশের জুজুদের কাছে খুব একটা কাণ্ড বটে।

কাব্যগ্রন্থ।

যিশু খৃষ্ট জন্মিবার অথবা খৃষ্টীয় অব্দের আট শত বৎসর পূর্ব্বে, হিব্রু ভাষায় এক খানি নাতি-দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ লিখিত হয়, তাহা Book of Job অর্থাৎ "জবের পুস্তক" বলিয়া বিখ্যাত, এবং খৃষ্টীয় বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সহিত গ্রথিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত, কবি, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক, সমালোচক, সাহিত্যসংসারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের বিবেচনায়, একপ পুস্তকের মত পুস্তক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। কি পৌরাণিক, কি আধুনিক, কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও সাহিত্যে, কখনও একপ আশ্চর্য্য গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই; সম্ভবতঃ হইবেও না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শতাব্দীর শিক্ষা-গুরু কারলাইল কহেন,—

Book of Job.

অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

I call the Book of Job one of the grandest things ever written with pen. A noble Book, all men's book! There is nothing written, I think in the Bible or out of it of equal literary merit.

"এ যাবৎ কালি-কলমে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এবং সর্ব্বোপরি, মহত্তর হইতেও মহত্তম,—'জবের' গ্রন্থ! উহা সমগ্র মনুষ্যজাতির গ্রন্থ,— সার্ব্ব-ভৌমিক গ্রন্থ! সাহিত্যাংশে ইহার তুল্য রচনা কুত্রাপি নাই।"

এই সভ্য ও সুমার্জ্জিত যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি টেনিসন বলেন;—The greatest poem whether ancient or modern times. "পুরাতন ও অধুনাতন উভয় কালেরই উচ্চতম কাব্য,—জবের গ্রন্থ।"

টেনিসন।

দশাধিক তিন শতটি মাত্র শ্লোক পরিমিত এই খানি ক্ষুদ্র কাব্যের এই খ্যাতি!!! অতএব অনুধাবন করুন পাঠক। কিরূপ সেই কাব্য। এ কাব্য পাঠ করিতে স্বতঃই আপনার কৌতূহল হইবে; কিন্তু বাইবেলে যে 'বুক অব্-জব' আছে, তাহা পাঠে কাব্যের প্রকৃত ভাবের উপলব্ধি সম্ভবিবে না; কারণ, তাহার অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত; বুক-অব্-জব বাইবেলের অনুরূপ করিয়া, বাইবেলে গৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। জব যাহা বলেন নাই, তাঁহার মুখে তাহা বলান হইয়াছে। বাইবেলের ধর্ম্মমতের দ্বারা মার্জ্জিত ও বিধৌত করিয়া, মূল হিব্রুর বিকৃত অনুবাদ করা হইয়াছে। বাইবেল-সন্নিবিষ্ট 'বুক-অব্-জবে' আসল জবের অধিকাংশই উড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং আত্মা বিকল, অসংলগ্ন ও আত্মবিরোধী হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। মৌলিক জব মানুষ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বভাবের স্বহস্তনির্ম্মিত, সদাচারী, সন্নীতিসম্পন্ন ধর্ম্মমতক্লেদবিরহিত, স্বাধীনচিত্ত সাহসী মানুষ, প্রকৃতির প্রভাতনির্ম্মল পুণ্য-ক্রোড়ে মনুষ্যস্বভাবের, মনুষ্য-আত্মার অকৃত্রিম অসংযত কবি; আর একরূপ লোক। বাইবেলের জব পৌরাণিক ধর্ম্মক্লেদবিড়ম্বিত পাদরি-পুরোহিতঠাকুর-দিগের হস্তগঠিত জীব। ধর্ম্মব্যবসায়ী মহাপুরুষেরা, ধর্ম্মের আবরণে জবের জীবন ও জীবনের অগ্নিময় উক্তি যত দূর আচ্ছন্ন করা সম্ভবে, তাহা করিয়াছেন; তথাচ সেই আচ্ছন্ন অবস্থায়, আবরণের অভ্যন্তরেও বহ্নি নির্ব্বাপিত নহে,—তথায়ও তাহা আত্মপ্রভায় প্রজ্বলিত; স্বভাবের জ্বলন্ত হুতাশন শাস্ত্রীয় শিল্পে সংযত হইয়াছে বটে; কিন্তু নির্ব্বাপিত হয় নাই। নিত্য

জবের মৌলিক গ্রন্থ ও বাইবেল।

বাইবেলের জব।

পদার্থ নির্ব্বাণ করা অসম্ভব। যে স্থলে মৌলিক জব জগদীশ্বরের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে কহিতেছেন,—

So let Him kill me. I cherish hope no more.
Only I will show Him my way to His face.*

সে স্থলে বাইবেল-বর্ণিত জব জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতেছেন,—

Though he stay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before Him.†

মূল কাব্যে প্রজ্বলিত হুতাশন, বাইবেলসংশ্লিষ্ট অনুবাদে সে আগুণ মৃদু, কৃত্রিম কুহকময় ধর্ম্মধূমে আচ্ছন্ন। অতএব, জবের অখণ্ড কবিত্ব ও তদীয়গ্রন্থের অকৃত্রিম কাব্যরস এবং সে রসের স্বাধীন, উদ্দাম ও কোমল করুণ উচ্ছ্বাস, কেবল মূলে অথবা মূলের অকৃত্রিম অনুবাদেই প্রাপ্তব্য। মূল গ্রন্থ,—হিব্রু ভাষা সাধারণের অজ্ঞাত। কিন্তু ধন্য ইংরেজী সাহিত্য; ধন্য ইংরেজের গবেষণা। প্রায় তিন সহস্র বৎসর বয়স্ক গ্রন্থের মূল রচনা আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার অকৃত্রিম ইংরেজী অনুবাদ সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত জুলাই সংখ্যা কণ্টেম্পরারি রিবিউতে এ অনুবাদ প্রাপ্তব্য। আমরা আশা করি, আমাদের কোনও কোনও সক্ষম কবিকে অনুরোধ করি,—তাঁহারা কেহ বাঙ্গালা কবিতায় এই আশ্চর্য্য ও অমর গ্রন্থের অনুবাদ করিবেন। কিন্তু সক্ষম শক্তিশালী ব্যক্তিরই ইহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। চৌদ্দ অক্ষরের পদ্যওয়ালা পাতি-কবিরা ইহা পারিবেন না। পক্ষান্তরে, মৃদু মোলায়েম বিনোদ আওয়াজে, সূক্ষ্ম স্বল্পস্থায়ী সুরেও, এ মহাগীতি ব্যক্ত হইবার নহে।

মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ।

বাঙ্গালা অনুবাদ আবশ্যক।

পাতি কবি পারিবেন না।

Would He were like unto myself that I might answer Him.
That we might come together in judgment. ‡

* * *

Let Him but withdraw from me His rod.
And let not His dread terrify me;
Then would I speak and not fear Him,
For before myself I am not so. ¶

এতাদৃশ বহ্নিউদ্গারী গম্ভীর গীতি, বিরহ-বিধুরা বিলাসিনী বাসন্তী রাগিণীর আয়ত্ত হইবে না। দীপক, হিন্দোল বা নটনারায়ণ রাগ ব্যতীত, এ ভীষণ গীত ধ্বনিত হইতে পারে না। ইহা সুসমর্থেরই চেষ্টাসাপেক্ষ।

---

* তিনি আমাকে হত্যা করুন। আমি কেবল আমার রীতি তাঁহাকে প্রদর্শন

† তিনি যদিও আমায় বধ করেন, তথাচ আমি তাঁহার করুণায় বিশ্বাস-রক্ষি আমার প্রথা তাঁহাকে প্রদান করিব।

‡ তিনি যদি আমার মত হইতেন, আমি তাঁহার এ বিধানের উত্তর দিতে পারিতা আমাদের উভয়েরই একত্রে বিচার হইত।

¶ তিনি তাঁহার দণ্ড আমার উপর হইতে অপসৃত করুন, তাঁহার ভয়ে আমাকে ভীত হইতে না দিয়া দেখুন, আমি নির্ভয়ে তাঁহার নিকট আমার বক্তব্য বলিব। নিশ্চয়ই ভয় করিব না। কারণ, আমি আমার নিজের নিকট সেরূপ নহি।

জবের গ্রন্থ হইতে আমরা যে দুই চারি কথা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে সম্ভবতঃ কেহ কেহ বিবেচনা করিতে পারেন যে, জব নাস্তিক, কেন না, তিনি ঐশ্বরিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহসী। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম।

জব নাস্তিক নহেন।

আমরা অগ্রেই বলিতেছি, জব নাস্তিক নহেন। নাস্তিকতা অস্বাভাবিক, পৃথিবীপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ের অসংখ্য অনুমান ও আনুমানিক বিধিনিষেধেও অস্বাভাবিক। জব অস্বাভাবিক নহেন,—নাস্তিকও নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের সুনিপুণ অনুমাননিচয়েও আবদ্ধ নহেন. সত্যবতঃ তাঁহার অনেক অনুমান, তাঁহার সময়ে মনুষ্য মনে কল্পিতই হয় নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থে মনুষ্যজীবন-রহস্যের সেই সকল কথার উত্থাপন করিয়াছেন, যাহা অতি পুরাতন কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত, আবহমান কাল একই রূপ আছে,—ধর্ম্মশাস্ত্রের শত শত রকমের ব্যাখ্যা, ফিলজফি ও থিওরি সত্ত্বেও অদ্যাবধি মীমাংসিত হয় নাই,—কোনও কালেই হইবে না।

জীবন-রহস্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবেচনায় জবের মৌলিক গ্রন্থ যাহাই হউক, সাহিত্যাংশে উহা অতুলনীয়। উহা মনুষ্যস্বভাবের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস,—উহার কাব্যগত মূল্যের ইয়ত্তা হয় না।

সাহিত্যাংশে অতুল।

উহা নাটকাকারে অথবা কয়েকটি মনুষ্যমনের কথোপকথনাকারে লিখিত; নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে শিরায় শিরায় পূর্ণ। কিন্তু, উহা কেবল নাটক নহে। কেহ কেহ বলেন, উহা শুষ্ক গম্ভীর ইতিহাস, কেহ কেহ বলেন, উহা দার্শনিক তত্ত্ব; কেহ কেহ কহেন, উহা খাঁটী নাটক; পরন্তু কেহ কেহ কহেন যে, উহা হিব্রু ভাষায় লিখিত একমাত্র (epic) মহাকাব্য।*

নাটক, ইতিহাস কি মহাকাব্য?

কন্‌টেম্পোরারির লেখক ডাক্তার ডিলন লিখিয়াছেন,—

In truth it pertakes of the nature of each and every one of these categories and is yet circumscribed by the laws and limits of none of them In form it is most nearly akin to the drama with which we should be disposed to identify it, if the characters of the Prologue and Epilogue were introduced as *dramatis personæ* in action instead of having their doing and enduring recorded as accomplished facts, inserted merely as the fail of the dialogues which constitute the pith and substance of the poem. Perhaps the least erronious way to describd it succiently would be to call it a psychological drama.

"প্রকৃত প্রস্তাবে এপিক, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব ও নাটক, সকলেরই সত্তা ইহাতে বিদ্যমান, কাহারও নিয়মসূত্রে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। আমরা ইহাকে আর কিছু না বলিয়া বরং নাটকই বলিতাম, যদি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কার্য্যাবলি অতীতের ঘটনা বলিয়া বিবৃত না হইয়া, এরূপ ভাবে বর্ণিত হইত, যাহাতে করিয়া নাটকীয় ব্যক্তিদিগের কথোপকথনে নাটকীয় কার্য্যসম্পাদনের তা প্রতিপন্ন করে। জবের গ্রন্থকে দার্শনিক নাটক বলাই বোধ হয়, অধিকতর সঙ্গত।"

---

* Some treat it, even none as a serious work of history; others as a philosophicel dialogue, many have defined it to be a genuine drama, while not a few enthusiastically urges that it is the only epic poem ever written by the Hebrews.

তা "যুক্তি" যে দিকেই যত বেশী বা কম থাকুক, জবের গ্রন্থ সাহিত্যের কোন জাতীয় রচনা, ইহার তর্ক বিতর্ক অদ্যাবধি শেষ হয় নাই। অলঙ্কারবিজ্ঞান উহার সংজ্ঞানিরূপণে অসমর্থ হইয়াছে।

অলঙ্কারশাস্ত্র অসমর্থ।

"জব প্রকৃতির প্রত্যেক বৃক্ষে, অতি সাধারণ বৎসামান্য দৃশ্যেও কবিতার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করেন, উদ্দাম বাত্যানিনাদে প্রকৃতির ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড সঙ্গীত এবং পরা প্রতিভা। করেন, সেই গীতি এবং সেই মূর্ত্তি, তাঁহার আত্মায় স্পষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনিত হয়। জবের সৃজনী-শক্তি এত আশ্চর্য্য, এবং তাঁহার চিত্রাঙ্কনক্ষমতা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী, তীব্র, প্রস্ফুট এবং জীবন্ত যে, ইহা বিচিত্র নহে,—নানালোকে তাঁহার কাব্যকে নানা আখ্যায় অভিহিত করে। গেটের ন্যায় মৌলিক প্রতিভাও জবের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের জীবন-যাতনা সম্বন্ধে তদতিরিক্ত একটিও নূতন কথা কহিতে সমর্থ হন নাই; বায়ুনও পারেন নাই।"

গেটে ও বায়ুন।

এক দিকে সুন্দর, অপর দিকে বিস্ময়কর, সুন্দরে বিস্ময়করে মিলিয়া যে সৌন্দর্য্য, তাহা সাহেব অতীত,—তাহা "সব্লাইম"। জবের গ্রন্থ, এই সব্লাইম সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথারের মতে, জবের গ্রন্থ Magnificent and sublime as no other book of scripture. "বাইবেলের আর সমস্ত অধ্যায় অপেক্ষা ইহা মহত্তর এবং অধিকতর সব্লাইম।"

সুন্দর ও বিস্ময়কর,—সব্লাইম।

এক কথায়, এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ জগতের সাহিত্যে এক অমূল্য রত্নস্বরূপ। স্বদেশীয় ভাষায় ইহার যদি উপযুক্ত অনুবাদ না হয়, তবে দেশেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

আমরা উপরে লিখিয়াছি, খৃষ্টাব্দের আট শত বৎসর পূর্ব্বে জবের গ্রন্থ প্রণীত হয়; কিন্তু উহা লোকের অনুমান মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কত কাল পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারেন না। বলা সম্ভব নয়। জব নামে জনৈক ইহুদী এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাও অনুমানমাত্র। আসল ইতিহাস অতীতের অন্ধকার-কুক্ষিতে অনন্ত কালের জন্য নিমজ্জিত।

অনুমানমাত্র।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বিস্তর অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পর, গুরুতর শ্রম ও গবেষণায় জবের মৌলিক গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া, তাহার অকৃত্রিম অনুবাদ জগতে প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই অনুবাদের কথাই উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে জবের গল্প কিরূপ, পাঠক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বাইবেল খুলিলেই জানিতে পারেন। তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এ স্থলে দিতেছি। বাইবেল বলেন, "প্রাচ্য দেশে উজ নামে

বাইবেলের গল্প।

ইহুদি জাতির মধ্যে জব নামে জনৈক ব্যক্তি ছিলেন। জব সাধু, ধর্ম্মভীরু, এবং নিষ্পাপ। জবের সাত পুত্র, তিন কন্যা। জব ধনী লোক। তাঁহার সাত সহস্র মেষ, তিন সহস্র উষ্ট্র, পাঁচ শত হলবাহী বৃষ, এবং পাঁচ শত গর্দ্দভী ছিল। জব প্রাচ্য পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রগণ্য জমিদার ছিলেন। জব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্ম্ম, উপাসনা প্রার্থনাপরায়ণ, নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর, পরম সুখী লোক।

"এক দিন পরমেশ্বরের পুত্রগণ পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন, সয়তানও সেই সঙ্গে উপস্থিত হইল।

জগদীশ্বর সয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথা হইতে আসিলে?' সয়তান উত্তর করিল, 'আমি পৃথিবীর এখানে ওখানে সেখানে বিচরি, উচ্চে নিম্নে ঘুরিয়া বেড়াই।'

"পরমেশ্বর সয়তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার সেবক জবকে জান ত; তাহার মত পুণ্যাত্মা, সাধু সজ্জন পৃথিবীতে নাই। সে নিষ্পাপ, ভগবদ্ভক্ত।'

"সয়তান তদুত্তরে কহিল, 'তুমি জবকে ধন দৌলত দিয়াছ, পুত্র কন্যা দিয়াছ, সুখী করিয়াছ, কাযেই সে তোমার সেবা করে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব, পুত্র কন্যা, সুখ সম্পদ কাড়িয়া লও, দেখিবে, সে তোমাকে আর মানিবে না।'

"সয়তানের কথা শুনিয়া জগদীশ্বর জবের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে, জবের উপর যদৃচ্ছ অত্যাচার করিতে, সয়তানকে উপদেশ করিলেন। কেবল জবকে প্রাণে মারিতে নিষেধ করিলেন।

"সয়তান পরমেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জবকে সর্ব্বস্বান্ত করিল। এক দণ্ড কালের মধ্যে জবের সাত পুত্র মরিল, তিন কন্যা মরিল, মেষ, বৃষ, উষ্ট্র, সমস্তই অপহৃত হইল। জব এক স্থানে বসিয়া সব দিকের সর্ব্বনাশের সংবাদ শুনিলেন।

"জব তখন গাত্রোত্থান করিলেন, গাত্রাচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, মস্তক মুণ্ডন করিলেন, এবং ধরাতলে জানু পাতিয়া বসিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। জব বলিলেন,—

Naked camed out of my mothers womb and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken every blessed be the name of Lord.

"উলঙ্গ অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই তথায় প্রত্যাগমন করিব। ভগবান দিয়াছিলেন, ভগবানই আবার লইলেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; তাঁহার নামের মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত হউক।"

"ইহা অতি উত্তম কথা। ভগবদ্ভক্তের কথা। কিন্তু, ভগবান এ স্থলে সয়তানের হাতে চালিত। বিনা অপরাধে জবকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তিনি বস্তু নহেন। সয়তানের সহিত সচ্চিদানন্দের পুনর্ব্বার নানা পরামর্শ হইল। এবার সয়তান জবের শারীরিক নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। নিদারুণ নির্য্যাতন! জবের সর্ব্বাঙ্গ শরীর, প্রতি লোমকূপ বিস্ফোটকময় হইল। জব যাতনায় অস্থির।

"তখন জবের পত্নী কহিল, 'আর কেন, এখনও বসিয়া ভগবান ভাবিতেছ? Curse God and die,—পরমেশ্বরকে অভিসম্পাৎ করিয়া প্রাণ ত্যাগ কর।'

"জব তখনও অটল। সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নির্ব্বোধ স্ত্রী! কি উন্মাদের কথা কহিতেছ তুমি! ভগবানের নিকট হইতে মঙ্গল আসিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, আর অমঙ্গল আসিলে গ্রহণ করিব না, সে কি কথা? ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক; তাঁহার জয় হউক।'

জব এখনও অটল। ঈশ্বরের অন্যায় আচরণ উপলক্ষে তাঁহার মনে ও মুখে একটি চিন্তা ও কথাও উদিত ও উচ্চারিত হয় নাই।

তৎপর জবের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া তাঁহার তিন বন্ধু, এলিফাজ, বিলদাদ ও জবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, জবকে সান্ত্বনা করিতে আসিলেন।

জবের ভীষণ যাতনা দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত, আতঙ্কিত, নির্ব্বাক। বীভৎস দৃশ্য দর্শনে কাহারও মুখে কথা সরিল না। জবও নির্ব্বাক। এক স্থানে বসিয়া সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়া গেল, কেহ কোনও কথা কহিল না।

"অনন্তর জব জিহ্বা সঞ্চালন করিলেন। জীবন, জগৎ, এবং জগদীশ্বরকে অভিসম্পাত করিলেন। জীবনযাতনায় জর্জ্জরীভূত হইয়া, অনন্তকাল অবরুদ্ধ জীবন-রহস্যের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, জীবনকে ধিক্কার দিয়া, জগদীশ্বরের অন্যায় অবিচার দোষিত করিলেন।

গ্রন্থের মর্ম্ম।

"তখন তাঁহার তিন বন্ধু একে একে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া পরমেশ্বরের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। জব তাঁহাদিগকে উত্তর ও তাঁহাদের উভয়ের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। এই উত্তর প্রত্যুত্তরে, চারি ব্যক্তির কথোপকথন ও উপসংহারে ঈশ্বরের আগমন ও আত্মপক্ষসমর্থন লইয়াই জবের গ্রন্থ। জগদীশ্বরের আত্মপক্ষসমর্থনে মনুষ্যের জীবনরহস্য যে কিছুমাত্র উদ্ঘাটিত হইল, তাহা নহে। ঈশ্বর কেবল সর্ব্বশক্তিমত্তার অহঙ্কার করিয়াই গেলেন।

"জব জগদীশ্বরের অবাধ্য নহেন। তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবারও লোক নহেন।

"ঈশ্বরের আত্মগরিমাকীর্ত্তন শেষ হইলে, জব করজোড়ে (করজোড় করিবার উপায়টুকুও কিন্তু তখন সয়তান তাহার রাখে নাই) কহিল, 'প্রভো! পরমেশ, আমার যাহা বলিবার ছিল, সবই বলিয়াছি। আমি আর কি বলিব। তুমি সর্ব্বশক্তিমান, সবই করিতে পার। সবই করিতেছ। কিন্তু তোমার নির্ম্মম "লীলা খেলা" আমাদের অবোধগম্য, অবোধগম্য, অজ্ঞাত বলিয়া জীবনরহস্য বুঝিতে পারি না, বিনা কারণে জীবনযাতনার কারণ কি—জানি না বলিয়াই, হৃদয়ের অবস্থা বাক্যে উচ্চারিত করিয়াছি, আগুন আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়াছে।"

I know that thou canst do every thing
And that nothing is beyond thy reach,
Hence I say, I have uttered that I understand not
Things too wonderful for me which I know not.

মানব জীবন-রহস্যের এবং জীবনযাতনার যে সকল কথা জব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক জানিতে, জবের গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। জব প্রথমতঃ অনন্ত অভিশপ্ত জীবনের উপর অভিসম্পাত অর্পণ করিয়া, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইত্যাদি মর্ম্মের জগদ্বাক্যের প্রথম প্রতিবাদ করিতেছেন,—

Destroyeth the upright and the wicked.
The earth is given into the hands of the wicked.
The tents of robbers prosper,
And they that provoke God are secure.

পরন্তু পরমেশ্বরের পক্ষসমর্থনকারীদিগের উত্তরে কহিতেছেন,—

Will ye discourse wickedly for God?
And utter lies in his favour?
Will ye accept His person By fraud?
Will ye contend for God by deception.

জব জগদীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—

As a lion Thou huntest me who am soked in misery
And shourest Thyself marvellous upon me

"তুমি সিংহের ন্যায় আমার পশ্চাৎধাবিত, আমাকে উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন করিতেছ (আমি নিরাশ্রয় নিরপরাধী ও নিষ্পাপ জানিয়াও) তুমি আমার উপর তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তার অদ্ভুত বিক্রম দেখাইতেছ।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল; ঈশ্বরে ও সয়তানে লড়াই হইয়াছিল। অসুর ও সয়তান দেবতার দেবত্বে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী, দেব ও

ঈশ্বরদ্বেষী। জব ঈশ্বরদ্বেষী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নহেন। তিনি ঈশ্বর-সেবক, ঈশ্বরপরায়ণ;—

উপসংহার, God, Satan & Co.

ঈশ্বর এবং সয়তান কোম্পানী (God, Satan & Co.) কর্ত্তৃক নিপীড়িত,—ঈশ্বরের অন্যায় ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত। জব অসুরও নহে, সয়তানও নহে, মনুষ্য। মনুষ্যের উপর ধর্ম্মশাস্ত্রে কৈফিয়তের অভাব নাই, তাহা সকলেই জানে। শাস্ত্র বলিবেন, এ সব শাস্তি জবের পরীক্ষা। এরূপ পরীক্ষা যুগে যুগে জীবের হইয়া থাকে। ধ্রুব প্রহ্লাদাদির হইয়াছিল। শাস্ত্র যাহাকে বলেন পরীক্ষা, স্বভাবিক মনুষ্য তাহাকেই বলে অবোধ্য জীবনরহস্য। কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, তাঁহাতে স্বর্ণকারসুলভ পরখ-পরীক্ষা সম্ভবে না।

আমরা এই প্রবন্ধে আর এক খানি কাব্যের অল্পমাত্র আলোচনা করিব। এ খানি ইংরেজী কাব্য। ইত্যগ্রে আমরা যেরূপ কাব্যের আলোচনা করিলাম, এ খানিও সেই জাতীয় কাব্য; কিন্তু আধুনিক, অল্প কয়েক মাস মাত্র এই কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক, কিন্তু অতি ভীষণ এই কাব্য।

আধুনিক ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে সুইনবর্ণ এক সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের সংহারার্থে স্বকীয় কবি-

সুইনবর্ণ ও খৃষ্টধর্ম্ম।

শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সেটি সূক্ষ্ম-শক্তি। সেই সূক্ষ্ম শক্তি অপর এক কবি কর্ত্তৃক মাংস মেদ পেশিতে সুকঠিন শরীরযুক্ত হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের সম্মুখে সদর্পে দণ্ডায়মান। খৃষ্ট বাক্যের যাহাকে তাহাকে নয়, স্বয়ং যিশুকে যুদ্ধ আহ্বান করিতেছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের অনাচার অত্যাচার ও উদ্ধার-অকর্ম্মণ্যতার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিতেছে, সে বড় কঠোর কৈফিয়ৎ।

মিষ্টার রবার্ট বুকানন্ এখনকার ইংরেজী সাহিত্যের বর্দ্ধিষ্ণু কবি। সংপ্রতি এই কবি এক

The Wondering Jew.

অভিনব কাব্য লিখিয়াছেন, তাহার নাম "দি ওয়াণ্ডারিং জিউ", ইহা বড় দিনের বই,—ক্রিশমাসের আনন্দসঙ্গীত! আনন্দসঙ্গীতই বটে। এমন আনন্দসঙ্গীত কেহ কখনও শুনে নাই। আনন্দে অন্ধকার ও সংহার, শোণিত ও সন্তাপ!

মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট, চশমে চশমা, গলে কোবিযার ব্যাগের চর্ম্ম-উপবীত দোদুল্যমান, হস্তে মথিলিপিত সুসমাচার, পুণ্যবান্ পাদরী সাহেব অসঙ্কুচিত বলিতে পারেন,—"উহা সয়টানিক সঙ্গীত"। হইতে পারে উহা সয়তান-সঙ্গীত, হইতে পারে উহা অপবিত্র

সয়তানের সঙ্গীত।

পৈশাচিক কবিতা। কিন্তু, পাদরী সাহেব নিজে যে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে সুধা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা কি তাহা কাহার? সম্ভবতঃ তাহা স্বর্গেরই সুধা, কখনই সয়তানের নয়।

খৃষ্টীয় মিশনারী মহাশয়দিগের দ্বারা অস্মদ্দেশের অনেক উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং আমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। মনোবাক্যে, কোনওরূপে তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত করিতে আমরা উৎসুক নহি। তাঁহাদের অনেকেই আমাদের

মাহাত্ম্য।

পূজনীয়, বস্তুতঃই তাঁহারা পূজার পাত্র। তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া অনেক বিষয়ই আমাদের শিক্ষা করিবার আছে। তবে আমাদের বোধ করি কিয়ৎকালের জন্য বিদেশে গস্পেল প্রচার বন্ধ রাখিয়া, খৃষ্টীয় দেশে সে কার্য্য সম্পাদিলে ভাল হয়, কেন না, খৃষ্টীয় দেশেই খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর আক্রমণ অধিক বলিয়াই প্রতীত হয়। আমরা এস্থলে রবার্ট বুকাননের অভিনব কাব্যের কথাই বলিতেছি।

কবি কল্পনা-বাহনে ক্রিশমাস-ইভে একাকী লণ্ডন ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা সম্মুখে এক বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ—ইহুদী উপস্থিত। ভগ্নশরীর, কুব্জ, কুসিৎ অতিশয় বীভৎস-দর্শন এই ইহুদী। কবি প্রথমতঃ ইহাকে পৃথিবীর পরিত্যক্ত, অবমানিত, ঘৃণিত, বিষয়সংসারে বাস্তুভিটা-বিহীন 'ভবঘুরে' ইহুদী, অর্থাৎ "ওয়াণ্ডারিং জিউ" বলিয়া মনে করিলেন। পরে চিনিতে পারিলেন

যে, ইনি "জিসাস্ দি জিউ", অর্থাৎ ইহুদী যিশুখৃষ্ট। কাব্যের এই প্রথম দৃশ্য, কবিপ্রতিভায় প্রচণ্ড প্রস্ফুট। খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং আচরণে, পৃথিবীর যে দুর্দ্দশা হইতেছে, কবি বিবেচনা করেন, উহা তাহারই আলেখ্য। যিশু খৃষ্টকে সম্বোধন করিয়া কবি কলরবে গাহিয়াছেন,—

Humanity itself shall testify
Thy kingdom is a Dream, thy word a lie
Thyself a living canker and a curse
Upon the body of the Universe.

ইহা ভয়ঙ্কর। ইহা অতি মর্ম্মান্তিক আক্রমণ। এ সম্বোধন শোচনীয়। তেজস্বী ইংরেজ কবির এই ইংরেজী কবিতার তীব্র তড়িৎ, কৃশ বাঙ্গালীর কোমল বাঙ্গালায় ব্যক্ত হইতে পারে না। কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর আছে। যিশু খৃষ্টের প্রতি উপরি উক্ত উক্তিতে আমাদের হৃদয় বস্তুতই ব্যথিত হয়। যখন খৃষ্টান কবি যিশু খৃষ্টের প্রেতাত্মাকে জাগাইয়া, সশরীরে সম্মুখে খাড়া করিয়া, উগ্র কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া, অবমাননার অভিষেক পূর্ব্বক বলেন,—

'সমগ্র মানবজাতি সমস্বরে সাক্ষ্য দিবে, এক বাক্যে বলিবে, তুমি ভণ্ড, তুমি পাষণ্ড, তোমার বাক্য মিথ্যা, তোমার স্বর্গরাজ্য স্বপ্নবৎ অলীক। তুমি বিশ্বসংসারের সাংঘাতিক ব্যাধি, তুমি জীবন্ত অভিশাপস্বরূপ।'

তখন আমরা স্তম্ভিত হই, ব্যাকুল ও বিরক্ত হই।

কাব্যের অপর উচ্ছ্বাসে, খৃষ্ট ধর্ম্মের শত্রু মিত্র সকলেরই সুপ্তাত্মা, সংমিলিত সাধারণ ভাবে যিশু খৃষ্টের বিচারে বসিয়াছে। যিশু অতি দীন ভাবে, মলিন বেশে, অবনত বদনে, অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, নির্ব্বাক, নিশ্চেষ্ট—সাধারণ মতের ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডায়মান। খৃষ্ট ধর্ম্মে নিরাশ হইয়া জীবন্ত নাস্তিক জীবাত্মা, যিশু খৃষ্টকে বলিতেছে,—

That all thy promise was a mockery
That Fatherhood and God-head there is none
No father in Heaven and in Earth no son
That Darkness never can be Light, that still
Death shall be Death, despite thy wish or will
That Death alone can comfort souls bereaven
And Shed on earth the eternal sleep of Heaven.

ইহা নৈরাশ্য ও নাস্তিকতার অতি ভীষণ মূর্ত্তি। নিরাশ খৃষ্টান খৃষ্টকে বলিতেছেন,—

"তুমি যে সকল আশা দিয়াছিলে, সে সমস্তই তামাসায় পরিণত। তোমার অস্বীকার উপহাসের আকর হইয়াছে। ঈশ্বরের পুত্র নাই, ঈশ্বরই বা কোথায়। পরলোকে পিতৃত্ব ইহলোকে পুত্রত্ব, হায়! এ সব কল্পিত কথা।—তোমার প্রবঞ্চনা। তোমার কথিত পিতৃত্ব ও তোমার পুত্রত্ব ও প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্বমাত্র নাই। মৃত্যু। মৃত্যু! অন্ধকার। একমাত্র অনন্ত নিদ্রা। সেই নিদ্রাতেই কেবল জীবযাতনা জুড়ায়; জগৎ শান্ত।

খৃষ্টধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দান করিয়াছিলেন, যাঁহারা মনুষ্যশোণিতে জগৎ রঞ্জিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যিশুর সম্মুখে যিশুর উপর স্থিরদৃষ্টি নিহিত করিয়া, তাঁহার অপক্ষে সাক্ষ্য দিতে ধর্ম্মাধিকরণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

A throng of martyrs slain
Bloody and maim'd and worn who waited in pain
Fitting their pitous eyes on that Jew.

ক্রমে তথায় বুদ্ধ আসিলেন, সোক্রেটিস্ ও মনু আসিলেন, জিরোষ্টার আসিলেন, মহম্মদ

ও কনষ্টিউকস প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই যিশু খৃষ্টের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন,—

This man has been a curse in every clime
Changing the world from a glad home of men
Into a prison and a lazar den.

"এই—এই ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, পৃথিবীকে পাপপঙ্কে ডুবাইয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র অভিশাপস্থল করিয়াছেন. সর্ব্বত্র অভিশাপস্বরূপ হইয়াছেন, ইনি পুণ্যময় সুখ-শান্তিময় মনুষ্যলোক, সংক্রামকরোগপীড়িত মনুষ্যপূর্ণ অন্ধকূপে পরিণত করিয়াছেন!"

এই সময়ে সেই ধর্ম্মাধিকরণে সহস্র সহস্র শোণিতাক্ত, আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত, বিকলাঙ্গ, বিকটবদন, উলঙ্গ, উলঙ্গিনী, মানুষ মানুষী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকায় পূর্ণ হইল, মানুষ মানুষের মহাপ্রাণী ছিঁড়িল, রক্তকুণ্ড উপড়াইল। বায়ু পূতিগন্ধে বিষাক্ত হইল। দশদিকে হত্যা ও হা 'হতোস্মি!' রব ছুটিল।

তখন যিশু অবাক্, অবসন্ন, একাকী জ্বলন্ত যাতনায় অধীর, কিন্তু অবাক্!

He, the man, forlorn, stood mute in woe.

যিশু আত্ম-সমর্থনের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। অতি কষ্টে, অর্দ্ধস্ফুট, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন;—

I have no word to answer ...
The winter of mine age hath come,-and lo!
My heart within sinks, 'neath its weight of woe.

"হায়! আমার কিছুই বলিবার নাই। আমি বৃদ্ধ বিপন্ন, রুগ্ন অবসন্ন। আমার আসন্ন উপস্থিত! যাতনায় আমার জীবাত্মা জ্বলসিতেছে। আমার হৃৎপিণ্ড কাটিতেছে।!"

[illegible]র্জ্জিন মাদার, জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট, সেণ্টপল প্রভৃতি এই সময়ে উত্থিত হইয়া যিশু খৃষ্টকে [illegible] করিলেন। অতি ক্ষীণ স্বরে যিশু-মঙ্গলগীতি [illegible]sannah to the Lord গাইলেন। [illegible]কে বিনয় করিয়া বলিলেন;—

"আপনি স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন, আমরা পিতার পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করি; সকলে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত হউক।"

কিন্তু হায়, মঙ্গলগীতি সন্তাপকোলাহলে ডুবিয়া গেল! যিশু কোনও উত্তর করিলেন না। কাঁপিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু আশ্বস্থ হইয়া বলিলেন,—আমার স্বপ্ন বৃথা হইয়াছে, ইহা আমি অতঃপর বুঝিয়াছি,—

My dream was vain
Woe to ye all! and endless woe to me,
Who deemed that I could save Humanity.

তাপ। পরিতাপ। পরিতাপ-পাবাবারে তোমরা সকলেই ডুবো। অনন্ত সন্তাপ [illegible]াস করুক! অনর্থক আশা করিয়াছিলাম যে, ভূভার উদ্ধারে সমর্থ হইব।"

[illegible]র কবির কাব্যেও, এরূপ কাতর ব্যক্তির প্রতি কোনও কথা চলে না। কিন্তু কবি [illegible]ন্ত নহেন।

[illegible]া মৃত্যু কামনা করিলেন। কিন্তু মৃত্যুও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসম্মত। মনুষ্যাত্মার [illegible]ধারণ মতের ধর্ম্মাধিকরণ তাঁহাকে মরিতেও দিল না। বলিল,—

"যাও, উঠ; তুমি তোমার ক্রস পুনর্গ্রহণ কর। ক্রস বক্ষে, গৃহদ্বারবিহীন ভিখারীর বেশে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পথে পথে গিয়া বেড়াও। পাথারে, প্রান্তরে, দুর্গম স্থলে, যে স্থান কখনও মনুষ্যপদস্পৃষ্ট হয় নাই,—সেখানে সর্ব্বত্র যাইয়া ভ্রমণ কর,—ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তোমার পিতা

পবনেশ্বরের বৃথা অনুসন্ধান কর। তোমার স্বস্তিবাচন শাপস্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইবে; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র তোমার সঙ্গে ফিরিবে। তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইবে না; যখন ক্লান্ত, সন্তপ্ত ও নিদ্রাতুর হইবে, তখনও তুমি জাগ্রত থাকিয়া যাতনা ভোগ করিবে, তোমার বিলাপ পরিতাপের কখনও শেষ হইবে না;—অনন্তকাল তোমার সঙ্গে থাকিবে। পাপ বিনাশ করিবার শক্তি তোমার ছিল না, অথচ পাপবিনাশের ভাণ করিয়া তুমি তাহা বর্দ্ধিত ও বেগযুক্ত করিয়াছ, যে দুর্ভিক্ষ তুমি প্রশমিত করিতে পারিবে না, তাহা তুমি জাগ্রত করিয়াছ। তুমি উন্মত্ত হইয়া উন্মাদবৎ বকিয়াছিলে, বৃথা অঙ্গীকার করিয়াছিলে, যাহা মানুষে কখনও পাইবে না, তাহা দিবার অলীক আশা দিয়াছিলে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তুমি যাতনাভোগের জন্য চিরজীবী হইয়া থাকিবে। কোনও দেশে কেহ তোমাকে মারিবে না, কোনও হস্তই ঈশ্বরাবতারের গাত্র স্পর্শ করিতে সাহসী হইবে না। মৃত্যু স্বয়ং তোমাকে ছুঁইবে না। যাও, ক্রস উঠাও, চলিয়া যাও। তোমার অপরাধের এই শাস্তিই সাব্যস্ত হইল।"

ইহা ভয়ানক! জানি না, কবিকল্পনা, প্রকৃতির কি নিগূঢ়নিয়মানুবর্ত্তিনী হইয়া, এই নিদারুণ কাব্য কল্পিত করিল।

শারদীয়া।

গান।

আগমনী।

দেখে আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসে রে।
উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসে রে।
এ নহে অরুণ আভা,
নহে শশধর বিভা,
হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর
গৌর আভা হাসে রে।
শারদ শশী বঙ্কিম, কবি ঐ আভাহীন
পশ্চিম গগনে ঐ উমামুখ ভাসে রে।
বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্ব্বতী,
জুড়াতে মায়েরই প্রাণ
উমা আমার আসে রে।
বৎসর অন্তরে আজ উমা আমার আসে রে।

আবাহন।

এস মা আনন্দময়ি। এস মা গৃহে আমার।
বাঞ্ছা পারে আলো করি মাগো অখিল সংসার।
কি আছে আমার ওমা করিব পূজা তোমার,
লও তৃণ কুশ জল প্রেম-অশ্রু উপহার।
লও সুখে লও দুখে, চির ভক্তি-পুষ্প-হার।
জীবের জননী তুমি, তুমি সর্ব্বজীবাধার।
জীবন কি নহে পূজা স্নেহময়ী মা তোমার,
লও কাম ক্রোধ বলি, ছয় রিপু দুর্নিবার।

বিজয়া।

যেও না যেও না নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী লবে তারাগণে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান,
যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন।
প্রভাত কাকলি গান,
কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার
উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। ভাদ্র। এ সংখ্যার প্রথমেই শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি গল্প—"সুষমা"। লেখক গল্পে একটি হিন্দু বালবিধবার করুণ চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লেখকের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। গল্পটি মোটে জমে নাই। এবারকার "সাধনায়" সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কণারক"। বলেন্দ্র বাবুর উড়িষ্যাবিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি অতিশয় মনোজ্ঞ হইতেছে। প্রবন্ধটি পুব বড় নহে;—আমরা তাহার অধিকাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ আবাহিত প্রীতিভরে অকৃপিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত, এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনক কিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন।

"এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালুকা একটা ভগ্নমন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু যেটুকু বিচিত্র শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যে ও অক্ষুণ্ণশিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিকের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দরকপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ কত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলিই কি সুন্দর। এমন সুগ্রীব তেজে-ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর। কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ, উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায়

চারি শত হস্ত নূবে ইংরাজের লৌহরণোপরি স্থাপিত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আসা হয় নাই, পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দূর লেপনপূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়, কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অমূল্য প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

"উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের বাজব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণমন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দির ক্ষুদ্র নহে। গত শতাব্দীতেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহারই পাথর খসাইয়া [illegible] গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুদ্রে স্তম্ভ দেখা যায়, তাহাও এই কারুকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

"বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডৌল গঠন অনেক স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।—হয় ত বাহিরেও যেমন ভিতরেও সেইরূপ ছিল। নর্ত্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত, এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্ত্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে।

"এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোক কত দিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, গৃহস্ত্রী পুত্র পিতামাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, মায়া কৃত্ত মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধের মোহবাসিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর, এবং শত দীপালোকে তোমরই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়।

"তবে এ কি মায়া? এ কি সংসারখেলার একটা রূপক? বুঝান' যে চারিদিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্ত-ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত—আপন আপন বিচিত্র যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এপিঠ ওপিঠ ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।

"কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে, জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া, সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এত পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ

কাল সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র, হায়, মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না!

"মায়াই বটে—বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়াস্বপ্ন।

"ভুল করিয়া শাম্ব সেদিন সরযূতীরে আসিয়াছিলেন—জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণাল-ভুজ আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব। পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল—কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক্।—অভিশপ্ত শাম্ব দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভক্ষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্যকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।

"মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র যেমন মাইল পথ সরিয়া গিয়াছে, বালীও প্রবাহও সেইরূপ অর্কক্ষেত্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া ঠেকিয়াছে।—বৌদ্রদীপ্ত নারিকেল তরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখা যায়।

"পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিম শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে, সম্মুখস্থ বালুকাবিস্তৃত প্রান্তর দেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন, যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথে চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত, যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে বক্ষিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। মনে হয়,

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

বলেন্দ্র বাবুর বচনায় ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও কবিত্বের সহিত ঐতিহাসিক সত্যের সুন্দর সম্মিলন। "পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র , তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক 'সাংখ্য দর্শনে" এবার সৃষ্টি, সাংখ্য দর্শনের সাংখ্য দর্শনের "অহঙ্কার, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় ও স্থূল ভূত কি তাহার বিশদ ব্যাখ্যা ছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত. বাবুর মতভেদ হইয়াছে, তিনি এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা তর্কসমরের সূত্রপাত দেখিতে পাইতেছি। এবারকার 'সাময়িক সারসংগ্রহে" 'মানুষ সৃষ্টি,' 'ওলাউঠার বিস্তার,' 'ক্রিশ্চিয়ান বর্জ্জন,' 'ঈশ্বর,' 'পুনর্জ্জন্ম' সম্বন্ধে বেসাণ্টের মত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে বিদেশীয় মত, এই কয়টি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ন্যায়ের বিজ্ঞান" অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী

হইয়াছে। এইরূপ আবশ্যক বিষয়ের সাধারণের বুঝিবার মত বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার সুরেন্দ্র বাবু আমাদের একটি অভাবমোচনের সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "সৌন্দর্য্য," সাধনার সৌন্দর্য্য ও গৌরব, উভয়ই বর্ণিত করিয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বের এরূপ বিশদ আলোচনা প্রশংসার উপযুক্ত। "ভবা ভাদরে" কবিতাগুলির লেখকের নাম নাই,—কিন্তু যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক বাঙ্গলা কবিতার অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কাছে, "ভরা ভাদরের" লেখক কোনও মতে আত্মগোপন করিতে পারিবেন না। এই কবিতাটি দেখিয়াই আমাদের "সোণার তরী'র স্বর্গীয় ঝঙ্কার মনে পড়িয়াছিল। কবিতাটি "সোণার তরী'র মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক,—মনোরম বটে। "কি বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে।" ও "আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল" এই দুটি চরণ, সমগ্র কবিতাটির কতকটা হানি করিয়াছে। প্রথম চরণটি নিতান্ত চর্ব্বিতচর্ব্বণ—বিদ্যাপতির আমল হইতে এ পর্য্যন্ত এত বাঁশি বাজিয়াছে যে, এই বাঁশির নাম শুনিলে বিভীষিকা বোধ হয়। শেষ চরণটির কবিতার সৌন্দর্য্যহানি ভিন্ন আর কোনও উপযোগিতা নাই। কবিতাটি অতি সুন্দর,—এই দুটি সামান্য খুঁত না থাকিলে আমরা আরও সুখী হইতাম। "একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প" বোধ করি কোনও জ্যেঠা মহাশয়ের কল্পনা—লেখক নাম না দিয়া ভালই করিয়াছেন—যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া নেপথ্যে অভিনয় করাই অনেক সময় নিরাপদ। লেখাটিতে না আছে কিছু রস কস,—না আছে কোনও উদ্দেশ্য। লেখক বলিতেছেন "তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথা মুণ্ড অর্থ কি আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য্য কি কিছুই জটিল নহে, হয় ত কিঞ্চিৎ বয়স্থ হইলেই বুঝিতে পারিবে।" সে কথা সত্য। আমরা তার সুদৃঢ় রূপকজাল ভেদ করিয়া এ বয়সে ত ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না; যদি বাঁচি, বুড়া বয়সে একবার চেষ্টা দেখিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু তত দিন গল্পটি বাঁচিবে ত?

ভারতী।—ভাদ্র। প্রথমেই "প্রবাস-যাত্রা" নামক, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর একটি কবিতা। কবিতাটি চলনসই,—অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া, ভাবের সংহতি রক্ষিত হয় নাই। আমাদের মতে কবিতাটি কোনও মাসিকের প্রথম স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত নহে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "শ্রীনগর" সুখপাঠ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, লেখক ভারতীর প্রতি সেরূপ মনোযোগী নহেন। "হরিদ্বার ছেড়ে ইস্তক যত জায়গা দেখেছি," প্রভৃতি নিতান্ত কর্ণকটু বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, 'প্রত্যুত্তর' লিখিয়া, মুন্ময়ী সমালোচনার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মোফদাচরণ ভট্টাচার্য্য, 'হিজরী ও বাঙ্গালা' বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বলেন, 'অতি প্রাচীন কালে, ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায় না।'—সে কালের কোন্ তথ্যটাই বা জানা যায়?—ভারতে উল্লিখিত রাজসূয়যজ্ঞের পর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ চলিত হয়। তাহার পর, যথা, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের সংবৎ ও শকাব্দা প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সনের ব্যবহার আছে; যেমন চট্টগ্রামের মণিসন, ত্রিপুরার ত্রিপুরাসন ও হিন্দী কমলিসন। ভারতে যখন মুসলমানদের পূর্ণ প্রভাব, তখন আরবদেশীয় হিজিরা সন ভারতে প্রবেশলাভ করে। আর সকলে জানেন,—হাকিমের এলাহী সনের প্রবর্ত্তন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক

মহম্মদ মক্কাফার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবে অনেক প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অব্দ লইয়া সাল গণনার বড় অসুবিধা হইত বলিয়া, প্রাচীন আরবেরা একটি অব্দ প্রচলিত করিয়াছিল,—তাহারই নাম হিজিরা। খলিফা ওমর রাজি আবদু পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, খলিফা মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের দিবস হইতে সাল গণনা করিলেন। কোরাণ শরিফের মতে এই সাল—আমলেইজা—অর্থাৎ, আদেশপ্রাপ্ত বৎসর। মহম্মদের মক্কা গমনের আরবীয় নাম "হেজরৎ,"—হেজরৎ হইতেই, হিজরী অব্দের উৎপত্তি। তদবধি আকবরের সময় পর্য্যন্ত ভারতেও হিজরীর প্রাধান্য ছিল। হিজরী চান্দ্র মাস, এবং হিন্দুদের সংবৎ ও শকাব্দা সৌর মাস। চান্দ্র অব্দের সহিত সৌর অব্দের গণনা করিতে হিন্দুদের অসুবিধা হইত বলিয়া, আকবরের আদেশে, তদীয় সভাসদ বিখ্যাত পণ্ডিত আমীর ফতেউল্লা সিরাজী, সৌর মাসের সহিত চান্দ্রমাস একত্র গণনা করিয়া, একটি নব অব্দ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। আকবরের পরাক্রমের স্মরণার্থই ইহার সৃষ্টি—৯৯২ হিজরী অব্দে, আকবরের রাজত্বের সপ্তবিংশতিতম বর্ষে, "তারিখে এলাহি" প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই আমাদের বাঙ্গালা সাল।' শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, "হিন্দু সমাধি প্রথায়" দেখাইয়াছেন যে, কোনও কোনও হিন্দুদের মধ্যেও শবদাহের পরিবর্ত্তে সমাধি-দানের নিয়ম আছে। প্রবন্ধটিতে এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর "সিংভূমের কোল জাতি" প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেক কথা জানা যায়। কোল জাতির মধ্যে যে আদি সৃষ্টিবৃত্তান্তের গল্প চলিত আছে, এ স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করি-তেছি,—ওতে বোঙ্গা এবং শিংবোঙ্গা নামক দুই দেবতা ছিলেন। ইহাঁরা পৃথিবীতে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ইহাঁরাই প্রস্তর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পৃথিবী, তরুলতাদি এবং পশু সকল প্রথমে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অরণ্যে পশু পক্ষী সৃষ্ট হইল। যখন দেবতাদ্বয় দেখিলেন যে, পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, তখন তাঁহারা একটি বালক ও বালিকা সৃষ্টি করিলেন, এবং একটি উপত্যকার পার্শ্বস্থ গিরিগহ্বর তাহাদিগের আবাসস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছানুরূপ প্রেম এই বালক বালিকার মনে উদয় না হওয়ায়, তিনি তাহা-দিগকে ডিয়েং প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিলেন, এবং তাহারা ঐ ডিয়েং খাইয়া হর্ষোৎ-ফুল্ল মনে দিন যাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে উহাদের দ্বাদশটি পুত্র এবং দ্বাদশটি কন্যা জন্মিল। তৎপর শিংবোঙ্গা মহিষ, গরু, শূকর, কুকুট ও শাকসবজির দ্বারা একটি ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং বালক বালিকাদিগের বিবাহ দিলেন। প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ অংশ মনোনীত করিয়া লইতে লাগিল। প্রথমে চারি জন গো ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহারা কোল ও ভূমিজ জাতিতে পরিণত হইল। দুইটি শাকসবজি আহার করিল, তাহারা ক্ষত্রিয় তাহাদের বংশোদ্ভূত। যাহারা ছাগ মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিল, তাহারা তেলী হইল। যে দুই জন কচ্ছপাদি ভক্ষণ করিল, তাহারা ভুঁইয়া, এবং চারি জন শূকরের মাংস আহার করিল, তাহারা সাঁওতাল হইল। অবশিষ্ট দুই জনের আহারীয় দ্রব্যের কোন অংশ না থাকায়, তাহারা প্রথম দুই জনের উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া, আহার করিল—ইহারা ঘাসিজাতি (মেথর) হইল।"

"পাদুকা রহস্য" একটি অদ্ভুত রকমের গল্প, আমরা ইহার বিশেষ কোনও গুণপণা দেখিতে পাই না। 'ভাষাপুষ্টি' চিন্তাশীলতার পরিচায়ক প্রবন্ধ—এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

যান, দেখিয়াছি। * * * একটা বৃহৎ বিষয়ের হাত পা বাঁধিয়া, সনেটের সঙ্কীর্ণ থালির ভিতর পুরিলে, উহার শ্বাসরোধ ও প্রাণবিয়োগের প্রভূত সম্ভাবনা।" কিন্তু লেখক "বিষয়" কাকে বলেন? রামায়ণ, মহাভারতের বিষয় অবশ্য সনেটে লেখা যায় না,—আর কোন্ বিষয়-গুলি বড়, কোন্ বিষয়গুলি ছোট, সচরাচর সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার একটা মোটামুটি সর্দ্দও দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখক এ স্থলে তাঁহার বক্তব্য বিশদ করিয়া বলিতে পারেন নাই। এক জন কবি যাহা সনেটে বলিয়াছেন, আর এক জন তাহা অন্য আকারে বলিতে পারেন। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু জানি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, সনেটে একটা কোনও ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়,—একই কবিতায় একের অধিক ভাবের সন্নিবেশ থাকিতে পারে, কিন্তু সনেটে কেবলমাত্র একটি ভাবকেই বিকশিত, পূর্ণপরিণত করিয়া তুলিতে হয়। "কিন্তু সুদীর্ঘ একটা মহাকাব্য অথবা প্রণয়মূলক উপাখ্যান বা বর্ণনা কাব্য (বর্ণনা কাব্য পদার্থটা কি?) যে আগাগোড়া চতুর্দ্দশপদীর আকারে বিরচিত হইবে, তাহা অসহ্য।' আমরা স্বীকার করিতেছি,—সত্যই অসহ্য। কিন্তু লেখককে তাঁহার প্রিয় সনেট-কার মাইকেলের সনেটেই জিজ্ঞাসা করি, "এ বিষয়ে তব এ বৃথা সন্দেহ কেন?" লেখক কি বাঙ্গলায় সনেটে রচিত এমন-তর কোনও কাব্য উপাখ্যান দেখিয়াছেন? যাহা নাই, তাহা লইয়া এত মাথা ব্যথা কেন? লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনেট সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমাদের মতে রবীন্দ্র বাবুর সনেটগুলি আদর্শস্বরূপ পরি-গণিত হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন, "কিন্তু যিনি মানবের সুখ দুঃখের সঙ্গীত গাঁথিয়া 'অমর আলয়' রচনা করিতে চান, যুবতীর 'স্তনের ছায়ায়' শয়ন করিয়া কেবল 'অঞ্চলের বাতাস' সেবন করিলে, তাঁহার চলিবে না। 'স্তনের ছায়ায়' কোটেশন দেখিয়া আমাদের রবীন্দ্র বাবুর 'হৃদয় আসন' শীর্ষক উচ্চ দরের সনেটটির কথা মনে পড়িতেছে। যিনি এই উৎকৃষ্ট সনেটটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ভাবগ্রহণ না করিতে পারেন,—'তাঁহার পক্ষে পাঁচালী ব্যবস্থা।' নিত্য বাবু নিজে কবিতা লেখেন,—তাঁহার ভাবুকতা ও সহৃদয়তার অভাব নিতান্তই শোচনীয়। "হৃদয় আসন"কে তিনি "কমল বিলাসী" কবিদের বিলাসপ্রিয়তার পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া-ছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কবি বিলাসের পঙ্কিল ভূমি ছাড়িয়া, তাঁহার কবিতাকে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়াছেন। সেখানে বিলাস নাই,—কাম নাই,—এবং নিত্যকৃষ্ণ বাবুর মত সহৃদয়দেরও তাহারা প্রবর্ত্তক নহে, নিবর্ত্তক। এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে গেলে যেরূপ সাবধানতা, অধ্যয়ন ও বিচারশক্তির আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে নিত্যকৃষ্ণ বাবু তাহার পরিচয় দিতে "স্তনের ছায়া" দেখিয়াই ডরাইয়া নাউঠিয়া, সাবধানে তলাইয়া দেখিলে নিত্য ত পারিতেন যে, 'কামগন্ধ নাহি তায়।' কবিতা হৃদয়ে বুঝিবার সামগ্রী, বুঝাই-বার নহে, সুতরাং আমরা নিবস্ত হইলাম। শেষে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধের ভাষাটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের "মহারাজ দুর্য্যোধন" নূতনতর সামগ্রী। লেখক পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে, "দুর্য্যোধন স্বর্গীয় চরিত্র", এবং "যুধিষ্ঠির বাস্তবিক তুমি ঐ স্বর্গের উপযুক্ত নও," আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ও চিরাগত সংস্কারের বিরুদ্ধ, এই দুই অভিনব তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের

উন্নতি"—তৃতীয় প্রস্তাব, এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি কাজের কথায় পূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মার "বিজ্ঞান ও শিল্প" চিন্তাপূর্ণ, সুলিখিত রচনা। "বঙ্গের বৈষ্ণব কবি" (দ্বিতীয় প্রস্তাব) শ্রীযুক্ত হারাধন দত্তের রচনা। প্রবন্ধটি মন্দ হইতেছে না; এবার আর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধের সূচনা দেখা গেল,—"মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ ও সিদ্ধান্ত দর্পণ," শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ইহার লেখক। এই সংখ্যায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এত অল্প যে, পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। এরূপ প্রবন্ধ একটু অধিক মাত্রায় দিতে ক্ষতি কি? এবারকার নব্যভারতে "মতামত বা সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" নানা রস আছে। এই সাহিত্য-পত্রের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় এবার নব্যভারতে কুন্তলীন তৈল ও হিন্দু বিস্কুটের সমালোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, নব্যভারতের মত মাসিকপত্রে এরূপ দ্রব্য-বিশেষের সমালোচনা ভাল দেখায় না,—কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে বিস্কুটের বিস্তর প্রভেদ। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না।—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" যদি সকলে আরম্ভ করেন, এবং বড়বাজারের খাবারওয়ালারা খাবার পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরাও প্রথমে ভক্ষণ ও তৎপরে সমালোচন করিতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরী প্রভৃতি মাসিকের সমালোচকগণ,—তাঁহাদের এই আর্য্য ভ্রাতাদের নিকট হইতে মাসিক-পত্রের এই নূতন কর্ত্তব্য শিক্ষা করিবেন।

জীবন ও মৃত্যু।

সর্ব্ব চিন্তার মূল মৃত্যু ও জীবন। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য জীবনের নিয়ম। মৃত্যুর পরেও আর কিছু আছে, এই বিশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, পরলোকের সংস্থান করিবার ইচ্ছাও সেইরূপ স্বাভাবিক। জীবনে আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহাতে বিশ্বাস হয় যে, জীবন সমাপ্ত হইলেই সব ফুরায়। যতই আমরা দেখি, যতই আমরা শিখি, ততই বুঝিতে পারি যে, কিছুই ফুরায় না। চরাচরের সকল স্থানের নিয়ম পরিবর্ত্তন, সমাপ্তি কোন স্থানের নিয়ম নয়। জীবনের সমুদয় নিয়ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, না হয় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। জীবনের সুখদুঃখ অনেকটা আমাদের নিজের হাতে। জীবন যখন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিয়মে নিয়মিত, তখন মৃত্যু যে সেইরূপ অভ্রান্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিয়মে নিয়মিত নয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। জীবনে আমরা যে সকল সুখদুঃখ ভোগ করি, তাহা কতক পরিমাণে আমাদেরই কার্য্যাকার্য্যের ফল। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমাদের ক্রিয়াসমূহ বহুদূরগামী; যে বীজ আমরা আজ বপন করি, বহুকাল পরে তাহার ফল সঞ্চয় করিতে হয়। যদি পরলোকে থাকে, তাহা হইলে পরলোকেও ইহলোকের মত সুশৃঙ্খল নিয়মাবলি আছে। যে সমুদয় কার্য্য আমরা ইহলোকে করিতেছি, সেই সকল কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী ফল যদি ইহজীবনে না ফলে ত পরজীবনে ফলিবেই। নিয়ম মাত্রেই অলঙ্ঘ্য, কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলেই বিপদ ঘটিবে, এ কথা আমরা জানি। ইহজীবনে আচরিত কর্ম্মের ফল জীবনান্তরে ভোগ করিতে হইবে মনে হলে, সাবধান হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিতে ইচ্ছা করে। আমরা যে সকল পরলোকের বিষয় ভাবিয়া করি, এমত বলিতেছি না। কিন্তু পরের ভয় অনিশ্চিত ভয়, এবং সেই ভয়ে আমরা অধিক ভীত হই। নিশ্চিত অপেক্ষা অনিশ্চিত দণ্ডকে কে না বেশী ভয় করে?

বুদ্ধি বলে যাহা অনিশ্চিত, যাহা সপ্রমাণ করিতে পারি না, তাহাতে বিশ্বাস করিব কেন? জীবনে পবিত্রতা হওয়া আবশ্যক, মনে বলের প্রয়োজন, কিন্তু সে জন্য পরলোকের কথা তুলিবার আবশ্যক কি? পরলোককে সাক্ষী মানিয়া কি হইবে? আমাদের জীবনকে লইয়াই কাজ। জীবনের পরে কি, মৃত্যুর

পরে কি, তাহা আমরা কখন জানিতে পারি নাই, কখন জানিতে পারিবও না। অতএব অন্য লোকের দোহাই দিয়া, আমরা কাহাকেও ধর্ম্মাচরণ করিতে বলিব না। ধর্ম্ম কর, পুণ্য কর, সকলই ইহজীবনের তরে কর, ইহলোকের জন্য কর। পরলোকে সুখ ভোগ করিবে, পুণ্যফলে স্বর্গবাস হইবে, সে সব স্বপ্ন দূর করিয়া দাও। যাহা সম্ভব নয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহাতে আমাদের কাজ নাই। স্বর্গ নরকের কথা শুনিব না, পূর্ব্বলোক পরলোক মানিব না, তবুও সৎকর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিব, পরোপকার জীবনের ব্রত করিব, আত্মদান অতি শ্রেষ্ঠ দান বিবেচনা করিব। বালকের মত সহজে ভুলিব না, ভ্রমকে মনে স্থান দিব না। অবিবেচকের মত অসম্ভব কথায় বিচলিত হইব না।

এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ কেহ অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করা সকলের সাধ্য নয়, সমাজ সূক্ষ্ম নিয়মে চালিত হয় না। মনুষ্য সমাজে যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহারা সাধারণের জন্য সূক্ষ্ম নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। এই কর্ম্ম কর, এই কর্ম্ম করিও না, এই আদেশবাক্য সমাজের ভিত্তিমূল স্বরূপ। যে কথা সকলে বুঝিতে পারে, সেই কথাই সার কথা। মহাপুরুষেরা যে সকল মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আদেশ জীবনের বন্ধন। যদি সকলেই পৃথক হইয়া দাঁড়ায়, সকলেই স্বেচ্ছামত আচরণ করে, কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে সমাজ সংগঠন কখন সম্পন্ন হয় না, আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে সৌহার্দ্দ হয় না, জীবনধারণে সুখ থাকে না। এই যে কোটি কোটি নরনারী আসিতেছে যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন রহিয়াছে। পরলোকে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সমাজ রহিয়াছে। জগতে নেতার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল, অনুগামীদিগের সংখ্যা বিস্তর। সুতরাং আদেশ পালন করা মনুষ্যের প্রধান গুণ। মহাপুরুষ মাত্রেই বলিয়াছেন যে, মনুষ্যপ্রকৃতি সীমাবদ্ধ হইলেই নীচগামিনী হয়। ইহার পূর্ব্বে কিছু নাই, পরে কিছু নাই, এ বিশ্বাস জন্মিলে জীবন মরুময় হইয়া আমাদের স্বভাবে যত প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। যাহার কোন আশা নাই, তাহার সমান দুর্ব্বল কে? আশা না থাকিলে যে, সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা নয়। বিদ্যার বলে অথবা বুদ্ধির বলে আশা ত্যাগ করিয়াও কেহ কেহ দুর্ব্বলচিত্ত হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসীর

বল যতই অধিক হউক, বিশ্বাসীর বল তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক। দুই ব্যক্তি সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে; এক জনের বিশ্বাস সন্তরণ করিয়া পার হইয়া তীরে উঠিবে, সেখানে লোকালয় আছে, আশ্রয় স্থান আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্থির করিয়াছে যে, সমুদ্রের অন্ত নাই, পার নাই, তীর নাই। সন্তরণ করিয়া সে যতদূর যাইতে পারে যাইবে, কিন্তু অবশেষে ডুবিতে হইবেই। এ দুই ব্যক্তির অবস্থায় যেমন প্রভেদ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর অবস্থায় তেমনি প্রভেদ। যদি জীবনের পরে কিছুই না থাকে, তবে এত ভাবিয়া মরি কেন? কেনই বা ইহলোক পরলোকের চিন্তা করি? আশাশূন্য বল কঠোর, নীরস; আশাপূর্ণ বল কোমল, সরস। যাহার বিরহে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আবার দেখিতে পাইব, এ সান্ত্বনার কত সুখ! জীবনের সঙ্গেই যে সব ফুরাইবে না, এ চিন্তায় কত আশা বাড়ে! যে আমার প্রাণতুল্য, তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই, এ কথা মনে হইলে জীবনের প্রতি অণুমাত্র অনুরাগ থাকে না। জীবন যে এত ক্ষুদ্র, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না, আত্মা যে মৃত্যুর অধীন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য এক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'আমি বরং নরকে বাস করিতে সম্মত আছি, তথাপি ধ্বংস হইতে সম্মত নহি।'

কিন্তু বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সত্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, মিথ্যায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম বল, আত্মা বল, স্বর্গ নরক বল, সত্যের তুল্য কিছুই নয়; 'সম্যক্ অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় একমাত্র সত্যের তুল্য।' সত্যকে ত্যাগ করিয়া, তাহার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করা যায় না। ইহলোকের পর অন্যলোক আছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা হইলেই হয় না, এরূপ বিশ্বাসের কারণ আবশ্যক। যদি এ বিশ্বাস অকারণ হয়, তবে ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি বুঝি যে, এ বিশ্বাস সত্য নয়, ইহার ত্য নাই, তাহা হইলে ইহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে, নহিলে সত্যের না হয়। এই জীবনের পরে অন্য জীবন আছে, এরূপ বিশ্বাস আমরা রি? এ বিশ্বাস আমাদের প্রকৃতি-নিহিত ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনু-। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, আমাদের অনেক স্বাভাবিক বিশ্বাস মিথ্যা। এ বিশ্বাসও মিথ্যা, অতএব এ বিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আর এক কথা। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দোষারোপ হয় কেন? আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ নিত্য মনে করি, তাহা

যে বিচার করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস টলিয়াছে বলিয়া যে, আর এক জনের বিশ্বাস টলিবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। পরলোক, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ; অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভবে না; প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহিলে যুক্তি অকাট্য হয় না। এক জন যদি বলে পরলোক আছে, আর এক জন বলে পরলোক নাই, তাহা হইলে এই দুই জনের মধ্যে কেহ কাহাকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে পারে না। পৃথিবী গোল কি সমতল, এই প্রশ্ন লইয়া যদি দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, এ বিবাদ মিটিবার সম্ভাবনা আছে, কারণ পৃথিবী যে গোল, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বলোক পরলোক সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ কিছুই নাই—পরলোক আছে কি নাই, কোন দিকেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের ভাষা, মনুষ্যের কল্পনা সমস্তই ইহজীবন-সম্বন্ধীয়। মনুষ্যের বুদ্ধি, তর্কসূক্ষ্মতা, বিচারশক্তি, ব্যবচ্ছেদশক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সকলের অবধি জীবন। কেবল বিশ্বাসের কোন অবধি নাই। বিশ্বাসের এমনি বল যে, বুদ্ধি, বিচার কিছুই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। স্বর্গে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে হাস্যমুখে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। কারণ, স্বর্গলাভের তাহার দৃঢ় আশা আছে। সে সময় যদি সে বিচার করিতে বসে, স্বর্গ আছে কি না, তাহা হইলে দাহ-যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিলে সেই মুহূর্ত্তে স্বর্গলাভ হয়, এমন বিশ্বাস না থাকিলে, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বোধ হয় প্রাণদানে কিছু সঙ্কুচিত হইত। এ সকল বিশ্বাস তর্ক দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিচার করিয়া অবিশ্বাস হয়, বিশ্বাসের জন্য বিচারের প্রয়োজন নাই। কে ভ্রান্ত, কে অভ্রান্ত, তাহার বিচার কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ এমন বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মানবের এই এক আশ্চর্য্য স্বভাব যে, যাহা অপ্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়, বোধাতীত, সেই বিষয়ের জল্পনা অত্যন্ত প্রিয় বোধ হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পূর্ব্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, এই সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বিচারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। ঈশ্বর সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ, পরলোক প্রকৃত অথবা কল্পিত, আত্মা অবিনশ্বর অথবা ধ্বংসশীল, এ বিবাদ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এমন বিতণ্ডা মিটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। যে বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, সে বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ একেবারেই

জীবন বহু খণ্ড হয়, এই ভয়ে অমরত্বের কল্পনা। এই জন্য সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ত্রিকালদর্শী নামে অভিহিত হইতেন। যে ত্রিকাল দেখিতে পারে, তাহার অদর্শনীয় আর কি রহিল? এই কালের প্রগাঢ় অন্ধকারে আমরা কত ভীত হই, কত বিস্মিত হই। এত আমাদের বল, এত আমাদের বীর্য্য, এত আমাদের চতুরতা—কালের মুখে ত কিছুই মুহূর্ত্ত মাত্র টিঁকিতে পারে না। কালের মত মৃত্যুর দ্বিতীয় সহায় নাই। কত সময় আমাদের মনে হয়, মৃত্যু ও কাল দুই অভিন্ন পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কালের গতি আমরা নিরূপণ করিতে পারি, মৃত্যুর সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি না। অতীত, আগত, অনাগত, কালের তিন মূর্ত্তি দেখিতেছি, মৃত্যুর কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। মানুষ মরিলে তাহার দেহের যে বিকার হয়, আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সেই বিকার মাত্র ত মৃত্যু নহে। কালের গতি অলক্ষ্য, কিন্তু অননুভবনীয় নহে। অতীতে কালের পদচিহ্ন দেখিতেছি, ভবিষ্যতে কালের ঘন অন্ধকার দেখিতেছি। অর্জ্জুন যেমন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া, ভীষ্মকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া শরশয্যায় শায়িত করিয়াছেন, মৃত্যু সেইরূপ কালকে অগ্রসর করিয়া, মনুষ্যকে নিহত করে। এক মুহূর্ত্ত কাল আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। নিঃশব্দ গতিতে, সমীরণ অথবা স্রোতস্বতীর ন্যায় কালের স্রোত বহিতেছে। সম্মুখে কিছু দেখা যায় না, পশ্চাতেও অধিক দূর দেখিতে পাওয়া যায় না, ইচ্ছা করিলে ফিরিয়া চাহিতে পারা যায় না। স্রোতের মুখে আমরা তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছি, কিছুক্ষণ পরে সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব, আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

এই নদীতে কর্ণধার হইলে কেমন বোধ হয়! জীবনের তরণী কোথা হইতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, জানিতে পারিলে কত সুখ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ কে? যে ত্রিকাল বর্ত্তমানের মত দেখে, সেই সর্ব্বদর্শী; যে অমর, সেই ত্রিকালদর্শী। ত্রিকালদর্শী না হইলে অমর হইয়া কি লাভ? চিরকাল শুধু বাঁচিয়া থাকিয়া কি হইবে? কালের পটে যাহা কিছু চিত্রিত আছে, ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইব, তবে ত তপস্যা সাধনা সার্থক।

মৃত্যুসম্বন্ধিনী চিন্তার ফল দুই—মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, অথবা মৃত্যুর রহস্য অভেদ্য স্বীকার করা। সনৎসুজাত মৃত্যুকে তৃণময় ব্যাঘ্রের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তৃণময় ব্যাঘ্র যেমন ভীষণদর্শন, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ভীষণ নহে; মৃত্যুও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। মৃত্যুভয় তাহা হইলে আর থাকে

না। এই জন্য প্রাচীন মুনি, ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। আর এক দিকে কেহ কেহ মৃত্যুর রহস্য জ্ঞানাতীত বিবেচনা করিয়া সে চিন্তা পরিত্যাগ করে। পরিত্যাগ করে বলিলে বোধ হয়, ঠিক বলা হয় না; কারণ অপরিতৃপ্ত কৌতূহল লইয়া সহজে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব নহে। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা না একটা বিশ্বাস—হয় দৃঢ় বিশ্বাস, না হয় শিথিল বিশ্বাস—নিশ্চিত হয়। অধিকাংশ লোক বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একটা কিছু আছে, এই রকম একটা অস্পষ্ট বিশ্বাসকে মনে স্থান দেয়। মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি না, এই বিশ্বাস হইলে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ আরও দৃঢ় হয়। আত্মার চিরন্তন ভ্রমণপথে মৃত্যুকে যে ভয়ের কারণ বিবেচনা করে না, তাহার পরলোকের প্রতি সমধিক অনুরাগ হয়, যে মৃত্যুকে জ্ঞানাতিরিক্ত বিবেচনা করে, সে ইহলোকের চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ মগ্ন থাকে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিবর্গ ও আধুনিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কি প্রভেদ, এ বিচার সদা সর্ব্বদাই উঠিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা অবশ্য বলিবেন যে, প্রাচীনেরা আধুনিকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইয়োরোপীয়েরা বলেন যে, আধুনিক পণ্ডিতেরা জগতের অধিক হিতসাধন করিতেছেন। ইয়োরোপে তপস্যা বনবাসের বিড়ম্বনা নাই, পূর্ব্বে ঋষিগণ বনে বাস করিতেন। এ দুই মতে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বকালে চিন্তা মৃত্যুমুখী ছিল, এখন চিন্তা জীবনমুখী। পূর্ব্বে পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম লইয়া সকলে চিন্তা করিত, এখন সকলে বিবর্ত্তবাদ লইয়া ব্যস্ত। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন, এখন পণ্ডিতেরা সমাজবিপ্লব কিরূপে সাধিত হয়, তাহাই চিন্তা করেন। পূর্ব্বে লোকশিক্ষকেরা ত্যাগ শিখাইতেন, এখন জীবনের সুখভোগের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাচীনেরা বল্কল ধারণ করিতেন, আধুনিকেরা অঙ্গরাগে ব্যাপৃত। পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজা রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন, এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, রাজারা পরের রাজত্ব হরণ করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই প্রভেদ উপায়ের প্রভেদ মাত্র, উদ্দেশ্যে কোন প্রভেদ নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করাই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোগসুখে শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হয় না বিবেচনা করিয়া, ঋষিগণ জীবনের বহির্দেশে সুখের অন্বেষণ করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে কেবল লালসা বৃদ্ধি হয় মাত্র, সুখ পাওয়া যায় না। দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিগ্রহ করাই সুখের একমাত্র উপায়। শরীর নশ্বর, শরীর যাহা কিছু সুখভোগ করিতে

চায় তাহাও নশ্বর, অতএব শারীরিক সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য। শরীরের সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা যে নিষ্প্রয়োজন, এ কথা তাঁহারা বলিতেন না, কিন্তু শরীরের প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। আত্মার আশ্রয় স্থান বলিয়াই শরীরের যত্ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শরীরকে স্বেচ্ছাধীন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জীবন কিসে শ্রেষ্ঠ হয়? ইন্দ্রিয়লব্ধ ভোগসুখে নিরত রহিলে সুখও নাই, তাহাতে জীবনও শ্রেষ্ঠ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই বাড়িবে, মনুষ্য ততই পশুর মত হইয়া উঠিবে। জীবনের বাহিরে চল, লোকালয়ের প্রলোভন ত্যাগ কর, বনে বনে ভ্রমণ কর, নির্জ্জনে পূর্ণ সত্তার চিন্তা কর, ইন্দ্রিয়গ্রামকে অনুক্ষণ দমন কর, তাহা হইলে জীবন শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা হইলে সুবিমল অনন্ত সুখ ভোগ করিবে। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যাহা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, তাহারই চিন্তা কর, জীবনের এই ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষ জ্ঞানের আলোক দ্বারা আলোকিত কর। জীবনের সুখ, জীবনের শ্রেষ্ঠতা, জীবনের শান্তি, জীবনের বল, সমুদয় জীবনের বাহিরে। জীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া জীবনের সুখভোগ কর। প্রাণবায়ু যেমন শরীরের বাহিরে অবস্থিত, জীবনের জীবনী-শক্তি সেইরূপ জীবনের বহির্ভাগে অবস্থিত। দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা যেমন আমরা প্রাণধারণে সক্ষম হই না, যেমন পলে পলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আবশ্যক, সর্ব্বত্রগামী সমীরণের মনুষ্য শরীরে প্রবেশ যেমন আবশ্যক, জগদন্তর হইতে ইহজগতে তেমনি নূতন জীবনের আগমন আবশ্যক। বায়ুর সঙ্গে শরীরের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবনের সহিত জীবনাতীতের সেইরূপ সম্বন্ধ। সমীরণের মুক্ত প্রবাহের ন্যায় অনন্ত জীবনের অসংখ্য নির্ঝর হইতে নির্ম্মল জীবনস্রোত বহিয়া আসিতেছে, সেই স্রোতে আমাদের উত্তপ্ত জীবন শীতল হইতেছে, জীবনের শীতল, কোমল, উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিশ্বাসের কল্পতরু দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে। পৃথিবীর আলোকদাতা সূর্য্য যেমন পৃথিবীর বাহিরে, জীবনের আলোকদাতা জ্ঞানসূর্য্য সেইরূপ জীবনের বাহিরে। লোকালয়ের গণ্ডগোল, জীবনের অন্ধকার দূরে রাখিয়া, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও। জ্ঞানের আলোক যেন অন্ধকারে, যেন সংসারের কুজ্ঝটিকায় না আবৃত হয়। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ডাইওজিনিস আলেকজাণ্ডারের অনুরোধানুসারে এইমাত্র প্রার্থনা করেন,—'তুমি সূর্য্যালোক আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছ। আলোকের পথ ত্যাগ কর, আসি রৌদ্র সেবন করি। তোমার নিকট আমার অন্য প্রার্থনা নাই।'

আধুনিকেরা বলেন, জীবনের বাহিরে কি আছে, তাহার অনুসন্ধানেই জীবন সমাপ্ত করিলে কি হইবে? জীবনের বাহিরে কি আছে, তাহা কোন কালেই আমরা প্রকৃত রূপে জানিতে পারিব না। যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা অনুমান অথবা বিশ্বাসমূলক। যাহা কেবল অনুমেয়, তাহার বিচারে চিরকাল কাটাইলে কি হইবে? জীবনের বাহিরে যাহাই থাকুক, জীবনের ভিতরে যাহা আছে, তাহাই আমাদিগের আয়ত্ত, তাহাই লাভ করিবার আমাদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আকাশের বিদ্যুৎ আমাদের গৃহে প্রদীপরূপে জ্বালাইব, পৃথিবীর গর্ভে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা অধিকৃত করিব; জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত করিব—এই সকল আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তপস্যা, যোগ প্রভৃতি হয় মূর্খের, না হয় বাতুলের কাজ। অনাহারে বনে বসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চেষ্ট রহিলে কি ফলোদয় হয়? জীবনধারণের যে সকল নিয়ম আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলেই দোষ। জীবনের পরে কি আছে, তাহা জানিবার আমাদের সাধ্য নাই, কিন্তু জীবনের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করিলে জানিতে পারি, এবং জানিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয় আমাদের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; আমরা যতই অনুসন্ধান করিব, ততই সুখের নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহারা মৃত্যুচিন্তায় চিরজীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি উপকার হইয়াছে? জীবন একটা বৃহৎ উদ্যানের স্বরূপ; মৃত্যু সেই উদ্যানের নির্গমদ্বার। উদ্যানে নানাবিধ ফলফুলের বৃক্ষ আছে, কোন স্থানে নির্ঝর বহিতেছে, কোথাও দুর্গম, জটিল, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য; কোথাও কত প্রকার ফল মূল ওষধি আছে, কোথাও কোন নিভৃত স্থানে রত্নরাজি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা সকলে এই উদ্যানের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। যাহারা উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ না করিয়া, অথবা কোন স্থলে কোন ভয়াল অথবা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, অথবা নিষ্ক্রমণ-দ্বার দেখিয়া বাহিরে কি আছে, দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহাদিগের বুদ্ধির কি প্রশংসা করিতে হইবে? সে দ্বারে মাথা খুঁড়িলেও বাহিরে কি আছে, কিছুই জানা যায় না, অথচ জীবনের উদ্যানেও দীর্ঘকাল কেহ থাকিতে পাইবে না। সকলকেই সেই দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু একবার বাহির হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সাধ্য নাই। সেই রন্ধ্রশূন্য বজ্রকঠিন দ্বারের সম্মুখে বসিয়া অনর্থক বাহিরে দেখিবার বিফল চেষ্টা শ্রেয়? না উদ্যানে

ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি ফল আছে, কোথায় কি রত্ন আছে, অন্বেষণ করা শ্রেয় ? উদ্যানে আমরা নিজে ভ্রমণ করিয়া অন্যকে পথ দেখাইয়া দিই, যাহাতে তাহাদের পথভ্রম না হয়, যে সকল বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার হইয়াছি, তাহারা যেন সে সকল বিপদে না পতিত হয়। উদ্যানের বাহিরে যাহা আছে, তাহা আমরা উদ্যানের ভিতর যে পর্য্যন্ত আছি, সে পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। কৌতূহলনিবৃত্তি করা কঠিন, কিন্তু কৌতূহলনিবৃত্তি করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় দুর্লভ জীবন সমাপন করা মূঢ়ের কর্ম্ম। জীবন প্রত্যক্ষ, জীবনের ফলও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত।

উভয় পক্ষে এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনে ও আধুনিকে যতটা মতভেদ মনে করা যায়, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ মতভেদ নাই। জীবনের বিস্তৃতি সংসাধন করাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা। প্রাচীনেরা ইহজীবনকে নিতান্ত অসার বিবেচনা করিয়া অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন, কিন্তু তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে জীবনের সীমা বিস্তৃত করিতেন, অন্য রাজ্যের অংশ অধিকৃত করিয়া জীবনের সহিত সংযোজিত করিতেন। প্রাচীনই হউন অথবা আধুনিকই হউন, জীবনের পূর্ণ উন্নতির পথ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন অন্ত যদি কেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব জাতি এখনও সে পথের অসম্পূর্ণ। তে পায় নাই। জীবন অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, উন্নতির উপায় সম্পাদিত জীবনের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা প্রাচীন কালেও সম্পাদিত হয় নাই, এখনও নিকের অভাব নাই। প্রাচীনের অভাব আধুনিক মোচন করিতেছেন, আধু- যেমন এক অভাব ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মোচন করিবেন। তেছে। জীবন পূর্ণ হইতেছে, অমনি আর এক নূতন অভাব উৎপন্ন হই- তা অসম্ভব ; কারণ মৃত্যু নহিলে জীবন পূর্ণ হয় না। পূর্ণতা পাইতে পারি না, আংশিক পূর্ণতার অধিক আর কিছু ই। যাঁহারা মানব জাতির মঙ্গল কামনা করেন, যাঁহারা করেন, তাঁহারা পূর্ণের অংশ লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আংশিক পূর্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি মানবজাতির উন্নতি ও অবনতির একমাত্র কারণ।

জীবনের অথবা মানবপ্রকৃতির কল্পিত পূর্ণতা নাই এমত নহে। কল্পনার অসাধ্য কিছুই নাই। জীবনের কল্পিত আদর্শ চিরকালই আছে। কেবল কল্পনা নহে, সাক্ষাৎ আদর্শেরও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বিশেষের চরিত্র আদর্শস্বরূপ, এ কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, কিন্তু তাহা-

মাধুরী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শরীর ও মন লইয়া [illegible] লেখালেখি হইয়া গিয়াছে, তা [illegible] চিতে আর কাজ নাই। [illegible] মন মনঃবড়, কেহ বলেন [illegible]। প্রথম দল বলেন, শরীর [illegible] বৈ তো নয়—মন যখন [illegible] করে, শরীরে [illegible] প্রতিবিম্ব প্রতি[illegible] য় মাত্র। আবার, [illegible] লেন, হউক দেখি [illegible] শরীর সুস্থ, [illegible] ভাল থাকে [illegible] স্থ শিবরামের দ্বন্দ্ব- [illegible] ন্ত [illegible] রাজ— [illegible] ই গোল [illegible], পরস্পর উভয়েই স্ব স্ব [illegible] রাহে [illegible] গুরু [illegible] বের গুরু রা[illegible] ন্ত যার তার ও মোটা কথায় [illegible] কেন [illegible] তার্কিক [illegible] বসেন, দার্শনিক দর্শনের কূট [illegible] ন্ত্র। গোলে [illegible] থা লাগিয়া যায়। তবে, শরীর [illegible] ঘোরতর বনিষ্ঠ [illegible] আছে—তাহার আর সন্দেহ [illegible] চলে, [illegible] ই বলিয়া যে, সকল স[illegible] বিষয়েই তাহারা গাটছড়া [illegible] য়া বেশ [illegible] মার ধারণা নাই। কে[illegible] মানে, বিদ্যায়, পুত্র- [illegible] কোন উ[illegible] নর সুখে আছেন, কিসে [illegible] রাগে আক্রান্ত, [illegible] মনের ভিতর [illegible] থিতে জীর্ণ। কেহ বা বি[illegible] দ্বলবায়, [illegible] সুস্থ হইলেই [illegible] অভাবের চিতা অহর্নিশি [illegible] জ্বলিতেছে। [illegible] এমন কোন [illegible] মন সুস্থ হইবে, বা মন সুস্থ হইলেই যে শরীর সুস্থ [illegible] চিকিৎসা ও সুশ্রূ [illegible] বাধি নিয়ম নাই।

লেন। কিন্তু শরীর সু[illegible] ওণে ভুবন দেখিতে দেখিতে বেশ সুস্থ হইয়া উঠি- [illegible] দিনেব পর [illegible] চইল বটে, মন তো সুস্থ হইল না।

খাইতে, শুইতে, [illegible] লিয়া যায়, ভুবন রাজবাড়ীতেই অবস্থিতি করেন। কাটে ভাবনায়। [illegible] তে ও বেড়াইতে দিন কাটিয়া যায়,—আর রাত্রি করে; পড়া শুনা [illegible] ভাবনা? মাঝে মাঝে পিতাব জন্য মন বড় কেমন স্থিত হয; [illegible] য়াছে; তাহার জন্যও থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপ উপ- [illegible] ভাবনা কি তাই? কি যে ভাবনা, তাহা ভুবন বুঝা-

ইতে পারে না—প্রাণ কিন্তু অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করে। একবার একবার স্থির করেন, কালই চলিয়া যাইব। কাল আসে, কিন্তু যাওয়া তো হয় না। প্রাণ যাতনা পায়, কিন্তু যাইতে তো চাহে না। এই রকম হইয়া হইয়া কত চিন্তা মনে উদয় হইল; ভুবন মনে করিল, প্রভাতে নিশ্চয়ই চলিয়া যাইব। কিন্তু প্রভাত না হইতেই কে যেন পায়ের শৃঙ্খলটা আরও কসিয়া আঁটিয়া দিয়া গেল। [illegible] সাধ্য কি, সে বাঁধন খুলিয়া যান? ও কিসের বাঁধন? রাণী ভুবনকে [illegible] সহিত স্নেহ করেন সত্য,—সে স্নেহ, সে আদর, যত্ন, ভুবন জীবনে কখন [illegible] পাবিবে না। ভুবন আশৈশব [illegible]হীন, আর আদর যত্ন কখন পায় নাই, [illegible] কেমন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা [illegible]—কিন্তু হৈমবতীর স্নেহ মমতা [illegible] সহবের জন্যও সে [illegible] হইত।—এ কি সেই [illegible] রাজা সিংহ [illegible] দিং লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন—[illegible] তাহাতে পুরা [illegible] তাঁহার সেই সাদর সম্ভাষণ, [illegible] সেই স্নেহমাখা, সেই স্নেহমধু [illegible] প্রশান্ত কারুণ্যপ্রফুল্ল ও বাৎসল্য [illegible] চাহিয়া [illegible] যাইত। ভাবিত, অতি সামান্য [illegible] সে—[illegible] বাসা কেন? সে তাঁহার কে [illegible] অধিক স্নেহ পাইবা [illegible] কার? উভয়ের সেই অপার [illegible] স্নেহ যত্নের কথা [illegible] হতবুদ্ধি হইয়া যাইত—এ [illegible] ভালবাসার বন্ধন [illegible] যাইতে কিছুই ঠিক করি [illegible] দিকে [illegible] করিল। তত্ই যেন [illegible] থাকে পাকে আরও জড়াই [illegible] চঞ্চল হইয়

শুধু কি [illegible]? থাকিয়া থাকিয়া অষ্ট প্রহরই [illegible] কিসের অশ কেন? এত যত্ন, এত আদর, এত সুখভোগ—ত [illegible] নোন হয় ভাবের অভাব তো কিছুই নাই, তবে রাত্রি দিন এত শূন্যম [illegible] য়ায় পাঠ স সায়াহ্নে সেই শীতল সমীরণ বহে—তাঁহার নিজগৃহে [illegible] রে ধীরে বহিয়া করিয়া যখন ছাদের উপর বেড়াইতেন, আর বায়ু [illegible] তাহার সেই মন প্রাণ জুড়াইয়া দিত, এখনও তেমনি প্রবাহিত [illegible] তাঁহার বাড়ীর স্নিগ্ধতা ও সুবাস আর তো তেমন অনুভূত হয় না। [illegible] খোলা জানালা বাগানে যেমন ফুটিত, এখনও তেমনি ফুটে; কিন্তু [illegible] সেই মন মাতান দিয়া তাহার গন্ধ আসিয়া মন মাতাইয়া দিত, এখন [illegible] ও তেমনি উঠে, মধুর গন্ধ কোথায় গেল। জ্যোৎস্না আগে যেমন উ

কিন্তু সে পুলকের পরিবর্ত্তে মন এত বিষাদ ভারে চাপিয়া পড়ে কেন? এত যে পড়া ভাল লাগিত, তাহাও আর তেমন লাগে না কেন? জোর করিয়া পড়িতে বসিলেও যেন মন অন্য দিকে ছুটিয়া যায়। ভুবন যার পর নাই অস্থির হইয়া পড়িলেন। অস্থির আরও অধিক হইলেন এই জন্য যে, এই আকস্মিক বিষম পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

তবে, পরিষ্কাররূপে না হউক, কতক পরিমাণেও কারণটা ভুবন যে বুঝিতে পারিত না, তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে অস্থিরতা আরও বাড়িত বৈ তো কমিত না। তাহা যখন তাহার মনে হইত, তখন যেন আরও কেমন অধিক বিমর্ষ করিয়া তুলিত, গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম বহিত, শরীর ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইত, মুখে কথা জড়াইয়া আসিত। ভুবনের তখন ভাবনাশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইত। হাঁ করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিত।

মাঝে মাঝে ভুবন রাণীর কাছে বাড়ী যাইবার কথা পাড়িত। রাণী যাইতে দিতেন না। বলিতেন, "তাও কি হয়, কেন বাপু, তোমার এখানে কিসের অযত্ন হইতেছে?" অযত্ন! ভুবনের যে যত্ন আদর পায় নাই, তাহা পাইয়া সে—ইহার উত্তরে কি বলিবে? বাড়ী যাইবার কথা পাড়িলেই রাণী যখন ঐ কথা তুলিতেন, তখন কাজেই আর তাঁহার কাছে সে কথা পাড়িত না। রাজাকেও মাঝে মাঝে ভুবন বলিত। কিন্তু রাজা কথাটায় বড় একটা কান দিতেন না। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "ভাল, আরও একটু শরীরটা সারুক।" হরি হরি! শরীর সারিয়াছে, কিন্তু মন যে যায়। কখন বা ভুবন মুকুন্দরামকে ধরিয়া বসিত, তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাড়ী যাইবার উপায় যদি তিনি করিয়া দেন। বুড়া মুকুন্দরাম হাসিত। বলিত, "তা হবে, ব্যস্ততা কি?" অনন্যোপায় হইয়া ভুবন এক দিন রাজকুমারীর এক সহচরীকে ধরিয়া বসিল, যদি রাণীকে বলিয়া কহিয়া অনুমতি চাহিয়া দিতে পারে। সে শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভুবন যত কাঁদ হইয়া বলিতে যায়, সে ততই হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। শেষে, নিরুপায় হইয়া ভুবন নিরস্ত হইল। আবার ভাবনায় চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল।

ভুবন যখন একা বসিয়া ভাবিত, রাণী তখন আড়াল হইতে গোপনে গোপনে দেখিতেন। দেখিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেন। আবার একবার

কন্যার পানে চাহিতেন। কি পরিবর্ত্তন! এই কয় দিনে সে বালিকা মাধুরী আর নাই—একেবারে যেন কত বয়সভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সে হাসি, সে কথা, সে চাপল্য—সে সব আর নাই। কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ, কত যেন অপরাধ। মার কাছেও সে আর তেমন করিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। আগে সর্ব্বদাই রাজার কাছে কাছে থাকিত, এখন রাজা বারম্বার ডাকাডাকি করিলেও বড় একটা কাছে যায় না। যদি বা যায়, চোরের মত চুপ করিয়া এক ধারে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেখিয়া রাণী হাসেন; রাজা অন্য কোন কথা তুলিয়া মৃদু হাস্য করেন—মাধুরী ধীরে ধীরে সেখান হইতে এক পা এক পা করিয়া সরিয়া পলাইয়া যায়। সখীদিগের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ এত যে আমোদ আহ্লাদ ও হাস্যকৌতুক করিত, তাহাও আর কিছু নাই। সখীরা বিদ্রূপ করিয়া হাসে, রাগে মাধুরীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। এক দিন, এক সহচরী ভুবনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে কি বলিয়াছিল, রাগে তাহাকে কিল মারিয়া, চুল খুলিয়া দিয়া মাধুরী সেখান হইতে উঠিয়া আপনার ঘরে গিয়া খিল দিয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল। সদাই কেমন যেন আনমনা—কিসের যেন একটা বিষম চিন্তা—কি যেন এক আতঙ্ক। মাধুরীর জড় সড় ভাব যে দেখিত, সেই মুচকিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। তার এখন অন্যমনস্ক সব বিষয়ে—মা ডাকিতেছেন, হয় ত আপন মনেই বসিয়া রহিয়াছে; সখীরা বাঁধিয়া দিবার জন্য চুল এলাইয়াছে, হয় ত চিরুণী দিবার আগেই ফিতার কাঁসটা টানিয়া দিল; খাইতে বসিয়া হয় ত মাছের ঝোলের পরিবর্ত্তে দুধের বাটীটাই টানিয়া লইয়া বসিল। আবার হাসিলেই বিষম গোল—হয় ত রাগ করিয়া ভাতের থালা ফেলিয়াই উঠিয়া গেল। অন্যমনস্কতা তার সব বিষয়ে। কেবল ছিল না দুইটি কাজের সময়। সেই রুগ্ন ও অতুরদিগের সেবা সুশ্রূষায় ও অতিথি অভুক্তদিগকে অন্ন বিতরণে। তখনকার সেই ভাব দেখিয়া সখীরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইত। রাজা, রাণী ভাবিতেন, নিশ্চয়ই শাপগ্রস্তা হইয়া কোন দেবী তাঁহাদিগের গৃহে আসিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। এক দিন কৌতূহলপরবশ হইয়া ভুবন মাধুরীর সেই অলৌকিক কীর্ত্তি দেখিল। সেই দিন ভাবিল যথার্থ সে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্য উদ্বাহু হইয়াছে। সে কে?—স্বার্থপর জঘন্যতম সংসারের কীট। আর মাধুরী কে?—ত্রিদিবভ্রষ্টা পারিজাত-শোভাময়ী দেববালা! তার এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন?

এক দিন—তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, পাখীরা সব কলরব করিয়া বাসায়

ফিরিতেছিল, আকাশের গায় পূর্ণচন্দ্রের অনুজ্জল অস্পষ্ট মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল—ভুবন অন্তঃপুর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ সে শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, ব্যাকুল হইয়া রাজকুমারীর এক সখী চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে কাঁদিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন—বুঝি সর্ব্বনাশ হইল—রাজকুমারী দীঘির জলে কুমুদ ফুল তুলিতে গিয়া তাহার দামে জড়াইয়া গিয়াছেন।" কি সর্ব্বনাশ! মুহূর্ত্তমধ্যে ভুবন সেই দীঘির দিকে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, যেখানে পাতার জল ছাইয়া প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধস্ফুটিত ও স্ফুটনোন্মুখ অসংখ্য কুমুদ শোভা পাইতেছে, সেইখানে, সেই কুমুদাধিকশোভাময়ী মাধুরী দামে জড়াইয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন! লম্ফ দিয়া ভুবন গিয়া দাম ছাড়াইয়া চকিতে মাধুরীকে তুলিয়া আনিলেন। চাতালে আসিবামাত্র সখীরা সব ঘেরিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারীর বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া বসিলেন। সখীর মুখে তাঁহার অনন্যস্থতার সংবাদ পাইয়া ভুবন ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই কি বলিব—ভাষায় যাহার বর্ণনা হয় না, এমন যে দেহ বুকে করিয়া তুলিয়া আনিবার সময় দুই একটা উষ্ণ নিশ্বাস গায়ে লাগিয়াছিল—তাহার অপার্থিব সৌরভ অস্থিতে অস্থিতে এখনও মিশিয়া রহিয়াছে। ভুবন ভাবিল, কি পুণ্য করিলে কুমুদের দাম হওয়া যায়?

আর, আজ—সেও সন্ধ্যার সময়—ভুবন সেই উদ্যানে পূর্ব্ববৎ বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় অদূরে লতাকুঞ্জের মধ্য হইতে ভ্রমরীর প্রথম গুঞ্জন তুল্য অতি ধীর, অতি মধুর এক কমনীয় কণ্ঠগীতি কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দ অস্পষ্ট, ভয়োচ্চারিত—ভয়োচ্চারিত বলিয়া তাহা আরও কত মধুর! সেই উদ্যান—উদ্যানস্থিত লতাবল্লরী সমস্ত মধুময় করিয়া, মধুবত্তা যেন আকাশের স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছে। মহাশ্বেতার কণ্ঠস্বরে পুণ্ডরীক এক দিন যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়া ভুবন ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিলেন, সখীজন সঙ্গে মাধুরী সেই লতাগৃহে বসিয়া সেই গান করিতেছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভুবন তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেই সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে প্রকৃতির মধুর প্রকোষ্ঠ মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সপ্তস্বরের সারভূত মধুরতম সুর শুনিতে শুনিতে ক্ষণেকের জন্য ভুবন পৃথিবী, উদ্যান, বৃক্ষ, লতা ও আপনার সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। সহসা

উপায় যে নাই, তাহা সত্য। পড়াশুনা ঘুরিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা নিকটে, এখন রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করিবার সময়, এখন কি এই সব চিন্তা লইয়া কাটাইলে চলে? তাঁহার পড়াশুনার জন্য তাঁহার পিতা যে কত আদর করেন, কত ভাল বাসেন, লোকের কাছে সুখ্যাতি করিতে তাঁহার আনন্দ ধরে না—সেই পিতাকে কি শেষকালে হতাশ্বাস করিবেন? আর এত দিন ধরিয়া এই যে তিনি এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন, ইহাই কি তাঁহার উচিত? বৃদ্ধ পিতা না জানি সেই প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কত স্থানে অন্বেষণ করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার মাতুলালয় ও কলেজ পর্য্যন্ত সন্ধান লইয়াছেন, শেষ হতাশ্বাস হইয়া কতই না রোদন করিয়াছেন। আর তিনি এখানে রাজভোগে থাকিয়া, অন্য চিন্তা লইয়া দিন কাটাইতেছেন। এই কি পুত্রোচিত কর্ত্তব্য? লোকে এই জন্য কি পুত্রকামনা করে? ভুবন বেশ দেখিতে পাইলেন, যেন তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য কত দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছেন। সময় পাইয়া বিমাতা কত বাক্যযন্ত্রণা দিতেছেন, আর তিনি তাহার নাম করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। তাহা মনে হইবামাত্র ভুবনের চক্ষে জল আসিল। নিঃশব্দে সে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া সংকল্প করিলেন, কাল যেরূপে হয়, এখান হইতে যাইতে হইবে।

প্রভাতে রাজা বাহিরে আসিবামাত্র ভুবন কলিকাতায় যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা স্বরে বুঝিলেন, আজ আর অন্য দিনের ন্যায় কথায় কিছু হইবে না। বলিলেন, "পড়ার ক্ষতি করিতে আমি বলিতে পারি না। ভাল, আমি অদ্যই লোক দিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিব। কিন্তু একটা কথা—কলিকাতায় গিয়া আমার বাসা বাড়ীতে তোমায় থাকিতে হইবে।"

ভুবন কোন কথা কহিলেন না।

রাজা বলিতে লাগিলেন "তোমার মাতুলালয় হইতে কলেজ অনেক দূর। আমার বাড়ী খুব নিকট, তাহাতে তোমার আপত্তি কি?"

ভুবন নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "তাহা স্বীকার না করিলে যাইতে দিব না।"

ভুবন বলিলেন, "পিতা কি মনে করিবেন?"

রাজা বলিলেন, "পিতা! যে পিতা স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া এমন দুর্য্যোগের

সময় পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে, সেই পিতা আবার কি মনে করিবেন বলিতেছ ?"

ভুবনের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "পিতা আমায় কিছু বলেন নাই। আমি তাঁহাকে না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম।"

ভুবনের স্বর শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া জলে ভাসিতেছে। রাজা অপ্রতিভ হইলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন—"আমি তাহা জানিতাম না।"

কোন কথা না বলিয়া মস্তক নত করিয়া ভুবন নীরবে দাড়াইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "কিন্তু দেখ, এত দিন তোমায় বলি নাই—জান, তোমাদের বাড়ী হইতে দুই জন লোক এখানে আসিয়াছিল ?"

আশ্চর্য্য হইয়া ভুবন রাজার প্রতি চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "তাহারা কেন আসিয়াছিল জান ? তোমার সহিত মাধুরীর সম্বন্ধ ভাঙ্গাইবার জন্য।"

সে সময়ে যদি সে গৃহে সহসা বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও ভুবন অত স্তম্ভিত হইত কি না সন্দেহ। অবাক্ হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় ভুবন রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "তোমার মাতার কি যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইয়াছিল ?"

ভুবনের মার কথা কিছুই মনে পড়ে না। যদি কখন বহুদিনদৃষ্ট স্বপ্নের ন্যায় কিছু মনে পড়ে, তবে সেই মৃত্যুর কথা। সেই অপরাহ্নে প্রাঙ্গণে তুলসীতলার মাটীর উপর সে মূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে, পার্শ্বে বসিয়া পৌরজন রোদন করিতেছে, পাগলের ন্যায় পিতা মাথায় করাঘাত করিতে করিতে হাহাকার করিতেছেন—সে তখন অতি শিশু, কিছু বুঝে না, কিছুই জানে না। চিরদিনের তাহার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার জ্ঞান নাই—পিতাকে রোদন করিতে দেখিয়া আপনি উচ্চে রোদন করিয়া উঠিল—সেই কথা—জীবনের সেই প্রধান অশুভ মুহূর্ত্তের নিদারুণ কথা ছায়ার ন্যায় মাঝে মাঝে মনে পড়িত, তখন ভুবন সমস্ত কাজ ও সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল তাহাই ভাবিত, আর দর দর ধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। অনেক দিনের পর সেই মার কথা—মার সেই মৃত্যুর কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শুনিবামাত্র ভুবন আকুল হইয়া উঠিল, কাতরে মাটী পানে চাহিয়া ভুবন দাড়াইয়া রহিল। চেষ্টা করিয়াও হৃদয়ের বেগ সামলাইতে পারিল না—টস্ টস্ করিয়া অনর্গল অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া রাজা যার পর নাই বাথিত হইলেন।

ব্যথিত হৃদয়ে রাজা বলিলেন, "তিনি পুণ্যবতী, পতি পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক করিও না।"

ভুবন কথা কহিলেন না। তাঁহার প্রাণে তখন যাহা হইতেছিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ হইবার নহে। নীরবে ধীরে ধীরে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

ভুবন কতক শান্ত হইলে রাজা বলিলেন, "তা, তাহাদের কথা যে মিথ্যা, তাহা আমাদের জানিতে বাকি নাই।"

ধীরে ধীরে ভুবন জিজ্ঞাসিলেন, "জানিতে পারিয়াছেন কি, যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কে?"

"তাহারা উভয়েই স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু তুমি যদি বুঝিতে পার, তবে তাহাদের আকার বর্ণনা করিতেছি।" রাজা যত দূর শুনিয়াছিলেন, উভয়ের আকার ও রূপ বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া ভুবন ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে রহিয়া গেলেন।

তখন অদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া রাজা বলিলেন, "তুমি কলিকাতায় যে যাও; কিন্তু যেখানে তোমার এমন সব শত্রু থাকিতে পারে, সেখানে আর যাইও না।"

ভুবন কথা কহিলেন না। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই বাক্‌শক্তি লোপ হইয়া গিয়াছিল।

* * * * * * *

সেই দিনই সকলে শুনিল, পর দিবস প্রত্যূষে ভুবন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন। আগে সেই দিনই যাইবার কথা হইয়াছিল, রাণীর অনুরোধে তাহা রহিত হইয়া পরদিবস ধার্য্য হইয়াছিল। তা, সবাই যখন শুনিল, তখন মাধুরীও না শুনিবে কেন? মাধুরী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে দিন সখীদিগের কাছে বিরসভাব ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। সখীরাও যার পর নাই ম্রিয়মাণ। রাণীও বিশেষ দুঃখিতা। যাওয়া হবে বলিয়া ভুবনই কি হৃষ্ট? তাঁহারও কেমন বিষাদময় মূর্ত্তি। বড় কষ্টে সবার দিনটা কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ভুবন দুই দিনের পর আজ আবার সেই উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছে। চিন্তাকুল প্রাণে এ দিক্ ও দিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দেখিল, দূরে একটা অশোকের ডাল ধরিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। ভুবন চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। কেবল

রহিয়া রহিয়া মৃদুসমীরণ বকুল বৃক্ষের পাতা কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কেবল অচিরস্ফুট মল্লিকার দল সহস্র শোভা বিস্তার করিয়া বায়ুভরে এ উহার গায়ে হেলিয়া পড়িতেছে; কেবল দুইটি তারা আকাশের কোণ হইতে চুপি চুপি উঁকি মারিতেছে, আর কেবল সেই অশোক বৃক্ষ আপনার পত্রসমাকুল শাখা প্রশাখাগুলি নত করিয়া সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে বেরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে ভুবন এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রতি পদবিক্ষেপে যেন পায়ে কত কি বাধিতে লাগিল, বক্ষস্পন্দন বড় ঘন ঘন আরম্ভ হইল, কি একটা ত্রাসে মুখ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। কাছে গিয়া পশ্চাৎ হইতে ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন—"মাধু—মাধুরি!"

বনহরিণী যেমন নিকটে হঠাৎ বংশীস্বর শুনিলে চমকিয়া উঠে, সেইরূপ চমকিত হইয়া মাধুরী পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। চারি চক্ষুর মিল হইল! অমনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় দেহ আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল। সেই সময় সেই অশোক বৃক্ষের ঘনপত্রের ভিতর হইতে একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া উঠিল। সাড়া পাইয়া নিকট হইতে একটা পাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া সবলহরীতে উগান মাতাইয়া তুলিল। সেই ভাবেই মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"যাবে—কালই যাবে?"

কথা শুনিয়া ভুবন কাঁপিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কেন মাধুরি! আমার থাকা ও যাওয়ায় তোমার কি আসিয়া যাইবে?"

মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কথার উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভুবনও নীরব নিস্তব্ধ নিশ্চল।

কতক্ষণের পর মাধুরী ধীরে ধীরে বলিল—"আবার কবে আসিবে?"—স্বর কাতরতাপূর্ণ।

ভুবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আসিলে যদি ভালবাস, তবে শীঘ্রই আসিব।"

এ কথারও উত্তর মাধুরী দিতে পারিল না। একটি নিশ্বাস সেই সন্ধ্যার বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

ভুবন ভাবিল, এ কি স্বপ্ন? স্বপ্নই যদি হয়, তবে এমনই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মানুষ মরে না কেন?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তাদ্রিম তাদ্রিম দ্রিম।—দ্বিপ্রহরের নীরব নিশীথে তবলা বড় মধুর বলিতেছিল। বাদক যে সুরে যন্ত্র বাঁধিয়াছিলেন, তাহা অতি মনোহর। আর তাহার লয়ে লয় মিশাইয়া গায়িকা যে "কেয়াসে পিয়ারা নেহারোঁ" বলিয়া গান ধরিয়াছিল, তাহা মনোহর হইতে আরও মনোহর। সেই মধুর গীতধ্বনি মধুর বাদ্যতরঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিপ্রহর রাত্রির সুষুপ্ত গভীরতা ভেদ করিয়া সে শব্দ আকাশের স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছিল। দূরে অদূরে যে তাহা শুনিল, সেই তৎক্ষণাৎ মোহিত হইয়া গেল। সঙ্গীত গমকে গমকে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় উঠিতেছে নামিতেছে, বাজনাও সঙ্গে সঙ্গে পহরমে পহরমে অতি সুন্দর বলিতেছে। যে বাজাইতেছিল, সে নিশ্চয়ই বাদ্যবিশারদ, আর যে কণ্ঠে সে সঙ্গীত হইতেছিল, তাহা মধুর হইতে আরও মধুর। সে মনীষ কণ্ঠ পুরুষের সম্ভবে না। একটু একাগ্র হইয়া শুনিলেই বেশ বুঝা যায়, বামাকণ্ঠ। সে যেই হউক, তাহার কণ্ঠ অপূর্ব্বোল্লাসন, সুর বীণাধ্বনি, সে নিজে গীতবিদ্যায় সুনিপুণ। গান যখন প্রাণ মন মসগুল করিয়া দিয়া হারায় হুন্ চলিয়াছে, তখন বড় একটা বেখাপ বাহবাধ্বনি জীবন্ত হইল। সে বাহবা প্রথমে এক জনেই দিয়াছিল, দেখাদেখি চারি দিক হইতে শৃগালরবের ন্যায় শৃগালরবে বহু কণ্ঠে সেই বাহবাধ্বনি উচ্চারিত হইল। অমন যে সুন্দর গান, একেবারে মাটী হইয়া গেল। গায়িকা বুঝি একটু বিরক্ত হইল। বাজিতে বাজিতে একটা আঘাত লাগিলে বীণার তার যেমন ছিঁড়িয়া যায়, তেমনি সে গীত বন্ধ হইল। বাদক তবলা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই গানের পরিবর্ত্তে চারি দিক হইতে এক বিকট শব্দ উত্থিত হইল। সঙ্গীতের মধুর শব্দ তখনও বায়ুর উপর কাঁপিয়া বেড়াইতেছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সেই আওয়াজে ডুবিয়া গেল।

তখন, নানা লোকে নানা রকম রাসভ কণ্ঠে গান ধরিল। কেহ ধরিল শ্যামা বিষয়,—"ও মা কালি মুণ্ডমালি"। কেহ গাহিল মানভঞ্জন—"রাই ধৈর্য্যং রহ ধৈর্য্যং।" কেহ আর থাকিতে না পারিয়া, দুই হাত তুলিয়া চিতাইয়া পড়িয়া কবির মহড়া ধরিয়া "মরি হায়—হায়—হায় রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। এক জন ছুটিয়া আসিয়া সেই গায়িকাকে ধরিয়া বসিল।

বলিল, "বাইজি, তুমি ঝুমুর জান? ও ক্যায়সে ম্যানাসে বেখে একটা ঝুমুর গাও তো বাবা।" তাই শুনিয়া বড় একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। যে এ কথা বলিল, তাহার নাম নিতাই। তাহাকে ডাকিয়া, দলের যিনি চাঁই, হুজুর বাবু—তিনি বলিলেন, "নেতা, আজ তুই আমাদের নেতা।"

অমনি কোথা হইতে আর এক জন বলিয়া উঠিল—"রও বাবা জিতা।"

হাসিয়া উঠিয়া বাবু বলিলেন, "বহুত আচ্ছা কালিদাস।"

তখন যে সেই বাইজীকে আনিয়াছিল, সে উঠিয়া বলিল—"হুজুর, একটা কথার মিল করিয়া ও যদি কালিদাস হয়, তবে আমি এই চাঁদে চাঁদে মিল করিয়াও কি এ সভার বররুচি হইতে পারিব না!"

সে কথার উত্তরে দল হইতে এক জন বলিল, "তুমি বাবা বরাহ।"

তখন সেই বররুচিপদপ্রার্থী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "অ্যাঁ আমি বরাহ মিহির—তবে আমার খনা কি এই বাইজী?"

যে আগে উত্তর দিয়াছিল, সে বলিল, "তুই বেটা আসল বনবরাহ। সে যে সম্পর্ক বিরুদ্ধ—শ্বশুর বৌ সম্বন্ধ।"

কথাটা মজাদার-বটে, কাজেই আবার হাসির গোল উঠিল। তখ বলিলেন, "চুপ চুপ—বাজে কথা ছাড়িয়া দাও, এস সব আসল কা দেওয়া যাক্।"

অমনি চারি দিক হইতে এক সুরে সকলে বলিয়া উঠিল—"শিশুগণ মন নিজ নিজ পাঠে।"

ডেকাণ্টার বোতল গেলাস সব নিকটে থরে থরে সাজান ছিল। লৌহতারমণ্ডিত অপূর্ব্বমোহরাঙ্কিত বোতলের শীর্ষদেশ হইতে পট্ পট্ রবে ছিপি সকল উদ্ঘাটিত হইল, অতি শ্রুতিমধুর টক্ তক্ নাদে তাহা গেলাসে ঢালিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিল। এত যে নেশা হইয়াছে, তবু আদব কায়দা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। গেলাস আগে বাইজীর হস্তে প্রদত্ত হইল। বাইজী সেই রক্তকমলকান্তি সুরা আপনার রক্তকমলকান্তি অধরে স্পৃষ্ট করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলে, তখন সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য পান করিতে আরম্ভ করিল। বাবু স্বয়ং সকলকে ঢালিয়া দিতেছিলেন। সকলের খাওয়া হইলে এক জন আসিয়া এক গেলাস ঢালিয়া বাবুকে পান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বাবু বলিলেন, "অনেকটা খাইয়াছি, আর খাইব না।"

যে অনুরোধ করিয়াছিল, সে বলিল, "সে কি বাবা, তুমি পরম হিন্দুর

পান দিয়া আসিতে হইবে, আলোটা মিট্ মিট্ করিতেছে, একটু তেল না দিলে চলে না—ইত্যাদি কাজের তাহার অন্ত ছিল না। বিছানা করিতে ক্ষেমা খুব ভাল পারে, সুতরাং সে না করিয়া আর কে করিবে? পরিষ্কার করিয়া ঘর গুছাইতে সে সিদ্ধহস্ত, কাজেই সে ভারও অবশ্যই তাহার উপর। ক্ষেমার কিন্তু তাহাতে কোন কষ্ট নাই, শ্রমবোধ নাই—চাই কি, দাদা বাবু বলিলে সে সারা দিন-রাত্রি ধরিয়া সেখানে বসিয়া তাঁহার বহির পাতাগুলা পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দিতে পারে। মূর্খ ক্ষেমা, অমূল্য এখন উড়িতে শিখিয়াছে, সে আর কত দিন অমন করিয়া খাঁচার ভিতর থাকিবে? দুই দিনেই অমূল্য বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিল, দূর হোক, এমন করিয়া রাজার মেয়ে বিবাহ করার চেয়ে সাত জন্ম আইবুড় থাকা ভাল। এমনি করিয়া থাকা কি অমূল্যের কাজ? এ কাজ তো একটা পশুর—একটা মেয়েমানুষের—আর ভুবনের! মার কথা অনেক রক্ষা করা হইয়াছে, আর তাহা শুনিলে চলে না। অমূল্য পিঁজরা ভাঙ্গিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

একটা কিন্তু বড় বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আর খরচ দিতে না। কিন্তু তা তো চাই। তাহা না হইলে তো কোন মজাই হইবে না। ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া কিছু হাত লাগান যায়। মা বেটী বড় সেয়ানা, বাহিরে কিছুই রাখে না। যা কিছু সব চাবির ভিতর। চাবিও সদাই আঁচলে আঁচলে ফেরে। উপায় কি? উপরে তেতালার ঘরে একটা ছোট খাট সিন্দুক থাকিত। অমূল্য জানিত, তাহা কোন অস্ত্রে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে হঠাৎ সে শব্দ কেহ শুনিতে পাইবে না। সে সিন্দুকে ঠাকুরের বাসনাদি থাকিত। হরিহর বাবু পশ্চিম হইতে আসিবার সময় ঠাকুরের জন্য অনেক টাকা দিয়া এক খানি স্বর্ণসিংহাসন গড়াইয়া আনিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনও সেই সিন্দুকের ভিতর থাকিত। অমূল্য আর কিছু ঠাহরিতে না পাইয়া তাহারই উপর লোভ করিল। শেষ রাত্রে যখন বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত লোক নিদ্রিত, তখন অমূল্য গিয়া সেই সিন্দুক ভগ্ন করিল। একবার ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে চাহিল। হঠাৎ কিসের ছায়া লক্ষিত হইল। অমূল্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহার এই প্রথম চুরি। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সিন্দুকের ডালা ফেলিয়া দিল। আবার দরজার পানে চাহিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। ভাবিল, তাহার ভ্রম। কিন্তু তবু বুকের ভিতর হইতে কম্পটা গেল না। তখন ডালা খুলিয়া ফেলিল। উপরেই সে সিংহাসন রক্ষিত ছিল, তাহা লইয়া সিন্দুকের ডালা ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল। কে

বেন ছাঁৎ করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। অমূল্য ভাবিল, এ কি, এখনও ভয় ঘুচে না কেন? কিন্তু তখন সিঁড়ির উপর কাহার পায়ের শব্দ শ্রুত হইল। ভয়ে অমূল্য কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু তখন সে অপহৃত দ্রব্য পুনর্বার সেখানে রাখিয়া আসাও সোজা নয়। অমূল্য ভবে ভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহার একটা ভরসা ছিল, তারাসুন্দরী এত রাত্রে উঠিয়া কখন এখানে আসিবেন না, তবে আর যে হোক, যদি দেখিয়াই থাকে, তাহার মুখ বন্ধ করিবার উপায় আছে। সিঁড়িতে কোন শব্দই শুনিল না। তখন নামিয়া আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, তখনও বারাণ্ডায় শুইয়া ক্ষেমা ও ব্রাহ্মণঠাকুরাণী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া পাশ কাটাইয়া দ্রুত গিয়া অমূল্য আপনার গৃহে প্রবেশ করিল। এ চুরির কথা কেহ কিছু জানিতে পারিল না। সে সিন্দুক অনেক দিন খোলা হয় নাই, জানিবার বিশেষ কোন কারণও ছিল না। কিন্তু দুই দিন পরে, তারাসুন্দরী সেই শুভবিবাহ যাহাতে ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য শুভচণ্ডীর পূজা দিতে গিয়া, যখন নৈবেদ্যের জন্য বাসন আনিতে সেই ঘর নিকট গমন করিলেন, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুঃস্থির হইল। খুলিয়া দেখিলেন, সিংহাসন নাই। খুব একটা গোলমাল উঠিল। তখন অমূল্য বলিল, "আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, এ সেই ভুবনের কাজ। এতদিন কেউ ওদিকে যাও নাই, তাই জানিতে পার নাই। এ তার কাজ না হইয়া আর যায় না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমারও তখন সন্দেহ হয়েছিল বটে, নহিলে রাতারাতি চোরের মত অমন করিয়া পলাইবে কেন? আর পয়সা নহিলে বা পেট চলিবে কেমন করিয়া?"

কথাটা হরিহর শুনিলেন। ভুবন চোর—এ কথা তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। তবে, ভালমন্দ কোন কথাই কহিলেন না। তাহাতেই বা তারাসুন্দরীর ঝঙ্কার কত!

এ দিকে অমূল্য যখন দেখিল, দোষটা তাহার ঘাড় হইতে বেশ নির্ব্বিবাদে অপরের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, তখন আর কালবিলম্ব অবিধেয় বিবেচনায়, দুই জন ইয়ার দিয়া সে সিংহাসন বেচিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল, আর তাহার টাকা হইতে আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিল। সিংহাসন বেচিয়া যাহা হইল, দুই জন ইয়ারে অবশ্য তাহার অর্দ্ধেক

আপনাদের মধ্যে বখ্‌রা করিয়া লইল। বাকি অর্দ্ধেক হইতে আসিল, সাকী আর সরাব। তাই আজ এত আমোদ প্রমোদ, এত গীতবাদ্য, এত হাসির তরঙ্গ ও সুধার প্রবাহ।

ঢাল—ঢাল—আরও ঢাল। সাকী গায়িতেছে, "পিয়ালা মুঝে ভরে দে"; বোতলে গেলাসে কি সুন্দর ঠুন্ ঠুন্ শব্দে প্রেমালাপ করিতেছে; সুধার সৌরভে প্রাণ মন তর্ হইয়া যাইতেছে—খাও খাও—দেদার খাও। যদি এক দণ্ডের জন্যও সশরীরে স্বর্গভোগ বাসনা থাকে, যদি জীবনের কোনও সাধ পূর্ণ হইল না বলিয়া আপশোষ থাকে, যদি দুঃখের তাড়নায় ব্যথিত হইয়া থাক—আবার ঢাল—আবার পান কর। সব জ্বালা দূরে যাইবে, কোন সাধ অপূর্ণ থাকিবে না, মরণের এমন সুন্দর সোপান্ আর নাই। বলিহারি, কি সুখের মরণ! হরি হে, তোমার অপার লীলা!

সেই রজনীতে যখন সকলে নিদ্রার আরামক্রোড়ে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে, তখন পশুবৎ উন্মত্ত এই সকল বেল্লিকের দল পশুবৎ উন্মত্ত ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ লাফাইতেছে, কেহ চীৎকার ছাড়িতেছে, কেহ বা টলিয়া টলিয়া শেষ দড়াস্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর যিনি বাবু, তিনি অনেকক্ষণ দুর্গন্ধময় শুষ্কাবরাশির উপর মুখ গুঁজিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তখনও প্রভাতের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, শৃগালের দল সবেমাত্র শেষ প্রহরের ডাক ডাকিয়া চুপ করিয়াছে, তখনও আকাশপোরা নক্ষত্র, আর বনপোরা অন্ধকার থাকে থাকে সাজান রহিয়াছে—সেই বীভৎস-আচার পাষণ্ডগুলা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বীভৎস ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ চিৎভাবে, কেহ উপুড় হইয়া, কেহ কুণ্ডলী পাকাইয়া, পতিত আছে। এক জনের হাত আর এক জনের মুখের উপর পড়িয়াছে, এক জনের পা আর এক জনের গলদেশে সংলগ্ন হইয়াছে, এক জনের বুকের উপর আর এক জনের মাথাটা গিয়া লুটাইয়াছে। কাহারও সর্ব্বাঙ্গে বমনের দুর্গন্ধ ছুটিতেছে, গেলাসের উপর পড়িয়া কাহারও নাকটা কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে এখনও রক্তধারা লাগিয়া রহিয়াছে, কাহারও মুখের উপর একটা কাণা মাছি ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে। পার্শ্বে বোতল ও গেলাস্ গড়াগড়ি যাইতেছে, দুএক তব্‌লাটা ফাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সামাদানে আলো অতি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সাক্ষাৎ নরকের দৃশ্য।

যদি সেই সকল পাষণ্ডদিগের মধ্যে এক জনও সজ্ঞানে থাকিত, তাহা হইলে সেও তখন সে দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত। তবে সে দৃশ্য যে কেহই দেখিল না, তাহা নহে। তাহা দেখিল, এবং দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিল—এক জন স্ত্রীলোক। সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নয়—ক্ষেমা।

ক্ষেমা দেখিল, দুই দিন হইল অমূল্যের মনটা কেমন উড়ু উড়ু হইয়াছে। সে তাহার সঙ্গে হাসে, কথা কয়; কিন্তু কেমন যেন আন্‌মনা, থাকে থাকে কি যেন মনে পড়ে, কি যেন ভাবে। ক্ষেমা দেখিল, কয় দিন ধরিয়া গোপনে গোপনে দুই এক জন ইয়ারও আনাগোনা করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া অমূল্য ছুটিয়া যায়, কি ফুড়ুর বুড়ুর করে, আবার লুকাইয়া আসিয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে। ক্ষেমা চুপ করিয়া দেখে, কাহাকেও কিছু বলে না। তবে নিজে বড় একটা কোথাও যায় না, সদাই অমূল্যকে চোখে চোখে রাখে। মনে মনে বলে, "আমি যেন তোমাতে মজিয়াছি, কিন্তু তুমি তো সেদিনকার ছেলে, কত বুড়ো আমার কাছে হাবি মানিল, আর আমি তোমায় কি করিতে পারিব না!"

যে রাত্রে অমূল্য ঠাকুরের সিংহাসন চুরি করে, সেই দিন সন্ধ্যা হইতেই যে আন্‌চান্ ও ছট্‌কটানি দেখিয়া ক্ষেমা পাহারা বড় কড়াকড় লাগাইয়াছিল। সে দেখিল, যাহা সে সন্দেহ করিয়াছিল, ব্যাপার তাহা অপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর। সেই যে, সেই সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সিংহাসন লইয়া আসিবার সময় অমূল্য কি একটা আব্‌ছায়া দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তার পর সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া পলাইবার মত কাহার পদশব্দ শুনিয়া দাঁতকপাটী লাগিবার যো হইয়াছিল—সে আর কেহ নহে—সেও এই ক্ষেমা। ক্ষেমার সে রাত্রে ঘুম ছিল না। ঘুম আরও না হইবার কারণ, সন্ধ্যার সময় সে অমূল্যের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বিদ্রূপ করিয়া দুই একটি কথা বলিয়াছিল; অমূল্য তখন নূতন সুখের স্বপ্নে বিভোর—এক রকম উন্মত্তপ্রায়—বারম্বার ক্ষেমার সে ভ্যান্‌-ভ্যানানি ভাল লাগিবে কেন? এ কয় দিন কেবল উড়িতে না পারিয়া পোষমানা বৈ তো নয়। সে তাহার উত্তরে দুই একটা কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। ক্ষেমা বুঝিয়া অমনি চাপিয়া গেল, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—"দেখিব, বঁধু, তোমার দৌড় কতদূর।"

আলোর কাছে বসিয়া তারাসুন্দরী পান চিবাইতে চিবাইতে চুলের পেটেটার যেখানটা কাপড় লাগিয়া উস্কো খুস্কো হইয়া গিয়াছিল, তাহা হাত

দিয়া ধীরে ধীরে পাতিয়া পাতিয়া দোরস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় তাড়াতাড়ি ক্ষেমা সেইখানে আসিয়া বলিল, "মা, এ কয় দিন পড়িয়া পড়িয়া দাদাবাবুর বড় কষ্ট হইয়াছে—থাকে থাকে মাথা ধরে, চোখ কর্ কর্ করে; তাই আজ না পড়িয়া এখানে আসিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছি। তুমি একবার ডাক না, মা।"

তারাসুন্দরী মহা আগ্রহান্বিতা হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, অসুখ! অমূল্যর আমার অসুখ করিয়াছে! তা, তুই আমাকে আগে বলিস্ নি কেন?"

তারাসুন্দরী আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অমূল্যকে ডাকিলেন। মার ডাক, অমূল্য অমান্য করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ আসিয়া বলিল, "কেন মা?" মা বলিলেন, "তোমার নাকি বাবা, অসুখ করিয়াছে? তা, আজ আর পড়িয়া কাজ নাই। এইখানে আমার কাছে একটু শোও।"

অমূল্য ভাবিল, এ কি বিপদ! তাহার যে কোন অসুখই করে নাই, তাহা সে বারম্বার মাকে বিশেষ করিয়া বলিল, মার প্রত্যয়ের জন্য যাহা বলিবার নয়, এমন সব দিব্যও করিল। কিন্তু তারাসুন্দরী কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। মনে মনে বিজ্ বিজ্ করিতে করিতে অগত্যা অমূল্য চুপ করিয়া রহিল। সে এত যে দুরন্ত, তার উপদ্রবে বিব্রত হইয়া পাড়ার সকলে তাহার বিশ্ববিজয়ী নাম দিয়াছিল, পিতাকে তিলমাত্র ভয় করিত না, কিন্তু মার একটু উঁচু কথায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িত। তাহাকে সেইখানে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমা দুই একবার সেখান দিয়া আনাগোনা করিল—যেন কত কাজেই ব্যস্ত। একটিবারও দাঁড়াইল না। টীপি টীপি হাসিয়া চলিয়া গেল। সে জানিত, সন্ধ্যার সময় কাজ ফেলিয়া অমূল্যকে তো পাহারা দিতে পারিবে না, তাই কৌশল করিয়া তাহাকে তারাসুন্দরীর নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া দিল।

তার পর, রাত্রি অধিক হইল, আহারাদি করিয়া অমূল্য গিয়া আপনার ঘরে শয়ন করিল। এতটা সময় অনর্থক নষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়া তাহার অক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। বিছানায় শুইয়া সুযোগপ্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে শুইলে ক্ষেমা টীপি টীপি গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিল, তখনও অমূল্য বিছানায় পড়িয়া উপি খুপি করিতেছে। তখন আর কিছু না পাইয়া ব্রাহ্মণঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিল, "বামনদিদি, একটা রূপকথা বল না ভাই।"

বামনদিদি রূপকথা বলিতে বড় ভাল বাসিতেন। যাহাকে পাইতেন, তাহাকে ধরিয়া রূপকথা শুনান তাঁহার একটা রোগ ছিল। যে চুপ করিয়া তাঁহার সেই গল্প শুনিত, আর মাঝে মাঝে সায় দিত, তাহার উপর তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার মাথায় যত চুল তাহার তত বৎসর পরমায়ু হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। যে দিন কোন নূতন ব্যঞ্জন হইত, সে দিন তাহা বেশি করিয়া পাইবার লোভে মাঝে মাঝে অনেকে তাঁহার গল্প শুনিতে ইচ্ছা করিত। বামনদিদি সেদিন বাবুর বাটী হইতেও তরকারি চুরি করিয়া তাহার পাতে বেশি করিয়া দিতেন। ক্ষেমা বড় একটা তাহার দুয়ারে রাখিত না, সে আপনার গরবেই আপনি থাকিত। আজ সে যাচিয়া আসিয়া রূপকথা শুনিতে চাহিতেছে, বামনদিদি একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আহা, দিদি, রূপকথা শুন্‌বে, তা ব'সো। কোন্‌টা ব'ল্‌ব? সেই তালপত্রের খাঁড়া, সেই ব্যাংঘমা ব্যাংঘমী, না সেই দো সো দুই রাণীর গল্প—কোন্‌টা শুন্‌বে?"

ক্ষেমা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা, আজ আমি ঐ তিনটাই শুন্‌ব; ঐ বারাণ্ডায় গিয়া শুই।" অমূল্যের ঘরের সামনা সামনি যে বারাণ্ডা, সে গিয়া তথায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল।

ব্রাহ্মণঠাকুরাণী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে তিনটী গল্পই বলা হইল। প্রত্যেক গল্প শেষ হইবার পর সেই "আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো" বলিয়া তাহার উপসংহার করিলেন। তাহা সাঙ্গ হইলে, ক্ষেমা একবার মাথা উঁচু করিয়া অমূল্যের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন অমূল্য একটা জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল। ক্ষেমা বলিল, "দিদি, তোমার কি পুঁজি পাটা সব ফুরুলো?"

কি! ক্ষেমা এমন কথা বলে! বামনদিদি নাকি আজ ক্ষেমার উপর বড় সন্তুষ্ট, তাই কিছু বলিলেন না, অন্য লোক হইলে এখনই গালি পাড়িতে আরম্ভ করিতেন। তা, তিনি বলিলেন—"না, দিদি, তুমি কত শুন্‌বে? সে এমন সাত দিন সাত রাত ধরে বল্লেও ফুরায় না। তা, সেই সোনার কাটী রূপোর কাটীর কথাটা বল্‌ব?"

ক্ষেমা বলিল, "বল না, দিদি, তোমার পায়ে পড়ি; তোমার মুখে গল্প বড় ভাল শুনায়।"

"এক যে রাজা" বলিয়া বামনদিদি পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন। তখন

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, চন্দ্র আকাশের পশ্চিমে ঢলিয়া আসিয়াছিল—বুড়া মানুষ—বকিয়া বকিয়া বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, বিশেষ ঘুমেও চোখ দুটা জড়াইয়া আসিতেছিল, বলিতে বলিতে সে ঢুলিতে লাগিল। বুড়ী যেই চুপ করিয়া ঢুলিতে থাকে, ক্ষেমা অমনি বলিয়া উঠে, "ও দিদি, ঘুমুলে?" সে আবার ধড়মড়ি মাথা তুলিয়া গল্প আরম্ভ করে। শেষ, বামনদিদি বড়ই জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বাবা, রূপকথা বলা কি ঝক্‌মারি! আর যেন তাঁর জ্ঞাতাসূত্রে যে যেখানে আছে, কেহ কখন কাহারও কাছে রূপকথা বলিতে না যায়।" যাহা হউক, এক রকম করিয়া তিনি গল্পটা তো শেষ করিলেন। ক্ষেমা দেখিল, বুড়া মানুষকে আর কষ্ট দেওয়া ভাল হয় না। বলিল, "দিদি, তবে এস আজ ঘুমুই, কাল তখন আবার আর একটা রূপকথা শুনব।"

বামনদিদি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন—"তাই ভাল দিদি, তাই ভাল। আজ এস ঘুমুই—কাল তখন সেই চোর চৌধুরীর গল্পটা বলিব।"

ক্ষেমা মনে মনে বলিল, চোর চৌধুরীর গল্প কাল তোমার কাছে শুনিব কি, আজই আমি তারে ধরিব। ক্ষেমা কি ভাবিল। তার পর চাহিয়া দেখিল ব্রাহ্মণঠাকুরাণী নিদ্রাগতা। সেও আর সাড়া শব্দ না করিয়া চুপ করিয়া মড়ার মারিয়া পড়িয়া রহিল।

অমূল্য এতক্ষণ জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে সেই মাগী দুটার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতেছিল, এখন দেখিল—এই সুসময়, আর অপেক্ষা করিলে কি জানি আবার কেহ যদি জাগিয়া উঠে। আর কালবিলম্ব না করিয়া, একখানা অস্ত্র লইয়া একেবারে তেতালার উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেমাও সেই দণ্ডে উঠিয়া আড়াল হইতে তাহার পিছু লইল। তার পর যাহা যাহা ঘটিল, নিঃশব্দে সে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিল। অমূল্য নামিবার পূর্ব্বেই ক্ষেমা আসিয়া আপনার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তখনও তার গায়ে কাঁটা দিয়াছিল, তখনও তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, তখনও তার হাঁপানি থামে নাই। বামনদিদি সেই নিশ্বাসের শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষেমার রকম সকম দেখিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে—অমন করিয়া হাঁপাইতেছ কেন?"

ক্ষেমা বামনদিদির মুখে হাত চাপা দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ কর দিদি—ভূত!" ক্ষেমা জানিত, বুড়ীর ভূতের ভয় অত্যন্ত। সে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—রাম রাম দুগ্গা দুগ্গা—কৈ কোথায়"?

এই সময়ে চোঁ করিয়া অমূল্য সিড়ি দিয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেমা কিছু না বলিয়া, অঙ্গুলি বাড়াইয়া তাহা দেখাইয়া দিল। বামন-দিদি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রাম রাম করিতে করিতে ক্ষেমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। সারা রাত্রি উভয়ের আর নিদ্রা হইল না। এক জনের নিদ্রা হইল না ভয়ে; আর এক জনের নিদ্রা হইল না—ভাবনায়।

প্রভাতে, বামনদিদি সেই তালগাছের মত লম্বা, বাঁকা বাঁকা পা, খোনা খোনা কথা—ইত্যাদি নানা রকম ব্যাখ্যা করিয়া সকলের নিকট রাত্রিদৃষ্ট সেই ভূতের গল্প করিলেন। শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষেমাও তাহাতেই সায় দিল। আসল কথা কিছু ভাঙ্গিল না। তবে সেই যে সে দিন তারাসুন্দরী সিন্দুক হইতে পূজার থালা বাহির করিতে গিয়াছিলেন, সে কেবল ক্ষেমার জন্য। বাহিরে অন্য থালা যে ছিল না, তাহা নহে। তবে ক্ষেমা সে গুলা কোথা লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা, কাণ্ডটা কি হইয়া গিয়াছে, তারাসুন্দরী তাহা জানিতে পারেন। তার পর, যখন শুনিল, অমূল্য স্পষ্ট বলিল—এ চুরি নিশ্চয়ই ভুবন করিয়াছে, তখন সেও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যাহা হউক, তবু আসল কথাটা ভাঙ্গিল না। মনে করিল, তবু যদি অমূল্য তাহাকে ভাল কথা কয়, হাসিয়া দুটা মিষ্ট আলাপ করে, তাহা হইলে এ কথা সে কখন কাহাকেও বলিবে না। কিন্তু সে যে তার দুরাশা মাত্র, তাহা বুঝিতে আর অধিক দিন বিলম্ব রহিল না।

আজ দেখিল, অমূল্য সেই যে আহারান্তে বাড়ীর বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও তখন ফিরিল না। তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইলেন; ব্যস্ততা বুঝি তার চেয়ে ক্ষেমার অধিক হইল। সন্ধ্যা গিয়া রাত্রি হইল, তবু অমূল্য আসিল না। প্রহর গিয়া দুই প্রহর হইতে যায়, অমূল্য আসিল না। হরিহর এক বার খোঁজ লইলেন—অমূল্য কোথায়? তারাসুন্দরী কি করেন, বলিলেন, "তার কোথায় আজ নিমন্ত্রণ আছে।" তারাসুন্দরী ঐ কথা বলিয়া স্বামীকে বুঝাইলেন বটে, কিন্তু নিজের মন কিছুতেই বুঝিতেছিল না। বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পথ চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত, ক্ষেমা, গেল কোথায়?"

ক্ষেমা মনে মনে বলিল—"যমের বাড়ী।"

তা, সত্য সত্য যমের বাড়ী গেলে ক্ষেমা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত বটে, কিন্তু আজ আর তার মন কিছুতেই স্থির হইতেছিল না। সে বলিল, "তা

মা, আজ তো আর এত রাত্রে সন্ধান পাইব না। ভোর না হইতেই আমি তাহাকে ধরিয়া আনিব।"

তারাসুন্দরী কাজেই কি করেন, হরিহর শুনিলে আবার বড়ই চেঁচামেচি করিবেন, এই ভাবিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত না হইতে ক্ষেমা অমূল্যকে খুঁজিতে বাহির হইল।

সে তাহাদের আড্ডা জানিত, একেবারে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। গয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুঃস্থির হইল। অমূল্য যে এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না। বিকট দুর্গন্ধ বশতঃ নাকে কাপড় দিয়া, সে কোথায় অমূল্য পড়িয়া আছে, তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করিল। সেজের আলোর তৈল ফুরাইয়া গিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে চট্ চট্ শব্দ করিয়া আলো নিবিয়া গেল। অন্ধকারে এক জনের গায়ে পা বাধিয়া ক্ষেমা সেই মদ ও হুঙ্কারপ্রবাহিত মেজের উপর পড়িয়া গেল।

কবিকাহিনী।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কি গত চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? ধর্ম্মবিশ্বাসে, আচার ব্যবহারে, বসন ভূষণে, ভোজন পানে, আমোদ-উৎসবে, পূজা পার্ব্বণে, দান ধ্যানে, গৃহদ্বারে, ব্যায়াম অধ্যবনে, ক্রীড়া কৌতুকে? পরিবর্ত্তন ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, বিচার করিবার আর। শুরুতা নাই। মহাজনক্ষুণ্ণ পথে আমরা চলিতেছি, না নূতন পথে আসিয়া পড়িয়াছি?

টাকায় আট মণ চাউল, এক মণ দাইল, দশ সের তৈল ও পাঁচ সের ঘি, এখন বাঙ্গালার আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। পাঁচ শত বৎসরে বাঙ্গালার জন সংখ্যা অন্ততঃ দশ গুণ বাড়িয়াছে। এক দিকে দ্রব্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অন্য দিকে অভাব বাড়িয়াছে। জীবনসংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে, স্বাস্থ্য কমিতেছে। অল্প সময়ে অনেক আয় এখন সকলের লক্ষ্য হইয়াছে। আমোদ প্রমোদে অধিক সময় এখন আর দেওয়া যায় না। এজন্য

আমোদ উৎসবের পরিমাণ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অল্প সময়ে অধিক আমোদ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য মাদকতা প্রভৃতি দোষের দেশে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দানধ্যানে আর তত ব্যয় বা সময় ক্ষেপণ করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশীর সহিত এখন বন্ধুত্ব প্রীতি কমিয়া আসিয়াছে, পূজা পার্ব্বণ জলে জলে সারিতে হইতেছে।

অন্য দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত করিয়াছে। ধর্ম্মবিশ্বাসে আর তেমন সরলতা নাই, বৃদ্ধ ও গুরুজনে ভক্তি নাই, গ্রামে প্রধান নাই, গৃহে প্রধান নাই, স্বেচ্ছাচার ও স্বতন্ত্রতাব বৃদ্ধি হইয়াছে। দুষ্য কর্ম্ম করিতে এখন আর তত শঙ্কা হয় না, গ্রামেব নিন্দায় তত ক্ষতি হয় না, গ্রামে দশ জনের এক জন হইতে এখন আর তত ইচ্ছা নাই। বসন ভূষণে রুচি পবিবর্ত্তিত হইয়াছে, আহার-বিহাবে রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সামাজিক গল্পে রাজনীতি ও সাহিত্য প্রবেশ করিয়াছে, সাঁওতালের কুটীরে ছাতা, জুতা ও হেরিকেন ল্যাম্প প্রবেশ করিয়াছে, ব্যবসায় প্রবৃত্তি বাড়িতেছে, ব্যবসায়ীব প্রকৃতি বাড়িয়াছে, জামা-মোজা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, যবনিকার ভিতরেও প্রবেশ করিতেছে। কবিরাজের স্থানে ডাক্তার, ব্যায়ামের স্থানে ব্যসন, চৌকীর স্থানে চেয়ার, এখন অনেক গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংবাজী শিক্ষা প্রবেশ করে নাই, এমনও অনেক স্থান আছে। সেখানে এখনও সকলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কৃষিকার্য্য করে, সামান্য শাকান্নে তৃপ্তি বোধ কবে, পাঁচী ধুতিতে আনন্দ পায়, থালি পায় বেড়াইতে লজ্জা পায় না, ধন জন ধান্য গাভীতে গৃহ পূর্ণ, আনন্দ উৎসবে গ্রাম পূর্ণ, একের কথায় দশে দৌড়ায়, সকলে একপ্রাণ। দবিদ্রের কুটীরে অভাগিনীর সন্ধান লইতে গ্রামের প্রধান পবাঙ্মুখ নহেন, পরোপকার, অতিথিসৎকার এখনও পূর্ব্বের মত কতক রহিয়াছে। যুবকেরা পতিত হয় নাই, উচ্ছৃঙ্খলও নহে। ইংরাজীর সঙ্গে হাফ্ মোজা, কামিজ, সিঁথি ও ব্যভিচার এখনও সেখানে প্রবেশ কবে নাই।

বাঙ্গালাব হিন্দুসমাজেব অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কবিগণের নিকট অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যাব। কবিগণেব বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকে, তাঁহাবা হয ত আপনাদেব অপেক্ষা প্রাচীনতর সমাজের বর্ণনা করেন। ইহার মধ্যে বিচক্ষণতার সহিত সংগ্রহ করিতে পারিলে, বাঙ্গালী হিন্দুব সমাজ-প্রকৃতি কবিমুখে সংগ্রহ করা যাইতে পাবে।

গুণরাজ খাঁর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অর্দ্ধবাঙ্গালা বা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী, তাঁহার নিকট বাঙ্গালী সমাজের ইতিবৃত্ত পাইবার আশা করা যায় না। চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ দুজনের পরে গুণরাম খাঁ বাঙ্গালার তৃতীয় বিখ্যাত কবি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নামক এক গ্রন্থ লিখেন। বাবু রাধিকানাথ দত্ত এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন।

গুণরাজ খাঁ আপনার গ্রন্থের ও নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ;—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। গৌড়েশ্বর দিননাথ গুণরাজ খাঁন॥
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥ কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
গুণ নাই অধম মুই নাই কোন জ্ঞান। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥

দিল্লীতে লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্বকালে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় সম্পূর্ণ হয়। গুণরাজ খাঁর প্রকৃত নাম মালাধর বসু। আদিশূর আনীত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পর্য্যায় মালাধর। কুলীন গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুলীন গ্রামের বসুরা চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় ছিল। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করিয়া থাকিবেন।

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোর লৈয়া॥ তাহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

মালাধর বসুর পিতার নাম ভগীরথ বসু, মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী। মায়ের নামটা কিছু বেঢো রকমের হইল। মালাধরের ভাষাও রাঢ়দেশীয় কথায় পূর্ণ। এখন তাহা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয়।

নথুরা পুরে সে কৃষ্ণ বজক মারিল। যতেক গোকুল নারী, কৌতুকে ঢামালি করি,
মালাকারে বর দিয়া কুব্জ সহ কৈল॥ ক্রীড়া করে যশোদার পাশে।
শুনিয়া ত কংস রাজা চমকিত মনে। তাঁহার বোলে আই নড়ি তোমার সদনে,
নারদ কহন্তি কথা শুনে নিজ কাণে॥ তাঁহার পুত্রের করিব নাস করণে॥
তথা চিয়াইয়া যশোদা পুত্র দেখি পাশে। ধাইয়া যশোদা যায় আউদড় চুলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উঠিল আকাশে॥ ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবালে॥
বিপরীত বাকাড়ে বাক্ষসী দারুণী। ডাক শুনি গোবিন্দাই ধান্য নিয়া করে।
এড এড স্তন মোর বাঁচাও পরাণী॥ বড় দিয়া যায় কৃষ্ণ বল আনিবারে॥
বড় দীঘির আড়া যেন হাত পা সারি। চলিয়া ত দেবগণ যার যেই স্থান।
উদর দেখিয়ে যেন শুপান পোখরি॥ বক মারি ঘরে আইল নন্দের পোরান॥

মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁনের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় শ্রীমদ্ভাগবত দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। গুণরাজ স্বয়ং বলিয়াছেন—

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে। লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি রচিয়া॥
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহা সুখে॥ ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাই।
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। তে কারণে ভাগবত গীতছন্দে গাই॥

মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যেরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, মালাধর সংস্কৃত জানিতেন, এবং কেবল কথকের মুখে শুনিয়া নহে, স্বয়ং মূল গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করিয়াছিলেন; এজন্য আমাদের অভিপ্রেত বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে মালাধরের গ্রন্থ হইতে বিশেষ কোন সম্বাদ পাওয়া যায় না। আমরা কেবল এইটুকু জানিতে পারি যে, চৈতন্যের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব্বে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তখন ভক্ত প্রাচীনগণ কথকের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে আনন্দলাভ করিতেন। তখন লক্ষ্মী-সরস্বতী গণপতি ও দুর্গা পূজা বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমান ও হিন্দুতে সদ্ভাব ছিল। গৌড়ের মুসলমান নবাব হিন্দু মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুনিয়া তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

অনুবাদ হইলেও মালাধরের গ্রন্থে সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের গোপালরূপ শত্রুনিপাতন ও রাজত্বলাভবর্ণনায় গ্রন্থখানি পূর্ণ হইয়াছে। গোপালের বর্ণনা পাঠ করিলে বীরভূমের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে রাখাল বালকের গরু চরান, দৃষ্টিপটে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়।

এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত ধড়ি। কেহ শিকায় কেহ চুপড়ি কেহ নিল কোলে॥
উভু করি চূড়া বান্ধেন দিয়া ছাঁদন দড়ি॥ কোথায় মর্কট শিশু লাফ দেই বন্দে।
শিকা করি ভাত নিল সকল ছাওয়ালে। তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
বৎস রাখি ভাত খায় যমুনার কূলে॥ চিত্র বিচিত্র গতি নবুরে নৃত্য করে।
নড়িলাত কানাঞি সব ছাওয়াল লইয়া। তাঁহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥
নিজ নিজ বাছুর সনে গেল চালাইয়া॥ কতি ছোঁ কোকিল পাখী সুস্বাদ নাদ পুরে।
ছাওয়াল সব বলে ক্ষুধা পাইল আমারে। তাহার সঙ্গে বাকাড়ে রাম দামোদরে॥
শিকা মুকাইয়া ভাত খায় যমুনার তীরে॥ কতি হোঁ পঙ্গগণ আকাশে উড়িয়া।
সকল শিকার ভাত এক এক করিয়া। তার ছায়া সঙ্গে বুলে দু ভাই বিবিয়া॥
সবাকারে ভাত কৃষ্ণ দিলেন বাঁটিয়া॥ কোথায় বুলে ফুল তুলিয়া মুরারি।
কেহ হাতে কেহ পাতে কেহ ফলদানে। কত গলে কত বাণে কত সাপে পরি॥

মালাধর বসুর পরে শত বৎসর মধ্যে বঙ্গের দ্বিতীয় বিখ্যাত কবির গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি এক জন বাঙ্গালীর জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সুতরাং মালাধরের গ্রন্থে আমরা যে অভাব লক্ষ্য করিয়াছি, এই নূতন কবির গ্রন্থে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাঝের এক শত বৎসরের পরিচয় দিবার কেহ নাই, অথচ বাঙ্গালী সমাজে এই সময়ে যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

এই কবি, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। ইনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান হয়। বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত সেমুড় গ্রামে, ইহার স্থাপিত মন্দির ও বিগ্রহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহা বৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীপাঠ নামে বিখ্যাত।

বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যপার্ষদ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর গর্ভজাত। বৈষ্ণবেরা বলেন, ইনি কাহারও ঔরসজাত নহেন। ইনি প্রাচীন ব্যাস ঋষি—গৌরাঙ্গ অবতারে চৈতন্যভাগবত লিখিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

নারায়ণী দেবী গোবিন্দ মহাপ্রভুর চর্ব্বিতচর্ব্বণ পান আহার করিয়াছিলেন, ইহাতেই নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনের আবির্ভাব হয়। বোধ হয়, নবদ্বীপে বৃন্দাবনের জন্ম হইয়াছিল।

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে, খেতুরীতে নরোত্তম দাস ঠাকুর মহামহোৎসব করেন। বঙ্গের বৈষ্ণব ইতিহাসে ইহা একটি বিখ্যাত ঘটনা। খেতুরীর মহোৎসবে বৃন্দাবন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর। শ্রীলোচন জ্ঞানদাস মনোহর॥

—ভক্তিরত্নাকর।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব হয়।

চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান।

—চরিতামৃত।

তিরোভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমবাসী হইয়াছিলেন। এজন্য বৃন্দাবনের ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্যের তিরোভাব হইলেও, বৃন্দাবনের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হয় নাই। কিন্তু নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বৃন্দাবনে এ সাক্ষাৎকার ঘটে। নিত্যানন্দের আদেশক্রমে

বৃন্দাবন চৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দবংশমালা নামক গ্রন্থ চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টরূপে বৃন্দাবন রচনা করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের প্রথম শিষ্যগণের এক জন এবং নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রতিবাসী। তিনি চৈতন্যের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এক কড়চা লিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবন সেই কড়চা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যভাগবত রচনা করেন।

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত কবিলা গ্রথিত॥

চৈতন্যভাগবত লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে, ইহার এত গৌরব হইয়াছিল যে, বৃন্দাবনে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ইহা নিত্য বিকালে পাঠ করা হইত। কিন্তু চৈতন্যের শেষ লীলা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। মহাপ্রভুর নীলাচল বাস সময়ে স্বরূপ দামোদর সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং চৈতন্যভাগবত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা অবলম্বন করিয়া, চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়।

প্রভুর মধ্যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর। এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
সূত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ বর্ণনা করেন বৈষ্ণব নাম যে করিয়া॥

শুনা যায়, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গল নামে আপনার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে, ত্রিলোচন দাস নামে আর এক জন বৈষ্ণব কবি চৈতন্যমঙ্গল নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আপন ইষ্টদেবের নিকট ত্রিলোচন নিজ গ্রন্থ দেখাইলে, ইষ্টদেব তাঁহাকে বলেন যে, বৃন্দাবন দাসের পুস্তকের নাম আপন পুস্তকের নামকরণ করাতে তিনি বৃন্দাবনের নিকট মহা অপরাধ করিয়াছেন। যত দিন এ অপরাধের প্রতিবিধান না হয়, তত দিন ইষ্টদেব ত্রিলোচনের মুখদর্শন করিবেন না, এবং তাঁহাকে গ্রন্থ প্রকাশে অনুমতি দিবেন না। তখনও বৃন্দাবন দাস জীবিত ছিলেন। ত্রিলোচন তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, বৃন্দাবন আপন গ্রন্থের নাম চৈতন্যভাগবত রাখিয়া, ত্রিলোচনকে চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল। বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল॥
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল॥ চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন॥
সূত্র করি সব লীলা কবিল গ্রথন। আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
পাছে বিস্তারিবে তাহা কৈল বিবরণ॥ শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। সোরে আগ দিল যবে করুণা করিয়া।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥ তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পরে প্রায় শত বৎসর গত হইয়াছে। এই সময়ে বঙ্গে পাঠানেরা অব্যাহত স্বাধীন রাজত্ব ভোগ করিতেছিল। মুসলমান কাজী নবদ্বীপে শাসনকর্ত্তা। তান্ত্রিকভাব যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পঞ্চ-মকার-সাধন ও শক্তি-সেবা, দুর্গা, চণ্ডী ও বিষহরি পূজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত এবং বিষহরি ও রামায়ণের গান, বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালী, সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসী বিদ্যার অধিক চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান শব্দ অল্পে অল্পে মিশ্রিত হইতেছিল, রাঢ়-দেশীয় কথা ক্রমে কম পড়িতেছিল, নবদ্বীপের ভাষার অধিকতর প্রচার হইতেছিল। বাঙ্গালা ছন্দে মিত্রাক্ষরতা পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা শেষ শব্দের মিলনে কিছু উন্নতি হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শব্দমিলনে কিছু বিচিত্রতা লক্ষিত হয়। চৈতন্যভাগবতে সেরূপ মিলন লক্ষিত হইলেও, পরিমাণে যেন কিছু অল্পতা হইয়াছিল, বোধ হয়। পূর্ব্বে কেবল শেষ বর্ণের মিল হইলেই পদ্য হইত, শেষ বর্ণের পূর্ব্ব স্বরের মিল রাখা আবশ্যক হইত না। নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলিতে পাঠক আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় :—

বদরিকাশ্রমে তপ করিল বিস্তর। কেশী অরিষ্ট ব্যোম অসুর মারিল
মহিমা লইল যাঁর সকল সংসার। ১। অক্রূর গোকুল আসি রাম কৃষ্ণ লৈল। ৪।
শৃগালীর রূপে আগে দেবী মহামায়া জরাসন্ধ মহারাজা মরিল যেন মতে
যলাছত্র পরিয়া বাসুকি পাছে যায়। ২। রাজসূয়ে শিশুপাল মারিল জগন্নাথে। ৫।
কাত্যায়নী মহোৎসব বৃন্দাবনে কৈল মায়ের ছয় পুত্র অসিল যেমনে
শঙ্খচূড় মারি কৃষ্ণ গোকুল রাখিল। ৩। বলির সুভদ্রাকে হরিল অর্জ্জুনে। ৬।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৌতুক করিয়া এক দিন লিখিয়াছিলেন,—

বড় তৃষ্ণায় চাহিলাম এক ঘটী জল। খানিক পরে এনে দিল এক খণ্ড বেল।

একরূপ উদাহরণ বঙ্গের প্রাচীন কবিতায় সুলভ।

নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে দেখিয়া দৈবকী মনে হইল কৌতুক।
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যে মতে। নারদে কহিল যত মিথ্যা কিছু নহে।
কংস আদি মহাসুরে, পৃথিবীর গুরুভারে কি মতে ভাল হয় চিন্তহ উপায়।
কম্পবান দেবী বসুমতী, তবে ত দৈবকী দেবী যোড় হাত করি,
নারির সহিতে ভার, যাই আসি রসাতল একমনে চিন্তেতে গোবিন্দে স্তুতি করি।
শুন শুন দেব প্রজাপতি। হেন সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস,
তবে বসুদেব গেল নিয়া নিজ সুত, যোগনিদ্রায় ভগবতী হইলা সাত মাস।

শুন শুন চানুর মুষ্টিক মহাশয়,
কেশী ধেনুক শুন বক মহাশয়।
যমুনার জলে বস্ত্র অলঙ্কার এড়ি,
বিবস্ত্র করিয়া স্নান পূজি দেবী চণ্ডী।

চৈতন্যভাগবত।

অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে
গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখি। ১
চৈতন্য চন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র
ভক্তপ্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত। ২
আদি খণ্ডে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকা
গৃহ মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা। ৩
মধ্য খণ্ডে বিদিত হইল গৌরসিংহ
চলিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ। ৪
মধ্য খণ্ডে ষড়ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ
মধ্য খণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্বরূপ। ৫
মধ্য খণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক
অন্ত জনে বুঝে যেন কলহ স্বরূপ। ৬
ঈশ্বর আজ্ঞার আগে শ্রীঅনন্তধাম
বাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম। ৭
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইলা বিরক্তি
শেষবেই সকল শাস্ত্রেতে হইলা স্ফূর্ত্তি। ৮
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবেক কার
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়। ৯
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে বসে
কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে। ১০
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে। ১১
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম। ১২
কোন দিন কবে গোবর্দ্ধনধারণ লীলা
বৃন্দাবন বচি কোন দিন কবে খেলা। ১৩
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে
ফলমূল দিয়া হনুমানেরে আশ্বাসে। ১৪
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভণ্ড জ্ঞানী
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি। ১৫
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাঞি
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি। ১৬
কেহ বলে আমার ঘরের যত ভাত
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমার। ১৭
কামদেব উপমা দিব সে ইহা নহে
তিহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়। ১৮
কবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ
অতএব হৈল মোর প্রতিভা সঙ্কোচ। ১৯
চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ উড়য়ে পতাকা
কদলী ফবরী বান্ধিলেন আম্রপাতা। ২০
লক্ষ্মী নারায়ণের মঙ্গল দৃষ্টিপাতে
সুনবয় সর্ব্ব লোক হৈল নবদ্বীপে। ২১
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ
অধ্যাপক শিরোমণি রূপে করে বাস। ২২
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ
তণ্ডুল কাপাস ধান্য লোল বড়ি মুদ্গ। ২৩

কারকব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ও চৈতন্যভাগবতে যে প্রাচীনত্ব লক্ষিত হয়, এখানে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। এ সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণবিজয় অপেক্ষা চৈতন্যভাগবত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। মাধা ধর বসু রাঢ়দেশীয় লোক, বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপবাসী। তখন বীরভূম ও বর্দ্ধমান হইতে নবদ্বীপ এখনকার অপেক্ষা দুরধিগম্য ছিল। স্থানভেদে এইরূপ ভাষাভেদ ঘটিয়াছিল কি না, বলা যায় না। তথাপি দুই খানি গ্রন্থ এক সময়ে

পড়িলে বোধ হয়, চৈতন্যভাগবতের ভাষা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষা অপেক্ষা অধিক মার্জ্জিত, অধিক উন্নত, অধিক পরিমাণে গ্রাম্যতাদোষশূন্য। যে অশ্লীলতা পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি কলুষিত করিয়াছিল, এ দুখানি গ্রন্থে তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ভক্তের রচিত ভক্ত বা বীরচরিতে অশ্লীলতা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। ছন্দ রক্ষা করিবার জন্য কারকাদি সম্বন্ধে পদ্যে অনেক সময় অঘটন ঘটাইতে হয়। এজন্য পদ্য দেখিয়া তখনকার কারকরূপ যথার্থ নির্ণয় করা যায় না। সেই সময়ের গদ্য কোন পুস্তক নাই। কয়েকখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে গুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বোধ হয়, তখন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায়, ফারসীনবীসেরা ফারসীতে, এবং সাধারণ লোকে বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিত। কিন্তু সেরূপ পত্র এক খানিও পাওয়া যায় নাই।

কহিব সকল কথা অদ্ভুত কথন,
সূর্য্যগ্রহে প্রভাসিকে করিল গমন।
নারদে কহিল যত মিথ্যা কিছু নহে,
কি মতে ভাল হয় চিন্তহ উপায়।
দেখিয়া পলায় ত্রাসে সকল নগরে,
খানি খানি করি কাট পুরিল তাহারে।
নলকুবের দুহে চলহ যায় ধরে,
আমার প্রসাদে গতি থাকিব তোমারে।
এত মায়া কেন গোসাঞী পাতহ আমায়,
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নিমেষকে হয়।
আজি হোঁ প্রভাত হৈল কালীকে দিন মণি
মস্তকে পাদপদ্ম দিলেন চক্রপাণি।
চলিতে থাকি আসিতে বড় দুঃখ পাই,
রক্ত অলক্তার দেহ সবে ঘর্ম্মে যাই।

পিবন্তি, করন্তি প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দ সকলের প্রয়োগ বিজয়ে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে ক্বচিৎ দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

চতুর্দ্দিগে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর,
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির। ১।
শুনিয়া ত কংসরাজা চমকিত মনে,
নারদ কহন্তি কথা শুনে নিজ কাণে।
কেমতে পুতনা মইল করন্তি রাখাল,
বসুদেব যত হৈল কিছু নহে আন।
হেন মতে হরিষে সবে করন্তি কাহিনী,
দিনমণি অস্তে গেল প্রবেশ রজনী।
প্রতি দিন আসি সবে যমুনার কূলে,
পূজন্তি পার্ব্বতী সবে যমুনার কূলে।
না ভাণ্ডিহ সত্য কহ পড়ই চরণে,
সপত্নীক ভাব কিছু না করিহ মনে।
ইন্দুমুখি সুমুখি বরবী চন্দ্রিকা,
বিলাসন্তি নিবসন্তি অঙ্গনা গোপীকা।

চৈতন্যভাগবতে ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি নানারূপ। এখনকার মত অনেক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য প্রকার শব্দও দেখা যায়। যথা গাস্তি, বেড়াস্ত, পাস্ত, ধাইমু, লঞা, বলিবন্তি, কিলাইমু, নাচিমু, পড়িবাস্ত, ডুবিঞাঙ দেখিলাঙ, পাইলাঙ, বুঝাবাঙ, চাঙ, পড়াইমু, যাঙ, চলিবাঙ, করিযাঙ, সুইবাঙ,

বিলাইমু, দিলু, করিমু, করৌ, মারিমু, দেও, নিমু, ফেলাইমু ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবন্তি, পিবন্তির মত শব্দ চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় না। কারকবাচক শব্দ, যথা—মুঞি, বামনিঞা, তান, তাহান, ইহান, উহান, মোহারে, মোহার, তুঞি, তাহানে, তানে, তোমাত, মোকে, উহাবি, ইহানে, তাঁন, তাঁহান, তাঁনে, তেঁহ, তছ, চৈতন্যভাগবতে যথেষ্ট আছে।

যতিপাত ও বর্ণসংখ্যা মালাধর বড় গণনা করিতেন না। শেষ অক্ষর কোন রকমে মিল করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার ছন্দোবন্ধন সম্পূর্ণ হইত। বৃন্দাবন দাস এ সম্বন্ধে মালাধরের শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

পদ্মজিতা লক্ষ্মী এ দুই ত সুন্দরী, দুচুকন্দ প্রদ্যুম্নে মুগ্ধ হইল যেন মনে,
বৃথ বান্ধি মৎস্য বিন্ধি বিভা কৈল হরি। রুক্মীদন্ত বক্রের বলি নিধনে। ৩।
নরক রাজা মারি বিভা কৈল গদাধরে, এত বলি ব্রহ্মাদি দেব প্রণামস্তুতি,
ষোল সহস্র একশত কন্যা বিভা একবারে। ১। চলি গেলা দেবগণ যার যেই পুরী। ৪।
যেন মতে নৃগ রাজার শাপ বিমোচন, হাসিয়া ত হাই তুলে শ্রীমধুসূদন,
বলের বিক্রমে দুর্য্যোধনের কন্যার হরণ। ২। তাহার উদরে দেখে যশোদা সকল ভুবন। ৫।

চৈতন্যভাগবত।

ধান্য পুথি খৈ কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত, সর্ব্ব বিষ্ণু অনন্ত ভক্তি সত্য সংসারে। ৪।
ধরিবার নিমিত্ত কৈলা উপনীত। ১। কোন দিন থাকি কোন বালকের আড়ে,
পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলে শিশু ভাবে, পাতায় আসিয়া তান পরাণ যেন ডরে। ৫।
যোগনিদ্রা প্রভাবে কেহ নাহি জানে। ২। রাজপণ্ডিতের বড় ইচ্ছা থাকে তান,
এ মত উদ্ধত গৌর সুন্দর যখনে, আমার পুত্রেরে করুন কন্যাদান। ৬।
এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘিতা যখনে। ৩। জিহ্বা পাইয়া ও নর সর্ব্বপ্রাণী,
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে, না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি। ৭।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অপভাষার ব্যবহার সামান্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

দেবযজ্ঞ কথা কহিব ভালমতে। কেন হেন বিধি মোর লিখিলা কপালে॥
সাধি সাধি ভৃগু বুকে পরীক্ষা লইতে॥ জুয়াচুরী করিয়া কান্দিল কন্যাখানি।
কাল কাল মর মর বলে নরপতি। চিয়াইল প্রহরী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি॥
ভালমতে রাখিহ সবে করিয়া শকতি॥ তবে আসি কংসরাজা বসুদেবে আনি।
ভয় নাই ভয় নাই আকাশেতে শুনি। বন্দি ছোড়ান কবি কেল প্রিয় বাণী॥
ভূগুপদী পারহ দেখ এক হাটু পানি॥ কোথাই না দেখে দশ দিবসের ছাওয়াল।
আস্তে ব্যস্তে বসুদেব হাতাড়িয়া বুলে। আচম্বিতে গেলা নন্দ ঘোষের দুয়ার।

বড় দীঘির আড়া যেন হাত পা সাবি। পানাইল তন মোর ঝটি খাও আসি।
উদর দেখিয়ে যেন শুখান গোখরি॥ তোমার বিলম্বে নন্দ আছেন উপবাসী॥

চৈতন্যভাগবতেও অপভাষা আছে। কিন্তু তত অধিক নাই। কিন্তু অনেকগুলি শব্দ অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—

বিজয়—মৃত্যু, যাত্রা, অধিকার।

আদি খণ্ডে পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়। পুঁড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা পরিণয়॥ আত্মপ্রকাশের আসি হইল সময়।
প্রতি দিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তির বিজয়।

উড়িষ্যা ভাষায় বিজয় শব্দ শুভযাত্রা, শুভাগমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্মানীয়কে আহার করিতে "বিজে করিবা হেবে" বলিয়া অদ্যাপি সম্ভাষণ করা হয়। জগন্নাথের মন্দিরে ক্ষোদিত লিপিতে লেখা আছে, "বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর প্রতাপ কপিলেশ্বর দেব মহারাজাঙ্কুর বিজে রাজ্যে সমস্ত ১৯ক গ্রাহী মের অগারে রবিবারে মলিকা পরিসাদিতা বিজে করি বাহুড়া কট কাই শ্রীপুরুষোত্তম কটকে বীর মোনোই বিজে সময়ে" ইত্যাদি। এখানে বিজয় রাজ্য=জয়যুক্ত রাজ্য, বিজয় করি=জয় করিয়া, বিজে সময়ে=অবস্থান বা ভোজনসময়ে—তিনটি ভিন্ন অর্থে তিন বার বিজয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদিত—প্রচারিত।

মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌরসিংহ। চলিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥

কৌতুক—তামাসা, আদর।

মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক। ভক্তাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে।
অন্য জনে বুঝে যেন কলহ স্বরূপ॥ হেন সে উদ্ধাও প্রভু করেন কৌতুকে॥
তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥

কক্ষা—সমকক্ষতা।

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকে ও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥

বিরক্তি—বিরক্তিযুক্ত, উদাসী।

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হৈলা বিরক্তি। শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
আজন্ম বিরক্তি সর্ব্বগুণের নিধান।

উপস্থান—উপস্থিতি।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান। তবে দিব্য দোলা করি বুদ্ধিমন্ত খান।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইলা উপস্থান॥ হরিষ আনিয়া করিলেন উপস্থান॥

আথে ব্যথে—আস্তে ব্যস্তে।

আথে ব্যথে সবে দেখি হাস হায় করে। শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥

লঙ্ঘিল—দংশন করিল।

কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল। কেহ বলে জাতি সর্প তেঁই না লঙ্ঘিল॥

পরিহার—এই শব্দটি ভিক্ষা, দীনতা প্রভৃতি কত অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা যায় না।

দৈবযোগে যদি কেহ পাবে ধরিবারে। সত্য বাক্য কহিবেক যদি পরিহার।
তবে তার পায় ধরি করি পরিহারে॥ তথাপি আতিথ্য পুণ্য না হয় তাহার।
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥
তবে লাথি মারি তার শিরের উপরে।

ভোল—বিস্ময়।

আমি আনিয়াছি কোন জনে নাহি বলে। অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে॥

উপপন্ন—প্রাপ্ত।

কদাচিত কোন দিবসে খাই অন্ন। সেই যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপপন্ন।

উপস্কার—প্রস্তুত করা, পরিষ্কার করা।

সন্তোষে সবাই হরি বলিতে লাগিল, রন্ধনের সামগ্রী আনিলা তৎক্ষণে।
স্নান উপস্কার সবে করিতে লাগিল। এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার,
যথে যথে স্থান উপস্কার সর্ব্ব জনে, রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার।

আবরিয়া—আটকাইয়া।

চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন। শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন।

সম্পতি—সৌভাগ্য।

নদীয়ার সম্পতি বা কে বলিতে পারে। অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে।

অপন্যায়—অন্যায় আচরণ।

শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব। তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।

করণ—কার্য্য।

শচী সংবোধিয়া সবে বলেন বচন। শুন ঠাকুরাণি নিজ পুত্রের করণ।

সর্জ্জ—আয়োজন। } বিষ্ণুপূজা সর্জ্জ যেন করে অপহার,
অপহার—নাশ। } বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার।

অব্যভার—মন্দ ব্যবহার।

সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার। না গেলে ও সব দোষ কহেন আমার।

অ উপসর্গ সচরাচর না অর্থে ব্যবহার হয়,—যেমন অবোধ। কিন্তু অতি শব্দের ভ্রংশে অ উৎপন্ন হয়। যেমন অঘোর, অকুপার।

বি—বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন বিরাগ। আবার বিশিষ্ট অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন বিনয়।

অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত। বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত।

রক্ষিতা—রক্ষয়িতা।

আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা। মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার।
কিবা চিত্ত তুমি যার মাতা পতিব্রতা।

সমীহিত—মর্ম্ম, ইচ্ছা।
গোষ্ঠী—দল।

ধরে সর্ব্ব শাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত,
গোষ্ঠী মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত।
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিদ
তার ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত।

চালায়—ব্যস্ত করে।

চালায় প্রভু কাঁকি জিজ্ঞাসিলে।

পোষণ—আহার।

প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ।

চিন্তিব—শিখিব।

চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।

ভিতে—দিকে।

প্রভু বলে কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে।

ঢোল—তামাসা।

আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার ন্যায়। তবে ঢোল কর কোন যুক্তি ইথে হয়।

গহল—ভিড়।

আর বার আসি মহা লোকের গহল।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বৈদিক প্রবন্ধ।

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

দীক্ষা হইতে পশুবলি পর্য্যন্ত ক্রিয়াতে ছয় দিবস অতিবাহিত হইলে, একাদশ সোমযাগের শেষ দিবস আসিয়া পৌঁছে; ইহার পারিভাষিক নাম সৌত্য-দিবস। কেন না, এই দিবসেই সবন—অর্থাৎ সোমরসপ্রস্তুতকরণ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই দিবসেই সোমরস দেবতাকে আহুতি দিয়া ঋত্বিক্ ও যজমানগণ পান করিতেন।

যে সোমযাগে একদিন মাত্র সবনক্রিয়া হয়, তাহার নাম "একাহ"; যাহাতে বার দিন ধরিয়া ঐ ক্রিয়া হয়, তাহার নাম "অহীনা"; আর যাহাতে সম্বৎসর বা ততোধিক কাল ব্যাপিয়া সবনক্রিয়া হয়, তাহার নাম "সত্র"।

একাহ সোমযাগের সপ্তম দিবসে প্রাতে যখন অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রস মেষলোমনির্ম্মিত দশাপবিত্র বা ছাঁকনীর মধ্য দিয়া কলসে ঢালিতেন, তদবস্থায় সোমের নাম পবমান সোম। পবমান, অর্থাৎ যাহা পূত বা ছাঁকা হইতেছে।

এই ক্রিয়াকালে উদ্গাতা নামক সামগায়ক ঋত্বিকেরা পবমান স্তোত্র নামক পবমান সোমের প্রশংসাসূচক সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন; এবং হোতা নামক ঋত্বিকেরা আজ্য-শাস্ত্র নামক মন্ত্র পাঠ করিতেন।

স্তোত্র ও শাস্ত্রের প্রভেদ এই যে, স্তোত্র প্রণীত মন্ত্র, শাস্ত্র অ-প্রণীত মন্ত্র।

সোমযাগে আনের জন্য মধুচ্ছন্দা একটি পবমান স্তোত্র রচনা করেন; তাহা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে তাহা এইরূপ হয়:—

১। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য লতা হইতে নিষ্পিষ্ট হইয়া স্বাদুতম ও মাদকতম ধারাতে তুমি পবমান হও।

২। রাক্ষসগণের হন্তা, বিশ্বসংসারের দ্রষ্টা সোমদেব, অধ্বর্য্যুগণের সুবর্ণ-সুষ্ঠুবীযশোভিত হস্ত দ্বারা পিষ্ট হইয়া অভিষবণ-দ্রবকের উপর নিষণ্ণ হইলেন।

৩। হে সোম! তুমি প্রভূত পরিমাণে ধনের দাতা হও, সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনীয় পদার্থের দাতা হও, আমাদের শত্রুগণের শ্রেষ্ঠ বিনাশকারী হও। ধনবান শত্রুগণের ধন আমাদিগকে দিয়া পূর্ণ কর।

৪। তুমি মহান দেবগণের যজ্ঞ অভিমুখে অন্নের সহিত আগমন কর—আমাদিগকে বল এবং অন্নের সহিত সংযুক্ত কর।

৫। হে ইন্দু! আমরা তোমার পরিচর্য্যার উদ্দেশেই বিচরণ করি, প্রতিদিন তোমার পরিচর্য্যাই আমাদের কার্য্য। আমাদের আশা ভরসা সকলই তোমাতে।

৬। হে সোমদেব! তোমার যে সোমরস চারি দিকে ক্ষরিত হইতেছে, "সূর্য্যের" দুহিতা শ্রদ্ধাদেবী (মনুষ্যের হৃদয়কমলে) বিশ্বব্যাপী সনাতন দশা-পবিত্রের দ্বারা তাহার পবন সাধন করিতেছেন!!!

৭। এই মনুষ্যসমাকীর্ণ যজ্ঞে অদ্য এই পরিপূর্ণ সৌত্যদিবসে দশ

ভগিনীর ন্যায় আমাদের দশ অঙ্গুলী তোমার ন্যায় মহানুভাব দেবতাকে ধারণ করিতেছে।

৮। তাদৃশ মহানুভাব সোমকে—বায়ু যেমন ভাস্বর মেঘখণ্ডকে চালনা করে, তদ্রূপ অঙ্গুলিগণ অভিষবণপ্রদেশে চালনা করিতেছে; এই মধু (সোম) যাহা শত্রুগণের নিবারক—তাহা দ্রোণকলস, আধবনীয় ও পূতভৃৎ নামক তিন পাত্রে আহৃত হইয়াছে।

৯। অবধ্য ধেনুগণ স্বীয় দুগ্ধের দ্বারা এই নবজাত সোমকে ইন্দ্রের পানের জন্য মিশ্রিত করিতেছে।

১০। আমাদের পুরোদেবতা ইন্দ্র এই সোমেরই পানে হৃষ্ট হইয়া সমুদয় শত্রু বিনাশ করেন, এবং যজমানগণকে ধনদান করেন।

এই পবমান স্তোত্রে সোমের অর্থ কোথাও সোমলতা—কোথাও সোমলতার রস—কোথাও বা সোমলতা বা সোমরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশেষ বুঝিতে হইবে। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি অনেক দেব দেবীর মধ্যে এক জন, না সকল দেব দেবীর সমষ্টিস্বরূপ পরমাত্মার নামান্তর মাত্র?—সোমদেব রাক্ষস নামক মনুষ্যের অনাক্ষ্য শত্রু বিনাশ করেন। তিনি বিশ্বসংসারের দ্রষ্টা বা অন্তর্যামী। তিনি মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনীয় পদার্থ দান করেন। তিনি উপাসকের শত্রুগণকে সংগ্রামে নষ্ট করিয়া তাহাদের ধন উপাসককে অর্পণ করেন। উপাসকগণকে তিনি অন্ন এবং বলের দ্বারা সংযুক্ত করেন। কিম্বহুনা, তিনি উপাসকের নিত্য ও পরম বন্ধু। মধুচ্ছন্দার ন্যায় ঋষি সমুদায় আশা ভরসা সেই সোমদেবেই স্থাপিত করিতেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার উপাসনায় রত থাকিতেন। এই বর্ণনায় পরমাত্মার অনেক লক্ষণ দেখা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা এই স্তোত্রের ষষ্ঠ ঋক্‌টি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। ইহার অর্থ কি?—শ্রদ্ধাদেবী কে?—বিশ্বব্যাপী ও সনাতন দশাপবিত্র কেমন?—সোমদেবের সোমকে আবার কিরূপ?—শ্রদ্ধাদেবীই বা সূর্য্যের দুহিতা কেন?

এই ষষ্ঠ ঋক্‌টি বেদভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন; ইহার প্রত্যেক শব্দ অর্থপূর্ণ; কিন্তু সেই অর্থ কিছু গম্ভীর থাকায় তলাইয়া না দেখিলে বুঝা যায় না।

ঋক্‌টির আকার এইরূপ—

"পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।
বারেণ শশ্বতা তনা॥"

মূলে "সূর্য্যস্য দুহিতা" কে, তাহা স্পষ্ট নাই। বেদপ্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় ঋষির মত অবলম্বন করিয়া সায়ণ এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা—

"হে সোম! তে তব পরিস্রুতং ক্ষরন্তং সোমং সোমরসং সূর্য্যস্য দুহিতা শ্রদ্ধাদেবী বাবেন বাণেন শশ্বতা—শাশ্বতেন তনা বিস্তৃতেন পুনাতি। তথাচ বাজসনেয়িন আমনন্তি—শ্রদ্ধা বৈ সূর্য্যস্য দুহিতা শ্রদ্ধাহ্যেনং পুনাতি।"

এ ব্যাখ্যাও বড় সংক্ষিপ্ত; ইহাতে শব্দার্থমাত্র দেওয়া হইয়াছে; তবে বাজসনেয়ে একটি ইঙ্গিত দেখা যায় যে, "শ্রদ্ধাই সোমকে শোধন করেন।"

ফলতঃ, এই ঋকটির সহিত রচয়িতার পিতা বিশ্বামিত্র ঋষির একটি ঋকের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশ্বামিত্র আপন জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া এক স্থানে বলিয়াছেন—

"সসর্পরীরমতিং বাধমানা বৃহন্মিমায় জমদগ্নিদত্তা।
আ সূর্য্যস্য দুহিতা ততান শ্রবো দেবেষু অমৃতং অজুর্যং॥"—৩—৩৩—১৫।

বিশ্বামিত্র স্বীয় গুরু জমদগ্নি ঋষির নিকট বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্যসমাজে তাহা প্রচারকরণাভিলাষে অনেকগুলি ঋক্-সূক্ত রচনা করেন। তিনি বলিতেছেন—"জমদগ্নি হইতে আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া বাগ্‌দেবী চারি দিকে বিস্তারশালিনী হইয়া এবং মনুষ্যের অজ্ঞাননাশিনী হইয়া প্রভূত শব্দ করিয়াছেন;—সূর্য্যের দুহিতা দেবতাদের জন্য অক্ষয় অমৃত-ভোজন বিস্তার করিয়াছেন।" এস্থলে দেবতাগণের জন্য অক্ষয় অমৃত-ভোজন শব্দে সায়ণ—"আহুতি" বুঝিয়াছেন, তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বামিত্রের প্রযত্নে আর্য্যাবর্ত্তে যাগ-যজ্ঞের বহুল পরিমাণে বিস্তার সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এস্থলে বিশ্বামিত্রের বিরচিত মন্ত্রনিহিত কোনও পদার্থকেই "অক্ষয় অমৃত-ভোজন" বলা হইয়াছে। সূর্য্যের দুহিতা বাগ্‌দেবী বিশ্বামিত্রের মুখে নানা ছন্দে বহুসংখ্যক ঋকসূক্তে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহাই মূল অর্থ। ঋক্‌সূক্তেরই বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে; ঋকসূক্তেরই বিস্তারের দ্বারা যজ্ঞক্রিয়ার বিস্তার করা হইয়াছে বলিলেও বলা যায়; কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত কষ্টকল্পনা। দেবশব্দ অনেক স্থলে—"ঋষি" অর্থ প্রকাশ করে। বিশ্বামিত্র বোধ হয় এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, বাগ্‌দেবী আমার দ্বারা বহুতর বেদসূক্ত রচনা করাইয়া পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্-ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম নামক "অক্ষয় অমৃত-ভোজন" বিস্তার করিয়াছেন।

যে পদার্থ ভোজন করিলেও ফুরায় না, এবং যাহা ভোজন করিলে মনুষ্য অমর হয়, তাহাকে "অক্ষয় অমৃত-ভোজন" বলা যাইতে পারে।—বস্তুতঃ, এই অক্ষয় অমৃতান্নের নাম "সোম"। ঋগ্বেদের এক স্থানে "সোম"কে বলা হইতেছে—

"যস্তা দেবাঃ প্রপিবন্তি তত আ-প্যায়সে পুনঃ॥"

তোমাকে দেবতারা (ঋষিরা বা পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরা) যখন পান করেন, তখন তোমার ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হয়। এ কথা প্রেম ও ভক্তির পক্ষে বেশ খাটে। আর "সোম" পান করিলে যে অমর হওয়া যায়, তাহা ত ঋগ্বেদের অসংখ্য স্থানে দেখা যায়; তাহার এক উদাহরণ প্রগাথ ঋষি বলেন—

"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।"

আমার বিবেচনায়, ঋষিরা যে এক গূঢ় মধুবিদ্যা বা "সোম" রহস্য জানিতেন, যাহার কথা জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহারা কেবল ঠারে ঠোরে বলিতেন, বিশ্বামিত্র এখানে সেই মধুবিদ্যার "মধু" বা "সোম কেই অক্ষয় অমৃত-ভোজন বলিতেছেন। তাহা মুখে ভোজন করিবার সামগ্রী নহে; স্পষ্টই একস্থানে বলা হইয়াছে, "সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ব্রাহ্মণেরা যে সোমের বিষয় অবগত আছেন, তাহা মুখে ভোজনের সামগ্রী নহে। তাহা হৃদয়ের পেয় সামগ্রী। সরল ভাষায় তাহার নাম ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম।

বিশ্বামিত্রের রচনা যে মধুচ্ছন্দা না জানিতেন, তাহা নহে। ফলতঃ, উভয়ের ভাষায় বিলক্ষণ সাদৃশ্য। উভয়েই "সূর্য্যস্য দুহিতা" শব্দে সমান অর্থই বুঝিতেন, সন্দেহ নাই। তাহাতে বাগ্‌দেবী ও শ্রদ্ধাদেবী সমান। "ঈশ্বর আছেন" এই বুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাসের নাম "শ্রদ্ধা"। এই শ্রদ্ধাকে দেবী কল্পনা করিলে তিনিই বেদের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী; শ্রদ্ধাই বেদের মূলভিত্তি। কিন্তু শ্রদ্ধা বা বাগ্‌দেবী সূর্য্যের দুহিতা কেন?

এখানে "সূর্য্য" শব্দের কোনও অর্থ সায়ণ লেখেন নাই, কিন্তু স্থানান্তরে লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের ৪র্থ ঋকের ভাষ্যে সায়ণ লেখেন—"হে সূর্য্য—অন্তর্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্। তবণিঃ—সংসারাত্তারকোঽসি।" ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, যিনি অন্তর্যামিরূপে সকল মনুষ্যকে স্বর্গধামের দিকে প্রেরণ করেন, এবং যিনি সংসাররূপ দুঃপার্ণব হইতে ত্রাণকর্ত্তা—সেই আনন্দময় পরমেশ্বরেরই এক নাম "সূর্য্য"। সূর্য্য শব্দের মূল অর্থ "প্রেরক", তাহা হইতেই ঐ অর্থ পাওয়া যায়।

তাহাতে শ্রদ্ধাদেবী পরমাত্মার কন্যা। কেন না—মনুষ্য নিজের বুদ্ধির দ্বারা "ঈশ্বর আছেন" ঈদৃশ জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ। পরমাত্মাই প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই শ্রদ্ধাদেবী সূর্য্যস্য দুহিতা। তাঁহার অপর নাম "সূর্য্যা"। সোমের সহিত যে সূর্য্যার বিবাহ-উপাখ্যান ঋগ্বেদে শুনা যায়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের নিত্য সম্বন্ধ খ্যাপনের জন্য। কে ঈশ্বরকে অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেম না করিয়া থাকিতে পারে?

এখন মধুচ্ছন্দা স্বীয় পিতার সূর্য্যদুহিতা শ্রদ্ধাদেবীর কথা স্মরণ করিয়া যখন দেখিতেন যে, অধ্বর্য্যুগণ মেষলোমের দশাপবিত্রে সোমরস ঢালিতেছেন, এবং তাহা ছাঁকা হইয়া কলসের অভ্যন্তরে যাইতেছে—তখন তাহার একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। মনুষ্যের হৃদয়ও তাঁহার চক্ষে ঐরূপ একটি কলস বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ঐ কলসমুখে যেন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিশ্বব্যাপী "সনাতন" দশাপবিত্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং তদুপরি শ্রদ্ধাদেবী ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম নামক আধ্যাত্মিক "সোমরস" ঢালিয়া দিতেছেন—তাহা মনুষ্যের হৃদয়কন্দরে স্বাদুতম ও মাদকতম ধারাতে প্রবেশ করিতেছে।

কথাটি বড় মধুর!—ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যেক নরনারীর উদ্ধারসাধনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব সোমরস নামক ভক্তি ও প্রেমরসের অমৃত সিঞ্চন করিয়া, তাহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিতেছেন—প্রত্যেক নরনারী সেই সুধারস পান করিয়া স্বর্গধামের যাত্রী হইয়াছে। কোনও দেশে কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তি সেই অমৃতের আস্বাদ লাভে বঞ্চিত নহে;—(ইহাই বিশ্বব্যাপী সনাতন দশাপবিত্রের তাৎপর্য্য!)—ইহা করুণাময়, আনন্দময় ঈশ্বরের উপযুক্তই বটে।

ঋষি বলিতেছেন—"হে সোম! তে তব পরিস্রুতং সোমং"—অর্থাৎ যে দিকে চাই, সেই দিকেই হে পরমাত্মন্! তোমার সোমরস ক্ষরিত হইতেছে, দেখিতে পাই!!! যিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, এবং স্বয়ং মধুচ্ছন্দস্, তাদৃশ ঋষিশ্রেষ্ঠ ভিন্ন আর কে এমন মধুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে?

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মৎস্যাহরণকারী যুগল।

(গীদে মোপাসাঁ।)

প্যারিস অবরুদ্ধ এবং প্যারিসবাসীগণ নিতান্ত ক্ষুধিত ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছে। এমন কি, গৃহচূড়াবলীর উপর পক্ষীও দুই একটি মাত্র দৃষ্ট হয়। এবং জলপ্রণালী সকলও অধিবাসীহীন হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইতেছে। লোকে যাহা পায়, তাহাই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার শান্তি করে।

মরিজো ঘড়ি সারাব কার্য্য করিত। জানুয়ারী মাসের এক সূর্য্যালোকপ্লাবিত প্রাতঃকালে, ক্ষুধার্ত্ত এবং বিষণ্ণ হইয়া, কোটের পকেটে হস্ত স্থাপন করিয়া বুলভার দিয়া মরিজো যখন যাইতেছিল, তখন অপ্রত্যাশিত রূপে তাহার সহিত তাহার এক বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। মরিজো ও শোভাজ, দুই জনের নদীতীরে পরিচয়; মরিজো বন্ধুকে চিনিতে পারিল।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি রবিবারে প্রত্যূষে মরিজো হস্তে বংশনির্ম্মিত ছিপ এবং পৃষ্ঠে টোপ প্রভৃতি পূর্ণ বাক্স লইয়া রেলে কোলোম্বে যাইত, সেখান হইতে সে পদব্রজে নারাহ্ দ্বীপে গমন করিত। নদীতীরে উপস্থিত হইয়াই সে মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করিত, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। এখানে প্যারিসের বস্ত্রব্যবসায়ী শোভাজের সহিত প্রতি রবিবারে তাহার সাক্ষাৎ হইত। সেও বলিষ্ঠকায় এবং প্রফুল্লচিত্ত লোক। মৎস্য ধরিতে উভয়েই সমান পটু।

অনেক দিন তাহারা পাশাপাশি বসিয়া দিবসের অর্দ্ধেক কাটাইয়া দিত, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে কথোপকথন অতি অল্পই হইত। তাহাদিগের পদ নদীসলিলের উপর উপর ঝুলিতে থাকিত। এইরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহারা কেহ একটি কথাও কহিত না, আবার সময়ে সময়ে তাহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু তাহাদিগের অনোবৃত্তি এবং মত একরূপ ছিল। কাজেই কথাবার্ত্তা না হইলেও তাহারা পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে পারিত। বসন্তের সূর্য্যকিরণে প্লাবিত প্রাতঃকালে যখন আলোক এবং কুজ্ঝটিকা অলসভাবে নদীর

উপর অবস্থান করিত, এবং এই মৎস্য-আহরণকারীদ্বয় গ্রীষ্মের পূর্ব্বেই গ্রীষ্ম-কাল অনুভব করিত, তখন মরিজো হয় ত তাহার সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিতঃ—"কেমন মন্দ নয়!"

শোভাজ হয় ত তাহার উত্তরে বলিত, "আমি ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই জানি না।"

এইরূপ মতের আদানপ্রদানে তাহারা পরস্পরকে বেশ বুঝিতে সমর্থ হইত ও ইহাতে তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সম্মানভাব স্থাপিত হইয়াছিল। শরতের সন্ধ্যাকালে যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত এবং নদীর জলে গতিশীল মেঘমালার প্রতিবিম্ব পাতিত করিত, যখন নদীজল গাঢ় লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইত, যখন সমস্ত আকাশ আলোকে উজ্জল হইয়া উঠিত, এবং সেই বন্ধুদ্বয়ের আলোকোজ্জল শরীর যেন অনলশিখা দ্বারা আলোকিত হইত, যখন বৃক্ষের লোহিতাভ বর্ণ যেন স্বর্ণবর্ণে মণ্ডিত হইত, এবং যখন বৃক্ষ সকলও যেন শীতবায়ুভরে কাঁপিতে থাকিত, তখন শোভাজ হয় ত হাসিয়া মরিজোকে বলিত, "কি সুন্দর দৃশ্য!"

মরিজো হয় ত ভাসমান ছিপ হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিত, "বুলভারের দৃশ্য অপেক্ষা এ দৃশ্য সুন্দর।"

এইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় সে দিন প্রাতঃকালে পরস্পরকে দেখিয়া তাহারা নিতান্ত আহ্লাদিত হইল, এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে পরস্পরে করমর্দ্দন করিল।

শোভাজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, "এরূপ অবস্থা ভাল!"

মরিজো দুঃখিত এবং নির্ব্বাক ছিল; সে বলিল, "কি আলোকোজ্জল দিবস! আজ নববর্ষের প্রথম দিন!" আকাশ সত্যই মেঘশূন্য উজ্জল এবং সৌন্দর্য্যময় ছিল। উভয়েই শোকাকুল এবং চিন্তাযুক্ত ভাবে চলিতে লাগিল।

শোভাজ বলিল, "যখন আমরা মৎস্য ধরিতে যাইতাম, তখন কেমন সময় ছিল"!

মরিজো বলিল, "কবে আবার আমরা তেমন দিন পাইব।"

তাহারা উভয়ে একটি নাতিবৃহৎ দোকানে প্রবেশ করিল, এবং এক গ্ল্যাস মদ্য পানান্তর আবার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

তাহারা আর এক গ্ল্যাস মদের জন্য আর এক দোকানে প্রবেশ করিল। লোকে অনেক দিন অনাহারের পর অত্যধিক মাত্রায় আহার করিলে যেমন

হস, শেষ দোকান হইতে যখন তাহারা বাহিরে আসিল, তখন তাহাদিগকেও যেন সেইরূপ দেখাইতেছিল।

সে দিন প্রকৃতি বড়ই মধুর, মন্দ মন্দ বায়ু তাহাদিগের মুখের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, সেই সুখস্পর্শ বায়ুতে শোভাজের নেশা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। শোভাজ সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যদি আমরা এখন যাই ?"

"কোথায় ?"

"কেন, মৎস্য-আহরণে ?"

"কিন্তু যাইব কোথায় ?"

"অবশ্য আমাদিগের সেই দ্বীপে"।

"ফরাসীস্ সৈন্যের বাহির শিবির কোলোম্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি কর্ণেল ডুমুল্যার সহিত পরিচিত আছি, তিনি সহজেই আমাদিগকে যাইতে দিবেন।"

মরিজো এই কথা শুনিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, এবং বলিল, "বেশ কথা। আমিও সম্মত আছি।" ইহার পর তাহারা ছিপ আনিতে চলিয়া গেল।

ইহার এক ঘণ্টা পরে তাহারা উভয়েই দ্রুতপদে সদর রাস্তা দিয়া কর্ণেল ডুমুল্যার অধিকৃত নগরাভিমুখে গমন করিতেছিল। কর্ণেল তাহাদিগের অনুরোধ শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া তাহাদিগকে গমনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা সাঙ্কেতিক বাক্য (Pass word) অবগত হইয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে গমন করিল।

তাহারা সেনারাস পরিত্যাগ করিয়া পরিত্যক্ত কোলোম্বের মধ্য দিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হইল। বেলা তখন প্রায় এগারটা।

অপর ধারে আর্জেনটুইল্ গ্রাম বোধ হয় যেন মৃতের মত। আর গ্রিমণ্ট ও সমনসের পর্ব্বতরাজি দণ্ডায়মান। নেন্‌টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর বোধ হয় যেন বায়ুর মত শূন্য। চেরিবৃক্ষ এবং ধূসরবর্ণ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

শোভাজ উচ্চের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, "প্রসিয়ান্‌রা ঐখানে আসিয়াছে।" দুই বন্ধুর মনে যেন কেমন এক অস্পষ্ট অসুখ বোধ হইতে লাগিল।

প্রসিয়ান্‌গণ! তাহারা কেহই তাহাদিগকে দেখে নাই, কিন্তু অনেক

মাস হইতে তাহারা তাহাদিগের অবস্থান বেশ অনুভব করিতেছে; তাহারা তাহাদিগের প্রিয় প্যারিস্ অবরোধ করিয়াছে; প্রিয় ফ্রান্সের ধ্বংস সাধন করিতেছে; তাহারা লুণ্ঠন এবং নরহত্যায় ব্যাপৃত। আবার তাহারা যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার নহে, অজেয়, অদর্শনীয় এবং সর্ব্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

বন্ধুদ্বয় যখন তাহাদিগের কথা ভাবিতে লাগিল, তখন তাহাদিগের হৃদয়ে সেই অজ্ঞাত জয়ীদিগের উপর পূর্ব্বের ঘৃণার সহিত যেন কেমন ভয় মিশ্রিত হইতে লাগিল। মরিজো অস্পষ্টস্বরে বলিল, "যদি এখন তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়?"

শোভাজ প্যারিসবাসীর স্বাভাবিক পরোপকারবৃত্তির সহিত বলিল, "তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে রাত্রির আহারের জন্য আমাদিগের ধৃত মৎস্য হইতে কতকগুলি দিব।"

সেই সর্ব্বত্র বিরাজমান নিস্তব্ধতা তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এবং তাহারা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

পরিশেষে শোভাজ সাহসী হইয়া বলিল, "আইস আমরা অগ্রসর হই, কিন্তু আমরা অবশ্য যথাসম্ভব সাবধান থাকিব।"

তাহারা নীচু হইয়া সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল। এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে গুড়ি মারিয়া যাইতে লাগিল, এবং সতর্কভাবে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উভয়েই কোনওরূপ অপ্রত্যাশিত শব্দের আশায় উৎকণ্ঠিত ছিল।

এখন তাহারা নদীর নিকটে আসিয়াছে। দুই বন্ধু দৌড়িতে আরম্ভ করিল। নদীতীরে উপনীত হইয়া তাহারা শুষ্ক নল বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।

মরিজো ভূমির উপর কান পাতিয়া, কোনওরূপ শব্দ শ্রুত হয় কি না, শুনিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। সেখানে তাহারা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ক্রমে ইহাই তাহাদিগের স্থির বিশ্বাস হইল, এবং তাহারা মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যে পরিত্যক্ত মারাত্মে দ্বীপ থাকায়, অপর পার হইতে মৎস্যাহরণকারী-যুগল দৃষ্ট হইতেছিল না। সেখানকার ক্ষুদ্র আহারীয়-বিক্রয়গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল, এবং বোধ হইতেছিল, যেন কয়েক বৎসর সেখানে আর কেহই আসে নাই।

শোভাজ প্রথমে মৎস্য ধৃত করিল, দ্বিতীয় মৎস্য তাহার সঙ্গী মরিজোর

ভাগ্যে পতিত হইল। এবং প্রতি মিনিটেই যখন তাহারা ছিপ তুলিতে লাগিল, তখন ছিপের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যনির্ম্মিতবৎ দ্রব্য ঝুলিতে দেখা যাইতে লাগিল। সত্যই এত অধিক মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না। তাহাদিগের পদতলে জলের উপর এক খানি জাল ভাসিতেছিল, তাহারা মৎস্য ধৃত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিতেছিল। অনেক দিনের পর আবার এইরূপ মৎস্য ধরিতে সমর্থ হইয়া তাহাদিগের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইতেছিল। তাহারা কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না, তাহারা কোনও বিষয়ের চিন্তা করিতেছিল না। জগতের অন্য যাহা কিছু তাহাদের নিকট নিতান্ত মূল্যহীন বোধ হইতেছিল, সে সকল যেন কিছুই নহে, দুই জনে কেবল মৎস্য ধরিতেছিল।

সহসা যেন মৃত্তিকাভ্যন্তরগত কোনও শব্দ সেখানকার ভূমি কাঁপাইয়া তুলিল। কামান সকল আবার অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মরিজো অপর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। বামভাগে তীরের উপরে অভিদূরে মন্টভালারীঞ্চের বৃহৎ ছায়া ও তদুপরি সদ্যোদ্গারিতবহ্নি কামানের শ্বেত ধূম দৃষ্ট হইল। যেন তাহার প্রত্যুত্তর রূপে দুর্গমধ্য হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইল, তাহার এক মুহূর্ত্ত পরেই আর এক ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। এইরূপে ক্রমাগত কামানের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, যেন প্রতি মুহূর্ত্তে পর্ব্বত মৃত্যু উদ্গীরণ করিতে লাগিল, এবং তদুপরিস্থিত শ্বেতধূমরাশি যেন শবাচ্ছাদনবস্ত্রের মত দেখাইতে লাগিল।

শোভাজ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে।" মরিজো তাহার ছিপের দিকে চাহিয়া ছিল, সহসা যোদ্ধাদিগের প্রতি তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, সে রুদ্ধস্বরে বলিল, "এইরূপে পরস্পরকে হত্যা করা কি নির্ব্বোধের কার্য্য!"

শোভাজ বলিল, "ইহা নীচ পশুদিগের কার্য্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।"

মরিজো তখনই একটি মৎস্য ধৃত করিয়াছে, সে বলিল, "যত দিন রাজতন্ত্র শাসন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন এইরূপ হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিও।"

শোভাজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলিত থাকিলে যুদ্ধ ঘোষণা হইত না।"

মরিজো বলিল, "রাজতন্ত্রে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজাতন্ত্রে গৃহেই যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।"

তাহারা দুই জনে শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিমান লোকের মত রাজনৈতিক বিষয়ে

তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। মণ্টভালারীঞ্চের উপর হইতে ফরাশীসদিগের গৃহ ভগ্ন করিয়া, অনেক ফরাশীসের জীবন নাশ করিয়া, কত জনের স্বপ্ন, আনন্দ এবং আশার মূলোৎপাটন করিয়া, কত জনের সুখ নষ্ট করিয়া, এবং ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানের রমণীদিগের হৃদয়ে শোক এবং কষ্টের অনল প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া, বজ্রনাদী কামান হইতে গোলা ছুটিতে লাগিল।

মরিজা বলিল, "ইহাই জীবন!"

শোভাজ বলিল, "বরঞ্চ বল, ইহাই মৃত্যু।"

উভয়ের বোধ হইল, যেন কেহ তাহাদিগের পশ্চাতে গমন করিতেছে। উভয়ের হৃদয় ভীতিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা চমকিয়া উঠিল। তাহারা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে পাইল, এক রূপ বিশেষপরিচ্ছদপরিহিত কতকগুলি ভৃত্য সেই দিকে আসিতেছিল, তাহাদিগের মস্তকস্থিত টুপীর উপরিভাগ সমতল। তাহারা মৎস্যাহরণকারীদ্বয়ের দিকে বন্দুক লক্ষ্য করিয়াছিল।

ভীত বন্ধুদ্বয়ের হস্ত হইতে ছিপ দুইটি পড়িয়া গেল, সে দুইটি অলসভাবে নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ফরাশীসদ্বয় ধৃত হইল। তাহারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া নৌকায় তুলিয়া অপর পারে লইয়া গেল।

তাহারা উভয়ে যে গৃহে অধিবাসী নাই ভাবিয়াছিল, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে পাহারা দিবার জন্য প্রসিয়ান-সৈন্যদিগের একটি পাহারা-বাস ছিল। এক জন ভীমকায় লোমশ ব্যক্তি পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া চেয়ারে বসিয়া চীনদেশীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাইপে চুরুট খাইতেছিলেন। তিনি, বিশুদ্ধ ফরাশীস ভাষায়, তাহারা কেমন মৎস্য পাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এক জন সৈনিক মৎস্যপূর্ণ জাল খানি আনিয়াছিল, সে তাহা অধ্যক্ষের পদপ্রান্তে স্থাপিত করিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন, "মন্দ নহে, কিন্তু আমাদিকে অন্য মৎস্য ভাজিতে হইবে। তোমরা দুই জনে শ্রবণ কর, ভীত হইও না। তোমরা দুই জন ফরাশীস চর, আমার গতিবিধি জানিবার জন্য মৎস্যাহরণচ্ছলে এখানে আসিয়াছ। আমি তোমাদিগকে বন্দী করিলাম। আমার আদেশে তোমাদিগকে গুলি করা হইবে। ভাগ্যক্রমে তোমরা আমার হস্তে পতিত হইয়াছ, তাহা তোমাদিগের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। তোমরা ফরাশীস সেনাবাস দিয়া আসিয়াছ। কাজেই তোমরা সাঙ্কেতিক বাক্য অবগত আছ, নহিলে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। আমাকে তাহা বলিয়া দাও, আমি তোমাদিগকে যাইতে দিব।"

দুইবন্ধু পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে উভয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহ একটি কথাও বলিল না।

সেনাধ্যক্ষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আর কেহই এ কথা জানিতে পারিবে না, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। এ কথা আর কেহই জানিতে পারিবে না। যদি অস্বীকার কর, এখনই তোমাদিগের উভয়ের মৃত্যু হইবে। এখন কি করিতে চাহ?"

তাহারা কিছুই বলিল না, একবারও নড়িল না।

প্রসিয়ান স্থির ভাবে নদীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমরা ঐ নদীগর্ভে নিমজ্জিত থাকিবে। বোধ হয় তোমাদিগের পরিবার আছে?"

মণ্টভালারিঞে হইতে অনবরত কামানধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

ফরাশীসদ্বয় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা উভয়েই নীরব।

সেনাধ্যক্ষ জার্ম্মান ভাষায় এক আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহার পর বন্দীদ্বয়ের নিকট হইতে দূরে চেয়ার টানিয়া লইলেন। বার জন সৈনিক আসিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

সেনাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে উঠিয়া ফরাশীসদ্বয়ের নিকটে আগমন করিলেন। মরিজোর করধারণ পূর্ব্বক তিনি অত্যন্ত অশ্রাব্য-মৃদু স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র আমাকে সাঙ্কেতিক বাক্য বলিয়া দাও। তোমার বন্ধুও জানিতে পারিবে না।"

মরিজো কোনও উত্তর প্রদান করিল না।

প্রসিয়ান শোভাজকে একটু দূরে লইয়া গেলেন, এবং তাহাকেও ঐ কয়েকটি কথা বলিলেন।

শোভাজ উত্তর প্রদান করিল না।

ফরাশীসদ্বয় আবার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল।

সেনাধ্যক্ষ আর একটি আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সৈনিকগণ তাহাদিগের বন্দুক উন্নত করিল।

ঘটনাক্রমে এই সময় মৎস্যপূর্ণ জালের উপর মরিজোর দৃষ্টি পতিত হইল। তাহা অদূরেই ভূমির উপর পড়িয়াছিল। তাহার উপর সূর্য্যকর পতিত হইয়া মৎস্য গুলির উজ্জ্বল দেহ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। সহসা মরিজোর মনে কেমন এক দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "শোভাজ, বিদায়!"

শোভাজ বলিল, "মবিজো, বিদায়!" তাহারা পরস্পরের হস্ত চাপিয়া ধরিল। তখনও ভয়ে তাহাদিগের আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "আওয়াজ কর।"

শোভাজের গতপ্রাণ দেহ সম্মুখে পড়িয়া গেল।

মবিজো অধিক বলিষ্ঠ ছিল। তাহার দেহ কম্পিত হইল, ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার পর মৃত বন্ধুর দেহের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মুখ আকাশের দিকে রহিল, গুলির আঘাতে তাহার বক্ষে অনেক গুলি ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল।

প্রসিয়ান আবার একটি আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ এক মুহূর্ত্তের জন্য অদৃশ্য হইল; তাহার পরে, তাহারা কতকগুলি প্রস্তর ও রজ্জু লইয়া আসিল। মৃত ফরাসীসযুগের পদে সেই প্রস্তর গুলি বাঁধিয়া, তাহাদিগের শব নদীতীরে লইয়া গেল।

মণ্টভালারিঞে হইতে অনবরত কামানধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

এক জন সৈনিক মবিজোর মস্তক, আর এক জন তাহার পদ ধরিল, আর দুই জন এইরূপে শোভাজকে ধরিল। দেহ দুইটি কয়েক বার দোলাইয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিল। আকাশে একটি বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া দেহ দুইটি নদী-সলিলে নিমজ্জিত হইল। দুইটি দেহেরই পদ প্রথমে সলিলে পড়িল।

জলে বুদ্বুদ উঠিল; তাহার পর ধীরে ধীরে জল শান্তভাব ধারণ করিল। শোণিতে ঈষৎরঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বৃত্তাকারে তীরের দিকে আসিতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ তেমনই অটল ভাবে কহিলেন, "এখন মৎস্যগুলার কিছু করিতে হইবে।"

তৃণোপরি পতিত মৎস্যগুলির উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি সে গুলিকে তুলিয়া ডাকিলেন, "উইল্‌হেল্‌ম!" শ্বেতবর্ণটুপিপরিহিত এক জন সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মৎস্যগুলিকে তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই গুলি টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে আমার জন্য ভাজিয়া আন। খাইতে বড়ই মধুর হইবে।"

তাহার পর সেনাধ্যক্ষ আবার চুরুট টানিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

রাজনীতির কৃষ্ণ স্রোত সতেজে সাহিত্যের শত মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আসমুদ্র পৃথিবী যদিও অবশ্য সে স্রোতে পূর্ণ, প্লাবিত, নিপীড়িত,—রাজনীতি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চায়,—ইন্দ্রের অমরাবতী পরাজিত, পদদলিত করিয়া, সুদূর দুরন্ত আফ্রিক ভূমে, মরু অরণ্যে, অসভ্য কাফ্রী নরপশু লোমেঙ্গুলার পুতিগন্ধময় পশুশালায় প্রবেশিয়া গো শূকরের মূত্র পুরীষ আঘ্রাণ করে,—তাহার অসহনীয় মলিনতার অভ্যন্তরে অবগাহন করিয়া বর্ব্বর বন্য সর্দ্দারের শক্তি পরীক্ষা করে, এক একটি করিয়া তাহার নিশ্বাস গণে, প্রতি পদক্ষেপে প্রহরা দেয়, সভ্যতার সর্ব্বভুক, সর্ব্বগ্রাসী, অনন্ত অতৃপ্ত, অনন্ত ক্ষুধাতুর উদরে, স্বচ্ছন্দবনচারী, পশুবৎ বন্য ব্যাঘ্র বরাহ মৃগের স্বতঃসঙ্গী, উদ্দাম, উলঙ্গ, তথাকথিত মনুষ্যসম্প্রদায়ের স্বভাব-দত্ত উদ্দাম উলঙ্গ স্বাধীনতাটুকু অচিরাৎ আহুতি দিবার জন্য রাজনীতি কাণে হাটে, অগ্নিবাণ বর্ষণ করে, গোলাগুলি কামান,—সভ্যতা উদ্ভাবিত সহস্র সহস্র সংহার-অস্ত্র উড়ায়, জীবন্ত জীবের রক্তে কঙ্কালে বহুমতী কলঙ্কিত করে। রাজনীতির নিগূঢ় লীলা, রাজনৈতিক প্রবাহের প্রবাহ প্রখর প্রজ্বলিত,—নিয়ত ঘূর্ণজলময়, কখনও আবৃত্ত অন্তঃসলিল, কখনও উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল, আবিল উচ্ছৃঙ্খল—রাজনৈতিক প্রবাহের গতি প্রকৃতি কেবল রাজনীতিরই বোধগম্য, গণনায়ত্ত। রাজনীতির পরস্বপিপাসা আকাশ পাতাল পৃথিবী এক গণ্ডূষে পান করিলেও অনির্ব্বাপিত, রাজনীতি লিবারেল, রাডিক্যাল, কনস্রাবেটিব, কিম্বা যা-কিছুই হউন, তিনি নিয়তই শুষ্ক-কণ্ঠ,—পরের রাজ্য, পরের ঐশ্বর্য্য, পরশ্রী, পরের স্বাধীনতা, মপা-সর্ব্বস্ব তাঁহার জঠরানলের ইন্ধনস্বরূপ; যাহা অকিঞ্চিৎকর; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীভৎস, কঠোর কঙ্কালাবশিষ্ট, যাহা অতি অপ্রলোভনীয়, তাহাতেও রাজনীতির নিরতিশয় লোভ, তাহা দেখিয়াও রাজনীতির লোলজিহ্বা নির্লজ্জভাবে লম্বমান।

রাজনৈতিক প্রবাহ।

আব্রিক স্থানে রাজনীতি।

মাতাবেল যুদ্ধ।

ভূমিতৃষ্ণা।

এ যুগে য়ুরোপের হস্তে এবং য়ুরোপ-উপনিবিষ্ট আমেরিকার হস্তে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজনৈতিক নির্বন্ধ। আমেরিকার য়ুরোপীয় উপনিবেশ, মার্কিনী ইংরেজ, একটা নূতন পৃথিবী হাতে পাইয়া, পিতৃভূমি হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক, আপন সাধারণ তন্ত্রে, এবং নব সভ্যতামন্ত্রে মশগুল হইয়া, সেই পৃথিবীটার পত্তন, কর্ত্তন ও বিবর্ত্তন করিতেছে। য়ুরোপে বহু রাজ্য,—বহু রাজা, যথেচ্ছাচারী মুকুটধারী মুণ্ড ব্যতীত, প্রজাতান্ত্রিক ও আধ প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য,—বহু রাজ্য, বহু রাজা—রাজ্য-বিস্তারলালসা সকলেরই সমান, অথচ য়ুরোপখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য মহাখণ্ডের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্র ভূভাগের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বিরাট বিশ্ববিজয়ী রাজশক্তিনিচয় অনবরত অন্তরে অন্তরে গর্জ্জিতেছে; পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উপর প্রলোভ-মুগ্ধ ক্রোধকষায়িত দৃষ্টি চালাইতেছে। কিন্তু পৃথিবী সেই পুরাতন কালের সসীম পুরাতন পৃথিবীই আছে। বিধাতা নূতন ব্রহ্মাণ্ড আর বড় একটা সৃষ্টি

য়ুরোপ ও আমেরিকা, রাজনৈতিক নিবন্ধ।

নূতন পৃথিবী প্রয়োজন।

করেন নাই, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর আয়তনও বড় বেশি বৃদ্ধি হয় নাই। পরমেশ্বর আর গোটা কতক নূতন পৃথিবী ইদানীং সৃষ্টি করিলে বোধ হয় কিছু সুবিধা হইতে পারিত। য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের বিশ্ব-বুভুক্ষার ও বাণিজ্যআকাঙ্ক্ষার অগ্নি, তাহাদের মেদ মাংস অস্থিতে আপাততঃ আহার খুঁজিয়া পাইত।

শক্তিচতুষ্টয়।

রুষ, ফরাসী, জর্ম্মন, বৃটিশ, এই প্রধান চতুঃশক্তির পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, করে এবং ক্রোড়ে, য়ুরোপীয় আরও অনেক উপশক্তি অষ্ট প্রহর উৎকর্ষ ভাবে অবস্থিত। মার্ত্তণ্ড মহাশক্তিচতুষ্টয়ের চক্রান্তে বিশ্ব সংসারের রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সংসারের প্রায় সর্ব্বত্রই এই শক্তিচতুষ্টয়ে কোনও না কোনও সূত্রে সংঘর্ষ, সংক্ষোভ;—রাজনৈতিক চতুরতায় তাহা চালিত; শক্তি-সম্প্রদায় সর্ব্বত্র সাবধান সতর্ক, সহস্র মুখে সর্ব্বদাই শান্তি-কামী, অথচ অশান্তির এবং আকাঙ্ক্ষার আগুনে অহর্নিশি অন্তর্দাহ হইতেছে। বন্ধুত্বের ভান এবং প্রতিশ্রুতির অভাব নাই; কিন্তু পরম শত্রুবৎ পরস্পরে অবিশ্বাসবান। রাজনীতির নিগূঢ় রহস্যই এই! ভারতের ভাগ্যের সহিত এসিয়ার অদৃষ্ট অনেকটা গাঁথা; তাহার ভবিষ্যৎ ইতিহাস ভারতের ভাবী ইতিহাসের সহিত একরূপ লিখিত পঠিত আছে বলিলেও হয়। "চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত" রাজনৈতিক মুকুরে একই প্রতিবিম্ব, এসিয়া য়ুরোপের ভাগাভাগি। ব্রহ্মরাজ্য ভারতসাম্রাজ্যের মহাশাখায় পরিণত হইয়াছে।

এসিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া।

সাধারণতান্ত্রিক ফরাসীর সহিত শ্যামের স্বাধীনতা-হরণ-সন্ধি-সূত্র গ্রথিত হইয়া গেল, শ্যাম এখন প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে ফরাসীরই প্রজা। এসিয়ার অবস্থা এই। অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশ, অষ্ট্রেলিয়া বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত।

আমেরিকা।

আমেরিকা বহু জাতির বিলাসভূমি। য়ুরোপের উদ্‌বৃত্ত জন-স্রোত বিপুল পরিমাণে আমেরিকা ধারণ ও পোষণ করিতেছে। অবশিষ্ট এক আফ্রিকা। যক্ষ অরণ্য কুৎসিৎ কাফ্রি-ভূমির শির ধমনী সহস্র নাড়ী য়ুরোপীয় শক্তি-সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। আফ্রিকায় অনেক য়ুরোপীয় উপনিবেশ বসিয়াছে।

আফ্রিকা।

ভাহমী রাজ্যে ফরাসিস বিজয়পতাকা পত পত উড়িয়াছে। স্পেন মরক্কোয় মহা বিপর্য্যয়। সংপ্রতি স্পেন পরাজিত হইয়া পিণ্ড উদ্গার করিতেছে; মায় মরক্কো হোসেন মরক্কোকে মোরোক্কো পাকাইয়া এক গ্রাসে গিলিবার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার বৃটিশ ও ফরাসিস্ স্বার্থও বিদ্যমান।

স্পেন,—মরক্কো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জঙ্গলি জুলু রাজ্যে সংপ্রতি বৃটিশসিংহ সাংঘাতিক সিংহ-নাদ ছাড়িয়াছেন। রাজ্যসমেত জুলুরাজ কাতাওয়ে কালগর্ভে বিলীন,—জুলু জাতীয় মাতাবেল মহীপ লোবেঙ্গুলাকে রসাতলে পাঠাইবার জন্য সিংহ মাসোনালেণ্ডে মাতাবেল-সমরে মাতিয়াছেন। যেরূপ হইয়া থাকে, সিংহ প্রথমতঃ সুচী হইয়া লোবেঙ্গুলার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন শাল হইয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পুরাবৃত্তের পুনরাবৃত্তি।

মাসোনা স্থান;—মাতাবেল স্থান।

বণিক কোম্পানী।

সেই কোম্পানীর কারবার; বণিক কোম্পানীর বাণিজ্য ছলা। বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিরাট ব্যসন; ভূমিতৃষ্ণা, দুর্গনির্ম্মাণ, রাজনিক সীমা; নেটিবের উপর অত্যাচার; রাজার উপর রাজাগিরির প্রয়াস,—সেই সবই। মাসোনাভূমে বঙ্গভূমির ন্যায় দ্বিতীয় ক্লাইবও উদিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় ক্লাইব সিঃ সিসিল রোড্‌স;—মধ্য আফ্রিক স্থান কলোনির প্রভু কর্ত্তা, ক্লাইববৎ ভারত-কহিনুরের ন্যায় কাফ্রিস্থানের কৃষ্ণ কহিনুর ইংলণ্ডের মুকুট

দ্বিতীয় ক্লাইব।

সংযোজনার্থে, লোবেঙ্গুলার বাজ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। আফ্রিক স্থানে ইংরেজ উপনিবাসী অত্যন্ত অন্যায় যুদ্ধ করিতেছেন। স্বভাব-সরল, অসভ্য অরণ্য-বাসী, বিশ্বাসী, বদান্য বন্ধুর বুকে ছুরি মারিতেছেন। ইংরেজের নিজের লিখিত ইতিহাসে, এবং তাঁহাদেরই কৃত অতীত ও উপস্থিত ঘটনাবলীর বিবৃতিতে এ কথা প্রকাশ। "গ্র্যাণ্ড ওল্ডম্যান" গ্লাডষ্টোনের মহামন্ত্রিত্বে এবং স্বতঃশান্তিপ্রিয় প্রবীণ ও ধর্ম্মভীরু লর্ড রীপনের ঔপনিবেশিক কর্ত্তৃত্বে এ ঘটনা, মাতাবেলস্থানে এই ঘোর অন্যায় যুদ্ধ আশ্চর্য্য বটে; অথবা রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অন্যায় যুদ্ধ।

য়ুরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির চক্র,—তাহারও অভ্যন্তরে চক্র,—সাধারণ বুদ্ধির বিশ্লেষের অতীত। ইতিমধ্যে রুষ ফরাশীতে প্রকাণ্ড প্রীতিবন্ধন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কষ রণ-তরী যবাশিস্ বাবিতে যাইয়া সবিশেষ আদর আহ্বান পাইয়া আসিয়াছে, যথেচ্ছাচারী জারে ও প্রজাতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্টে প্রগাঢ় প্রীতির আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। এ ঘটনায় সম্ভবতঃ কোনও কোনও রাজশক্তি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

য়ুরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল প্রজানৈতিক সমস্যা, আইরিশ আত্মশাসন বা হোমরুলবিল বৃটিশ পার্লামেণ্টের লর্ড হাউসে নিন্দিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যাভিমানী কুলীনগণ ও তাঁহাদের চিরপোষক বৃহল্লাঙ্গুল পুরোহিতগণ একবাক্যে আইরিশ প্রজার আশা ভরসা, (পার্লামেণ্টের এসেসনে) ভস্ম করিয়াছেন। উদারনৈতিক জনসাধারণে আন্দোলন উঠিয়াছে, "হাউস অব্ লর্ডস" অচিরাৎ ভূমিসাৎ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কার্য্যটি সহজ নহে। আবহমান কাল হইতে পরিপুষ্ট ও অত্যন্তবদ্ধমূল অত্যাচার-তরু, ঐশ্বর্য্য ও আত্মাভিমানের মহাবৃক্ষ, তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা, ঝাগাছা ও কুগাছার সহিত একদিনে, এক বর্ষে, এক শতাব্দে ছেদিত করা বৃটিশ আইরিশ প্রজার পক্ষেও এ অবস্থায় সম্ভব নহে। তবে স্রোত সর্ব্বত্রই ফিরিয়াছে। সময় নিজেই সময়ে এ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া, প্রচণ্ড প্রতিশোধ, অবশ্যম্ভাবী।

আইরিশ আত্মশাসন। লর্ড হাউস।

প্রাণপ্রিয় হোমরুলবিলের পরাজয়ে ও পরিবর্জ্জনে, বৃদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন প্রশান্ত গম্ভীর; সমগ্র দীক্ষিত জনসাধারণকে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, উত্তেজনামাত্রবিরহিত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। কথা উঠিয়াছিল, হোমরুল-বিলের পরাজয়ে গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রভবন ও উপস্থিত পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার সবনির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র মন্ত্রিত্ব ও পার্লামেণ্ট উত্থিত হইবে। এ কথা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু হোমরুল বিল সম্ভবতঃ উপস্থিত পার্লামেণ্টে আর উঠিবে না। পুনর্গঠিত নব পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ, একরূপ বিবেচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

মিঃ গ্লাডষ্টোন।

বিদেশীয় রাজনৈতিক ঘটনার উপসংহারে, এ স্থলে ব্রেজিল-বিভ্রাট সবশ্য উল্লেখনীয়। মার্কিন স্থানে ব্রেজিলের রাজতন্ত্রশাসন, আজ কয়েক বৎসর হইল, ধ্বংস করিয়া, বৃদ্ধ রাজাকে বিদায় দেওয়া হইয়া গিয়াছে। রাজতন্ত্র স্থলে প্রজাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী তথায় পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। অগস্ত কোমতের খিওরীর শরীরী মূর্ত্তি করিয়া, শুল্লিলাম নাকি এই সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি, কিন্তু, তাহাও টিকিতেছে না। প্রজাতন্ত্র মহাপ্রলয় ঘটাইয়াছে। ব্রেজিল কংগ্রেসের চারি জন মাত্র সেনের একত্র হইয়া, কি জানি কি স্বকার্য্য উদ্ধারার্থে, প্রজাতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থঅপচয়ের অভিযোগ উত্থাপন করে রাজ্যের সৈনিকদল

মেশ্বরচতুষ্টয়ের মাঝে মিশে; ফল,—রাও রাজধানী আক্রান্ত, সৈন্যবলবেষ্টিত, বিপর্য্যস্ত ও 'বোল্ডার্ড' হইয়াছে। প্রজা-শোণিতে প্রজাতন্ত্র ভাসমান। পুনর্ব্বার রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠিয়াছে।

বীর ও শিক্ষক।

ফরাশিস্ বীরত্বের এবং বৃটিশ শিক্ষকতার দুই মহাবধী, যথাক্রমে মার্শেল ম্যাকমাহন ও প্রফেসর জোয়েটের মৃত্যু, বীরত্ব ও বিদ্যার ইতিহাসের দুই অধুনা-সংঘটিত ঘটনা।

ভারতীয় রাজনীতি।

স্বদেশীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অব্যবহিত অতীত বা উপস্থিত ঘটনাবলী,—নব ভাইস্রয়-নিয়োজন, ডুরাণ্ড মিসন, গল্ফিকা ও অহিফেন কমিসন, বিনিময়প্রশ্ন এবং বিহার কেডাষ্ট্রাল সম্বন্ধে পুনশ্চ বাগ্‌বিতণ্ডা, গবর্ণমেণ্টের সদভিপ্রায়ে এবং সৎকার্য্যে বিহারের ধনকুবের, প্রজাশোণিতপিপাসু জমীদারমণ্ডলীর পাপপ্রণোদিত ধারাবাহিক প্রতিবাদ। পরন্তু গো-সমস্যা-বৃটিশ-ইণ্ডিয়ার রাজনীতির এক কঠিন প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাইস্রয়ত্ব দ্বারে দ্বারে।

ভারতীয় ভাইস্রয়ত্ব পৃথিবীর একটি অতি প্রধান পদ। এ পদ অর্পিত হইতে এবার প্রায় দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব মেধাবী মন্ত্রী লর্ড ক্রোমারকে প্রথমতঃ এ পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ হয়, তিনি অসম্মত হন, পরে ভারতের ভূতপূর্ব্ব সৈনিকসচিব, কুইন্‌স্‌লেণ্ডের গবর্ণর, বৃদ্ধ স্যর হেনরী নরম্যান উহা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। অহিফেন কমিসনের প্রেসিডেণ্ট লর্ড ব্রেসিকেও শুনিলাম নাকি এ পদ প্রদান করার কথা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আরও অনেক লোকের নাম এ পদের সহিত সংযুক্ত হইতে যাইয়া হয় নাই। অতঃপর, দ্বারে দ্বারে পসরা করিয়া ফেরার পর, লর্ড এলগিন এ পদ গ্রহণ করিয়াছেন, আগামী জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে তিনি ভারতভূমে আসিয়া পদার্পণ করিবেন। লর্ড এলগিন যুবা পুরুষ, তাঁহার এখন প্রথম প্রৌঢ়ত্ব মাত্র, বয়ক্রম ৪০ কেবল উত্তীর্ণ হইয়াছে, তিনি সুশিক্ষিত—য়ুনিভারসিটীর গ্রাজুয়েট: সর্ব্বোপরি ভারতীয় ভাইস্রয়ত্বের পৈতৃক শোণিত তাঁহার শরীরে শিরায় প্রবাহিত। তদীয় পিতা ভারতের জনৈক ভূতপূর্ব্ব ভাইস্রয় ছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ অবগত আছেন। অতএব, এলগিন নাম ভারতের সহিত ভারতীয় ভাইস্রয়ত্বের সহিত সংবদ্ধ।

ইহা ভিন্ন, ভারতের এই "নবভূপতি" লর্ড এলগিনের গুণ-গরিমা, ক্ষমতা-দক্ষতা ও রাজনৈতিক নৈপুণ্যের অতীত স্মৃতি বা পূর্ব্বপরিচয়, সবিশেষ আর কিছুই নাই। না থাকুক,—(থাকা বা না থাকাতেই বা অধিক কি,) লর্ড এলগিন উৎকৃষ্ট শাসয়িতা হইবেন আমরা আশা করি,—অনেকেই করেন। আর, লর্ড ল্যান্‌সডাউন যে কার্য্য করিয়া গেলেন, লর্ড এলগিনই বা তাহা না করিতে পারিবেন কেন? আমরা ইতর-জনসাধারণের সাধারণ অভিমত পুনরুক্ত করিয়া বলি, "কেহ করে না, কেহ করায়ও না; করে ও করায় মহারাণীর বা ইংরেজ জাতির "এবম্বাল" অর্থাৎ সৌভাগ্য।"

ডুরাণ্ড দৌত্য।

কাবুল দৌত্যে ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান সেনানায়ক লর্ড রবার্টস্ যাইবেন প্রথম স্থিরীকৃত হয়। আফগান আমীর রাজনৈতিক কৌশলে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে, পররাষ্ট্র-বিভাগের স্যর মর্টিমার ডুরাণ্ডের দৌত্য আমীর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া, দৌত্য সম্ভবতঃ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ডুরাণ্ড-মিশন আমীর অতি আদরে, সসম্ভ্রমে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৌত্য-সৎকার সাবধানে ও সযত্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। দৌত্য-কার্য্য—তাহার আনুষঙ্গিক শলা-

পরামর্শ, সন্ধি-মন্ত্রণা, ও আদান প্রদান শেষ করিয়া, স্যর ডুরাণ্ড কাবুল হইতে প্রত্যাগত-প্রায়। দৌত্য-ফল,—গুপ্ত-সন্ধি গোপন থাকা উচিত, অনেক সময়ে, বিশেষতঃ আফগান ব্যাপদেশে, রাজনৈতিক আবশ্যকতা; অতএব ডুরাণ্ডের দৌত্য-ফল অপ্রকাশই আছে। তবে আধ-সরকারী ও আধ-সাধারণ সংবাদপত্র,—পাওনিয়রের প্রমুখাৎ যতটুকু প্রকাশ, তাহাতে জানা যায় যে, ভারত সীমান্তের কোনও কোনও আফগান-অধিকার আমীর ইংরেজকে অর্পণ করিয়াছেন,—যাহা অধিকারে রাখা একান্ত আবশ্যক, তাহাই কেবল আফগানশাসনাধীন রাখিয়াছেন। এ সূত্রে চিত্রল রাজ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। আমীর অবশ্য এ সব নিজের বন্দোবস্ত করেন নাই। এ হিসাবে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা পাইবেন। তদুপরি বার লক্ষ,—এ বার লক্ষ তিনি বরাবরই পাইয়া আসিতেছেন; এখন একুনে আঠার লক্ষ করিয়া পাইবেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বরাজ্যে সামরিক উপাদাননির্ম্মাণ ও সংগ্রহাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এ অধিকার কি পূর্ব্বে আমীরের ছিল না? আফগানচরিত্র ইংরেজ-চরিত্র অপেক্ষাও অধিকতর বিচিত্র হইলেও, এ সময়ে আমীরের সহিত এই নবীন সন্ধি-বন্ধন ও মিত্রতার পুনর্মিলন,—সবিশেষ সন্তোষপ্রদ; কেন না, মধ্য-এসিয়ার রুষ-সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে,—নবীন লাট লর্ড এলগিন্ নিজ মুখেই সম্প্রতি বিলাতে এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গঞ্জিকা ও অহিফেন কমিশন দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়; ইহাঁরা উপরি-উক্ত উভয় মাদকের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া দেশময় ঘুরিতেছেন। পাদ্রী-সমাজ প্রধানতঃ গাঁজা আফিমের প্রচণ্ড প্রতিবাদী—কিন্তু তাঁহারা সুরা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, ইহা বড় বিসদৃশ। সুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সর্ব্বনাশিনী, কিন্তু সে সম্বন্ধে কথাটি নাই, কমিসন ত কল্পনাতীত। তবে গাঁজা আফিম, মদ অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর বলিয়া, আমরা তাহার অপব্যবহার সমর্থন করি না।

আফিম, গাঁজা।

মাদক দ্রব্য মাত্রেরই অল্পাধিক অতিরিক্ত ব্যবহার অনিষ্টকর, নিন্দনীয়, অধর্ম্মকর; কিন্তু, তাহাদের পরিমিত ব্যবহার অনেক স্থলে সময়ে এবং অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী; সংস্কারকদিগের সর্ব্বাগ্রে এ কথা প্রণিধান করা উচিত। যাহা সঙ্গত, সম্ভব এবং মানবসমাজোপযোগী, তাহারই আদর্শ অনুসরণ ও তাহারই অনুধ্যান করা বিধেয়। আকাশ-কুসুম প্রস্ফুটিত করিবার প্রয়াস বৃথা, তাহাতে কেবল শক্তিক্ষয় ও অপব্যয়। গাঁজা আফিম কমিসনে কাঙ্গাল করদাতার যে অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে, ইহা না হইলে অনায়াসেই চলিত, মানবসমাজের সুনীতি এক ইঞ্চিও খর্ব্বীকৃত হইত না, আর এতদ্দ্বারা যে তথায় পুণ্য-স্রোত এক ইঞ্চিও প্রসৃত হইবে, তাহা নহে। তবে কেন এ কর্ম্মভোগ? গাঁজা আফিমের কর হইতে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিলেও গাঁজা আফিমের চলন নিবারিত হইবে না, বরং বর্দ্ধিত হইবে।

বিনিময়বিভ্রাটে বিলাতি সাহেব রাজপুরুষদিগের ক্ষতিপূরণোপায় ভারতীয় অর্থকোষ হইতেই কথা হইয়াছে। কিন্তু টাকশালে স্বর্ণমিতি চালাইয়া বা টাকশালে মুদ্রণার্থে বেসরকারী রৌপ্যগ্রহণ বন্ধ করিয়া, বিনিময়বিভ্রাটের প্রতিকার বা প্রশমন হয় নাই। তদ্দ্বারা বিভ্রাট বরং বেশি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাজারের স্বর্ণরৌপ্যসংবাদেই তাহা প্রকাশ। মার্কিনে সাবমণ আইন রহিত হইয়া রৌপ্যক্রয় রহিত হইয়াছে; অতএব রৌপ্যের স্বর্ণমূল্য প্রায় মৃত্তিকায় পরিণত হইবার আসন্ন সম্ভাবনা। মার্কিন সম্পূর্ণরূপে দ্বিধাতুর পক্ষপাতী হইয়াছেন; কিন্তু হইলে কি হইবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মত। বিলাতে দুই ধাতুর,—স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার যুগপৎ প্রচলন না হইলে, বিনিময়বিভ্রাটে ভারতের রক্ষা নাই।

বিনিময়বিপদ; স্বর্ণ ও রৌপ্য।

অস্তগমনোন্মুখ বড়লাট লর্ড ল্যান্‌সডাউন এবং একটিং ছোটলাট স্যর্ এন্‌টনি ম্যাক্‌-ডোনেল, উভয়েই হিন্দু মুসলমান প্রজা সম্বন্ধীয় অপক্ষপাতিনী রাজনীতির তৌল কাঁটা ঠিক রাখিবার জন্য, গো-বিভ্রাটব্যপদেশে হিন্দু মুসলমান দুই সমাজকেই নরম গরম উপদেশ দিয়াছেন। অতি উত্তমা কিন্তু এ ব্যাপারে কেবল উপরি-উক্ত দুই সমাজ নহে,-তৃতীয় একটি "সর্ব্বশক্তিশালী" সমাজ সংলিপ্ত আছেন, তাহার কথা কেহই পাড়েন নাই, গণনার মধ্যেই আনেন নাই। কিন্তু তাহা আনা উচিত। গণিতাঙ্কেই হউক আর রাজনৈতিক অঙ্কেই হউক, গণনা ঠিক না হইলে, অঙ্কফলে প্রমাদ ঘটে। বড়লাট ও বঙ্গীয় লাট অন্ততঃ বাক্যে যে পথ এবং নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোটলাট অন্ততঃ বাক্যে এবং কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে, সেই পথ এবং সেই নীতি অনুসারে চলিলে বা চালিত হইলে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিভ্রাট অতটা বাড়িতে পাইত না, ইতর শ্রেণীর হিন্দুসাধারণের হৃদয় যুগপৎ অতটা উদ্বেলিত ও অবসন্ন হইত না,—ইহা আমাদের ধারণা, অনেকেরই ধারণা। বড়লাট তাঁহার আগ্রা "আড্রেসে" যে সদুপদেশ মার্ণাকুলার সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের উদ্দেশে ব্যয়িত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশও স্যর ক্রশথোয়েট, তাঁহার পরামর্শদাতা, সহকারী ও সবর্ডিনেটদিগের শিক্ষার্থে প্রথম কল্পে ব্যয় করিলে, উপযুক্ত ইষ্টকর ও তৎকালীন আশুসুফলপ্রদ হইত। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। বড়লাটের আগ্রা-বক্তৃতার আর একটা কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়লাট মুসলমান-দিগকে আবৃত ও স্বাধ-গুপ্ত স্থানে গোবধ করার উপদেশ দিয়া, হিন্দুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুস্থানে গোবধ বন্ধ হইবে না, ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও।' এ কথা খুব সরল কথা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থানে হিন্দুসাধারণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া এরূপ মর্ম্মান্তিক কথা কহা, অন্ততঃ রাজনৈতিক সতর্কতা ও সুশীলতার পরিচায়ক হয় নাই। বাক্যপ্রতিনিধির একটা কথাতেও অনেক আসে যায়। কথাটা কহার আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না, তাহাতেই সন্দেহ,—যদি একান্তই প্রয়োজন ছিল, তবে কথাটা প্রকারান্তরে এবং কিঞ্চিৎ মোলায়েম করিয়া কহিলেই হইত। কেন না, তাহা হইলে হিন্দু ও জৈনাদি গোরক্ষক সমাজের হৃদয়ে অনর্থক এত ব্যথা দেওয়া হইত না। ইহাতে কেবল এক দিক দিয়া তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া হয় নাই; সকল দিক দিয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের চিরপরাধীনতার স্মৃতি,—মুসলমান ও ইংরেজ অধীনতার সুপ্তস্মৃতি, অজ্ঞাতে জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'দেখ হিন্দু, হিন্দুস্থান আর হিন্দুর দেশ নহে,—ইহা আগে ছিল মুসলমান নবাবের, এখন ইংরেজ পাতসাহার, ইঁহারা উভয়েই গো-ভক্ষক, অতএব গো-হত্যা হিন্দুর প্রাণঘাতী, পুণ্য ও পরলোকঘাতী মহাপাতক হইলেও, হিন্দুস্থানে গোহত্যা অবশ্যই হইবে।' এরূপ সাংঘাতিক কথা কহিয়া সাংঘাতিক স্মৃতি সজাগ করা, রাজোচিত বিশেষতঃ বিজাতীয়রাজোচিত হয় নাই।

গো-বিভ্রাট।

মুসলমান গোহত্যা করেন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানার্থে ও আহারার্থে, ইওরোপীয় গোহত্যা করেন বা মুসলমানের হাতে করান কেবল আহারার্থে, অতএব হিন্দুমুসলমানাদির ন্যায় ইওরোপীয় সমাজও উপস্থিত ব্যাপারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অসাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সংলিপ্ত; পরন্তু মুসলমান সমাজের সহিত ইওরোপীয় সমাজের এ সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অতএব কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাচ সরকার বাহাদুর এ ব্যাপারে কতকাংশেও "তৌল ঠিক" রাখিয়াছেন, ইহা সবিশেষ প্রশংসার্হ। পক্ষান্তরে ডাক্তার লিটনার মসলেম শাস্ত্র বিশ্লেষ করিয়া, এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিবিউতে দেখাইয়াছেন যে, বকরিদ উৎসবেও

ধর্ম্ম ও আহার।

গোহত্যা আদৌ আবশ্যক নহে। ডাক্তারসাহেব আরব্য ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত; তিনি মুসলমান শাস্ত্রে মৌলবীবিশেষ; অনেক মৌলবী অপেক্ষাও জ্ঞানী। তথাচ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তারের কথা মুসলমানসমাজ কিছুমাত্র মানিবেন, প্রাজ্ঞতা এমন আশা করিতে পারে না। মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় গোহত্যা করিবেন করুন; তবে সরকার বাহাদুর যেরূপ ভাবে করিতে বলিতেছেন, তাহাই করুন। কিন্তু যে সকল স্থলে কেবল আহারার্থেই গোহত্যা লইয়া প্রশ্ন, সে সকল স্থলে তাহা, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও প্রশমিত করা কি সম্ভাবিত নহে? সৈনিক গোরা লোকের আহারার্থেই বেশি বেশি গোহত্যা হইয়া থাকে। সংপ্রতি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণ করা গোরা লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে ইষ্টকর না অনিষ্টদায়ক? অনিষ্টকর বলিয়াই অবশ্য এ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্ভবই এ প্রশ্ন মীমাংসিত করিবার কল্পনা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। যদি এমন সিদ্ধান্ত হয়,—আমরা আশা করি এমনই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে গোরা লোকের আহারের জন্য এত গোহত্যার আবশ্যক হইবে না। পরন্তু গো-খাদক মুসলমানদিগের মধ্যেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অধিক, অতএব গো-ভক্ষণ যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর, ইহা দেদীপ্যমান ঘটনা। এতাদৃশ অবস্থায় মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই, গোজাতির উপকারার্থে, হিন্দু জাতির উপকারার্থে, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের নিজ শরীরের ও স্বাস্থ্যের উপকারার্থে, গোহত্যা অল্পাধিক প্রশমিত করিতে পারেন। শুনিলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অন্যতম মুখপত্র "সুধাকর" নামা সাপ্তাহিক নাকি বলিয়াছেন যে, ছাগ-মাংস যদি স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে অনেক মুসলমান গোমাংস ভক্ষণ করেন না। 'সুধাকরের' এই সুধাসম্মিত কথা যদি সত্য হয়,—এ কথা যদি মুসলমান সমাজের কতকাংশেরও কথা হয়, তাহা হইলে হিন্দু আদি গোরক্ষক সম্প্রদায় ইহাতে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন। তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছাগমাংসের মহার্ঘতা দূর করিতে প্রয়াস পান। অতএব সুধাকরের কথাটা প্রকৃত, কিম্বা হিন্দুকে উপহাসার্থে রস-রসিকতা, আমরা জানিতে চাই।

গো-হাঙ্গামায় দেশের গো-রক্ষণী সভাগুলি অজ্ঞাত, অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াও অযাচিতভাবে রাজনৈতিক গণনার মধ্যে আসিয়াছে। তাহাদের রাজনৈতিক মূল্যও বিলক্ষণ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, গবর্ণমেণ্টের ধারণা জন্মিয়াছে যে, গো-রক্ষণী সভানিচয় গো-রক্ষার্থে "জিহাদ" প্রচার করিতেছে। জানি না, এই জিহাদপ্রচার কতটা সত্য। কিন্তু যদিই উহারা জিহাদপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জোরজবরদস্তিতে জিহাদ নিবারিত হইবে না, বরং বর্দ্ধিতই হইবে বলিয়া বোধ হয়। সকল দিকেই এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা ও সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করা আবশ্যক।

বিহার কেডাষ্ট্রাল সার্ভে ধনী দরিদ্র প্রবল দুর্ব্বল সংশ্লিষ্ট সমস্যা। ইহা বিহারী প্রজার জীবনমরণ সমস্যা। বৎসরের বার মাস অন্নকষ্ট পীড়িত উপবাসী রেয়তের অন্নমুষ্টির সমস্যা, ইহা অসংখ্য অত্যাচারী লোকের হস্ত হইতে অত্যাচারপীড়িত, পদদলিত প্রজাকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করার সমস্যা। পরন্তু, ইহা বিহারে সুশাসন ও সংক্রামক দুর্ভিক্ষনিবারণের সমস্যা। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যাপূরণার্থে প্রবৃত্ত। কিন্তু, প্রতিবন্ধক পদে পদে। বিহারের জমীদারসম্প্রদায় তাঁহাদের

অসুমার অর্থবল, গবর্ণমেণ্টের এই বৃহৎ ও মহৎ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বিলাতে বঙ্গে তাঁহাদের অর্থস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অর্থের দ্বারা তাঁহারা "দুধকে জল, জলকে দুধ" করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা প্রজা উভয়েরই চক্ষে ধূলা দিয়া তাঁহারা আপনাদিগের আবহমান কালের অত্যাচার অটুট রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বিহারের চাষী রেয়ৎ অত্যাচারে অত্যাচারে এবং ধারাবাহিক অনাহারে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। নিষ্পীড়নে নির্য্যাতনে তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবেই পাষাণবৎ অসাড়, অচল। বস্তুতই তাহারা বাক্যবিরহিত। জমীদারেরা উপস্থিত ব্যাপারে, এ সুযোগও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বঙ্গের তথাকথিত প্রজাহিতৈষী ও বেয়তপ্রমুখ রাজনৈতিক সংস্কারক ও সভাসমিতির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, প্রবঞ্চিত বা প্রলুব্ধ করিয়া, আপনাদিগের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই প্রজাহিতৈষী-নামধারী সভাসমিতি ও রাজনৈতিক সংস্কারকদিগের সহায়তা এহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বলাইয়াছেন যে, বিহার রেয়ত থাকবন্দি জবিপ ও "রেকর্ড অব রাইট" চায় না।

বিহারী জমিদার ও বাঙ্গালী রাজনৈতিক।

সুরেন্দ্র বাবু এ কথা বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা বিহার রেয়তের অবস্থার ও উন্নতির বিষয় কি জানেন? তথাকার জমীদারদিগের জমীদারী সেরেস্তার কোন খবর রাখেন যে, মুক্তকণ্ঠে অযথার্থ কথাগুলা কহিয়া প্রজার হিত সাধিলেন? বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কথা ধরি না, তাঁহারা এরূপ কথা বলিতে স্বতঃ পরতঃ বাধ্য, কেন না, জমিদারী স্বার্থই তাঁহাদের অস্তিত্বের হেতু। কিন্তু কোন অধিকারে, কোন অভিজ্ঞতায়, কি প্রমাণে বঙ্গদেশী প্রজাসভা ও প্রজাহিতৈষী, বিহার কৃষকের প্রাণসংহারে উদ্যত? শুনিয়াছি, আগামী ন্যাশানাল কংগ্রেসেও নাকি প্রজা-মেধ-যজ্ঞের ব্যবস্থা হইবে। এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বিচিত্র বলিতে হইবে। জমীদারপ্রদত্ত পাপ অর্থে কংগ্রেসের জীবন বহন করিবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই।

নিজ জমীদারী সেরেস্তা পরিষ্কার ও সঠিক রাখা জমীদারের নিজেরই কার্য্য। বিহার জমীদারেরা এত কাল এ কার্য্য করেন নাই নানা কারণে। গবর্ণমেণ্ট এখন তাঁহাদিগকে এই কার্য্য করিতে বলিতেছেন, বাধ্য করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের এই অপরাধ। এই অপরাধে জমীদার প্রভুরা আকাশে পাতালে, আন্দোলন তুলিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্র মাত্রই সে আন্দোলনে বাতাস দিতেছেন। এই সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের এমনই ধারণা আর এমনি বুদ্ধি যে, গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা মন্দ বা ভাল হউক, তাহাতে বাধা দেওয়া, তাহার বিরুদ্ধে লেখা, তাঁহাদের অনিবার্য্য কর্ত্তব্য। নহিলে আর দেশের এমন দুর্গতি হইবে কেন. সংবাদপত্রের মান মর্য্যাদাই বা থাকিবে না কেন! এই সার্ভে সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, গবর্ণমেণ্ট মিনিটে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক কথা আমরা অবগত আছি, এবং অবগত হইবার উপায় আমাদের আছে। আবশ্যক মতে বিহার জমীদার ও রেয়ত, উভয়েরই নাড়ী নক্ষত্র বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখাইব যে, কেডাষ্ট্রাল সার্ভে ও রেকর্ড অব রাইট অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন, এবং তাহার সমস্ত ব্যয় জমীদারবর্গপ্রদায় ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বহন করিতে বাধ্য। অনেক হেতুর মধ্যে তাহার একটা হেতু এই যে, গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে প্রজার ন্যায় জমীদারও আর্থিক সম্বন্ধে অনেক স্থলেই বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। তবে, প্রণমোক্তের প্রতি শেষোক্তের অত্যাচার ও অন্যায় দাবী ইহাতে কমিবে বটে। অত্যাচার ও অন্যায্য দাবীর প্রলোভেই জমিদারেরা সরকারী কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া লোকহিতকর সৎকার্য্যে বাধা দিতেছেন।

জবিপের ব্যয় জমীদার দিতে বাধ্য।

সমাজনীতি।

সময়-স্রোত বহুসংখ্যক সামাজিক সমস্যা হিন্দুসমাজের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। কাল প্রবাহ হিন্দু সমাজকে সম্বোধন করিয়া অনবরত বলিতেছে, "হে হিন্দুসমাজ! মৎকর্ত্তৃক আনীত এই সকল সামাজিক সমস্যা পূরণ কর, আমার প্রশ্নের উত্তর দেও; নহিলে সংসার অচল হয়, সমাজ তরী বানচাল হয়, কার্য্য-স্রোত বন্ধ হয়, মনুষ্যজীবন নিষ্ফল হয়, অন্ন মেলা দুর্ঘট হয়, পৃথিবী পাপ-পঙ্কে কলুষিত হয়, মানব-ধর্ম্মের ধ্বংস হয়, শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞানের সংহার হয়, মনুষ্য পশুতে পরিণত হয়, তাহার পশুজীবনও বন্ধ্য হয়। তুমি সত্বর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা কর। সরল প্রশ্নের উচিত উত্তর দেও।" সামাজিক সমস্যা।

হিন্দুস্বাধীনতা ও হিন্দুরাজত্বের পতনের দিন হইতে, হিন্দুসমাজ যে ভূপতিত হইয়াছে, তদবধি আর উঠিল না। হায়! বুঝি আর উঠিবে না। অগাধ আলস্যে, অবসাদে অবসন্ন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, সকল বিষয়েই অকৃতনিশ্চয়, আত্মদেহের ভার আপনি বহিতে অক্ষম, মস্তিষ্কহীন, মস্তকহীন, বহুঅঙ্গবিহীন, হাড়ে দুর্ব্বা গজাইয়াছে, কঙ্কালে কণ্টক বৃক্ষ বৃহদায়তন হইয়াছে, সে বৃক্ষে বহুসংখ্যক বানর বন্য জীব বাস করিয়াছে, অঙ্গে অঙ্গে বল্মীক, স্তরে স্তরে তদভ্যন্তরে কীট পতঙ্গ পালে পালে প্রবেশিয়াছে, হিন্দু-সমাজ ভূপতিত, উত্থানশক্তিরহিত, উঠিয়া অঙ্গ ঝাড়া দিবার শক্তি নাই, ধড়ে ধিকি ধিকি প্রাণবায়ু বহিতেছে মাত্র। বন্ধুকুলের কণ্টকবৃক্ষকে কাটে, বল্মীককে ভাঙ্গে, সনাতনবৃক্ষ সমাজ তাহাতে ব্যথা পায়, ব্যস্ত ও বিরক্ত হয়, বেদনা করে, বৃক্ষস্থ বানরের পাল কিলকিল করিয়া উঠে. বৃদ্ধ বলে, "বাপু, বিরক্ত করিও না, আমায় বধ করিও না, আমি যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থাতেই বরং বাঁচিয়া থাকি, তোমাদের ডাক্তারী অস্ত্র-চিকিৎসায় ও ঔষধপত্রে আমার যতটুকু শ্বাস প্রশ্বাস আছে, তাহাও নিঃশেষ হইবে। তোমাদের যাহার যা খুসী হয় কর, কিন্তু আমার অঙ্গে হাত দিও না, আমার অভ্যন্তরে বাস কর, অঙ্গে হাত দিও না। আমি তোমাদের সমস্যা, সংশয় ছেদন করিতে পারিব না, তোমরা আপনারা করিয়া লও, আমার যে ভাগে যাহার ইচ্ছা বাস কর, আমার উপর তোমাদের যত দিন আস্থা থাকিবে, আমি তোমাদিগের সকলকেই আশ্রয় দিব, চিরকালই দিয়া আসিয়াছি। তোমরা আপনারা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ মর, আমার এ অবস্থায়, আমাকে আর ধরিয়া টানাটানি করা কেন?" হিন্দুসমাজ।

সমাজের এ অবস্থায় সমাজ কর্ত্তৃক কোনও সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা সময়কেই করিতে হইবে; সংস্কারকে পারিবে না, সমাজও করিবে না। তবুও যে তথাকথিত সংস্কারক মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে ও সম্পাদকীয় কলমে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) হিন্দুমতে বিবাহ যাওয়ার বিলাস-তরী সাজাইয়া হাওয়ার সংহার করেন, সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সংস্কার সময় করিবে।

কলিকাতা সহরে সম্প্রতি সর্ব্বজাতিমিশ্রিত বড়ই এক কঠিন বিভ্রাট উপস্থিত। ব্যভিচারে কলিকাতা পূর্ণ। কলিকাতা বেবিলনেরও বেশী হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতাসাগরে রাজনীতি সটান ডুবিয়া যাইতেছে, রাজপথের প্রত্যেক অলিগলিতে বিলাস ব্যভিচারের বিস্রোত ছুটিয়াছে। গণিকা অগণনীয়, দেশ বিদেশ য়ুরোপ এসিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হইতে সংগৃহীত, সংগ্রহের জন্য নিয়মিত এজেণ্ট নিযুক্ত, দিব্য দিবালোকে সৌন্দর্য্যের, সতীত্বের, তরুণী, কিশোরী, যুবতীর ক্রয় বিক্রয় চলিয়াছে। পরিমাণ প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্পূর্ণ

প্রতিবিধান সম্ভবে না, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে প্রশমনও ত সম্ভব, কিয়ৎপরিমাণে প্রশমনও ত আবশ্যক। আবশ্যক বটে, কিন্তু উপায়হীনতা একান্ত। আবর্জ্জনা আইনের অতীত। বিশেষতঃ, কেল্লা ক্যান্টনমেণ্টে কার্য্যানুরোধে বেশ্যা পোষিত হয়। আদর্শ অতি উচ্চস্থানে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের আদেশ সত্ত্বেও শুনি এ কলঙ্ক কমে নাই। ভূতপূর্ব্ব ভারতসেনাপতি লর্ড রবার্টস আপন প্রতিবাদ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সৈনিকনিবাসে এ পাপ-পদ্ধতি, "আবশ্যকীয় অমঙ্গল", necessary evil বলিয়া কথিত। সমস্যা বড়ই বিষম। কিন্তু অমঙ্গল মাত্রই আদৌ অনাবশ্যক, necessary evil কথাটাই অসঙ্গত, অযৌক্তিক, আত্ম-বিরোধী। উপস্থিত অবস্থায় বিবাহিত সৈনিকই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। পাপবহুলতার পরিবর্ত্তে ব্যয়বাহুল্য অবশ্যই শ্রেয়ঃ।

কলিকাতা সহরের পাপ-পঙ্ক যথা সাধ্য পরিষ্কার করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, প্রধানতঃ খৃষ্টীয় পাদ্রী-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের সাহচর্য্যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী সহৃদয় সামাজিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। টাউন হলে সংপ্রতি এ সম্বন্ধে এক বৃহতী সভা হইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য।

সহরের কোনও এঙ্গলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মুখে শুনি, কিয়ৎপরিমাণে প্রবাসী ব্যাসনে, অনুকরণে বা আদর্শে, কলিকাতা সহরে, শোভাবাজারস্থ রাজবুহার ভবনে,—কুমার বাহাদুরেরই যত্নে, আনুকূল্যে এবং অনুরাগে, এক বার্ণাকুলার সাহিত্য-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। আমরা এ সুসংবাদে সবিশেষ সুখী হইয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য। আর ইহাও বলা বাহুল্য যে, এই সাহিত্য-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে, কতকগুলি বড় বড় এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সংমিলনে। ইহাদের অনেকেই বার্ণাকুলার সাহিত্যসংসারে খুব বেশী বিশিষ্ট না হইলেও, এবং কেহ কেহ বার্ণাকুলার বর্ণ-বিহীনতা নিবন্ধন সুপ্রসিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, আমরা এ কথা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব, যে কোনওরূপ বিশিষ্টতাই হউক, বিশিষ্টতা বিশিষ্টতাই আকর্ষণ করে, অতএব অনায়াসেই আশা করা যাইতে পারে যে, বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও (যদি সবিশেষ বিশিষ্ট কেহ বিদ্যমান থাকেন) এই অভিনব সাহিত্য-সমিতিতে স্বতঃই আকৃষ্ট হইবেন, অন্ততঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও অগ্রসর হইবেন।

অভিনব সাহিত্য-সভা।

এই সাহিত্য-সমিতির বাঙ্গালা বা অন্য কোনও বার্ণাকুলার নাম কি শুনি নাই —কারণ ইংরেজীতে লিখিত এঙ্গলোইণ্ডিয়ান পত্রের মুখে শুনা,—অতএব ইংরেজী নামই লিখিলাম। ইংরেজী নামটি বাঙ্গালা অক্ষরে,—"বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর।"

Bengal Academy of Literature.

একাডেমি ইহারই মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে শুনিলাম, অনেক কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছেন। ইংরেজী পত্র বলিতেছেন, সে সকল কার্য্য unostentatiously কৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, সমিতি সে সকল কার্য্য করিতে ঢক্কানিনাদ করিয়া আত্ম-বিজ্ঞাপন প্রদর্শনী খুলেন নাই, নীরবে, নিশীথ নিস্তব্ধতায়, অলক্ষ্য এবং অলক্ষিত ভাবে আত্ম-গোপন করিয়া, সমিতি সাহিত্যোন্নতিকল্পে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই অতি উত্তম। সমিতি unostentatiously কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে যে, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য-ব্যবসায়ী হইয়াও, এই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধায়িনী সভার সংবাদটি পর্য্যন্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা বঙ্গভাষার নাবকতে শুনিতে পাই নাই। ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রমুখাৎ সে সংবাদ শুনিয়া

একাডেমী-কৃত কার্য্য।

তাহা প্রচার করিতেছি। ইহা অপেক্ষা unostentationএর অধিকতর পরিচয় আর কি হইতে পারে? তবে কথা হইতেছে এই যে, সমিতি সাহিত্যোন্নতির যে প্রকৃতির সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বা তাঁহাদের পক্ষে, এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা বাণীকুলার সাধারণ সংসার হইতে একেবারে অজ্ঞাতবাসের বন্দোবস্ত না হইয়া, বরং সে সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ostentation থাকিলে নেহাত মন্দ হইত না। কেন না, গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া; সাহিত্যের সাধারণী সাধনা ও সার্ব্বজনিক সংশোধন, বোধ হয়, সম্ভবে না। বলা আবশ্যক যে, সাহিত্য-সাধনার ন্যায় তাহার সংশোধনও সমিতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনে সমিতির অর্থাৎ একাডেমির, কার্য্যাবলী, মতামত, মৌলিক গবেষণা, এবং সাধারণ্যে প্রচলিত সাহিত্যের সমালোচনার বহুল প্রচার আবশ্যক, ইহা বলাই অতিরিক্ত।

বহুল প্রচার আবশ্যক।

কিন্তু, এই "একাডেমি" ইহার অজ্ঞাতবাস সত্ত্বেও যে একেবারে প্রচারকার্য্যে পরাঙ্মুখ, ইহাও বলা যায় না। কেন না, ইংরেজী পত্রেও ত ইহার অস্তিত্ব এবং—অনেকানেক কার্য্যের পরিচয় না হউক,—পর্য্যালোচনা ও প্রশংসাও ত শুনিলাম। পক্ষান্তরে ইহাও জানিলাম যে, "একাডেমি" আপনার এক "জর্নাল"ও বাহির করিয়াছেন, এবং সেই জর্নালে তাঁহার কার্য্য-বিবরণ ও সাহিত্য-কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। অস্তিত্বকাল হইতে এ পর্য্যন্ত একাডেমি চারি সংখ্যা জর্নাল নাকি প্রকাশিতও করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাবধি এ জর্নাল আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। সে যাহাই হউক, আমরা এখন হইতে, কর্ত্তব্যানুরোধে, উহার সন্ধিশের অনুসন্ধান করিব। এই একাডেমির কার্য্য-প্রণালী ও কার্য্য-বিবরণ ইংরেজী পত্রে যাহা অবগত হইলাম, তাহা প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।

একাডেমির জর্নাল।

একাডেমির সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। ইলেক্‌টিভ আইনে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়। প্রত্যেক অধিবেশনে কোনও না কোনও সদস্য কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হয়। পঠিত প্রবন্ধ "পাস" হইলে, অর্থাৎ একাডেমি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, তাহা জর্নালে বাহির হয়। একাডেমির অধিবেশন হয়, প্রতি রবিবারে। সদস্য সংখ্যা আপাততঃ ৩১ জন।

কার্য্য-প্রণালী।

একাডেমির জর্নালে বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর জীবনচরিত, এবং বাঙ্গালা নাটক এবং কাব্য সম্বন্ধে ক্রমশঃপ্রকাশ্য এক এক খণ্ড আংশিক (প্রথম) প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, অবগত হইলাম। এ সকল প্রবন্ধ কেমন হইয়াছে, এবং কে কে লিখিয়াছেন, অবশ্য জানি না। তবে, তাহাদের বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতা বিষয়েও আমরা সবিশেষ-সন্দিহান নহি। কেন না, সাহিত্যের বিকাশের ন্যায় তাহার বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতার-জন্যই একাডেমির জন্ম।

একাডেমী-প্রচারিত প্রবন্ধ।

একাডেমির আগামী অধিবেশনে যে যে ব্যক্তি যে যে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহাও দেখিলাম। প্রবন্ধ-পাঠকগণ অবশ্যই বোধ করি একাডেমির সদস্য। তাঁহারা অনেকেই সাহিত্য-সংসারে একান্ত অজ্ঞাতনামা হইলেও তাঁহাদের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে না, এ কথা আমরা কদাচ বলিতে পারি না। জ্ঞাতনামা অপেক্ষা বরং অজ্ঞাতনামায় মৌলিকতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তবে, অজ্ঞাতনামা লোকে একটানে, পৃথিবীর কোনও একাডেমির সদস্য হইতে পারেন না বটে।

আগামী অধিবেশন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ন্যায় বিলাতী সাহিত্যও একাডেমির আলোচ্য। ইহা উদার, ইহা আমাদেরও আকাঙ্ক্ষণীয়। আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়াই মাসে মাসে সহযোগী বিদেশী সাহিত্য সংক্ষেপে স্বদেশীয় ভাষায় সংগ্রহ ও সমালোচনা করিয়া থাকি।

বাঙ্গালা ও বিলাতী সাহিত্য।

একাডেমির কোনও বক্তা আক্ষেপ করিয়া (ইংরেজীতে?) বলিয়াছেন,—In Bengal we have no regular criticism of the current literature of the day to speak of. There are no reviews such as the *Academy* or the *Saturday Review* in England. Books and periodicals passing out in numbers from the hands of the printers are nor reviewed in the proper sense of the word. There is no stock-taking of the worth and value of the literary productions of Bengal. There is no recognised organ in which to try and supply the deficiency.

একাডেমির আক্ষেপ; —সাহিত্য-পত্র ও সাহিত্য-সমালোচনার অভাব।

আমরাও এরূপ আক্ষেপ বহুকাল হইতে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কেবল আক্ষেপে অভাব মোচন হয় না। বিশেষতঃ, আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অকৃতী, একক ও পৃষ্ঠপোষকবিহীন ব্যক্তি দ্বারা সাহিত্যের এ অভাব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনাই বা কি? এখন "একাডেমি" হইয়াছে, অতএব আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি যে, আক্ষেপ অভাবমোচনে কৃতকার্য্য হইবে। আশা করিতে পারি যে, উপরি-উক্ত অভাব সকল অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় "এথিনিয়ম," "একাডেমি," "স্যাটার্ডে রিবিউ" ও "স্পেক্টেটরের" মত সাহিত্য-পত্রের অভাব, চলিত সাহিত্যের প্রকৃত ও সমীচীন সমালোচনার অভাব, এবং বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকরাশির গুণাগুণগ্রহণের অভাব, একাডেমির যত্নে, আনুকূল্যে ও আগ্রহে অচিরাৎ বিমোচিত হইবে।

একাডেমি অভাব মোচন করুন।

বক্তা আরও বলিয়াছেন যে, recognised organ অর্থাৎ সুধী-সমাদৃতীকৃত, সমীচীন সাহিত্যপত্রের অভাবে, সাহিত্য-সমালোচনা প্রকাশিত করিবারও সুবিধা নাই। একাডেমির নিজেরই ত "জর্ণাল" হইয়াছে; তাহাতে আমরা দত্তর মত সাহিত্য-সমালোচনা দেখিতে পাইব, প্রত্যাশা করি।

বেঙ্গল একাডেমি বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, বলিতে পারি না। শুনিতেছি, বঙ্গীয় নাট্যশালাসমূহের শ্রুতিবধিরকর বাহ্য আওয়াজ ও আভ্যন্তরিক আড়ম্বর সত্ত্বেও বাঙ্গালা নাটকের কথা যতই কম বলা যায়, ততই ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু, এটা উৎকৃষ্ট নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাট্যশালার যুগ বলিয়া বোধ হয়। উৎকৃষ্ট নাট্যশালা ও উত্তম নাটকাভিনয় হইলে নাটকও উত্তম হইবে, আমরা এ থিওরি মানি না। বাঙ্গালীর নাট্যশালা ও নাটকাভিনয়ের কতকটা উন্নতি না হইয়াছে, এমন বলা যায় না; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ নাটক আজও একখানিও উৎপন্ন হয় নাই, এ কথা আমরা এখনও অগত্যা বলিতে বাধ্য। কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলের বিলাতি নাট্যশালা, কুইন এলিজাবেথের সময়ের নাট্যশালার অপেক্ষা সহস্র গুণ বা তাহারও বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত বিজ্ঞানের এবং শিল্পীর উদ্ভাবিত শত শত সুন্দর ও সুন্দর উপকরণে তাহা শোভিত, সজ্জিত: মনুষ্যশ্রমে এবং যন্ত্রে, ততোধিক বিজ্ঞানবলে ও শিল্প-নিপুণতার কৌশলে, সভ্যতার ও সুরুচির যত প্রকার সাজ সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে, সমস্তই আধুনিক নাট্যশালায় সংগৃহীত হইয়া সুবিন্যস্ত আছে। তাহার দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্যতুফানে, শিল্পশোভায় এবং বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যে নয়ন মন বিমুগ্ধ হয় বলিলে সব বলা হয় না, তাহার অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষা-নৈপুণ্যে ও শিল্পানুকৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসংস্থাপনে ও প্রদর্শনে নয়ন মন উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয় বলিলেও সব বলা হয় না। বলার আরও অনেক বাকি থাকে। কিন্তু তাহাতে কি? কুইন এলিজাবেথের সময়ে যত উৎকৃষ্ট ও অমর নাটক, অকৃত্রিম ও আসল নাটক উৎপন্ন হইয়াছিল, কুইন

নাটক ও নাট্যশালা।

ভিক্টোরিয়ার কালে তদনুরূপ একখানি নাটক ত অদ্যাবধি উৎপন্ন হয় নাই; তদনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক, নাটকীয় গুণে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, এমন নাটকও ত আজও দেখা যায় নাই।

বাঙ্গালা নাটক সাধারণ সংস্কৃত ধরণে গ্রথিত হয় না, হইলেও বোধ হয় এখন আর বড় চলে না। বাঙ্গালা নাটক বিলাতী নাটকের অনুকরণে বা আদর্শে লিখিত হইয়া থাকে।

আদর্শ অনুকরণে দূষিত।

অতএব আধুনিক ইংরেজী আদর্শেরই যখন এই অবস্থা, তখন তাহার এ দেশীয় অনুকরণে,—অনুকরণ যতই উচ্চ ও দেশীয়ভাবানুস্যূতই হউক,—অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমাদের বোধ হয়, এখন ইংরেজী ও সংস্কৃত আদর্শ (শেষোক্ত আদর্শ যদি অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে) ছাড়িয়া দিয়া, বাঙ্গালার নিজের যদি কিছু মৌলিকতা উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে নাটকে নিক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মৌলিকতা প্রসঙ্গকল্পে, যতই চাকচক্যবিহীন, যতই স্বল্প হউক, তবুও তাহা মৌলিক, অতএব মর্ম্মস্পর্শী। বাঙ্গালীর হৃদয় মন বাঙ্গালার নিজস্ব মৌলিকতায় খুব অল্পই গঠিত, ইহা স্বীকার করি; তাহাতে যে

মৌলিকতা আছে।

আদৌ নিজের নেটিব মৌলিকতা নাই, এমনও বলা যায় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যহৃদয় সর্ব্বত্রই মনুষ্যহৃদয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক ভাবে প্রস্ফুট করিতে কালিদাস, ভবভূতি, সেক্ষপীয়রাদির তুল্য প্রতিভা প্রয়োজন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে, পুরাতন মহাকাব্যের কবিদিগের ন্যায় কালিদাস সেক্ষপীয়র দ্বিতীয় বার জন্মান আশাতীত। আর কালিদাস সেক্ষপীয়র যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত করিয়াই গিয়াছেন।

আত্মপথে চলা চাই।

তদতিরিক্ত আরও কিছুও ত এখন হওয়া প্রয়োজন। ঠিক তাই, তদনুরূপ বা তদনুযুক্ত কিছু হওয়াতে সবিশেষ পুরুষত্ব কি,—সাহিত্য-বৈচিত্র্যই বা কি? ওস্তাদ অনবরত অধ্যয়নীয়, শিক্ষণীয়, সাধনীয়, কিন্তু ওস্তাদকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা কিছুই নয়। ওস্তাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিগত প্রতিভায় এবং প্রাণগত স্পিরিটে পূর্ণ হও, কিন্তু আত্ম-শক্তি-উদ্ভাবিত পথে যথাশক্তি গমন কর, তবেই চলিতে পারিবে। নতুবা পরানুসৃত পথে পরের শক্তি ঋণ করিয়া চলিলে, পদে পদে পতন নিশ্চয়।

সার্ব্বত্ত, সার্ব্বভৌমিকতা, সার্ব্বজনিকতা ও সার্ব্বকালিকতা যদি এখনও অসম্ভব না হয়, তবে তাহা কেবল একমাত্র মৌলিকভাব মধ্যেই প্রাপ্তব্য। মিশ্র, অতিমিশ্রিত বিষম জটিল ও জড়োয়া চরিত্র হইতে পারে, কিন্তু সে মৌলিক মনোভাবেরই মিশ্রণ, নিজ মনুষ্যত্বের ভাববিরোধিতা ও ভাবানঙ্গতির মিকশ্চার অতএব মৌলিক, ইহা চরিত্রের মিশ্রভাব, কিন্তু যোগলাই খিচুড়ীর—

সার্ব্বভৌমিকতা একমাত্র মৌলিকতায় প্রাপ্তব্য।

মিকশ্চারের চরিত্র বহুদেশীয় ও বহুজাতীয় মশলাযুক্ত হইলেও, তাহাতে মৌলিকতা, সুতরাং সার্ব্বকালিকতা থাকা সম্ভবে না। চরিত্রের মিকশ্চার ও মিকশ্চারের চরিত্র, এ দুয়ে তফাৎ ঢের, এক মানুষ, অপর সঙ। সঙ প্রহসনে চলে, নাটকে চলে না। বাঙ্গালী-চরিত্রে সঙত্ব প্রচুর আছে,—বাঙ্গালা প্রহসন তত মন্দ হয় না। বাঙ্গালীচরিত্রে এ অংশ এত দেদীপ্যমান যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, সুতরাং বাঙ্গালা প্রহসন বানাইতে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনও তত লাগে না। প্রত্যহ পরি-

নাটক ও প্রহসন।

দৃশ্যমান অতি সাধারণ ব্যাপারে, রঙ চড়াইয়া খাড়া করিয়া দিলেই যেমন তেমন প্রহসন হয়। কিন্তু সাময়িক সঙের ন্যায় মৌলিক মানুষও বাঙ্গালীর ভিতর আছে। সেই মৌলিক মানুষ টানিয়া বাহির করিয়া, খাঁটি বাঙ্গালা বর্ণে

তাঁহাকে ব্যক্তিয়া, অথবা অমার্জ্জিত মৌলিক ভাবে তাহাকে দৃশ্যকাব্যে অঙ্কিত করার কথা আমরা কহিতেছিলাম। কিন্তু ইহাতে চটক, চাকচিক্য তেমন থাকিবে না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথচ জানি যে, ষ্টেজ-ম্যানেজার মহাশয়েরা, অবস্থাগতিকে চটক চাকচিক্যেরই অতিরিক্ত অতএব অযথা পক্ষপাতী। কেবল এখানে নয়, য়ুরোপে, সর্ব্বত্র। "ষ্টেজ উপযোগী" ও "ষ্টেজ এফেক্ট," এই দুইটা বিষয়ের উপরেই স্বভাবতঃ তাঁহাদের ঝোঁক বেশী। উহা বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেও এক বিন্দু এ দিক ও দিক হইতে দিতে তাঁহারা একান্ত নারাজ। বায়রণ, শেলি, ব্রাউনিংয়ের প্রতিভাও শুনিতে পাই ষ্টেজে গিয়া ষ্টেজোপযোগিতা ও ষ্টেজ এফেক্টের জন্য টিকে না। কিন্তু এ দোষ আমরা ষ্টেজ ও ষ্টেজীদিগকেই দিই। সেক্সপীয়র নিজে ষ্টেজী ছিলেন; ষ্টেজে নিজের নাটকীয় প্রতিভা নিজেই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহার পুনরুক্তির পারদর্শিতা দেখানতে আধুনিক ষ্টেজীদিগের সবিশেষ প্রশংসার বিষয় কি? অভিনয়-অব্যবসায়ী অষ্টেজী নাটকীয় প্রতিভা ষ্টেজোপযোগী করতঃ প্রদর্শন করিতে পারাই ষ্টেজীদিগের দক্ষতা। কিন্তু, তাঁহারা সে দক্ষতা, সে নিপুণতার পরিচয় দিতে না পারিয়া অত্যুচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাকেও ষ্টেজোপযুক্ত হইল না বলিয়া দোষারোপ করেন। এবং নিজেদের নাটকীয় প্রলাপ ষ্টেজোপযোগী বলিয়া সগর্ব্বাচর তাহাই অভিনীত করেন। অতএব আশ্চর্য্য নহে যে, নাট্যশালা হইতে প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভার চিরবিচ্ছেদ ঘটিতেছে, সুতরাং উৎকৃষ্ট নাটক উৎপন্ন হইতেছে না। বলা অনাবশ্যক যে, এই ষ্টেজোপযোগিতা ও ষ্টেজ এফেক্ট লইয়া সাহিত্য ও শিল্প সমালোচকদিগের সহিত, বিশেষতঃ সাহিত্য সমালোচকদিগের সহিত ষ্টেজ ম্যানেজারদিগের চিরবিবাদ। ষ্টেজ ম্যানেজারদিগের হঠকারিতা, সাহিত্যবোধহীনতা ও মনুষ্যহৃদয়ের নিগূঢ়ভাবানুভব-শক্তি-বিরহিতা, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের অভিনয়াভিমান-জনিত অতলস্পর্শী আত্মগরিমা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ বিবাদ কোনও কালে মিটিবে বলিয়া বোধ হয় না! বিলাতী ষ্টেজ ম্যানেজারদিগের উক্তি অধুনা বঙ্গীয় ষ্টেজ ম্যানেজারদিগের মুখে পুনরুক্ত হইতে কখনও কখনও শুনা যায়। তা যাউক। এ দেশীয় ষ্টেজী ও ষ্টেজ ম্যানেজারেরাও ষ্টেজোপযুক্ত ও Stage-effective করিয়া নিজে নিজে নাটক লিখিতেছেন। অতি উত্তম। ইহাঁদের মধ্যে কখনও সেক্সপীয়র সদৃশ নাটককার জন্মিবেনই না কে বলিল?

ষ্টেজোপযোগিতা ও ষ্টেজ এফেক্ট।

ষ্টেজী ও অষ্টেজী প্রতিভা।

সাহিত্য সমালোচক ও ষ্টেজ ম্যানেজার।

বঙ্গের অবস্থা।

নাটকপ্রণয়ন সম্বন্ধে আমরা উপরে একটা পরামর্শের কথা বলিতেছিলাম। সে পরামর্শটা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াসার্থে, বাঙ্গালী নাটককারের, বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালী জাতির মৌলিক চরিত্র অনুসন্ধান ও সযত্নে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। নাটকীয় উপকরণ,—নর-নারী, দৃশ্য ও ঘটনাদির সংগ্রহার্থে, রাজপুতানাদি দেশে, ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবলোকে, রাজা মান্ধাতাদির আমলে, বা পুঁথিলিখিত অতি পৌরাণিক কালে না যাইয়া, নবলোকে, বঙ্গদেশে, মধ্য ও বর্ত্তমানকালে, বাঙ্গালীর গৃহে এবং কার্য্যক্ষেত্রে আপাততঃ কিছুদিন পর্য্যটন করিলে ভাল হয় বলিয়া বিবেচনা করি। এ ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও বহুলবৈচিত্র্যবিহীন, ইহা সত্য,—ইহা সর্ব্বথা স্বীকার করি। কিন্তু, মানুষ সংকীর্ণতা ও সসীমতার মধ্য দিয়াই অসীমতা ও অনন্তে পৌঁছে, ইহা শাস্ত্রীয় সনাতন সত্য। পরন্তু, সংকীর্ণতার মধ্যে কবি-শক্তি ও কল্পনা তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে খেলে, ইহা সাহিত্য-সংসারের সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ সত্য।

পরামর্শের পুনরাবৃত্তি।

সসীমতা ও অসীমতা।

দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি, বাঙ্গলার রামপ্রসাদাদি। স্বয়ং সেক্সপীয়র ও কালিদাস যে দেশের যত পৌরাণিক কালের নাটকই লিখুন না, সংকীর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া মনুষ্য-হৃদয়ের গভীর সমস্যা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ক্লাসিক গ্রীক ট্রাজিডিয়ানদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। পক্ষান্তরে, বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালার ব্যক্তিগত ও জাতীয় মৌলিক চরিত্রের বহুল বৈচিত্র্য-বিহীনতা জন্য, নাটকে চাকচিক্য-চটুলতার যদি খুব অভাবও হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। অনেক স্থলে চটক চাকচিক্য না থাকিলেই, অভিনয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে।

পরীক্ষা প্রয়োজন।

নাটক ও নাটকাভিনয়ের এরূপ পরীক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু, এ পরীক্ষায় সৎসাহস, বিষয়গত ঐক্যবিশ্বাস, মৌলিক বুদ্ধি ও তদনুরূপ প্রতিভা চাই। দেবতত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ, ফিলজফি, ফেটালিটি প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যের আনুষঙ্গিক ও আভ্যন্তরিক উপকরণনিচয়ের কোনও উল্লেখই আমরা এ স্থলে করিলাম না। আধুনিক আলোকে তাহাদের সমালোচনা পৃথক পৃথক ভাবে হওয়া উচিত। পরন্তু সে সকলের প্রতি আধুনিক নাটককারদিগের বড় একটা দৃষ্টিও নাই। দৃষ্টি না থাকাতেই বোধ হয় এখনকার নাটকে প্রগাঢ়তার অভাব, উচ্চতর লেখার দুর্ভিক্ষ।

ডাক্তার পীয়ারসনের National Life and Character * নামক অভিনব গ্রন্থ, বিলাতী সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল আন্দোলন উত্থিত করিয়াছে। এই গ্রন্থের সমালোচনাতরঙ্গে বিলাতী বিদিত্ত নিচয়, বিগত কয়েক মাস হইতে বস্তুতই তরঙ্গিত। প্রবীণ ও নবীন সমালোচকমাত্রেই প্রায় এই গ্রন্থের, অর্থাৎ গ্রন্থনিহিত মতামতের সপক্ষ বা বিপক্ষ সমালোচনা ব্যপদেশে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। পেসিমিজিম অর্থাৎ পেচকবাদের অল্পবিস্তর অন্ধকারে ডাক্তার পীয়ারসনের অভিমতনিচয় অনুশাসিত হইলেও, চিন্তাশীলতায় ও পর্য্যবেক্ষণ-তীক্ষ্ণতায় তাঁহার এই গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীরও সবিশেষ দর্শনীয় এক সাহিত্যিক ব্যাপার। ডাক্তার পীয়ারসন আধুনিক ইংরেজী নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

পীয়ারসনের গ্রন্থ ও তাহার সমালোচনা।

"Unfortunately the age is no longer tolerant of work with a high aim."

পরন্তু,

"It has become a proverb that Shakespere spells ruin, and the exceptions to this are where popular actors give the stage version more or less infamously garbled with such gorgeousness of costume and surroundings, that the mind is diverted from the words to the presentation."

পুনশ্চ,

"We find that the serious work of modern times is never even regarded. Shelley, Browning and Tennyson are experimented on from time to time, and put away almost instantly. Byron's name has not recommended his dramas, Swinburne has never been tried."

বর্ত্তমান কালের নাট্য-রুচি ও নাট্যশালা সম্বন্ধে ডাক্তার পীয়ারসনের এবম্বিধ উক্তি, ষ্টেজ ম্যানেজার ও ষ্টেজানুরাগী ব্যক্তিদিগের অবশ্য ভাল লাগে নাই। নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরিতে মিঃ

---

* বৈশাখ সংখ্যা "সাহিত্যের" ৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

হেনরি আর্থার জোন্স, ডাক্তার পীয়ারসনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রতিবাদ স্বাভাবিক; কেন না, সত্য কথা অনেক সময়ে মনুষ্যস্বভাবের মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ হয়। ডাক্তার পীয়ারসনের কথা সত্য, সুতরাং মর্ম্মান্তিক, কাযেই

নাইটিন্থ সেঞ্চুরি। ষ্টেজপক্ষ হইতে দু দশ কথা অগত্যাই উদ্গারিত হইয়াছে।—যদি বা তদ্দ্বারা সত্যের কতকাংশও আবৃত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীর সম্মুখে সত্যের উপর আবরণ দেওয়া সুকঠিন। অতএব মিঃ হেনরি আর্থার জোন্স, অন্ততঃ অনেকের নিকট কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ডাক্তার পীয়ারসন প্রথমতঃ বলিতেছেন, এখনকার নাট্যশালার উচ্চ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়, এই নাটকীয় যুগই উচ্চ লক্ষ্যে উদাসীন।

তাহার পর বলিতেছেন, সেক্সপীয়রও নাট্যরসের সর্ব্বনাশ করেন বলিয়া শুনা যায়। তাই অনুপযুক্ত, অতিবর্ণরঞ্জিত সাজগোজে সেক্সপীয়রের নবনারীদিগকে সাজাইয়া সেক্সপীয়রের সর্ব্বনাশ করা হয়। সে এমন যে, সেক্সপীয়রের অমর বাক্যাবলী অপেক্ষা অভিনেতার সাজগোজের উপরেই লোকের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয়।

পরন্তু এখনকার গভীরভাবোদ্দীপক প্রগাঢ় নাটকীয় গ্রন্থেও নাট্যশালার শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। শেলি, ব্রাউনিঙ, টেনিসনাদির গ্রন্থ নাট্যশালার পরীক্ষাভিনয় অন্তেই তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়, বায়রণের সুবিখ্যাত খ্যাতিও নাট্যশালায় তদীয় গ্রন্থ আকৃষ্ট করে নাই। সুইনবর্ণের নাটক নাট্যশালায় কখনও অভিনীত হয় নাই।

মিঃ হেনরি আর্থার জোন্স সেই পুরাতন কথা, ষ্টেজোপযোগিতা ও ষ্টেজ এফেক্টের কথা উঠাইয়া, ডাক্তার পীয়ারসনের সত্য-উক্তি আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার যুক্তি তর্ক হইতে, মোটের উপর ইহাই প্রকাশিত হয় যে প্রকৃত প্রতিভা-উদ্ভাবিত উচ্চতর নাটকীয় গ্রন্থ ইদানী আর ষ্টেজের উপযুক্ত নয়, অতএব বাঁদর-কচকচিই বিধেয়।

তা, এই বাঁদর কচকচি হইতেছেও খুব। এরূপ নাটকের সংখ্যা অসংখ্য। নর্থ এমেরিকান রিবিউর কোনও লেখক অসংখ্য সংখ্যার আমোদিত হইয়া, আমেরিকার নাটকীয় হিসাব

নর্থ এমেরিকান রিবিউ। প্রদান করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ খানা করিয়া নূতন নাটক অভিনীত হইবার জন্য আমেরিকান ষ্টেজে প্রেরিত হইয়া থাকে। এপর্য্যন্ত দশ হাজারেরও অধিক নূতন নাটক এক মার্কিনেই লিখিত হইয়াছে।

খুব বাহাদুরী বটে। তবে, সাহিত্যের সুকুমার অঙ্গের একটা অস্বাভাবিক স্ফীতি তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। স্ফীত মাংস স্ফোটকাদি শরীরের ক্ষয়ই করে, পুষ্টিসাধন ত আর করে না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এবারকার সাধনা নানাবিধ সুখপাঠ্য সুন্দর প্রবন্ধে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রাচীন উড়িষ্যা" মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত উড়িষ্যাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির তুলনায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধটিকে অনেকটা কষ্টকল্পনা-কল্পিত বলিয়া মনে হয়। "সমাপ্তি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প। আমরা বহুদিন

পরে মাননীয় রবীন্দ্র বাবুর একটি গল্পের প্রশংসা করিবার অবকাশ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার পুরুষপ্রকৃতি, চঞ্চলস্বভাব মৃন্ময়ী, তাঁহার পাড়াগেঁয়ে ইষৎ বেঙ্গল অপূর্ব্ব, অল্পের ভিতর বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গল্পভাগও মনোরম। কিন্তু, স্বামীর প্রতি চিরবিরূপ মৃন্ময়ী কেমন করিয়া সহসা পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল,—গল্পে তাহার তথ্য পাওয়া যায় না। লেখক বলিতেছেন, "গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্দ্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারী সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন, সে জানিতে পারে নাই, আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল, এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।" কিন্তু গল্পে এ কৈফিয়ৎ পাইয়া মন সন্তুষ্ট হয় না। লেখককে প্রতি পদে "কেন" "কেন" করিয়া বিরক্ত করিতে পাঠকের স্বাভাবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে,—এবং নিপুণ ঔপন্যাসিক, প্রথমে কৌশলে পাঠকের এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া, পরে ঘটনার বৈচিত্র্য ও কারণ সংস্থান করিয়া, সেই কৌতূহলমিশ্রিত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন। রবীন্দ্র বাবু যদি কারণ ও ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া, মৃন্ময়ীর হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গল্প সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। মৃন্ময়ীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন লেখক সহসা স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন,—গল্পকৌশলে তাহা ব্যক্ত করেন নাই, এই জন্য "সমাপ্তির" মাঝখানটা কেমন খাপছাড়া ও অতৃপ্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের পাড়াগাঁর বর্ণনা,—রচনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, এবং মনস্তত্ত্বের সহজ বিশ্লেষণ, এই গল্পটিকে আরও মনোরম ও প্রশংসনীয় করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্যায়াম বিজ্ঞান' নামক উপকারী প্রবন্ধটির শেষাংশ বেশ হইয়াছে। শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর "শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা" সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ। লেখিকা আমাদের সমাজের একটি গুরুতর অভাবের বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি, সমাজসংস্কারকগণের দৃষ্টি এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও আকৃষ্ট হইবে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রবি বর্ম্মা" অতি সুন্দর এবং ভাবুকতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক প্রবন্ধ। চিত্র সমালোচনা, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রথম। বলেন্দ্র বাবুর ভাষার গুণে চিত্রগুলি যেন নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ মৌলিক প্রবন্ধ ভাবার গৌরব। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের, "কালিদাস ও অশ্বঘোষ" প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণাপূর্ণ সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে সমালোচনার অবতারণা করিয়াছেন, এবং প্রশংসার বিষয় এই যে, এককালে এই উভয় শাখার আলোচনায় কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রবন্ধটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ও সমালোচনমূলক হইলেও, সাধারণের পক্ষে সুবোধ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ইংরেজ ও ভারতবাসী" চিন্তাপূর্ণ, সহৃদয়তাব পরিচায়ক উচ্চদরের প্রবন্ধ। লেখক অসামান্য দক্ষতা ও সহানুভূতির সহিত ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। ইহাতে স্বজাতিপ্রেমের সৌরভ আছে, কিন্তু পরজাতিবিদ্বেষের কণ্টক নাই, স্বজাতির দুঃখে ও অপমানে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতার পরিচায়ক কাঁদুনি নাই। সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখ্য দর্শন" এখনও চলিতেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর "পিসের লোটী ও ইস্তাম্বুল" এবারও সাহিব হইয়াছে, ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "সিকাগো মহামেলা," বেশ হইয়াছে, বিষয় কৌতূহলজনক,—রচনা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুখ' অতি-সুন্দর মধুর কবিতা।

ভারতী। আশ্বিন। এবারকার ভারতীর প্রথমেই শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাপ্রেম' নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। দুঃখের সহিত ইহাও স্বীকার করা উচিত যে, এই "মহাপ্রেমের" মহাভাব আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়া আদৌ অনুভব করিতে পারি নাই। একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই যে, "ক্ষুদ্রের" সহিত "সমুদ্রের" মিল করিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না। টানিয়া বুনিয়া ছন্দ গাঁথা যায়, কিন্তু স্বাভাবিক প্রতিভা না থাকিলে, কেবল অনুশীলনের ফলে, কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, কবিতাটি সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফল হইয়াছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক শারডেনে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান দিয়া, কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, "কৃত্রিম রেশম" প্রবন্ধে সেই সংবাদটি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র। কি কি উপাদানে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হয়, আবিষ্কারক তাহা গুপ্ত রাখিয়াছেন। কাজেই কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত প্রণালী সাধারণের অজ্ঞাত রহিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক সেই অজ্ঞাত ও অসম্পূর্ণ তত্ত্বের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। পড়িয়া সন্তোষ ও শিক্ষা, কিছুই লাভ করা যায় না। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষালের 'হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণ" এবারকার ভারতীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সচরাচর বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখা যায় না। লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের নিবেদন, তিনি যেন আরও প্রাঞ্জল ও সরল করিয়া, সাধারণের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যাহারা জ্যোতিষব্যবসায়ী নহেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহাদের আয়ত্তাধীন হইবে, বোধ হয় না। কানাই বাবু যদি সাধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্য যথেষ্ট উপকৃত হইবে। "বাঁশী" একটি গল্প। শ্রীমতী সরলা দেবী এই গল্পের প্রণেত্রী। গল্পটি অস্বাভাবিক ও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে রচনার বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু আখ্যানের ধ্রুব অভাবে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। লেখিকার "নব বর্ষের স্বপ্ন" ইহা অপেক্ষা অনেক সরল ও সুন্দর ছিল। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্ভুজ ক্রীড়া" চতুরঙ্গপ্রিয় পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিবে। লেখক বলেন, আমাদের চতুর্ভুজ ক্রীড়ায় অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, ইংরেজদিগের চতুর্ভুজ ক্রীড়া অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আমরা যদি ইংরেজদের ক্রীড়া প্রণালীর অনুসরণ করি, তাহা হইলে মন্দ হয় না। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়ের 'সিমলাতে তিন দিন" সুখপাঠ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মিসরদেশীয় সংবাদপত্র" প্রীতিকর হয় নাই। মোটের উপর, এবারকার "ভারতী"তে সুখপাঠ্য প্রবন্ধের বড় অভাব। ভারতীর 'মাসিক মাধব সমালোচনা" ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি বন্ধ হইল কেন?

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এবারকার নব্যভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম"। এই গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িয়া অনেক শেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবু যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, আমরা আশা করি, তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যকে তাঁহার অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলভাগী করিবেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের "অতীশ বা দীপঙ্কর" প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক মনোরম প্রবন্ধ। কৈলাস বাবু এই প্রবন্ধে, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের দুই একটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আশা করি, শরৎ বাবু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিবেন। "মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ ও সিদ্ধান্তদর্পণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের রচনা। প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য,—এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুরাগীগণের আদরণীয় হইবে। কিন্তু কথা এই যে, জ্যোতিষ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকগণের অত্যন্ত অজ্ঞানাভাব। অগ্রে তাঁহাদিগকে জ্যোতিষের স্থূল তত্ত্বে অভিজ্ঞ করিয়া, পশ্চাৎ এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সাধারণ পাঠকেরা জ্যোতিষালোচনায় সুখভোগ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি সুলেখকগণ যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের এ অভাব বিদূরিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির "বঙ্গের বৈষ্ণব কবি" চতুর্থ প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বেশ হইতেছে। তাঁহার অনুসন্ধান ও ভাবুকতা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'ফুলরেণু'তে এবারও কয়টি সনেট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একরার কর্ত্তব্যের অনুরোধে গোবিন্দ বাবুর কবিতার সুখ্যাতি করিতে না গাহিয়া তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি, এবং "কৃতজ্ঞতা স্বীকার' নামক তাঁহার একটি সনেটের নায়ক হইয়াছি। প্রথম চারি লাইনের আমরা অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই,—তা গোবিন্দ বাবু যদি আবার সনেট লিখিয়া আমাদের গালি দেন, ত আমরা নাচার। শেষ কয় পংক্তির অর্থ পাঠক জানিতে চাহেন কি? পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, গোবিন্দ বাবু একটি সনেটে কিশোরীর রূপের সঙ্গে নেয়াপাতি ডাবের উপমা দিয়াছিলেন। আমরা তাহা সুকবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুকরণ ও হাস্যাস্পদ বলিয়াছিলাম। গোবিন্দ বাবু তাঁহার "কৃতজ্ঞতা স্বীকারে," "হাস্যাস্পদ" ও 'অনুকরণ," এই দুটি শব্দে উদ্ধারের চিহ্ন সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতেই অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দ বাবুর বক্তব্য এই যে, "সম-আলোচক সমক সাহিত্য-পাটে আছড়াইয়া তাঁহার ময়লা কাপড় ধুইয়া দিয়াছে।" অর্থাৎ, এক জন সমালোচকের মতে তাঁহার একটি কবিতা ভাল হয় নাই, তাই গোবিন্দ বাবু তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছেন,—"আমার কবিতা তোর ভাল লাগিল না, না, তুই ধোবা।" আমরা হাস্যমুখে কেবল গোবিন্দ বাবুর সুরুচির প্রশংসা করি,—এবং যদি রাগ না করেন ত বলি যে, এইরূপে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া, নিজের কবিতাকে প্রশংসার উপযুক্ত করিলে কাজটা মন্দ হয় না। গোবিন্দ বাবুর আর একটি সনেট "রুচিফোবিয়া' ইহাতে সুরুচির পক্ষপাতী সমালোচককে তিনি 'শ্বান্" অর্থাৎ কুকুর বলিয়াছেন। (বোধ করি, কথাটা শ্বন্-ছন্দের খাতিরে বা না জানার দরুণ শ্বান হইয়া পড়িয়াছে)—গোবিন্দ বাবু নব্যভারতে নিশান উড়াইয়া বলিতেছেন, "রুচিফোবিয়ার আমি ফরাসী পাস্তুর!" বহুত আচ্ছা। বলিতে কি, আমরা গোবিন্দ বাবুর স্পর্দ্ধা, এবং নব্যভারত-সম্পাদকের সাহস ও অবিবেচনা দেখিয়া বিস্মিত ও হতাশ হইয়াছি। এক জন কবি অবস্থা গতিকে, ক্রোধবশে গালি দিয়া পদ্য লিখিয়া কবিতার অপব্যবহার করিলেন, এবং দেবীপ্রসন্ন বাবুর মত এক জন সম্পাদক সম্পাদকের দায়িত্ব ভুলিয়া, অনায়াসে তাহা পত্রস্থ করিলেন। এই দেবীপ্রসন্ন বাবুই এই সংখ্যার নব্যভারতের সমালোচনা স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—"আমরা একপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব উদ্গারিত হইতে দেখিলেই, খুব দুঃখিত হই। * * * একপ শ্লেষোক্তি হিতসাধীর যোগ্য নহে।" দুঃখ কি কেবল পরের দোষ দেখিলে উপস্থিত হয়? আশ্চর্য্য যে, অন্যকে যে কাজ করিতে দেখিলে দুঃখ হয়,—এক জন বিজ্ঞ সম্পাদকের স্বয়ং সেইরূপ কার্য্যের সহায়তা করিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না। আমরাও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ কবিতা প্রকাশ করা কি নব্যভারতের "যোগ্য" হইয়াছে?

কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এরূপ অশিষ্টাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে শত তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সাহিত্য-সংসারে এরূপ অশিষ্টব্যবহার মার্জ্জনীয় নহে মনে করিয়া, সাহিত্যের এতখানি স্থান নষ্ট করিলাম।

কবিতাকুঞ্জ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

১

স্মরণে উদিছে এবে সে সব কাহিনী,
সরমে সোহাগে সুখে বিজড়িত কথা,
বিকসিত বনফুল সুরভি যামিনী,
কাঁদিয়ে চকোর কহে মরমের ব্যথা,
কুহরে মুখর পিক, পাগল পাপিয়া;
শিথিল বাহুর পাশ, স্খলিত অঞ্চল,
তটিনী বহিয়া যায় সুখে তরঙ্গিয়া,
সুধাংশুকিরণ স্পর্শে উছলিছে জল,
তরুতলে দোলে ছায়া সমীর পরশে,
কৌমুদী পরশ মাখা ছড়ায় চৌদিকে:
সুখেতে অলস মাথা খুইয়া উরসে,
নয়ন মুখের পানে চাহে অনিমিকে;
উথলে সুখের ঢেউ হৃদয় সরসে,
হৃদয় কাননে ফুটে মালতী মল্লিকে।

২

কিঙ্কিণীর কন-কনি পশিছে শ্রবণে,
হেরিতেছি ফিরে সেই মধুর যুবতি,
সেই কণ্ঠস্বর বহে ধীর সমীরণে,
আবার বাঁধিছে গলে বাহুর লতাটী,
অঙ্গেতে হেলিছে অঙ্গ কপোলে কপোল,
কুঞ্চিত অলক পড়ে নয়ন ছাইয়া,
নীরব চরণে এবে নূপুরের রোল,
পরশ আবেশে দেহ আসে অলসিয়া।
নিশিযা সরিয়া যায় তটিনীর গাথা,
সুদূরে বহিছে যায় বসন্ত-বাতাস,
নিঃশব্দে ঘনছায়ে ঝরে' পড়ে পাতা,
নিভে যায় চন্দ্র তারা লুকায় আকাশ।
বিস্মৃতির মাঝে শুধু জাগিয়া দুজনে,
মরমে মরমে ডুবে নয়নে নয়নে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অভিসার।

১

কুঞ্জরগামিনী চলে অভিসারে,
গতি অতি মন্দ আভরণ ভারে;
কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। রোল, বণিত মঞ্জীর বোল,
বিনোদিনী চলে কুতূহলে
দোলে হার গজমতি গলে।

তনু যেন কুসুমের দাম
ঝলমিত চলচিত কাম,
নয়ন চকোর দ্বয়, স্পর্শে শ্রুতি কুবলয়
দীপ্ত আশা অধরেতে ভাষ;
সাধিগণ দেখে সাধিকায়।

তনু,—তনু পরশ লাগিয়া,
রূপ-স্রোতে চলিছে ভাসিয়া,
যৌবনের ঢল ঢল, টল মল কল কল,
সুষমায় অবনী উজোর,
অনুরাগে পরাণ বিভোর।

অদূরে মুরলী ডাকে 'রাধা।'
মধুর কিঙ্কিণী বলে 'মাধা,'
মোহন জঘন তলে, মেখলা ঝলকে ঝলে,
মৃদুল চলন চলে গোরি,
প্রবাল অধরে হাঁসি থোরি।

সখী এক বলে কত সাধে,—
"বন্ধিবসময়ী ওলো বাধে,
এনেছ আপন বশে, পিরীতি অমিয়রসে
জলদ বরণ কালাচাঁদে,
রাই ব'লে ওই বাঁশী কাঁদে"—

তোর ওই রোচিত নয়ান।
জানে বড় বিষম সন্ধান
সৌদামিনী মৃগফলে প্রেম লহ লহ ঝলে,
রাধা ব'লে তাই শ্যাম সারা,
মুরলী বরষে সুধা ধারা।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

বিদেশের পাখী।

বিদেশের ক্ষুদ্র পাখী মর্ত্ত্য-তরু-শাখে
এক রাত্রি ক'রেছিল বাস:
কেউ তা'রে চিনিল না, আপনি গাহিয়া
আপনি সে ফেলিল নিশাস।
প্রভাতে সে উড়ে গেছে, হ'য়েছে স্বাধীন,
কথাটিও যায়নি বলিয়া;
কোথা হ'তে এক-টুক আলো এনেছিল,
তাই শুধু গিয়াছে রাখিয়া।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

চাতক।

মধ্যাহ্ন গগনতলে আসিয়া চলেছে ধীরে
শরতের মেঘ নিরমল।
রবিকরদীপ্ত হ'য়ে আঁকি শত মরীচিকা,
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধ পথে ছুটেছে কেবল।
চাতক ছুটেছে পাছে পাখা দুটি বিস্তারিয়া
যাচি যাচি দে—যাচিক জল।
মধুর সঙ্গীতে তার উপলিছে মহাশূন্য,
পিপাসায় ফাটে প্রাণ—বাসনা বিফল।
মেঘ ভেসে চলে যায়, ধরিতে পারে না তায়;
ওই চাতকের মত প্রভাত সন্ধ্যায়—
কল্পনা জাগায়ে, লয়ে প্রাণে উদ্দীপনা,
আমিও ছুটিয়াছিনু তাহার আশায়।
ভেবেছিনু নিশা মোর সঙ্গীতে হইবে ভোর,
বুঝেছি আশার ফাঁদে প্রেম কি বিষম!
সে যে মন্দাকিনী-ভাবে তারকিত ছায়াপথে—
আমি সে পঙ্কিল হৃদে, দুর্ভাগ্য জীবন।

শ্রীচুনীলাল গুপ্ত।

বঙ্গ-বধূ।

মূর্ত্তিমতী নব প্রেম, সলাজ সুন্দরী,
ষোড়শী কিশোরী বালা উষার প্রতিমা,
লুকায়িত গৃহকোণে, বধূ রূপ ধরি
বঙ্গঅন্তঃপুর-মাঝে বন্ধ মধুরিমা।
ঘোমটায় আবরিত আনিন্দ্য আনন,
অবনত আঁখিপাতা কমলের দল;
বেড়ি মণিবন্ধ দুটি কনক-কঙ্কণ
জানাইছে অনুক্ষণ পতির মঙ্গল!
রাঙ্গা লজ্জা বস্ত্রে ঢাকা চম্পকবরণ
সুগোল কোমল চারু পূর্ণ তনু খানি।
নিশব্দ পদক্ষেপে করে বিচরণ,
শুনিতে পায় না কেহ অধরের বাণী।
স্নেহ-বন্দী, চিরবদ্ধ গৃহের মাঝারে,
লক্ষ্মী লুকাইয়া যেন বকুল-আগারে।

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

অভ্যর্থনা।

(কোনও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি)

পথ ভুলে এ ধরণীতে
এলি যদি, আয় যাদু। আয়,
পরাণের মমতা সে নিয়ে
দিব আজি সকল ধরায়!
স্বরগের এক বিন্দু হাসি,
কিন্নরের "সোহিনী"র তান,
পরশনে সুখে ভেসে, যে
আমাদের মাটি পরাণ।
চিরদিন অতৃপ্ত হিয়া
ধরা খানি ছিল তার তরে,
সাধ আশা পথ চেয়েছিল
চিরদিন অতৃপ্ত অন্তরে।
ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে
ওই কচি দেহের জোছনা,
মলয়ায় পড়িত কি এসে
তোরি গন্ধ, অমর বাসনা?
জগতের স্নেহ ভালবাসা
রাখিতে কি নাহি ছিল ঠাঁই,
আমাদের মাটীর ধরায়,
যাদুমণি! তুমি এলে তাই?
এখানে যে বিষাক্ত নিশাস
বুকে বুকে লুকানো অনল,
আদরে ও অভিমান ভরা
তোরে হেথা কোথা ধো'র বল?
তবু যদি দয়া করে বিধি
দেছে তোরে এ ধরা ধরায়,
দুর হো'ক বেদনা যাতনা,
আয় যাদু! বুকে আয় আয়।
উষার নবীন আলো-কণা,
চাঁদের প্রথম হাসি-রেখা,
পা'ক সুখে খা'ক চিরদিন,
শুভ হো'ক বিধাতার লেখা।
সংসারের নিঠুর পীড়নে
যাহার মরম ভেঙ্গে আসে,
তোর অই স্নেহছায়া পেয়ে
সে যেন আবার মত হাসে।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

আকবর সাহের বাল্যশিক্ষা।

সর্ব্ববিষয়োন্মুখী প্রতিভা লইয়া যাঁহারা এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইতিহাসের পরিচয় মতে, জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। কি রাজ্যশাসন, কি ধর্ম্মানুশাসন, কি যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা দেশ বিজয় করিয়া প্রাধান্যসংস্থাপন, কি লোকহিতেচ্ছা, কি রাষ্ট্রবিপ্লবসংঘটন, সকল বিষয়েই আমরা দেখিতে পাই, উল্লিখিত প্রতিভার কার্য্য পদে পদে আত্মশক্তি বিকাশ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মতে, বায়ুর গাঢ়তা, পরিবেষ্টনশীলতা দ্বারা সূর্য্যকিরণের দীপ্তি ও তীব্রতার ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী বায়ুসমূহ এই প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের চারি দিক বেষ্টন করিয়া না থাকিলে, হয় ত মার্ত্তণ্ড তেজের দীপ্তি জগতে এত সুন্দররূপে প্রতিভাত হইত না। বায়ুমণ্ডল যেরূপ এই মর্ত্ত্যে মার্ত্তণ্ডের দীপ্তিস্ফুরণকার্য্যে প্রধান সহায়, তদ্রূপ সুন্দর বাল্যশিক্ষা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞান, সর্ব্ববিষয়োন্মুখী তীব্র ও দীপ্ত প্রতিভার আরও জ্যোতিঃপ্রকাশক।

এই বৈজ্ঞানিক সত্য, সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা দেখি, মহাপ্রতিভাসম্পন্ন অনেক লোকেই আনুষঙ্গিক শিক্ষা ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশে, তাঁহাদের বাল্যশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা সহায়তা করে নাই; কেবল প্রতিভার, স্বমণ্ডলবর্ত্তী তীব্র তেজই তাঁহাদের কার্য্যের পথে চালিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। মহাত্মা শিবজী নামস্বাক্ষরের সময়ে, অনেক স্থলে ম্লানমুখ হইয়া পড়িতেন, শিশোদীয়কুলগৌরব, রাজস্থানের প্রদীপ্ত-প্রতাপ মহারাণা প্রতাপ, শিক্ষাবিষয়ে ততদূর প্রাধান্য লাভ করেন নাই। পাশ্চাত্যজগতে মহাবীর নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বিদ্যাবান ছিলেন না। অনুসন্ধান করিলে, আরও কত শত উদাহরণ আমাদের নেত্রপথে পতিত হয়।

সংসারের পথ সরল নহে। হয় ত কোনও প্রতিভাসম্পন্ন লোক, বরাবর যদি কুটিলতার প্রতিঘাত না পাইতেন, জীবনে প্রতিকূল বায়ু কখনও তাঁহার স্বাভাবিক গতি রোধ না করিত, হয় ত তাঁহার প্রতিভা অন্য পথে বিকাশিত হইত।

আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়, "আকবরের বাল্যশিক্ষা।" তৈমুরবংশের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা এই হিন্দুপ্রধান, বহুবিধ জাতি ও ভাষাসংকুল ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আকবর সাহ সর্ব্বাগ্রণী। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্ববিষয়িণী ও সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সম্প্রসারিণী শক্তির অনুগামিনী। সেই প্রতিভা, সেই বুদ্ধি লইয়া, তিনি ভারতে মোগল শাসনের প্রস্তরময় ভিত্তিমূল স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে সেই প্রতিভার অভাব হওয়াতে, তাহারা সহজেই সেই দৃঢ়বদ্ধ ভিত্তিকে অকালে বিদীর্ণ করিয়া, সুবিস্তৃত ও সুদূরসম্প্রসারিত মোগল রাজত্বের ধ্বংস সাধন করেন।

কি রণপ্রাঙ্গণে, কি প্রমোদোদ্যানে, কি ধর্ম্মানুশীলনে, কি প্রজাপালনে, কি বিগ্রহ ও শত্রুদমনে, কি সাম্যনীতি বা শাসন দণ্ড পরিচালনে, আকবর সাহ যে অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বদেশীয় সম্রাটমণ্ডলীতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য হইতে বিতাড়িত, বন্ধুবান্ধব ও পারিষদবিহীন, দুর্দ্দিন-গ্রস্ত পিতার দুরবস্থার সময়ে, বালুকাময় মরুপ্রান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যাবস্থায় প্রথম কয় বৎসর ক্রমাগত জ্ঞাতিদিগের অত্যাচার উপদ্রব ও পিতৃ-পরিত্যক্ত বিদ্রোহীপূর্ণ রাজ্যের শান্তিস্থাপনে নিযুক্ত থাকিয়া, শৈশব হইতে কঠোরতা, শ্রমসহিষ্ণুতা ও বিপদ-জালে পরিবেষ্টিত হইয়া, উষরক্ষেত্রে নিহিত বীজের ন্যায় যাঁহার পূর্ণতাবিকাশের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তিনি যে কি করিয়া এক জন সর্ব্বপ্রধান শ্রেষ্ঠপ্রতিভাশালী সম্রাট্ হইয়া উঠিলেন, তাহা উন্নত প্রতিভার জ্বলন্ত সাক্ষ্যরূপে ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে আজও দেদীপ্যমান।

বাল্যে সুশিক্ষা, কৈশোরে তাহার উন্নতি, আকবরের অদৃষ্টে ঘটে নাই। তিনি জন্মিয়াছিলেন পিতার ঘোরতর দুর্দ্দশার সময়, এবং শিক্ষাকাল তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়াছিল। বাল্যে তাঁহার শিক্ষালাভ সম্বন্ধে আবুল ফজল কেবল এক স্থলে বলিয়াছেন—"পঞ্চম বর্ষে আকবরের অক্ষর শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল।"

কিন্তু নিজাম উদ্দিন আহম্মদ নামক আর এক জন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত-লেখক ইহার আর একটু পরিস্ফুট বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন—"৯৫৩ হিজিরায় (১৫৪৬ খৃঃ) ৭ই সওয়ালে যখন আকবর চারি বৎসর, চারি মাস ও

চারি দিন বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার প্রথম অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হয়; মৌলানা আজিমুদ্দিন, তাঁহার প্রথম শিক্ষকরূপে নিযোজিত হন। বাদশাহ হুমায়ুন, হিন্দু জ্যোতিষ বিশ্বাস করিতেন, এবং নিজেও এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তিনি শুভদিন দেখিয়া শুভলগ্নে পুত্রের অক্ষর পরিচয় করাইবার দিন নির্দ্দেশ করেন। আকবর, এই সময়ে, বাল্যস্বভাবসুলভ চাপল্যে একটু আমোদ করিবার জন্য, প্রাসাদের এক স্থানে লুক্কায়িত হন। অনেক খুঁজিয়া তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বাহির করা হইল। জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলিলেন, সাধারণ মানবে যাহাকে "শিক্ষা" বলে, তাহা এই বালকের হইবে না বটে, কিন্তু কালক্রমে, অন্তর্নিহিত কোনও এক গুপ্ত শক্তির সহায়তায়, এই বালক যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইবে। সে শিক্ষা মনুষ্যের প্রদত্ত নহে, তাহাতে ঈশ্বরহস্ত দেদীপ্যমান থাকিবে।" শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতেই হউক, বা অন্য কোনও কারণেই হউক, আকবর তাঁহার প্রথম শিক্ষক আজিমুদ্দিনের নিকট কিছুতেই শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার পর, বায়াজিদ্ নামক আর এক পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষকতা করেন—তিনিও হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "এ বালক পার্থিব শিক্ষার মনোযোগী নহে—ঈশ্বর ইহাকে কোনও উচ্চতম শিক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

হুমায়ুন বাদসাহ হাল ছাড়িলেন না, তিনি মুনিম খাঁকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মুনিম খাঁ বাদসাহের উপদেশ অনুসারে, আক্ষরিক শিক্ষার সহিত রাজ্যশাসন ও রাজনীতি সম্বন্ধে মহম্মদীয় শাস্ত্রের উপদেশ, সেই কোমলমতি বালকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। অশ্বারোহণ, শস্ত্রবিদ্যা, তীর ও বর্ষাচালন, তরবারি ও বন্দুক শিক্ষা, তাঁহার আক্ষরিক শিক্ষার সহিত পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

ইহার পর, হুমায়ুনের অপঘাত মৃত্যু হইল। খাঁ খানান বৈরাম খাঁকে তিনি কুমার জালাল উদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর ন্যায় উপযুক্ত লোক আকবরের বাল্যশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈরাম নিজে এক জন কৃতবিদ্য পুরুষ। বাল্যে তৎকালে সমস্ত বিদ্যাভ্যাসের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি বাল্যজীবনে বাল্যের পণ্ডিতদিগের নিকট ইতিহাস, কবিতা ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের ন্যায় তিনিও পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সময়ে, দিল্লীর রাজসভা অনেক তাতার ও পারসীক পণ্ডিতে

পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের আদর্শে, আকবরের উপর সাংসারিক শিক্ষা প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূতন সম্রাটকে, অস্ত্র ও রাজনীতির সহিত, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মীর আবদুল লতিফ নামক এক জন মৌলভীকে পুনরায় আকবরের শিক্ষাভার দেওয়া হইল। ইহার যত্নে আকবর কতকগুলি "গজল" ও হাফিজের কবিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। কিন্তু লেখনীচালনে তাঁহার কোনও দক্ষতা লক্ষিত হইল না।

বাল্য-শিক্ষা, জীবনের উন্নতির ভবিষ্যৎ ভিত্তি। বাল্যশিক্ষক তাহার আদর্শ। পিতা মাতার প্রকৃতির ন্যায়, অনেক সময় সুশিক্ষকের প্রকৃতি, ছাত্রের বাল্য-জীবনে প্রতিভাসিত হয়। মীর আবদুল, সাম্যদর্শী ছিলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—"সাম্যবাদই জীবনের সুখ"। ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে পারস্যে তিনি "শিয়া" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁহাকে "সুন্নি" বলিয়া সকলে জানিত।

এই সুশিক্ষকের সহায়তায় আকবরের প্রথম জীবনে সাম্যনীতির ক্ষীণ দীপ্তি প্রতিফলিত হয়। এই তেজ পরে কিরূপ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁহারা তাঁহার জীবনী সবিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অবগত আছেন।

তৈমুর বংশের সকলেই বিদ্যালোচনা ভাল বাসিতেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুর হইতে হুমায়ুন পর্য্যন্ত,—বাদসাহদের ইতিবৃত্ত হইতে তাঁহাদের সকলকেই বিদ্যোৎসাহী বলিয়া জানিতে পারা যায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজ, তৈমুরলঙ্গের সমকালবর্ত্তী। হাফেজ কেবল যে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তৈমুর অনেক সময়ে, তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিতেন। তৎকালে বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিল্পবিদ্যার যতদূর প্রচলন হইয়াছিল, তৈমুর নিজের সাধের নগরী সমরখন্দ ও বোখারায়, তৎসম্বন্ধীয় পণ্ডিতদিগের যথাসম্ভব একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন।

তৈমুরবংশের মধ্যে বাবরের সহিত ভারতের সিংহাসন লইয়া প্রথম সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ কিছু বিশেষত্বাবিশিষ্ট। বাবর ভারতে মোগল রাজবংশের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সাহস এক দিকে যেমন তাঁহাকে যশ ও প্রতিভার সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, আবার অন্য দিকে শিক্ষাও তাঁহাকে পণ্ডিতদিগের অগ্রণী করিয়া তুলিয়াছে। পদ্য ও বিজ্ঞান পরস্পর বিসদৃশাচারী বিষয়, বাবর এই

দুই বিষয়েই দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের যে জীবনবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃত শব্দশাস্ত্রবিৎ ও সাহিত্যপারদর্শীর প্রকৃত প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মুখে সালাদিনের প্রশংসা ধরে না। কিন্তু বাবরের ইতিবৃত্ত অবগত হইবার যদি তাঁহাদের কোনও উপায় থাকিত, হয় ত তাঁহারা বাবরকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেন। "তারিখী রশিদি" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, বাবর "তুরকী দেওয়ান" নামক এক কবিতা গ্রন্থ ও তৎকালীন সমাজপ্রচলিত আইনকানুনের এক বহুশ্রমসাধ্য টীকাও প্রস্তুত করেন। সঙ্গীত, কবিতা, দর্শন, শাসনবিধি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল বিষয়েই তিনি দুই একখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। বাবরের জীবন যুদ্ধব্যবসায়েই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও যখন তিনি এত দূর বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিভা প্রকৃতই মানবীয় গৌরবের পরিচয়স্থান।

হুমায়ুন বাদসাহ পিতার স্বভাব পাইয়াছিলেন। সুখ দুঃখ, বিলাস, সম্ভোগ, যুদ্ধ বিগ্রহ, সকল অবস্থাতেই তিনি অবকাশ পাইলেই পুস্তক পাঠ করিতে ছাড়িতেন না। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাঁহার যথেষ্ট আয়ত্তাধীনে ছিল। তিনি এক প্রকার "গ্রন্থকীট" শ্রেণীর লোক; কারণ আমরা দেখিতে পাই, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়নের সময়েও তিনি তাঁহার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও কয়েক খানি বাছা বাছা পুস্তক লইতে বিস্মৃত হন নাই। দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি সেরসাহার এক মর্ম্মরপ্রস্তরময় বিস্তৃত প্রাসাদে বহুগ্রন্থাদিপূর্ণ এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন। দিবা রাত্রি সেই স্থানে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে পাইলে, তিনি অন্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেন। এই গ্রন্থাগারই তাঁহার জীবনের শেষ লীলাক্ষেত্র। ইহারই অধিরোহণীশ্রেণী হইতে স্খলিতপদ হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। *

পিতৃপিতামহের ও চাগ্‌টাই মোগলবংশের পৈতৃক রীতি অনুসারে, আকবরের হৃদয়ে বাল্যশিক্ষা প্রবৃত্তি, যৌবনে সেই শিক্ষার সম্যক স্ফূর্ত্তি ও প্রৌঢ়াবস্থায়, তাহার চরমোন্নতি, ইহাই সম্ভবতঃ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বাবর ও হুমায়ুন যেরূপ ভাবে বাল্যশিক্ষার অবসর পাইয়াছিলেন, যৌবনে তাহার পরিচালনার সুযোগ পাইয়াছিলেন—আকবর সাহ দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার

---

* বাবরের ন্যায় হুমায়ুনও একখানি "দেওয়ান" (কবিতা গ্রন্থ) লিখিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল বলেন, এই গ্রন্থ অনেক দিন ধরিয়া আকবরের পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছিল।

প্রাচীন মহারাষ্ট্র।

অনেকের ধারণা, মহারাষ্ট্রীয় (মরাঠা) জাতি ও মহারাষ্ট্রীয় (মরাঠী) ভাষা অতি আধুনিক। "হিন্দুপতি শিবাজী ছত্রপতি"র পূর্ব্বে মরাঠা জাতির ও তদীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। অনেকের বিশ্বাস, "শিবছত্রপতি"র সময়েই মরাঠা জাতির প্রথম অভ্যুদয় হয়। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে আমরা মরাঠা ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে মরাঠা জাতির প্রাচীনত্ব ও সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। (১)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিয়াংসিয়ং ৫৬১ শকাব্দে (৬৩৯ খৃঃ অঃ) মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশকে "মাহোলাক্‌খ" ও তদ্দেশাধিপতিকে "পুলোকিশো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই রাজ্যের পরিধি ৬ সহস্র 'লি' (১২ শত মাইল) এবং রাজধানীর পরিধি ৩০ 'লি' (৬ মাইল) (২)।" মহারাষ্ট্রপতি চালুক্য (চৌলুক্য) বংশীয় প্রবলপ্রতাপান্বিত "সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ" দ্বিতীয় পুলকেশী, হিয়াংসিয়ংএর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহারাজ পুলকেশীর সম্বন্ধে তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন:—ইনি (পুলকেশী) "ৎসতলি" (ক্ষত্রিয়) বংশোদ্ভূত। ইহাঁর নাম 'পুলোকিশে'। ইনি স্থিরবুদ্ধি, গম্ভীরপ্রকৃতি ও অতিশয় পরদুঃখকাতর। ইহার পরোপকার ও বদান্যতার ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। প্রজাগণ আন্তরিক ভক্তির সহিত সর্ব্বদা ইহার আজ্ঞা পালন ও সেবা করে।"

এই সময়ে কান্যকুব্জাধিপতি বৈশ্যবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য সমগ্র

---

(১) খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়—(মরাঠা) গণ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উন্নতি আধুনিক, এবং তদ্বিষয়ে আমাদের স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া, আমরা এ স্থলে তাহার বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

(২) হিয়াংসিয়ং বলেন, "একটি বৃহৎ নদীর পশ্চিম তীরে রাজধানীটি স্থাপিত। এই প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী।" বাদামী বা বাতাপীপুর ঐহোলী বা ঐরল্লী হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮ জন নরপতি তাঁহাকে কর দিতেন। একটি প্রস্তরলিপিতে লিখিত আছে, মহারাজ সত্যাশ্রয় পুলকেশী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়া "পরমেশ্বর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এ বিষয়ে হিয়াংসিয়ং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :— "সম্প্রতি সেই মহারাজ শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) আপনার বিজয়ী সৈন্য লইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। তিনি বহুদূরবর্ত্তী রাজ্য সকল জয় করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করেন। কিন্তু কেবল এই রাজ্যের (মহারাষ্ট্রের) অধিবাসীরাই তাঁহার শরণাগত হয়েন নাই। ইহাদিগকে সম্পূর্ণ অধীনস্থ করিবার জন্য তিনি স্বীয় রাজ্যের পাঁচ ভাগ হইতে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া, রাজ্যস্থ অতি পূর্বসেনা-নায়কদিগকে সঙ্গে লইয়া পুনঃপুনঃ স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন; কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই।" ইহা হইতেও তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়—(মরাঠা) গণের বলবীর্য্য কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় (৩)।

দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি লাট, মালব ও গুর্জ্জর (গুজরাট) দেশীয় রাষ্ট্রকূট (রাঠোর) বংশীয় কন্ধণের মৌর্য্যবংশীয় ও বনবাসী প্রদেশের কদম্ববংশীয় নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন (৪)। কোশল ও কলিঙ্গ দেশের নৃপতিগণ

---

(৩) Vide Indian Antiquity vol. VII pp. 290.

(৪) ঐহোলী বা ঐবলীর প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায়, নল, মৌর্য্য ও কদম্ববংশীয় মরাঠাগণ এই সময়ে (খৃঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) মহারাষ্ট্রদেশের স্থানে স্থানে আধিপত্য করিতেছিলেন। 'মৌর্য্য' শব্দ মরাঠাগণের কুলবিশেষবাচক 'মোরে' এই শব্দের সংস্কৃতরূপ। 'কদম' এই (কুলবিশেষবাচক) শব্দের সংস্কৃত রূপ কদম্ব। প্রাচীন কালের 'নল' উপাধিধারী মরাঠাগণ বর্ত্তমান সময়ে 'নলোড়ে' নামে পরিচিত। চালুক্যবংশীয় মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা (৪৮১ খৃঃ—৫১৩ খৃঃ অঃ) সর্ব্ব প্রথম এই মৌর্য্য, নল ও কদম্ববংশীয় মরাঠা নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া নিজের অধীনস্থ করেন। উত্তর কানাড়ার অন্তর্গত 'বনবাসীতে' কদম্ব বংশ রাজত্ব করিত। মহাত্মা কর্ণেল টড বলেন, মোরি (মোরে) জাতি সুবিখ্যাত পুমার বংশের একটি শাখা মাত্র। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, রাজপুতানার রাঠোরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মরাঠা-বংশোদ্ভূত। নাসিক ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশকে পূর্ব্বকালীন প্রস্তরলিপিতে 'মযূরখণ্ডী বা মৌর্য্যখণ্ড' বলা হইয়াছে। মৌর্য্য বা মোরে বংশীয় মরাঠাগণ এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।

তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত হইতেন। কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থ চের (মহীশূরের কিয়দংশ); চোল, পাণ্ড্য ও কেরল (মালাবার) প্রভৃতি প্রদেশের নৃপতিগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় গোবিন্দ নামক নরপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। তিনি শত শত রণতরী লইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী মালাবার দেশের নৃপতিকে বলপূর্ব্বক জয় করিয়াছিলেন। একটি আরবীয় গ্রন্থে লিখিত আছে, মহারাজ সত্যাশ্রয় পুলকেশী 'ইরাণ' দেশাধিপতি দ্বিতীয় 'খোস্রোজ'এর রাজসভায় স্বীয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (৫)। বিজাপুর জেলার অন্তর্গত মলপ্রভা নদীতীরে ঐহোলি বা 'ঐবল্লী' নামক গ্রামে ৫৫৬ শকাব্দে (৬৩৪ খৃঃ অঃ) ক্ষোদিত একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, তৎকালে মহারাষ্ট্রক (মহারাষ্ট্রদেশ) তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, ও উহাতে ৯৯ সহস্র গ্রাম ছিল। সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশী মহারাষ্ট্রকের অধিপতি ছিলেন। (৬)

চৈন পরিব্রাজক মরাঠাগণের স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

'এই দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দীর্ঘকায়, সাহসী, কৃতজ্ঞ ও বলিষ্ঠ; কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু দৃপ্ত। ইহাদের আচার ব্যবহার আড়ম্বরশূন্য ও কপটতা-বিহীন। ইহাঁরা উপকারী ব্যক্তির সাহায্য করিতে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু কেহ কোনও রূপে ইহাঁদের অপকার করিলে, ইহাঁরা তাহার প্রতিশোধ না লইয়া কখনই ক্ষান্ত হন না। কোনওরূপে অবমানিত হইলে, সেই অবমাননার শান্তির জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকেন। বিপদে পড়িয়া কেহ তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, স্বীয় ইষ্টানিষ্টের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা তাহার সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হন। অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে, তাহাকে তদ্বিষয় পূর্ব্বে না জানাইয়া কদাচ তাহার অপকার সাধন করিতে অগ্রসর হন না। যুদ্ধকালে সকলেই বর্ম্ম পরিধান ও বল্লম হস্তে লইয়া যুদ্ধ করেন। পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, কিন্তু শরণাগতের প্রাণরক্ষা করিতে বিমুখ হন না। তাঁহাদের সেনাপতিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তাঁহাদিগের প্রতি কোনও-

(৫) Vide Archeological Survey of Western India No. X pp. 90—92.
(৬) Indian Antiquary vol. VIII. pp. 243.

রূপ শারীরিক দণ্ডের বিধান করা হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগকে নারীজাতির পরিচ্ছদ পরিধান করান হয়। এইরূপে অবমানিত হইলে, পরাজিত সেনাপতিগণ প্রায়ই স্বেচ্ছাক্রমে আত্মহত্যা দ্বারা আত্ম-অবমাননার শাস্তি করেন। এই দেশের রাজার অধীনে মৃত্যুভয়শূন্য শত শত মহাবীর বাস করেন। ইহারা রণসজ্জাকালে মদিরাপানে উন্মত্ত হয়েন (৭)। এইরূপ উন্মত্ত অবস্থায় হস্তে একটি করিয়া বল্লম পাইলে, ইহাঁরা প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষীয় দশ সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্যকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে একাকী তাহাদের সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র ভীত হন না। এই অবস্থায় পথিমধ্যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, হত্যাকারী কোনও রূপে দণ্ডনীয় হন না। যুদ্ধযাত্রাকালে ইহাঁরা অতি দর্পসহকারে অগ্রসর হইতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত শত শত ক্রূরস্বভাব হস্তীকে মদিরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলেন। এবং শত্রুসেনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যুদ্ধোদ্যম হইলে ইহারা স্বয়ং অধিক পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া তাঁহাদের মদিরাপানোন্মত্ত হস্তীগণের সহিত এককালে শত্রুগণের অভিমুখে ধাবিত হন; এবং কোনও বাধা না মানিয়া, সম্মুখস্থিত প্রত্যেক পদার্থ পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে কোনও শত্রুই স্থির থাকিতে পারে না। এতদ্দেশীয় নৃপতির অধীনে এইরূপ মহাবলসম্পন্ন হস্তিসমূহ ও অতি দুর্দ্ধর্ষ বীরবৃন্দ অবস্থিতি করেন বলিয়া, তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন (৮)।

এই সময়ে অর্থাৎ চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে (খৃঃ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে) মহারাষ্ট্র দেশের ধর্ম্মজগতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের সাধারণতঃ একটু কৌতূহল জন্মিতে পারে। এই নিমিত্ত এ স্থলে সংক্ষেপে তদ্বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই সময়ে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ও পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামী নামক গ্রামে একটি প্রস্তরলিপি আছে; তাহাতে লিখিত আছে যে, চালুক্যবংশীয় (৯) বিজয়াদিত্য (৬৯৭ খৃঃ—৭৩৩ খৃঃ অঃ) নামক জনৈক নব-

(৭) পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যুদ্ধকালে ও উৎসবসময়ে মদ্যপান করিবার রীতি ছিল। ভগবান্ রামচন্দ্র ও মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনাদি সকলে পূর্ব্বকালে যুদ্ধ ও উৎসবসময়ে মদিরা পান করিতেন।

(৮) Indian Antiquary vol. VII pp. 291.

(৯) চালুক্যবংশ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রদেশে সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত

পতি বাতাপীপুরে (বাদামীতে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব), এই পৌরাণিক দেবত্রয়ের মূর্ত্তি স্থাপনা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাদামীতে প্রাপ্ত আর একটি প্রস্তরলিপির বর্ণনানুসারে উক্তবংশীয় মঙ্গলীশ নামক নৃপতি, ৫০০ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে, বাদামীর পর্ব্বতগুহায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তদুদ্দেশে প্রাত্যহিক "নারায়ণ-বলি" ও ১৬ জন ব্রাহ্মণের ভোজনের ও দরিদ্র পথিক ও ভিক্ষুকগণের প্রতি-পালনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে একটি গ্রাম দান করেন। এই বংশীয় আর এক জন নরপতি (প্রথম পুলকেশী, খৃঃ ৪৮৮ মৃত্যু) অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শিবের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির পূজাও তৎকালে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাতুষ্পুত্র নাগবর্দ্ধন (নাশিক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা) কাপালিবেশ্বর নামক রুণ্ডমালাধারী ভয়ঙ্করী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎপূজাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১০)। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে গ্রামাদি দানের (ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ) উল্লেখও বিরল নহে। চৌলুক্য-বংশীয়গণের ধ্বজে নারায়ণের তৃতীয়াবতার বরাহচিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। দেবসেনানী কুমার কার্ত্তিকেয়ের অনুগ্রহে তাঁহারা সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সপ্তমা-তৃকা তাঁহাদের কুলদেবতা। পৌরাণিক ধর্ম্মের বৃদ্ধির জন্য পর্ব্বতগুহায় দেব-

---

হয়। চালুকবংশীয় নৃপতিগণের প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা মানব্যগোত্রীয় ছিলেন। 'হারীতি' তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষ। চালুক্যগণ পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই বংশের একটি শাখা দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। জয়সিংহ নামক জনৈক নৃপতির চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে চালুক্যগণের আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। এই বংশীয় শেষ নৃপতির নাম দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা। রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গ নামক জনৈক নরপতি ৭৫৩ খৃঃ কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র দেশের সার্ব্বভৌম রাজা হন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিগণ ৯৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মহা-রাষ্ট্র দেশ শাসন করেন। তাহার পর পুনরায় চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণ মহারাষ্ট্র দেশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। খৃঃ ১১৮৯ অব্দে চালুক্য বংশের বিনাশ ও কলচুরি (হৈহয়) বংশের অভ্যুদয় হয়। কলচুরি বংশের পর সুবিখ্যাত যাদব বংশ খৃঃ ১১৮৭ হইতে ১৩১৮ অঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশ শাসন করেন।

(১০) বেত্রবতী নদীর ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এরণ নামক প্রাচীন নগরে বুধগুপ্তের এক ক্ষোদিত শিলাস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভের পশ্চিমে বিষ্ণুর মহাবরাহ মূর্ত্তি আছে, উহা উচ্চে দশ হাত। বরাহমন্দিরের পশ্চিম দিকে বিষ্ণু ও নরসিংহ প্রভৃতি দেবতার মন্দির আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভগবানের দশাবতারের কল্পনা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়।

মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার প্রথা মহারাষ্ট্র দেশে সম্ভবতঃ চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণের সময়ই (খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে) প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু জৈন ধর্ম্ম দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অগ্রগণ্যত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছিল। ঐবল্লীর প্রস্তরলিপিরচয়িতা এক জন জৈন কবি ছিলেন; তাঁহার নাম রবিকীর্ত্তি। মহারাজ সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশি তাঁহার প্রতিপালক ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিজয়াদিত্য নৃপতি একটি জীর্ণ জৈন মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন ও বিজয় পণ্ডিত নামক জনৈক সুবিদ্বান্ জৈন পণ্ডিতকে ধনদান করিয়াছিলেন। বিজয় পণ্ডিতের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সভাস্থলে বিপক্ষ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ও নিরুত্তর করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে লোকে একবাদী বা অদ্বিতীয়বাদী উপাধি প্রদান করিয়াছিল। (১১) যাহা হউক, এই সকল প্রমাণ দ্বারা ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া গেল।

পুণে (পুনা) জেলার অন্তর্গত 'ভাজে', 'বেড়সে' ও 'কার্লে' নামক গ্রাম-ত্রয়ের পর্ব্বতগুহায় নির্ম্মিত মন্দির ও চৈত্য সকলে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত যে সকল প্রস্তর লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত মন্দির ও চৈত্যসমূহ 'মহারঠি' (মরাঠা শব্দের প্রাচীনরূপ) ও 'মহাভোজ' জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও উৎসর্গীকৃত হইয়াছে (১২)। বেড়সের প্রস্তর লিপি

(১১) Vide Indian Antiquary vols. IX. pp. 127, 131; III. pp. 305; VIII. p. p. 241; IX. p. p. 123; VII. pp. 107, and J. R. A. S. (Bombay) vol III. p. p. 203/4 etc; II. pp. 4; দেখ।

(১২) Archiological survey of Westeren India No X. গ্রন্থের ভাজে নং ২, বেড়সে নং ২ ও কার্লে ২ ও ১৪নং প্রস্তরলিপির অনুকৃতি দেখ। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী ও অধ্যাপক বাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত এই প্রস্তরক্ষোদিত 'মহারঠি' শব্দের 'মহাযোদ্ধা' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কারণ, ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে 'মহারথ' বা 'মহাবথী' শব্দের অপভ্রংশে 'মহারঠ' বা 'মহারঠি' শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে। অধ্যাপক ভাগবত বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "মহারথ শব্দের প্রথমতঃ 'মহারঠ' এইরূপ অপভ্রংশ হইয়া, পরে ঐ অপভ্রষ্ট মহারঠ শব্দ কালক্রমে 'মহারাষ্ট্র' এই সংস্কৃত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকর এই মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। তিনি 'মহারঠি' শব্দকে কেবলমাত্র জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোনও কোনও প্রস্তরলিপিতে 'মহারঠ্ঠি' শব্দও দৃষ্ট হয়। আধুনিক মরাঠা জাতি ও প্রাচীন মহারঠ্ঠ বা মহারঠি জাতি এক।

পাঠে জানা যায় যে, 'মহাভোজ' জাতির সহিত 'মহারঠি' জাতির বিবাহাদি প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপিসমূহে ইহাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে 'মহারঠিনী' ও 'মহাভোজী' বলা হইয়াছে। নানাঘাটের (১৩) পর্ব্বতগুহাস্থ একটি মন্দিরের সম্মুখস্থিত দেওয়ালে কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি ও তাহাদের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রতিমূর্ত্তির শিরোদেশে "মহারঠি গনকরিয়ো" অর্থাৎ মহাবীর মরাঠা সেনাপতি, অথবা মরাঠা-জাতীয় মহাবীর, এইরূপ লিখিত আছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর এই লিপিকে খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের সময়-সাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক, ইহা দ্বারা ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে মরাঠা জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

মিসরদেশীয় ভূগোলবেত্তা টলেমীর গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে (১৫১ খ্রীঃ) মহারাষ্ট্র দেশ 'উত্তর মহারাষ্ট্র' ও 'দক্ষিণ মহারাষ্ট্র' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর মহারাষ্ট্রে "সিরোপোলেমিওস্" (শ্রীপুলোমবি) নামক শাতবাহন (১৪) বংশীয় জনৈক নৃপতি রাজ্য করিতেন। বৈঠনে (প্রতিষ্ঠানে, মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ 'পৈঠণ') তাঁহার রাজধানী ছিল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র "বলোও-কুরোস" ('বিলিবায়কুর') নামক শ্রীপুলোমবির জনৈক প্রতিনিধির অধীনে ছিল। বিলিবায়কুর, 'হিপ্পোকুরা' অর্থাৎ কোলাপুরে বাস করিতেন (১৫)।

---

(১৩) নানাঘাট—ঠানা (থানা, Tanna) মুরাটের দক্ষিণে অবস্থিত) জেলার অন্তর্গত 'মুরবাড়' তালুক হইতে (পুণে জেলার অন্তর্গত) 'জুন্নর' নামক গ্রামে যাইবার রাস্তার এই ঘাট (গিরিসঙ্কট) অবস্থিত।

(১৪) শাতবাহন—নাশিক ও নানাঘাট প্রভৃতি স্থলের প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও শাসনাদি পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, শালিবাহন বা শাতবাহন কোনও নৃপতি বিশেষের নাম নহে; উহা একটি বংশের নাম। শালিবাহন নামের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও স্থলে 'শালিবান' 'শাতবাহ' বা 'শাতবাহন' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে শাতবাহন নামই বিশুদ্ধ, 'শালিবাহন' শব্দ 'শাতবাহন' শব্দের অপভ্রংশ। কারণ প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনাদিতে সর্ব্বত্র 'শাতবাহন' নামই দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্রও স্বীয় ব্যাকরণে শালিবাহন শব্দকে 'শাতবাহন' শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জিন প্রভা সূরি (পৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে) প্রণীত 'কল্পপ্রদীপ' নামক জৈন গ্রন্থে, বাণভট্টের হর্ষচরিতে ও বাৎস্যায়নপ্রণীত কামসূত্রে শালিবাহনের পরিবর্ত্তে শাতবাহন নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদনুসারে ও "প্রাকৃতে শাত-বাহনঃ" এই বাক্যানুসারে, "শাতবাহন' নামই বিশুদ্ধ। নব্যভারত—নবম খণ্ড, নবম সংখ্যায় লিখিত শকাব্দ (৩) শীর্ষক প্রবন্ধ (৪৭৪। ৭৫ পৃঃ) দেখ।

(১৫) নব্যভারত—নবম খণ্ড (১২৯৮ সাল) নবম সংখ্যা, লিখিত শকাব্দ (৩) শীর্ষক প্রস্তাব, ৪৮২ পৃঃ দেখ।

নিম্নোদ্ধৃত তিনটি প্রস্তরলিপি পাঠ করিলে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারা যাইবে।

নাশিকের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহাস্থ একটি বিহারে ৪টি প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১ম টিতে যে বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার সারাংশ এইঃ—

গোবর্দ্ধন (নাশিক) প্রদেশের অন্তর্গত, এই ত্রিরশ্মি নামক পর্ব্বতের গুহায়, 'ক্ষহরাত নহপান' নামক নৃপতির জামাতা, দীনীকের পুত্র, পরোপকারপরায়ণ 'উষবদাত' এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উষবদাত তিন লক্ষ গাভী ও ১৬টি গ্রাম দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন। এবং বার্ণাসায়া নদীর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। প্রভাস অর্থাৎ সোমনাথপট্টনস্থ ৮জন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মার্থে নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিয়াছেন। ভরূকচ্ছ (ভোরোচ বা বরোচ), দশপুর (মালবের অন্তর্গত), গোবর্দ্ধন (নাশিক) ও শোর্পারগ (১৬) প্রভৃতি স্থানে উদ্যান, অট্টালিকা ও ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ এবং কূপ ও তড়াগাদি খনন করাইয়া দিয়াছেন। ইবা, পারদা, দমণা, তাপী (তাপ্তী) করবেণা ও দাহনুকা (১৭) প্রভৃতি নদীর উভয়তীরে পথিকদিগের সুবিধার জন্য নৌযান ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, জলসত্রস্থাপন এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এবং শোর্পারগ, গোবর্দ্ধন, সুবর্ণমুখ, পীণ্ডিতকাবদ ও রামতীর্থ প্রভৃতি স্থানে বেদের পঠন ও পাঠনার্থ পাঠশালা স্থাপন ও বেদশিক্ষয়িতা ব্রাহ্মণগণের জন্য সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়জাতীয় জনৈক নৃপতি মালয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইলে, উষবদাত স্বীয় প্রভুর অনুমত্যনুসারে বর্ষাকালেই তাঁহার উদ্ধারার্থে যাত্রা করি-

---

(১৬) শোর্পারগ—পেরিপ্লুস (৭০ খৃঃ অঃ) ইহাকে "সোপ্পর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পৌরাণিক নাম "শূর্পারক" বা "শোর্পারক"। শোর্পারক অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) প্রদেশের রাজধানী। পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া এই প্রদেশে স্থাপন করেন। (সাধনা; ৪র্থ সংখ্যায় মন্নিখিত "দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেখ।)

(১৭) এই নদী গুলি ঠানা ও সুরাটের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব সমুদ্রে পড়িতেছে।

লেন। উষবদাতের রণবাদ্যের শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র মালয়গণ ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। উষবদাত তাহাদিগকে উত্তমভদ্রজাতির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। তৎপরে তিনি পোষ্করাণি তীর্থে গমন করিলেন, এবং যথাবিধি তীর্থোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তথায় একটি গ্রাম ও তিন সহস্র গাভী দান করিলেন (১৮)।

দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিতে উষবদাতের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—৪২ অব্দে (শকাব্দে অর্থাৎ ১২০ খৃঃ অঃ) উষবদাত, চতুর্দ্দিক্‌দেশাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্য এই বিহার উৎসর্গ করিয়া দিলেন। গোবর্দ্ধন (নাশিক) রাসী গৃহাজনমণ্ডলের নিকট, বাৎসরিক ৭৫ কার্ষাপণ (১৯) (কিঞ্চিদধিক দুই শত তেত্রিশ টাকা) সুদে তিনি তিন সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বর্ষাকালে এই বিহারে যে বিংশতি জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিবেন, ঐ গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে তাঁহাদের বস্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্যের অভাব দূর করা হইবে। এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি নাশিকে একটি মহতী সভা আহূত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আদেশগুলি প্রস্তরোপরি ক্ষোদিত করিয়া, এই বিহারের দ্বারদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। ৪১ ও ৪০ শকাব্দে তিনি দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান করিয়াছেন (২০)।

ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, ক্ষহরাত নহপান ও তাঁহার জামাতা উষবদাত, পহ্লববংশীয় সত্রপ (Satrap) ছিলেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রদেশ অধিকার করিয়া ৪৫ বৎসর শাসন করেন। পরে শাতবাহনবংশীয় গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিতাড়িত হন। যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত প্রস্তর-লিপিদ্বয় পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, তৎকালে মহারাষ্ট্র দেশে, বৌদ্ধ ও আর্য্য, উভয় ধর্ম্মেরই সমান প্রভাব ছিল; তাৎকালিক নৃপতিগণও উভয় ধর্ম্মের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতেন।

নাশিকের নিকটস্থিত পর্ব্বতের অপর একটি গুহায় একটি বিহার আছে।

---

(১৮) J. R. A. S. (Bombay) vol. VII. নাশিকস্থ ১৭নং প্রস্তরলিপি দেখ।

(১৯) প্রাচীন মুদ্রাবিশেষ। ১৬ মাষা—১ কর্ষ। এক কর্ষ পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাকে কার্ষাপণ কহে।

(২০) Vide J. R. A. S. (Bombay) vol. VII. Inscription No. 18, 16. একই শাসন পত্র ঐ দুই খণ্ড প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে।

তাহাতে চারিটি প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (১৩৩ খৃঃ হইতে ১৫৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) নামক শাতবাহন বংশীয় জনৈক নৃপতির সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—"মহারাজাধিরাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অশিক, অশ্মক, মূলক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, অকরাবন্তী ও বিদর্ভ প্রভৃতি দেশের (২১) এবং বিন্ধ্যাবৎ, পারিযাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মলয়, মহেন্দ্র, চকোর ও শ্রেষ্ঠগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। বড় বড় নৃপতিগণ তাঁহাকে ভয় করিতেন ও কর দিতেন; তাঁহার পশুশালার জন্তুগণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই সমুদ্রত্রয়ের জল পান করিত। তিনি ভীতের ও শরণাগতের একমাত্র আশ্রয়দাতা ছিলেন; এবং প্রজাগণের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই পুরুষার্থত্রয়ের আলোচনার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নিরূপিত সময়ে তদালোচনায় নিরিষ্ট হইতেন। তিনি বিদ্যা ও সজ্জনগণের আশ্রয়, এবং কীর্ত্তি ও সদাচারের মন্দির ছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বর্ণসঙ্করবৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রম দেখিয়া লোকে রাম (বলরাম) কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের পরাক্রমের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রতাপে নভাগ, নহুষ, জনমেজয়, সগর, যযাতি, রাম (রামচন্দ্র) ও অম্বরীষের তুল্য ছিলেন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রুসেনার বিনাশ ও ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। শক, যবন, পহ্লব জাতির দমন ও খাগারাত বা ক্ষহরাত বংশের মূলোচ্ছেদ করেন। যে প্রাচীন শাতবাহন বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শাতবাহন বংশের বিলুপ্ত কীর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।" এই লিপির শেষ পংক্তিতে এই বিহারবাসী ভদ্রায়ন-পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের ভবণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে(২২)।

(২১) অশ্মক ও মূলক (পৌরাণিক মৌলিক) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। সুরাষ্ট্র—কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশ, বর্ত্তমান সুরত (Surat)। কুকুর—রাজপুতস্থানের অংশবিশেষ। অপরান্ত—উত্তর কঙ্কণ; (Concan) মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ 'কোঁকণ'। অনূপ—পুরাণানুসারে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। রঘুবংশানুসারে পূর্ব্ব নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী প্রদেশ; মাহিস্মতী ইহার রাজধানী। বিদর্ভ—বেরার। অকরাবন্তী—সম্ভবতঃ মালবের পূর্ব্বাংশে।

(২২) Archiological survey of W. India. No. X. Inscription No. 26 দেখ।

মহারাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণির প্রধানতম শত্রু রুদ্রদাম জুনাগড়ের প্রস্তর-লিপিতে গোতমীপুত্র শাতকর্ণিকে "দক্ষিণাপথাধীশ" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, তিনি সমগ্র দক্ষিণাপথের বা দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন। এই গোতমীপুত্র শাতকর্ণির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপুলোমবি ও তদীয় বাজ্ঞী বাসিষ্ঠীর (শ্রীপুলমবির জননীর) প্রস্তরলিপি অনুসারে, তাঁহারাও বিজনবাসী বাণপ্রস্থাশ্রমাবলম্বিগণের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

কয়লা, হীরা ও কালো সীসা বা গ্রাফাইট (যাহাতে পেন্‌সিল্ তৈয়ার হয়) এই তিনই এক পদার্থ বহুকাল হইতে শুনা যায়। কিন্তু কয়লা হইতে এ পর্য্যন্ত হীরা তৈয়ার করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে হ্যানে সাহেব প্রচার করেন, হীরা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু কথাটা শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই। সম্প্রতি ফরাসীস্ পণ্ডিত মোয়াসাঁ কয়লা হইতে হীরক উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

লোহা দ্রব অবস্থায় কয়লা খাইয়া থাকে। লোহায় কয়লা মিশিলে ইস্পাত হয়। আবার সেই ইস্পাতকে নাইট্রিক্ এসিড্ দ্বারা গলাইয়া ফেলিলে কয়লাটা কালো সীসার আকারে অবশিষ্ট থাকে। হীরক প্রস্তুতের প্রণালীও কতকটা এইরূপ। তবে লোহা যখন কয়লা খাইতে থাকে, তখন খুব চাপ দিতে হয়।

এইরূপে যে হীরকের দানা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে খনিজ হীরার তুল্য; কেবল তত উজ্জ্বল নহে; কিছু ময়লা। পাহাড় খুদিবার জন্য যে ময়লা হীরা ব্যবহৃত হয়, কতকটা সেইরূপ।

বায়ুকে খুব ঠাণ্ডা করিয়া চাপ দিলে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এটিও প্রায় পোনের বৎসরের আবিষ্কার। বায়ুর প্রায় তিন আনা অংশ অম্লজান,

এই অম্লজান জীবনের প্রধান সহায়। বরফ হইতে প্রায় ২০০ ডিগ্রি (শতাংশিক) নীচে শীতল করিয়া দেখা গিয়াছে, তরল অম্লজান অনেকাংশে লোহার মত চুম্বক ধর্ম্মযুক্ত। বড় চুম্বকের নিকট কয়েক ফোঁটা তরল অম্লজান রাখিলে তাহা লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে লাগে।

তাড়িত প্রবাহ মনুষ্যশরীরে তীব্র যাতনা দেয়। আঙ্গুলে একটি স্ফুলিঙ্গ লইলেই একটু বেদনা অনুভূত হয়। ডাক্তারি ব্যাটারি হাতে ধরিলে থরহরি কম্প উপস্থিত হয়। টিণ্ডাল সাহেব একবার বক্তৃতা করিতেছিলেন। বড় লীডেন্ ব্যাটারি হইতে অকস্মাৎ তাড়িত প্রবাহ তাঁহার শরীরে সঞ্চালিত হইবামাত্র তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয়। আজকাল আমেরিকায় ফাঁসী উঠিয়া গিয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাড়িত প্রবাহ দ্বারা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেকেণ্ডের মধ্যে দুশ পাঁচশ কি দু পাঁচ হাজার বার প্রবাহ চালাইতে পারিলে, তীব্র,—এমন কি,—সাংঘাতিক যাতনা হইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি ইতালীয় যুবক তেস্লা দেখাইয়াছেন, সেকেণ্ড মধ্যে লক্ষাধিক বার প্রবাহ চালাইতে পারিলে আর কোন কষ্টই বোধ হয় না।

বেঙাচির মধ্যে গড়ে শতকরা ৫৭ স্ত্রী ও ৪৩ পুরুষ ব্যাঙ্ উৎপন্ন হয়। এক জন জর্ম্মান সাহেব এইরূপ হিসাব করেন। পুষ্টিকর আহার যোগাইলে ৭৮ স্ত্রী ও ২২টি মাত্র পুরুষ জন্মে। ভেকমাংস নাকি বড়ই পুষ্টিকর। ভেকমাংস খাইতে দিলে ভেকজাতির পুরুষ সন্তানের সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। ৯২ স্ত্রী ও ৮ পুরুষে দাঁড়ায়। আমেরিকার ষ্ট্রীট সাহেব গুটি পোকা ও প্রজাপতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আহার যোগাইলে স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ে, আহার অনটনে পুরুষের সংখ্যা বাড়ে। শুনা যায়, মানুষের মধ্যেও দুর্ভিক্ষের সময় পুরুষ সন্তান অধিক জন্মে। ভাল বৎসরে কন্যার ভাগ বেশী হয়। ভরসা করি, অনেকে ইহা হইতে নীতি সঙ্কলন করিবেন।

মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কথাই চিরকাল শুনা যায়। কেহ বলেন, মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণে বল-জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং মাংসপেশী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু বলজ্ঞান স্পর্শ-জ্ঞানেরই ইতরবিশেষ মাত্র; ইহার জন্য আর একটা ইন্দ্রিয় না থাকিলেও চলিতে পারে। আবার ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শজ্ঞান ভিন্ন শীতোষ্ণতার বোধ জন্মায়। সুতরাং একা ত্বক দুই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। এই হিসাবে ইন্দ্রিয় ছয়টি বলা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বস্তুতঃই বাহির হইয়াছে; ইহার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। কাণের ভিতরে ইহার

হইবে। কারণ, উত্তরাধিকারী থাকিলে সে দেবালয়ের স্বামী বলিয়া অভিমান করিতে পারে। মহানদী বা মহাবালুকা পার হইয়া, কটক নগরের মধ্য-দেশ অতিক্রম করিয়া, কাটযুড়ীর পর পারে পান্থনিবাস পাওয়া গেল। সহর দেখিতে পুনর্ব্বার এ পারে আসিতে হইল। জলপ্লাবন বা শত্রুভয়নিবারণের জন্য নির্ম্মিত মর্কট কেশরীর প্রাচীর অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বারবাটী নামক দুর্গ কেবল ভগ্ন-উপল ও ভগ্ন-গৃহের স্তূপ। কিন্তু এখনও তথায় ব্রিটীশ প্রহরী পদচারণা করিতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তৈলঙ্গী তন্তুবায়দিগের একটি পল্লী দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গের মধ্যস্থলে উড়িষ্যা। উড়িষ্যাবা দেখিতে দক্ষিণী, ব্যবহারে বাঙ্গালী। উৎকল-রাজগণ হয় ত দাক্ষিণী ছিলেন; বাঙ্গালার সেন-রাজ-বংশের সহিত কর্ণাটের সংস্রব আছে। এই কটকের পথে দ্রাবিড়-সভ্যতা বঙ্গে যায়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুম্ফহীনতা ও ক্ষুরশিখা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশে একটি শ্রেণীর নাম আছে দাক্ষিণাত্য বৈদিক। যে তীর্থ পার হইয়া ভ্রমণে আসিয়াছিলাম, সে পথে না গিয়া আর এক ঘাটে পার হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ভাবিলাম ঠিক যাইতেছি, কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও পরিচিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। আমার দিক্‌নির্ণয়ে ভ্রম হইয়াছিল। প্রবল বাতাস বহিতেছে। অন্ধকারাবৃত বিজন পথে লতা গুল্ম গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। কদাচিৎ লোক সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একজনও জিজ্ঞাসিত হইয়া আলাপ করিল না। সঙ্গে টাকা আছে,—লোকে আগন্তুক জ্ঞান করিবে, এজন্য কাহাকেও উদ্দিষ্ট স্থান জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। অবশেষে, অবিশ্বাস অপেক্ষা লোকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল। দুইটি লোক মৎস্য ধরিতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে সহায় করিয়া, যেখানে আমার ভৃত্য দ্রব্যজাত লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলাম। তাহাদের সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত মমতার ভাব উদিত হইতেছিল।

প্রত্যূষে "মোকাম সহর" হইতে যাত্রা করিলাম। দুই প্রহরে সময় একাম্র-কাননের মন্দিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। অসংখ্য দেবালয়, যেন "কাশী"। মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভিখারী মহাপাত্রের সহিত কোটী-লিঙ্গেশ্বর দর্শন করিতে গেলাম। ভুবনেশ্বর দেখিতে প্রায় আমাদের কাশীর কেদারেশ্বরের মত; তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। বামার

আসিয়া পাণ্ডার প্রদত্ত কড়মাবারী ধূপ আহার করা গেল। ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন অতি কদর্য্য। পাণ্ডা আমার সহিত এক পাত্রে আহার করিতে চাহিলেন। প্রসাদগ্রহণে বর্ণভেদজনিত স্পর্শ-দোষ গ্রাহ্য নহে। কেন্দ্রাপাড়ায় দধি-বামন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের প্রসাদসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। তৈলঙ্গে শৈবগিরিস্থিত বেঙ্কট-রামের অন্নপ্রসাদভক্ষণের সময়ও পর্ব্বতের উপর বর্ণভেদ স্বীকার করা হয় না। দ্রাবিড়ে বিষ্ণু-কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম ও মধুরাপুরীস্থ মীনাক্ষীর মন্দিরে ব্রাহ্মণে ভাতের পিণ্ড বিক্রয় করে। সুতরাং শ্রীক্ষেত্রে অন্ন বিচার নাই দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কল্পনা করা অনাবশ্যক। যেমন নদী শুষ্ক হইলে তাহার দুই এক খানি বাঁক "বাঁমড়" রূপে অবশিষ্ট রহিয়া যায়, তদ্রূপ প্রাচীন প্রথা লোপ পাইলে, তাহার দুই একটি চিহ্নও ঘটনা বিশেষ বা স্থান বিশেষে পরিস্ফুট থাকে। হিন্দু আর্য্যগণ পূর্ব্বে এক বর্ণ ছিলেন, অদ্যাপি কাশ্মীরে তাহাই আছে। মানব-জাতির আদিম অবস্থায় বিবাহ ছিল না। এখনও মলয় প্রদেশে নাই। অন্যত্র এক স্থানে লিখিত আছে;—ব্রাহ্মণ যেমন বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে না, তেমনি শূদ্রান্নও গ্রহণীয় নহে। আবার আর এক স্থানে বলিতেছেন;—শূদ্র সূপকারাদি করিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে সকল জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল। এক্ষণেও স্থানবিশেষে নৈবেদ্যস্থলে সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষিত হইতেছে।

ভাল করিয়া ভুবনেশ্বর দেখিবার সময় না থাকায়, রৌদ্রের তাপ হ্রাস না হইতেই দেউলে প্রবেশ করিতে হইল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গঠন কাশীর পঞ্চক্রোশী যাত্রাপথের চারি শত বৎসরের পুরাতন কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। কিন্তু উপস্থিত মন্দিরের তুল্য বিশাল ও উচ্চ আয়তনের মন্দির পশ্চিম-উত্তর-ভারতে নাই। দক্ষিণাপথের পক্ষে ইহা বিশাল নহে; কেবল প্রারম্ভ-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। দেবালয়ের প্রস্তর নিতান্ত কোমল। ভোগ-মণ্ডপের পাথরকে মৃত্তিকা বলিলেও ক্ষতি নাই। এজন্য বহু স্থান খণ্ডিত হওয়ায়, স্থূল চূর্ণের আবরণে বদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১২১২ বৎসর হইল, রাজা ললাটেন্দু-কেশরী ইহা নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিন্দে একটি করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের বৃহৎ বিগ্রহ আছে। বিগ্রহগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কোনও কোনটি এমনি সুকুমার যে, রক্তমাংস-গঠিত বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ব্ব কালের মনুষ্য ব্যবহৃত বিবিধ বেশ ভূষা ক্ষোদিত করিয়া মূর্ত্তি সজ্জিত করা হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে অসংখ্য দেব দানব ও মানবের লীলা ক্ষোদিত; তাহা সুগঠিত বটে,

কিন্তু অনেকগুলি কুরুচিসম্ভূত তান্ত্রিক ভাবের প্রতিকৃতি। তন্ত্র-শাস্ত্র কামরূপ হইতে হিমালয়ে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হয়। কলিকাতার পরপারে স্থিত ভোটের বাগানে, ভুটান হইতে আনীত বৌদ্ধ মহাকালের মূর্ত্তিও কুরুচি-কল্পিত। সেই জন্যই কাশীর নেপালী খাপ্রার কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরে অশ্লীল আসনের অভাব নাই।

প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বনের মধ্য দিয়া পথ। স্থানে স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী পাষাণ আহরিত হইতেছে। দুই এক জন বন-চর কাষ্ঠভার বিক্রয়ের জন্য সহরের দিকে যাইতেছে। দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতপুঞ্জের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। সুন্দর বট-তরুর মূলে যান রাখিয়া, শ্যামদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়া স্নিগ্ধ কূপোদকে স্নান করিয়া তাঁহার সহিত পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক, অথবা খণ্ড জাতির আবাস বলিয়াই হউক, এই গিরির 'খণ্ড-গিরি' নাম হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; উদয়-গিরি ও অস্ত-গিরি। আমরা প্রথম উদয়-গিরিতে আরোহণ করিলাম। কতিপয় সোপান আরোহণ করিয়া দেহলী পাওয়া গেল, তাহার পার্শ্বে একটি গৃহ। গৃহ, অলিন্দ, স্তম্ভ সমস্তই পর্ব্বত বক্ষে ক্ষোদিত। ঐরূপ আর কতকগুলি ঘর বা কন্দর অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। একবারে অদ্ভুত রসে ডুবিয়া গেলাম। পর্ব্বত খুদিয়া প্রকাণ্ড চতুঃশাল দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। গত কল্য চক্রক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া যে সুখ জন্মিয়াছিল, তাহা পরিমিত; কিন্তু এ দর্শনসুখের তুলনা নাই। আমার ঐক্ষেত্রে আগমন সার্থক বোধ হইল। শ্যামদাস কহিলেন, এই বাটীর নাম "রাণীহংসপুর"। পর্ব্বতের অন্যান্য প্রকোষ্ঠ দেখিয়া হস্তীগুম্ফায় (গুহা) উপনীত হইলাম। অনেক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপির আকার দেখিয়া এই অদ্ভুত স্থাপত্যের সময়ক্রম বুঝা গেল। মহারাজ বিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের অনুশাসনলিপির অক্ষরে ইহা লিখিত। সুতরাং এই কীর্ত্তি অন্যূন ২০০০ বৎসরের প্রাচীন; ইহার ভাষা পালি।

"দেবানাম্ পিয়ো প্রিয়দর্শি রাজা সবত ইচ্ছতি
সবে পাষণ্ডবংসেষু সবেতে সযমঞ্চ ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছতি।" *

* দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শিঃ রাজা সর্ব্বতঃ ইচ্ছতি সর্ব্বে পাষণ্ডবংশজাঃ সর্ব্বত্র সংযমঞ্চ ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছেতি (?) "রাজা প্রিয়দর্শি ইচ্ছা করেন, অন্যমতাবলম্বিরাও যেন থাকুক।"

নত, কিন্তু স্তম্ভের আকারে প্রভেদ আছে। বাড়ীটি পূর্ব্বদ্বারী, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে অলিন্দ-সংযুক্ত দ্বিতল গৃহশ্রেণী; পূর্ব্ব দিকে এখন কিছু নাই, বোধ হয় তোরণ ছিল। প্রবেশের মুখে দক্ষিণে বামে দুইটি ঘর উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; উহার দ্বার প্রস্থের দিকে, ইহার সংলগ্ন একটি করিয়া দেহলী আছে; তন্মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী ক্ষোদিত হইয়াছে। উঠানের প্রায় শেষ সীমায় দরদালানের প্রহরীর পার্শ্বে বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী। চত্বরের নিম্নে উঠানের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছাদহীন দুইটি গৃহ; তাহার বেধ তিন হস্ত। এই গৃহ কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, বুঝিতে পারিলাম না। আধুনিক বাটীতে উঠানে এ প্রকার ঘর থাকে না। তাহার পর দুই হস্ত প্রশস্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চত্বর। চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি গৃহ, উহার দ্বার দক্ষিণে ও উত্তরে। তাহার পর বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী; ঐ গৃহাবলীর সম্মুখে চৌতারা আছে, কিন্তু বারাণ্ডা নাই। দ্বিতীয় তলে পশ্চিম ও উত্তর দিকে ঘর আছে; তাহার সম্মুখে প্রশস্ত দালান। দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় তলে গৃহ নাই। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় তলের গৃহসম্মুখস্থ দালানের স্তম্ভগুলি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদুপরি যে ছাদ ছিল, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমার পথ-প্রদর্শক পাণ্ডা কহিলেন,—পাঁচ ছয় বৎসর হইল, কথিত স্তম্ভগুলি ইংরাজেরা উড়াইয়া দিয়াছে। রাণী-ইনপুরেশ্বরীর সমুদায় গৃহের বহিঃপ্রাচীরে খিলানের উপরে ও পার্শ্বে বিবিধ মনোরম বৃক্ষ, লতা ও নরনারীর ভাব শুদ্ধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। একটি চিত্র অত্যন্ত কৌতুকাবহ। শিল্পী টাঙ্গী দিয়া কবিতা খুদিয়াছেন। উহার প্রতি যতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি, হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। একদল মত্তহস্তীর সহিত কতকগুলি সুন্দরী যুদ্ধ করিতেছেন। একটা হস্তী শুণ্ড তুলিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক অবলা একগাছি ফুলের মালা লইয়া হস্তীকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিয়া মালা ছুঁড়িতেছেন। কেবল তাহাই নয়, অপর এক নারী সেই শূর-সুন্দরীকে পলায়নের জন্য হস্তধারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। এক সুকুমারী একটি সনাল কমলকোরক গ্রহণ করিয়া হস্তী তাড়না করিতেছেন। আর কয়েক জন রিক্ত-হস্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইতেছেন, কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। এই সুন্দরীসমাজে একটি সাহসী পুরুষ নারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্র একগাছি ছড়ি। এই বাটীর চিত্রাবলী দেখিলে পূর্ব্বকালের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। পুরুষে

মল-কোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়াছে। তাহার উপর কটীদেশে আর একখানি বস্ত্রখণ্ড বাঁধা আছে; তাহার অগ্রভাগ কোঁচার মত ঝুলিতেছে। গায়ে কাপড় নাই। মস্তকে দীর্ঘ কেশ ধম্মিল্ল করিয়া বস্ত্রখণ্ডসহযোগে আবদ্ধ। মুখে শ্মশ্রু বা গুম্ফ নাই। গলায় হার, হস্তে বলয়, কাহারও বা কর্ণে কুণ্ডল। স্ত্রীজাতি চিরকালই অলঙ্কারপ্রিয়। পাষাণচিত্রেও সুন্দরীদের হার, চিক, কর্ণভূষা, বলয় ও মল দেখিলাম। স্ত্রীলোকের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী ঠিক পুরুষের মত না হউক, তাহার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মাল-কোঁচার উপরে একখানি চু-মুখা কিম্বা এক-মুখা কোঁচা ঝুলান। উর্দ্ধ অংশুকের বিশেষ ব্যবহার দেখিলাম না। মস্তকে নানাবিধ বেণী। ছিত্র চালের যে প্রতিকৃতি আছে, তাহার আকার সীঁতি-মৌড়ের মত। ছত্র-দণ্ডের গায়ে এক বৃহৎ সূত্রপুচ্ছ আলম্বিত। পুরুষের পদে পাদুকা নাই। এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যে কেবল একটি দ্বারক্ষকের জানুদেশ পর্য্যন্ত বৃহৎ উপানৎ দ্বারা আবৃত দেখিলাম। এই পাদাবরণ ধরিয়া গ্রীক শিল্পাধিপত্য কল্পিত হইতে পারে।

অগ্রে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইলে হেতু বা উদাহরণ সংগ্রহের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকল বিষয়েই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সত্য নির্ণয় করিতে হইলে, বিপক্ষপাতী না হইয়া সন্দিহান হওয়া উচিত। হৃদয় নিরপেক্ষ করা আবশ্যক। ন্যায়াবলম্বী পথে উঠিয়া সাধারণ ভূমির স্বরূপ উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা না পাইলে সম্পাদ্য বাহির করা অসম্ভব। ফর্গুসন সাহেব স্থির করিয়াছেন, ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যা গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসি। কপিলেশ্বরের পুরোহিতগণ অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া কিছু দক্ষিণা লইলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রে ভুবনেশ্বরপুর পৌঁছি। সাগরের মন্দ্র আরাব শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২

পুরীতে পৌঁছিয়া মন নিরতিশয় উদাস হইয়া পড়িল। আমার এই প্রথম বিদেশে আসা। যাহার সঙ্গলিপ্সা প্রবল নহে এবং আত্মাভিমান অধিক, তাহার পক্ষে বন্ধুতা ঘটা কঠিন, ও তাহা ঘটিলেও সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানুষ মানুষের পক্ষে যে কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা আমি এখন উপলব্ধি করিতেছি। পথে যদি একটি বাঙ্গালী দেখি, তাহার সহিত বিনীত ভাবে আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। একদিন কোনও অপরিচিত ব্যক্তি কহিল,—মহা-

নন্দ বাবু আপনার খোঁজ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী কহিলেন ;—তুমি বাজারে গিয়া থাক, সে বাবুটি—যিনি সে দিন আসিয়া কহিয়াছিলেন, তাঁহার এখানে কাহারও সহিত পরিচয় না থাকায় বড় কষ্ট হইতেছে—তাঁহাকে কি দেখিতে পাও ? তিনি এত দিন হয় ত চলিয়া গিয়াছেন, নহিলে আসিতেন। ইহাতে আমার অকারণ-দুঃখপীড়া-গ্রস্ত মন মাতৃস্নেহের শীতলতা অনুভব করিল। দেশভ্রমণে নিত্য নূতন স্থান নূতন বিষয় পাওয়া যায় বলিয়া আহ্লাদিত হইবার কথা, কিন্তু সঙ্গে একখানি রঙ্গিন কাচ থাকা চাই। তাহার ভিন্ন দিয়া না দেখিলে কিছুই বিচিত্র বোধ হইবে না। সেই রঞ্জিত উপনেত্রের নাম অনুরাগ। অনুরাগ না থাকিলে কিছুই সুন্দর দেখায় না। আমরা নিত্য যাহা দর্শন করি, তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারি না ; এজন্য তাহাতে মন মুগ্ধ হয় না। চেষ্টা করিয়া যদি নবীন প্রদেশে উপনীত হওয়া যায়, আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অতি সামান্য বিষয়টিও বিশেষ সুন্দর বোধ হইবে ; তেমন মনোরম আর যেন কোথাও মিলিবে না। আমি বিদেশে আসিয়া বঙ্গিন কাচ খানি যখন হারাইয়া ফেলিয়াছি, তখনই সুখের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

সমুদ্রের সহিত সম্ভাষণ করিবার জন্য প্রত্যহ সৈকতপুলিনে বিহার করিতে যাইতে হয়। কর্কটী দৌড়িয়া গর্ত্তে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া তরঙ্গের সহিত আমিও নামিয়া যাই। উর্ম্মি মস্তক অবনত করিয়া যেমন বেলাভূমিতে উঠিতে থাকে, আমি অমনি ছুটিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি। কিন্তু ফেনিল নীলাম্বু পাদুকা স্পর্শ করিয়া ফেনিল দেখিয়া হাসি আসে।

সমুদ্র-কূলে সিকতা-পল্লীর একখানি বাঙ্গালায় বাবু নবীনচন্দ্র সেন বাস করেন। "পলাশীর যুদ্ধের" মোহনলালের উক্তি তাঁহার মুখে কেমন শুনায়, জানিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। কবির নিবাস পূর্ব্ব-বঙ্গে, ইহা জানাইয়া আরম্ভ করিলেন ;—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে গেলে, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী।
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মল অম্বরে,
ডুবায়ে ভারত-ভূমি যেও না তপন,
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিবা, আহা। ডুবিছ এখন ?

পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য কিবিল কেমন।"

ইত্যাদি।

পাঠকালে কবিকে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শ্রোতা ও পাঠক উভয়েই রসোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গেলেন। গ্রন্থকার কহিলেন;—ভূদেব বাবু এই অংশ শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাব্যামৃতরসাস্বাদ যে সংসার-বিষ-বৃক্ষের দুইটি সরস ফলের অন্যতর, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। অতঃপর নবীন বাবুকে এক বিবাহসভায় দর্শন করি। তিনি যেন জীবন্ত কাব্য হইয়া বসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে বিবিধ ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। গঞ্জম হইতে আগতা তৈলঙ্গী অন্নপূর্ণা একটি সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ গাইয়া পৈশাচী ভাষায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সারঙ্গী তবলা ও মন্দিরার সহিত ব্যাসপাইপের সঙ্গত হইতে লাগিল। একজন বাদক কণ্ঠ-সঙ্গীতে যোগ দিয়া আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সভাভঙ্গ হইলে কর্ত্তারি বাটীতে মহাপ্রসাদগ্রহণের জন্য যাইবার প্রস্তাব হইল। আমি তীর্থের কোনও প্রকার অনুষ্ঠানে রত নহি, সুতরাং সর্ব্বজনস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজন করা অনুচিত বিবেচনা করিতেছি। বর শিবিকারোহণে যাত্রা করিয়াছেন। সম্মুখে এক থাল তণ্ডুল রক্ষিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে তৈলঙ্গী নটী পাশী ধরিয়া যাইতেছে। এটি বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধ্রদেশীয় প্রথা। সামান্য লোকের ঘরের অগ্রে তরবারী খেলিতে খেলিতে যায়। স্নানযাত্রার দিন দেউলে পূর্ব্বপরিচিত কবিকে পাইলাম। তিনি রক্ত-পুষ্প-মালা শিরে ধারণ করিয়াছেন। একটি দালান দেখাইয়া কহিলেন, "ইহার নাম মুক্তিমণ্ডপ। কিন্তু দেশ দীনবন্ধু বাবুর 'মুক্তি-মণ্ডপ' জ্ঞান করিও না।"

শ্রীমন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের মূর্ত্তি বাহির হইল। সুদর্শন ও সুভদ্রা নরস্কন্ধে মণ্ডপোপরি গমন করিলেন। জগন্নাথ বলরাম হাঁটিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কটীদেশে ডুরী বন্ধন করিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করা হইতেছে। পশ্চাৎ ভাগে অন্য ব্যক্তি সাম্য রক্ষা করিতেছে। ইহাতে দারু-ব্রহ্ম লম্ফ প্রদান করিয়া চলিতেছেন। এই গমনের নাম পাণ্ডববিজয়। যাত্রীগণ তাঁহার অঙ্গ হইতে শ্রীকাপড়া (লোহিত-বস্ত্র) ছিন্ন করিয়া লইতেছে। স্থানে স্থানে আরত্রিক হইল। ধুনুচী দণ্ড-ধারী অগ্রে যাইতেছে। ভেরী তুরীর শব্দে জন কোলাহল মিশ্রিত হইয়া প্রকাণ্ড দেব-পুরী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

ছত্র ও আড়ানি উৎসবের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। পঞ্চাশ প্রকারের সেবক সমভিব্যাহারে যাইতেছে। একজন দুই খণ্ড স্থূল বেত্র হস্তে ধারণ করিয়া শব্দ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি? উত্তর;—এও এক প্রকারের সেবা। স্নান-মঞ্চ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে। দেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ সর্ব্ব-তীর্থ নামক কূপোদক এক শত আট স্বর্ণবালুকানির্ম্মিত কলসে পূর্ব্ব দিন অধিবাসের সহিত উত্তোলিত হইয়াছিল। অদ্য তাহা ষোড়শোপচারে পূজিত হইল। মুদীরথ উপস্থিত আছেন। শিরোবস্ত্রবিহীন উড়িয়াদের দলে তাঁহাকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ ও ধবল অঙ্গরক্ষা পরিহিত দেখিয়া সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে। রাজার প্রতিনিধি স্বরূপে যাত্রা উৎসবাদি কর্ম্ম ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে মুদীরথ উক্ত জল দ্বারা জগদীশকে স্নান করাইলেন, অমনি হুলুহুলা শব্দ উপস্থিত হইল। ভক্তগণ পুষ্প উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সকল পাণ্ডারা জলাভিষেক করিল। বৈরাগীরা চামর ব্যজন ও গান করিতে নিযুক্ত।

দ্রাবিড় প্রণালী অনুসারে জগন্নাথদেবের মন্দির দুইটি উচ্চ প্রস্তর প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকারের দৈর্ঘ্য ৪৫০, প্রস্থ ৩৩৬ হস্ত। ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গম নামক দেবালয় সপ্ত প্রাকার মধ্যে স্থাপিত। উৎকল দেউলের বিশেষত্ব তাহার পিরামিডাকার মণ্ডপ ও অধিকপ্রসারযুক্ত আমলাশীলার দ্বারা পরিচয় দিতেছে। কাশী-অঞ্চলের দেবালয়ে চূড়ার নিম্নে আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পল বিশিষ্ট শিলাখানি এত প্রশস্ত হয় না। মন্দিরের আকৃতির ন্যায় দেশকালভেদে স্তম্ভের আকারগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথাও চন্দ্রকাণ্ড, কোনও স্থানে ব্রহ্ম বা শিবকাণ্ড পাওয়া যাইবে। জগন্নাথের অংশরূপিণ্ড ও ভোগমণ্ডপের, দ্রাবিড় গোপুরমের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মাদুরার মীনাক্ষী সুন্দরেশ প্রভৃতির স্বস্তিক মন্দিরের ন্যায় ইহার প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে। তৎসন্নিকটে পদ্ম-ক্ষেত্র (কণারক) হইতে আনীত অরুণস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সিংহদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পতিতপাবন দর্শন করিয়া দ্বাবিংশতি সোপান উঠিতে হয়। এখানে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। দক্ষিণে স্নানমঞ্চ, বামে একটি কুণ্ড ও কাশীবিশ্বেশ্বরের মন্দির। পাকশালায় বৃত্তাকার মহানসের উপর মৃন্ময় স্থালী (আটিকা) গুলি এক শ্রেণীর পশ্চাৎ আর এক শ্রেণী ঊর্দ্ধে সজ্জিত করিয়া অন্ন পাক হইতেছে। আনন্দবাজারে ক্রেতৃগণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া ভোগ মনোনীত করিতেছে। দ্বিতীয় প্রাচীরাভ্যন্তরে শতার্ধিক

দেবগৃহ;—নৃসিংহ, সূর্য্য, শিব, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী সকলেই আছেন। সেবার আয়োজনের জন্য পঙ্ক্তি-ঘর, ভেটমণ্ডপ, চুনা-কুটাঘর প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ দেখা যাইতেছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে বহুধ্বজশোভিত চূর্ণপ্রস্তরগ্রথিত নানা ক্ষোদিত মূর্ত্তি বিভূষিত বড় দেউল; দৈর্ঘ্য ১০০, প্রস্থ ৪৫, ঊর্দ্ধে ১২৬ হস্ত। মন্দিরটি চারি অংশে বিভক্ত; গর্ভস্থান, অংশরপিণ্ড, জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ। গর্ভস্থানে রত্নবেদী নামক কৃষ্ণ প্রস্তরবেদীতে শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করেন। মন্দিরের সম্মুখীন হইলেই বৃহৎ অশ্লীল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মস্তক অবনত করিতে হয়। ৬৯২ বৎসর অতীত হইল, বীরশ্রীগজপতি গৌড়কর্ণাটউড্রেৎকলেশ্বর অনঙ্গ-ভীম ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি কর্ণাটী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট হইতে ঔড্রে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তমলুক পর্য্যন্ত ইহাঁদের অধিকার বিস্তৃত ছিল, এজন্য ইহাঁদিগকে বাঙ্গলার গঙ্গাবংশীয় নৃপতি বলা হয়।

স্বহস্তে পাক করিয়া, আহারান্তে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জগমোহনের কৃষ্ণ-পাষাণ তলে শয়নোপবেশন করিয়া যাপন করি। কত পাপী তাপী শ্রীমন্দিরে আসিতেছে। জগদীশ সন্নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া হৃদয়ের ভার অর্পনয়ন করিয়া যায়। যুক্তকর গরুড়মূর্ত্তির সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া গর্ভগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একজন ঔড্রীয় "এ কলা শ্রীমুখ" সম্বোধন করিয়া করযোড়ে স্বকীয় কষ্ট জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পরিচারকের উচ্চ অথচ গম্ভীর আহ্বানধ্বনি বিমানের সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ তরঙ্গায়িত করিতেছে। কেহ বা যাত্রিদলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত। অন্নস্থালী-বাহকগণ মুখ বদ্ধ করিয়া রন্ধনশালা হইতে প্রচ্ছন্ন পথে ভোগমণ্ডপে অবিরত ভাত আনয়ন করিতেছে। লক্ষ লোক হইলেও প্রসাদের অকুলান হইবে না। বল্লভভোগ, খিচুড়ীধুপ সন্ধ্যাধুপ ও বড়সিঙ্গারধুপের অপেক্ষা দুইপ্রহর-ধুপের আয়োজন অধিক। পুরী সহর ও উপকণ্ঠের কোনও অধিবাসীর বাটীতে ভোজ হইলে, ভোগ পাইবার জন্য তথা যাত্রীকগণও রন্ধনশালায় অগ্রে দ্রব্যজাত পাঠাইয়া থাকেন। এত ভাতের ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। শ্রীক্ষেত্র এ বিষয়ে অতুল। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভের শয়ানমন্দিরে অন্নক্ষেত্র ইহা অপেক্ষা হীন। অক্ষয়বটতলে বন্ধ্যাগণ অঞ্চল প্রসৃত করিয়া বসিয়া আছে;—যদি ফল পড়ে, ভক্ষণ করিবে। দেবস্থানের পূর্ব্বদিকে পুরদ্বার আছে। উত্তরের অন্তর দ্বার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্য আটিকা-বন্ধনের ঘর, উহার নাম বৈকুণ্ঠ। এ জন্য তাহা দ্বিতলের উপর স্থিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র তকতলে দারুব্রহ্মের পুরাতন কলেবর পচিতেছে।

কারণ হইয়াছে। ইহাতেই হিন্দুর দশাবতারে বুদ্ধের নাম শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অধুনা পৌরাণিক শ্রেণীর অন্তর্গত দেখা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, এই মূর্ত্তিত্রয় কলিঙ্গ দেশের পূর্ব্বতন গ্রাম্য দেবতা। নিকটবর্ত্তী জনপদের দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবগণ কি সাক্ষ্য প্রদান করেন, সাদৃশ্যের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

মনর-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা।—বটবৃক্ষমূলে অতি ক্ষুদ্র গৃহে অসম্পূর্ণ অবয়বের এক খানি প্রস্তরের মূর্ত্তি, মুখে সিন্দূর মাখান, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বসন, ইহাঁর নাম পচুম্মা। ব্রাহ্মণেতর জাতিতে রোগোপশমনের জন্য অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নীচ জাতি ইহাঁর পূজারী। মৃণ্ময় ঘোটক, হস্তী ও দানবের মূর্ত্তি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া মনর-স্বামীর সম্মুখে রক্ষিত হয়। কোনও স্থানে দীর্ঘাকার ভীষণদর্শন রঞ্জিত পিশাচ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। মনব-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মাও ভূতযোনি। কিন্তু ইহারা বলি গ্রহণ করেন না। বল, সেম, ধয়দ ও মৃত্যু নামক অনুচর পিশাচের জন্য বলির ব্যবস্থা আছে। মরিয়া ও পুতলিমা বলি গ্রহণ করেন। কোথাও কাষ্ঠের কুঁদা দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে।

জগন্নাথ-স্বামী ও তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা।—ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রেরিত বিশ্বাপতি নীলগিরিনিবাসী বসু-শবরের গৃহে বাস করিয়া নীলকন্দরে বটবৃক্ষমূলে চণ্ডাল কর্ত্তৃক পূজিত নীলমাধব দর্শন করেন। বসুশবরের পুত্র দৈতাপতি হইতে সেই বংশীয় লোকেরা, এক্ষণে দৈতা এবং পতি, এই দুই পৃথক উপাধি ধারণ করিয়া, জগন্নাথের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দৈতা এখনও শবর-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগ করে। পতি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে। অঙ্গরাগকালে তাহার দ্বারা পূজাকার্য্য সমাধা হয়। শবর-শব্দ-বোধক শোয়ার-নামধারীগণ বলভদ্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। শোয়ার বড় পাকশালায় রন্ধন রক্ষা করে। শোয়ার রন্ধন ও মহাশোয়ার পিষ্টক প্রস্তুত ও ভোগ বহন করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, নিম্নলিখিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

(১) ব্রাহ্মণ যে দেবতার পুরোহিত নহেন, নীচ জাতি যাহার পূজক, তাহাকে গ্রাম্য দেবতা কহিতে হইবে।

(২) গ্রাম্য দেবতার অধিষ্ঠাত্রী প্রায়শঃ ভূতযোনি, এজন্য মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

(৩) শবরের দেবতা যখন বিষ্ণুত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার ভগিনীকে সুভদ্রা নাম দেওয়া হইল। অপর সহচরটি বলভদ্র নামে আখ্যাত হইলেন। বৈষ্ণবগণ যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব কিছু কাল পরে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের বনিতা করিয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু নামের মধ্যে একটা রহস্য রহিয়া গেল। মূর্ত্তিতে গ্রাম্য ভাব লোপ পাইল না।

ভাস্করবিদ্যার আদিম অবস্থায় ক্ষোদিত অবয়ব বিকটাকার হইতে পারে। পেরু দেশের টিটি-কাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াওয়ানেকোর প্রস্তরক্ষোদিত নৃমুণ্ডের চিত্র দর্শন করিয়া একটি শিশু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল;—"বাবা, ইহা কি জগন্নাথের মুখ?" দ্রবিড় দেশে বৃহৎকায় অসুরের ব্যাঘ্রানবসদৃশ রঞ্জিত মুখশ্রী দর্শন করিলে কলিঙ্গের ব্যাঘ্র দানব সহসা জগন্নাথ স্মৃতিপথে উদিত হন। জগন্নাথের গুহ্য নাম দধিবামন। ছত্রপতি শিবাজি ভোঁসলেবংশীয় নাগপুরাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে, বৃটিস্‌রাজ জগন্নাথের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের উত্তেজনায়, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক হওয়ায়, খুরদার রাজাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি নরহত্যাপরাধে সেই রাজবংশীয় চলন্তি-বিষ্ণু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। জগন্নাথের সেবাদিকার্য্যে বার্ষিক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে। রথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কার্য্যে পুরুষোত্তমের মঠধারী মহন্তেরা উপকরণসামগ্রী প্রদান করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যের জন্য জগন্নাথের ভূসম্পত্তির ন্যায় মোহন্তেরা জমিদারী ভোগ করিতেছেন। একবার পপরিয়া-মঠের মোহন্ত নূতন কলেবর উপলক্ষে নিজ ব্যয়ে অযোধ্যা হইতে স্পেস্যাল ট্রেণে তের শত বায়ানন্দী বৈরাগী সমভিব্যাহারে পুরী যাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে ভারতীয় সমস্ত উদাসীন সম্প্রদায়ের মঠ আছে। পুরীতে মোহন্ত ও পাণ্ডা প্রধান অধিবাসীর মধ্যে গণ্য।

বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব জন্য রথস্থ বামন দর্শন করিতে পাইলাম না। সামুদ্রিক পীড়ার ভয়ে বাষ্পীয় তরণী আরোহণ করিতে ইচ্ছা হইল না। গরুড়ধ্বজ, পদ্ম-ধ্বজ ও নাঙ্গল-ধ্বজ রথ নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া, দোলমণ্ডপসাহী হইতে রাণীগঞ্জের দোতালা গো-শকট আরোহণে স্থলপথে যাত্রা করিলাম। কটকের পর বিরূপা পার হইয়া নূতন পথ আরম্ভ হইল। নীলগিরি শ্রেণীর বরুণী পাহাড়ে

মেষ ভ্রমণ করিতেছে। ধরিয়া তীরে শকট পার করিবার জন্য নৌকার প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য শিক্ষা হইল। শ্রীক্ষেত্র হইতে কলিকাতার দূরতা ১৫০ ক্রোশ। বালেশ্বর অর্দ্ধ পথে অবস্থিত। রাজা সুখময়ের সতপথে অন্ধ ও মহাব্যাধিতে পলিতপাদ ব্যক্তি একাকী পুরুষোত্তম চলিয়াছে।

সুবর্ণরেখা নদী উৎকলের উত্তর সীমা। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে দৃষ্ট হইতেছে, পুরুষেরা দীর্ঘকেশ ধারণ করে না। জলেশ্বরে বাঙ্গালীর ন্যায় কর্ত্তিত কুন্তল দেখা দিল। কাহারও শিখা আছে। দাঁতন অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ বাঙ্গালীর মত চুড়ি পরিয়াছে। অনেকের হস্তে শঙ্খ পরিহিত। শঙ্খের অনুকৃতি পিত্তল খাড়ুর ব্যবহার প্রায় ত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ হইল। স্থলপথে না আসিলে দেশের সন্ধি নয়নগোচর হইত না। উড়িয়া যে কেমন শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালীত্ব লাভ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি হইত না। দাঁতনবাসীরা আপনাদিগকে মধ্যদেশী কহে। এখানে পাঠশালায় এক বেলা উড়িয়া, অন্য বেলা বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়া হয়। উড়িয়া বর্ণমালা তেলুগু অক্ষরের ন্যায় গোলমাত্রা বিশিষ্ট, এবং উভয় লিপি তালপত্রোপরি লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। উড়িয়া বর্ণমালার উ-কার এবং ঠ ড ঢ তেলুগু, এবং অপর বর্ণের সহিত বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। উড়িয়া ঠ-কার অবিকল পালি অক্ষর, উহার সহিত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। কলিঙ্গ অন্ধ্রদেশের পারিপার্শ্বিক; এ জন্য পূর্ব্ব বিভাগের স্ত্রী নারী সীমন্তে সিন্দূর প্রদান করে না; এবং পড়ার কচ্ছ লুকাইয়া সেই শাড়ীর দ্বারা উড়িয়া ঘের দিয়া পরে। বালেশ্বরের উত্তর হইতে বস্ত্রপরিধান ক্রমে বাঙ্গালী রকম হইয়া আসিতেছে। দাঁতন হইতে যোজনদ্বয় অন্তরে বিরচটিতে আসিয়া দেখি, পরিচ্ছদাদি একবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, ভাষা উড়িয়াই আছে। কিন্তু দুই একটি বাঙ্গালা শব্দ ও ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মকরামপুরে তদ্বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাষা বাঙ্গালা, অথচ দুই একটি উৎকল শব্দের ব্যবহার হইতেছে।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

৮ মানসী। *

সৌন্দর্য্য উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতানিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি Shelley লিখিয়াছেন, প্রেমের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।

আমাদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য স্থায়ী, এবং সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এমন আর-কিছুতেই হয় না। কাব্যামোদী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবতঃ, সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

আমরা "মানসী" পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ পাইয়াছি, সচরাচর কোন কবিতা পুস্তকপাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ-উদ্বেগে প্রণোদিত হইয়া মানসী-প্রকাশের কিছু দিন পরেই আমরা উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখি—কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ উহা সাধারণ্যে প্রকা-

* মানসী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ১ম সংস্করণ; ১০ই পৌষ, ১২৯৭। ২য় সংস্করণ; ১৩০০।

দেখিতে পারিয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব বা প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা একাধারে একেবারে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাবপ্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। এ দিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে, সুন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সাবগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট এবং ভাবের পর্দ্দার সঙ্গে সুমিলিত। শুধু তাহাই নহে। এ প্রশংসায়, ভাষার এ গুণপণায়, উৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য উভয়েরই দাবী আছে, এবং উভয়েরই থাকা চাই। কিন্তু পদ্যের হিসাবে এই সকল কবিতার অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষাকে আরও সুন্দর এবং মুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছে। শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ, বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যাংশে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা যে কেবল রবীন্দ্র বাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার শৈশব কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্ব্বাচিত শব্দগুলির প্রতিটির যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার ন্যায় তাহারা নিসর্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন Photograph বা অন্ধ ছবি নহে। স্বভাবের সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহূত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, কখন বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুদ্র, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য মূর্ত্তি; এবং কেবল তাহাই নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীর ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্য্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্ত্তা আনিয়া দেয়—আনন্দ-উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগগলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়,

তাহাদের ভিতর যেমন নিসর্গের চিরপ্রফুল্ল সৌন্দর্য্যরাশি বর্ত্তমান, তেমনই তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবি-হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্ত্তমান।

এই পরিষ্কার ভাষা ও এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাসের উপর আবার আসিয়া পড়িয়াছে, উদ্বেলিত প্রাণের সমুচ্ছ্বাসপূর্ণ, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় মুগ্ধকর, এক অতি আশ্চর্য্য অতি অপূর্ব্ব ছন্দের আকুল তরঙ্গ। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ছাড়িয়া দিলে, শব্দবিন্যাস এবং ছন্দরচনায় কবি বাবু বঙ্গ কবিদিগের শীর্ষস্থানীয়, এবং ভবিষ্যতের চির আদর্শ। এক ছন্দ লইয়াই কবিপ্রতিভার পূর্ণ পরিমাণ লওয়া যাইতে পারে। নিকৃষ্ট সমালোচকেরা ছন্দকে কবিতার বাহ্য-গঠন বা পরিচ্ছদজ্ঞানে তাহাকে নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান স্থান দিয়া থাকে। নিকৃষ্ট কবিদের নিকট ছন্দ ভাবপ্রকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা বলবিকাশের শ্রেষ্ঠতর, যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাবপ্রকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবিমাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা, মিল বা যতি সংস্থাপন সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং সুমধুর, বেশ তাললয়বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মোহ নাই। মলয় সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন দিকে ভাসিয়া যাই।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

হাজার কথা দিয়া কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিত না, কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য, সাধা-সিধা, অতি সরল, অতি সহজ, অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে। জানি না, শেষচরণপাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও আরও মুগ্ধ সুন্দর সুর বিশিষ্ট পদ ও চরণ মানসীতে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাস এবং অপূর্ব্ব ছন্দঃসৌন্দর্য্য রসবিকাশে এবং ভাবপ্রকাশে তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহা দ্বারা সকল ভাব সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মানব ভাষা যেখানে পৌঁছিতে পারে না—অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজ-ময়ী কুসুমসুকুমার মূর্ত্তি—ভাষার কঠোর স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এ সকলই কি চমৎকার, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে। তাহাতে অপ্রাঞ্জল কিছুই নাই—জটিলতার নাম গন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। "উপহারে" যদিও ছন্দের মোহ বা

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ণ পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায়গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহাবাঙ্ময় খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্বেগ আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি, আমার কায ভারি কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। কিন্তু আমার দরিদ্র ভাষায় তাহাদের উপযুক্ত প্রশংসা অসম্ভব। আমি নিজেই বুঝিতেছি, আমার সেরূপ বাক্যবিভব নাই, যাহাতে তাহাদের সহস্র গুণের এক অংশও প্রকাশ করিতে পারি। তাহাদের ভাব যেমন গভীর, অকপট ও মধুর, তাহাদের ভাষা ও ছন্দ সেইরূপ সবল, মধুর এবং গভীর রাগিণীতে বাঁধা। মানব-প্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা মানসীর কবি যেমন অনুভব করিয়াছেন, এবং ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর খুব অল্প কবিই তাহা পারিয়াছেন। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশের ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সবল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কয়টি কবিতা আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভবশক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেই জন্য 'একঘেয়ে' হইলেও তাহারা চির-জীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জ্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্দ্ধিতদেহ।

তাহাদের ভিতর 'ছিব্‌লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানবহৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস আছে। মানবজীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত উন্মত্ত আকুল। বাস্তবিক মানুষের সমুদয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেমকবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্ব্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এবং তাহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে এক Shakespeareই যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে, সেইরূপ ঐ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তার পর এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদরের প্রেমকবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্র বাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম-কবিতায় অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাগুলিই সর্ব্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপ-বালা" হইতে আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্য্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁৎ নাই। রবি বাবুর কবিতাসমূহের ভিতর তাহারা বসন্তপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় বা বিমল নৈশ আকাশে প্রস্ফুট-শ্রী তারকাপুঞ্জের ন্যায় "উজ্জ্বল মধুর" শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। আবার তাহাদের মধ্যে দু-একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—"আজু সখি মুহু মুহু"। * বাঙ্গালা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহার উপযুক্ত প্রশংসা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা, শারদ জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয়সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্ত্তমান। ইহা পাঠে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর একটি অতি সুন্দর প্রেমকবিতা মনে পড়ে। Maudএর ভিতর বিরহ-বিধুর প্রেমের সেই মধুর অপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষাময় আহ্বানসঙ্গীত, এই মিলন সঙ্গীতের যথার্থ দোসর।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেমকবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা-উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় সুমধুর,—বাঙ্গালা

* ভানুসিংহের কবিতা দেখ।

ভাষার তাহাদের তুলনা কোথায়? "বিরহানন্দ", "ক্ষণিক মিলন" প্রভৃতির ছন্দ, কবি দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষ ভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্‌লেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হা হুতাশ নাই, "আন্ ছুরি" কই বিষ" নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্ব্বাসনের ভয় না বাধিয়া তাহার আনন্দবিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকা শক্তি অর্জ্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চির-সুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byronদিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকে কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেমজীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানবজীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানবজীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্য্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানবহৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায় ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ, উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্ব্বদিকের কবিতাগুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য্য মধিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্দ্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। প্রথমার্দ্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোকিলের ব্যস্ত, অপরার্দ্ধ সাগরোর্ম্মির মধুর, উদার নির্ঘোষের ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কল কৌশলে ইয়ুরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্য্যে এবং রসের

গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর "পূর্ব্বকালে" বা "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটি কবিতারই মর্ম্ম কথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এই মাত্র এই জন্মে ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত, নিবিড় অনুভব, ইহা কি আজিকার? এই বিশ্ববিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্ব্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মৃত যাহারা ভাল বাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান্ অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান্ অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি, এবং থাকিব। বর্ত্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুই জনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitmanএ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman মার্কিনদেশীয়, এবং অনেকটা প্রাচ্য ভাবে দীক্ষিত। "ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelleyর শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান ("তোমার পাইনে কূল, তুমি আমি একাকার" প্রভৃতি; মানসী, ১৮৯—৯০) কৈ Hugo বা Shelleyর ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই। মানসীতে এখনও নানাবিষয়ক কত কবিতা আছে যাহাদের এ পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে কবিতার ভিতর এমন অতুলনীয় শ্লোক আছে, তাহার সম্যক্ প্রশংসা করিতে গেলে "ভাষা" "মৌন" হইয়া পড়ে। ("আঁখি দিয়ে যাহা বল—কথায় বল না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে"—২২০পৃষ্ঠা) যে সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও "নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপের" রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। "নিষ্ফল উপহারের" বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং ভাবের শাসন, বঙ্গ সাহিত্যে অদ্বিতীয়। "দুরন্ত আশার" তীব্র দুরন্ত কশাঘাতে বাঙ্গালী ভিন্ন অপর সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেহুইনের

বর্ণনা আছে, তাহা কোন শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত? "মুছ বোম অপরিমাণ মস্ত সম করিতে পান"—ওমর খায়্যামের যোগ্য—সহসা শুনিলে তাঁহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার পরের দুইটি কবিতা যদি আমাদিগের নেতৃবীরেরা প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝি এক দিন ভারত উদ্ধারের পথ হইতে পারে। "সুরদাসের" প্রার্থনায় সৌন্দর্য্য-বিধুর প্রেম-বিহ্বল কবি-হৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। একটিমাত্র কবিতারচনার দ্বারা অনেকেই প্রভূত কবি-যশ অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু রবি বাবুর অক্ষয় ভাণ্ডারে ইহা একটি সামান্য ক্ষুদ্র রত্ন। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এমন হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন Browning ও Shelley একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত Stanzaর সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা এক বারমাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায় উজ্জ্বল উপমার গুণে, "ভীষণ মধুরের" প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে :—

"উজল যেন ঘোর রোষানল
"উদ্যত যেন বাজ'

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দুখানি পত্রের ভিতর বন্ধুহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদেরও ভিতর স্বভাববর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহমন্ত্র পরিস্ফুট ;—

"যেমনে সরম ছুটে। ফুল আর না ফুটে
কেতকী বাহির উঠে করে না অকুল"।

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের স্নেহ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং জ্যোৎস্নাকান্তি, প্রাণে আসিয়া পড়ে।

"নারীর উক্তি" এবং "পুরুষের উক্তি" ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির আরম্ভ অবিকল Browningএর মতন হইলেও, পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browningএর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানবজীবনের কোন রহস্যও উদ্ঘাটিত হয় নাই। "পুরুষের উক্তি"তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান ধারণার!
সেই মায়া উপবন, কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় মাপ দিতে শুকাল পাথার!

তাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসীম সুন্দর গদ্য কাব্যের নায়কের সহিত কেবল মাত্র এক রাত্রি প্রেম সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বলিয়াছেন ;— "তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চির-বাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।"—(Mademoiselle de Maupin) "শূন্য গৃহে" এবং "জীবন মধ্যাহ্ন" দুইটিই আমাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাবাতেই ব্যক্ত হইয়াছে. ("কাল ছিল প্রাণ যুড়ে"—হেন বজ্রপাত" ৭৬ পৃঃ) "তারার তারায় তার ব্যথা গিয়ে লাগে" সৌন্দর্য্যে Tennysonএর "Star to star vibrates light" এর অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। "জীবন মধ্যাহ্নের" ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভাণ বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেঙ্গান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর :—

"লজ্জা বস্ত্র জীর্ণ শতধা ছিন্ন
——— শয্যাশীধরাশি
স্বরার অঞ্চলতল ভাসি।"

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব।

"নিষ্ফল কামনা" একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন, ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবি বাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

"উচ্ছৃঙ্খল" নামক কবিতাটির কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা! ভাষায় কি তরঙ্গ! এমন সুন্দর কবিতা কখন পড়ি নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উন্মুক্ত এবং উদার। Shelley বা Swinburneএর ইংরাজী, Hugo বা Leconte de Lishএর ফরাসী, ভবভূতি বা

জয়দেবের সংস্কৃত, ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে। কেহ যদি ইহাকে নিতান্ত অন্যায় প্রশংসা বিবেচনা করেন, আমার তাঁহার নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি যেন উপরি-উক্ত কবিদিগের গ্রন্থাবলী হইতে শ্রেষ্ঠতর রচনা আমাকে দেখাইয়া দেন।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মানসীর কবিতাগুলি ভাবপ্রধান না বস্তুপ্রধান! তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুপ্ততত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন। অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম; এবং সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কাব্যসম্বন্ধে—আর কেবলই কাব্যসম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যাসম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক কি না? যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে তাহার অপর হাজার কেন অভাব থাকুক না; তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদার্থ। তাহার নিজ উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই, পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু বস্তুগ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ গুণ যে, তাহার সহিত কাহারও কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্য্যের অসীমতার ভিতর নিমিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয় অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন জপিবার, তেমনি মাতিবার এবং মাতাইবার। মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ কক্ষ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ববাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল

প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎসংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানব-হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুরমধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎশূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনই বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ", বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সাংখ্য স্বরলিপি।

বিরহবোধ।

রাগিনী গৌড় সারঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

(ও) পথিক রহ রহ বুঝিয়াছ কি বিরহ?
এ প্রেমের ভবে বিরহ নীরবে
রহে দাঁড়াইয়া টুটিবারে হিয়া
কেমনে দূরিব কহ?
পাইলে সুযোগ ঘটায় দুর্য্যোগ
হৃদয় গরজে কবে সে দহন
বিরহ হুতাশ চূর্ণ করি আশ
লোকে বলে সহ সহ
কেমনে সহিব কহ।

তালি । ২ । ৩ । ০ । ১ । আবর্ত্ত । স্থা । স্ত । ভো ।
মাত্রা । ২ । ৩ । ২ । ৩ । তালি । ০ । ২ । ২ ।

(স্থা)	।	গ্‌পা	পা	।	মা	গা	রেঃ	—	সাঃ	।
(স্থা)	।	ও	—	।	প	ধি	—		ক্‌	।
গা	রে	।	র্‌মা	গা	গা	।	গ্‌পা	পা	।	মা
র	হ	।	র	হ	—	।	ও	—	।	প

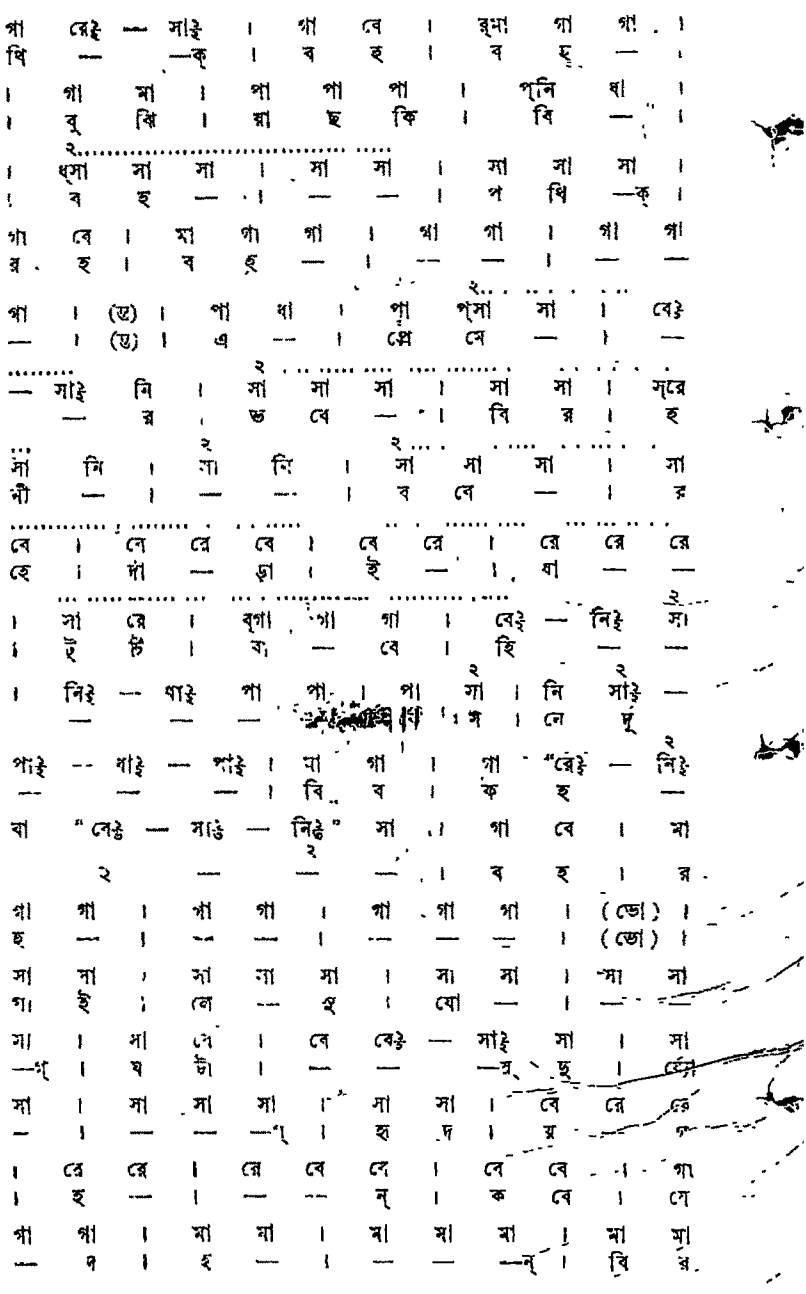
"বেই — সাই — নিই" সা

। পা পা মা । পা পা । পা পা পা ।
। হ — হ । তা — । — — —শ্ ।

মপাঃ — মাঃ সা । পধা ধা পা । মা গা ।
চু — র্ণ । ক — রি । আ — ।

গা গা গা । গপা পা । পা পা পা ।
— — —শ্ । লো কে । ব — লে ।

২ ২..... ২.....

পসা ধা । ধবে সা সা । পা পা । পসা সা
স হ । স হ — । কে ম । নে —

ধা । "পা মা । গা রেঃ — নিঃ সা" ।
২

ন । হি ব । ক হ — — ।

বা । "পা মাঃ — গাঃ । বে সা সা । গা
হি ব — । ক হ — । র

২.....

বে । মা গা গা । (স্থা—পু) গসা সা । ধা
হ । র হ — । (স্থা—পু) ও — । প

পাঃ — মাঃ — গাঃ — বেঃ — সাঃ । গাঃ
খি — — — —ভূ । র

সুখ-মোহ।

সায়ঙ্কাল—ঝাঁপতাল।

সুখে আছে যারা তারা মত্ত পারা হ'য়ে আত্মহারা
ভ্রমিছে এ ভবে।
দুখের দর্পণে প্রেমের তর্পণে আত্ম সমর্পণে
অন্ধ তারা সবে।
(তারা) বোঝে নি আপনে ভব-দরশনে অভিজ্ঞান মনে
ঘুরিছে গরবে তুচ্ছিয়া সরবে।
ও মোহে কি হবে।

তালি ।২ ।৩ ।০ ।১। আবর্ত্ত। স্থা। গু।
মাত্রা ।৪ ।৪ ।৪ ।৪। তালি। ২। ২।

(স্থা)। সা সা সা পা । রে রে বে রে ।
২

(স্থা)। সু খে আ ছে । যা — রা — ।

। মা পা মা বে । সা সা সা সা । সা বে
। তা রা ম ত্ত । পা — রা — । হ' য়ে

সা ধা । পা পা পা পা । নি সা বে
২.....

আ অ । হা — য়া — । ভ্র মি ছে

মা	।	রে	মা	রে	সা	।	(স্ত)	।	পা	পা					
—	।	—	—	ভ	রে	।	(স্ত)	।	দ্র	থে					
								২							
পা	মা	।	মধা	ধা	ধা	ধা	।	ধ্সা	সা	সা					
—	র	।	দ	—	র্প	ণে	।	প্রে	মে	। —					
সা	।	সা	সা	সা	সা	।	সা	রে	সা	নি	।				
র	।	ত	—	র্প	ণে	।	আ	ত্ম	স	ম	।				
২															
সা	সা	সা	সা	।	সা	রে	সা	ধা	।	পা	পা				
র্প	—	ণে	—	।	অ	ন্ত	রা	রা	।	স	—				
								২							
পা	পা	—	পা	।	পা	।	"সা"	বা	মনি	ধা	।				
রে	তা	বা	।	রো	।	নি	নি	আ	।						
২															
সা	সা	সা	সা	।	সা	রে	সা	নি	।	সা	সা	সা	সা	।	
প	—	নে	—	।	ভ	ব	দ্	ব	।	শ	—	নে	—	।	
মা	মা	মা	মা	।	মা	মা	বা	মা	।	মা	পা	মা	রে	।	
অ	তি	জ্ঞা	—	।	ম	—	নে	—	।	ঘু	বি	ছে	গ	।	
রে	রে	রে	রে	।	মা	পা	মা	রে	।	সা	সা	সা	সা	।	
র	—	রে	—	।	তু	চ্ছি	য়া	স	।	ব	—	রে	—	।	
নি	সা	রে	মা	।	রে	মা	রে	সা	।	সাঃ					
ও	—	মো	হে	।	কি	—	হ	রে	।	স্থ					

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "সাংখ্য-দর্শন"। যুক্তির মর্য্যাদা, আত্মা ও দীপশিখা, এবং অদ্বৈত বাদ, লেখক "সাংখ্যদর্শন" প্রস্তাবে এবার এই বিষয়ত্রয়ের অবতারণা ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বক্তব্যগুলি প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল,—এবং বলিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই, বটব্যাল মহাশয়ের "সাংখ্যদর্শন" সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ হইতেছে;—আমরা আশা করি, তাঁহারা প্রবন্ধান্তরে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিবেন। যত দিন প্রতিবাদ না হয়, তত দিন বটব্যাল মহাশয়ের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় সংস্কার না থাকিলে এরূপ বিতর্কের মীমাংসা বা এ বিষয়ে মত প্রকাশ সম্ভবে না। "বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনা," শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের রচনা। প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে সাধনায় যে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত প্রকাশিত হইতেছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই সমাগত অংশ মাত্র। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৈজ্ঞানিক সংবাদ" সুরচিত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। লেখক বেশ সহজে গুছাইয়া বলিতে পারেন; এবং তাঁহার বিষয়-নির্ব্বাচনও প্রশংসনীয়। "সুশিক্ষা পূরণ" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিল না। রবীন্দ্র বাবুর অন্যান্য গল্পে একটা না একটা আকর্ষণ থাকে,—ইহাতে তাহার কিছুই দেখা গেল না। 'ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন।' পুত্র বিপিনবিহারী বাপের দান খয়রাত বন্ধ করিলেন, এবং প্রজাদের নিবিড় বাড়াইয়া ন্যায়-বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রজাদের সহিত বিবাদ ও মকদ্দমার সূত্রপাত হইল। অনেক প্রজাই ভয়ভ্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জ্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি কিছুতেই নাকে সর্ষে দিল না। 'মকদ্দমা মামলা সবেগে চলিল,—এবং যেমন হইয়া থাকে, অছিমদ্দি বিশ্বাস ভ্রমে সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইল। 'অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে, তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।' কিন্তু এই সময়ে 'সমস্ত বুঝিয়া অছিমদ্দির মহাজন ডিক্রীজারী করিল। অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল। সে দিন সোমবার হাটের দিন।' অছিমদ্দি হাট করিতে গেল, এবং সহসা জমীদারপুত্র বিপিন বাবুকে তথায় দেখিতে পাইয়া, 'কাটারী তুলিয়া বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্দ্ধপথে ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া ফেলিল।' বিপিন বাবু সুযোগ পাইয়া তাহাকে ফৌজদারী মকদ্দমায় ফেলিলেন। বিচারের দিন, 'যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বিলম্ব নাই, এমন সময়ে এক জন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিন বাবুর কানে কানে কি একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া 'আবশ্যক আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।' বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—'কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন।' বৃদ্ধ সেইখানে দাঁড়াইয়াই বলিলেন, 'অছিম যাহাতে খালাস পায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে, এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।' পুত্র ত শুনিয়া অবাক, ভাব গব জেদ ধরিলেন, 'উহাদের পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?' কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি হইবে বাপু?' 'বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লোকের কাছে কি বলিব।' কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 'অবশেষে কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক (বোধ?) কর ত বলিয়ো, অছিমদ্দি তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।' 'বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, সকলের গর্ভে?' কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—'হাঁ বাপু!' এইখানেই গল্পের শেষ।—কিন্তু তাহার পরও রবীন্দ্র বাবু আর গোটা কত প্যারাগ্রাফ লেজুড় জুড়িয়া দিয়াছেন। গল্পের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে কথা এই যে, এ গল্প লেখা কেন? সংস্কৃত ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" এ গল্পের প্রয়োজন কি?—যখন পুত্রের জন্মদাতা স্বয়ং কৃষ্ণগোপাল যে কথাটা ছেলেকে বিজন বটতলায় ডাকিয়া 'কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে' কম্পিতস্বরে চুপি চুপি বলিলেন, এবং 'আবশ্যক হইলে' লোকের কাছে বলিতে বলিয়া দিলেন,—সে কথাটা রবীন্দ্র বাবু স্থির অঙ্গুলিতে লেখনী ধরিয়া অকম্পিত ভাবায় লিখিবার এমন কি আবশ্যকতা অনুভব করিলেন? ইহাতে সাহিত্যের এমন কি শ্রীবৃদ্ধি, কান্তি পুষ্টি সাধিত হইল? বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান গল্পের বিষয় রবীন্দ্র বাবুর

মত লেখকের লেখনীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "সৃষ্টি" সুন্দর, চিন্তাপূর্ণ সহজ দার্শনিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "কোহিনূর" একটি চলনসই প্রবন্ধ। "তুলনায় সমালোচনা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। কবিতাটির ভাব অত্যন্ত মধুর, ছন্দের ঝঙ্কারও চমৎকার, মোটের উপর মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। "সাময়িক সার-সংগ্রহ" চলনসই,—বিষয়গুলি কোন্ কোন্ সাময়িক প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়,—তাহার উল্লেখ থাকে না কেন?—সংগ্রহ পড়িয়া যদি কাহারও বিস্তারিত পড়িবার ইচ্ছা হয়, উল্লেখ থাকিলে, তাহা সহজে চরিতার্থ হইতে পারে। "বুড়া বয়সের কথা" একটি বহুচ্ছলে লিখিত বাগ্‌জাল,—প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। এরূপ বিষয়ের রচনা পাকা হাতেই শোভা পায়, কাঁচা হাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর "পিয়ের লোটি-ও ইস্তাম্বুল" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে দুই বার আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হারাধন দত্তের "বঙ্গের বৈষ্ণব কবি" শেষ হইল। আশা করি, বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হারাধন বাবু বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া আবার শীঘ্র সাহিত্য-সংসারে উপস্থিত হইবেন। "নব্যভারতের" কবিতানির্ব্বাচন সাধারণতঃ ভাল হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যায় নব্যভারতের কবিতা-ভাগ্য প্রসন্ন বলিতে হইবে। এবার শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত "দুটি কবিতা" নামক দুইটি নবীন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি "নূতন," অন্যটি "পুরাতন"। "নূতন" কবিতাটি মৌলিক ও চিন্তাপূর্ণ, এবং সহৃদয়তা ও ভাবুকতার পরিচায়ক। আমরা বহু ত্রৈবিদ্যে রচনায় বহুদিন এরূপ কবিতা দেখি নাই। দুঃখের বিষয় যে, স্থানাভাবে আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু "পুরাতন" কবিতাটি সত্যই পুরাতন, নিত্যকৃষ্ণ বাবুর "নূতনের" ই ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি ও কষ্টকল্পনা-কল্পিত বলিয়া বোধ হইল। প্রথমটি ভাবোদ্বেগপূর্ণ প্রাণের স্বাভাবিক সরল নির্ঝর, এবং দ্বিতীয়টি কৃত্রিমতার উৎস। কবি, "নূতনের" ন্যায় "পুরাতনের" সম্বন্ধে কবিতার স্থান নির্দ্দেশ না করিলেই ভাল করিতেন। এ সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম ও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বৌদ্ধ ধর্ম্ম।" ক্ষীরোদ বাবু তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে "প্রীতি, যজ্ঞ ও কর্ম্মের" সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে এরূপ সুখপাঠ্য রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, "মুসলমান সাহিত্য" নামক একটি নূতন প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় ফুট্‌নোটে বলিয়া দিয়াছেন, মুসলমান সাহিত্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের যথেষ্ট অধিকার আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার কিছু পরিচয় পাইলাম না। নব্যভারতে গুরু-গম্ভীর প্রকৃতির আরও দুইটি চলিতেছে, তাহাদের দোষগুণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও অসঙ্গত ও অনাবশ্যক। বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলিবার একটা প্রণালী ও নিয়ম আছে। এই সকল প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। মাসিকপত্রের প্রবন্ধ সাধারণের পাঠোপযোগী, সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, নব্যভারতের সম্পাদক ও লেখক, এ বিষয়ে উভয় পক্ষের কাহারও বিশেষ দৃষ্টি নাই। গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় মাসিকের গৌরব আছে বটে,—কিন্তু তাহা সাধারণের অধিগম্য হওয়াও তেমনই আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ "অনাত্মবাদের লৌকিকতা," "ইতিহাস শিক্ষা" প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইতে পারে। "তড়িন্ময়ী" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক মিষ্ট কবিয়া তড়িতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বেশ বুঝাইতেছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের "বর্ত্তমান বঙ্গভাষা" দেখিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি! এই প্রবন্ধ অনেকের নিকটই,—হয় বিভীষিকা, নয় উৎপাত বলিয়া বোধ হইবে। লেখক বিলক্ষণ

মহাশয়ের সহিত বাঙ্গলা লেখকদের চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, আমরা তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। "মুরাবেহুতীয়ঃ পন্থাঃ"—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া লেখক ব্যাকরণ শিখাইতে বসিলেন কেন? তিনি যে সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা "উপক্রমণিকা" দেখ বারম্বার ঋজুপাঠ ধরিয়াছে, তাহারাও তাহা জানে। তিনি একখানা ব্যাকরণ লিখুন, লেখকেরা যদি ইহা করেন, সেই ব্যাকরণের আদর্শে লিখিতে শিখিবেন। ভাষার বিশুদ্ধি প্রার্থনীয়, কিন্তু "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।" বাড়াবাড়ি কুত্রাপি শোভন নহে। শুনিতেছি, "বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটরেচর্" একখানি বাঙ্গলা অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন, সেই অভিধান-বহির্ভূত কথা কেহ ব্যবহার করিলে, তাহা বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। আমরা আশা করি, তাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়কে দলে টানিয়া লইবেন, এবং সভার সভাপতি করিবেন।—ভাষারও বিবর্ত্তন আছে—শত ব্যাকরণ, সহস্র প্রবন্ধ, কোনও ভুল তাহার ক্রমোন্নতিকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। যাহা সম্ভবে,—তাহার চেষ্টা না করিয়া, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিলে কেবল হাস্যরসের শ্রীবৃদ্ধি করা হয়, অন্য কোনও ফল দেখা যায় না। যাহারা বাস্তবিকই এই সকল সামান্য কথার প্রকৃত রূপ অবগত নহেন, তাঁহাদের জন্য মাসিকের এতখানি স্থান নষ্ট করা কেন? তাঁহাদিগকে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছে বসাইয়া ব্যাকরণ পড়ানই বিধি। কিন্তু যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া "অথাত সংযোগে ভূরিস্ত্র সন্ধিবেন, বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাদের শাস্তির কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন? [illegible] আগে পদী পড়িতে দাও, তার পর তপায় পাকা বন্দোবস্ত [illegible] স্বাভাবিক স্বাধীন ভাব জন্মের মত যায়, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? [illegible] মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" এখনও চলিতেছে। এবার পাঁচ প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "আশ্বিনে কার্ত্তিকে" শীর্ষক দুই দীর্ঘ কবিতায় একটিও আমাদের ভাল লাগিল না। শোকস্মৃতিস্বরূপ এ দুই [illegible] হইয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। "মাইকেল মধুসূদন [illegible] বিস্তর [illegible] ভাবধান ও অসংযত প্রবন্ধ, ইহাকে সমালোচনা [illegible] পড়িয়া [illegible] হইয়াছি।

ভারতী। কার্ত্তিক। এবারকার [illegible] প্রথমে শ্রীমতী [illegible] দেবীর [illegible] "বঙ্গে মাতরম্।" তাহার পর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "ফুলের মালার দুইটি পরিচ্ছেদ। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "সুরূপা ও কুরূপার বেদ" [illegible] সুন্দর কবিতা। কবিতা দুটি বেশ মধুর ও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "স্বাধীন শিক্ষা" আলোচনার উপযুক্ত। লেখকের উর্ব্বর মস্তিষ্কে অনেক রকম কল্পনার উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবল অনর্গল প্রস্তাবনা করিয়া [illegible] কোনও একটি কল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন ত দেশের অনেক উপকারের আশা করা যায়, এবং তাহার প্রস্তাবিত বিষয়গুলিও ক্রমশঃ পরীক্ষিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "সমুদ্রপ্রয়াগ" বেশ হইয়াছে। এই মৌলিক ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি বাস্তবিকই বড় মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইতেছে। "কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি [illegible] কবিতা। কবিতাটির ছন্দ মন্দ হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যায় না। কবিতাটি এক দুর্ভাগিনী মেয়ের উক্তি। বর্ণনাকৌশলে ভাষার ওজস্বিতায়, এবং দেবেন্দ্র বাবুর স্বভাবসুলভ কবিত্বে অলঙ্কৃত হইলেও, আমরা "কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী" পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কবিতাটিতে সন্দেহের ভাব বড় প্রবল, এবং তজ্জন্যই এরূপ কবিতার প্রচার [illegible] নিতান্ত অনিষ্টজনক। কেহ প্রেমাস্পদের নিকট প্রেম না পাইলেই, এবং নির্যাতিত হইলেই যে, তাহার

স্বেচ্ছাচারে অধিকার জন্মে, এমন নহে। সংযম পৃথিবীর একটা প্রধান শিক্ষা। যদি কেহ তাহার অভাবে কষ্ট পায়, নরকে যায়, সমাজ তজ্জন্য দায়ী হইতে পারে না। অবশ্য দেবেন্দ্র বাবুর 'কলঙ্কিনীর' পক্ষেও দুই এক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা অনাবশ্যক। দেবেন্দ্র বাবুর এই কবিতা সম্পূর্ণ লক্ষ্যশূন্য, নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন। ইহার প্রচার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। সমাজের প্রতি উৎকট অবজ্ঞা, সমাজবন্ধনের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা, নীতির প্রতি অনায়াস অবহেলা, নিষ্কৃত পাপের অন্ধ সমর্থন, কোনও কোনও অবস্থায় মানবের মনে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে, এবং সময়ে সময়ে বদ্ধমূলও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কবিতার বিষয় নহে। কবি কেবল সমাজ-দ্রোহের সমর্থন করিয়াছেন,—সমাজের ঘৃণিত পাপীর প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যাহা নীতিবিরুদ্ধ, তাহার প্রচারে যদি পরোক্ষভাবেও একটা অবাস্তব সুফল পাওয়া যায়, তবে তাহা সাময়িকী হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে কেবল সমাজ-বন্ধন ও সুনীতির বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনা ভিন্ন, অন্য কোনও অবাস্তব লক্ষ্য বা সুফলাশা দেখা যায় না,—সাহিত্যে সেরূপ কোনও রচনার স্থান হইতে পারে না। তাহার প্রচার কেবল অনাবশ্যক নয়,—আমাদের মতে পাপ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এ স্থলে সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, মাসিক পত্রের হিসাবেও এ কথার আলোচনা হইতে পারে। সাহিত্যের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, [illegible] যাহা ইচ্ছা তাহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা করা বরং শোভা পায়,—কিন্তু মাসিকের চিহ্নিত সীমার ভিতর একটা নিষ্ঠতা [illegible] বাঁধা উচিত। মাসিকের গতি সর্ব্বত্র। অন্তঃপুরের বাহির অবাধ গতি,—এমন কি প্রভূত প্রভাব,—সেখানে এরূপ সমাজ-দ্রোহপূর্ণ, নীতিবিরুদ্ধ কবিতার স্থান কোনও মতে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ভারতী এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া, বিদুষী মহিলার দ্বারা সম্পাদিত, বিশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পত্র। সেই পত্রে এরূপ কবিতার অবতারণা, কেবল সে সম্পাদিকার অবিবেচনার পরিচায়ক, এমন নহে। তাঁহাকে আমরা দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া গণনা করি। 'ভারতী' এই কবিতা মুদ্রিত করিয়া সাময়িক পত্রের নীতিজ্ঞ এবং পুরুষীয় স্ত্রীজাতির সম্মানের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "চীনের গল্প" হয় অনুবাদ, নয় সংগ্রহ। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা, বিশেষতঃ ইংরাজ, খেতবর্ণের বিদেশীদের প্রতি বড় সদয় নন,—তাঁহাদের অনেক কথাই অতিরঞ্জিত ও বিশ্বাসের অযোগ্য। দীনেন্দ্র বাবু যাঁহাদের নিবন্ধ হইতে "চীনের গল্প" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা কত দূর বিশ্বাসের পাত্র, বলিতে পারি না। যাহা হউক, দীনেন্দ্র বাবুর চীনের স্ত্রীহরণ গল্প শুনিয়া আতঙ্ক হয়। তাঁহার লেখাটিও বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্তের "গ্রীণউইচ মানমন্দির" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সাগ্রহে ইহার শেষ প্রতীক্ষা করিতেছি। প্রবন্ধটি বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক। 'দেহ ও মন' পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধ। লিখিবার প্রণালী মনোহর। লেখকের নাম নাই। "অকৃতী" একটি গল্প। এরূপ শোভাসৌন্দর্য্যহীন গল্পের আমরা প্রশংসা করিতে অক্ষম। ভাষাটি মন্দ নহে, অনুশীলন করিলে মন্দ হইবে না। "আলোচনা" মন্দ ব্যাপার নহে,—তবে চলিত ত? এবার ত শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্তের 'গোড়ায় গলদ' দেখা যাইতেছে। এবারকার ভারতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, নাটককার ও থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষের "চন্দ্রকিরণ সঙ্গে"—ইত্যাদি গানের একটি "স্বরলিপি" দিয়াছেন।

সহযোগী সাহিত্য।

বিজ্ঞান।

বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়াছে। দুঃসংবাদ! অধ্যাপক টীণ্ডালের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু শোচনীয়। মৃত্যু যে ঘটনায় ঘটিয়াছে, তাহা আরও শোচনীয়। যিনি মনুষ্যজাতির সাধারণ ও অসাধারণ ভ্রম প্রমাদ বিদূরিত করিয়া জ্ঞান সমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিস্তারের কল্পে, বিজ্ঞান সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, একটি অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ ভ্রমের 'চকে' তাঁহারই মৃত্যু! এবং সে ভ্রম প্রমের জনক পুরুষ হস্ত কর্ত্তৃক কৃত নহে, অধ্যাপকের আপন ঘাক-লক্ষ্মী, পতিপ্রাণা, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর একটি অভাবনীয় ভ্রমে অধ্যাপকের মৃত্যু।—ইহাকে অদৃষ্টের বিড়ম্বনাময়ী লীলা বলিব কি? অথবা ভবিতব্যের বিচিত্র বিদ্রূপ? এ নূতন একটি আকস্মিক ঘটনায় এই বিজ্ঞানাচার্য্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে, যাহাকে আমরা অবৈজ্ঞানিক অতি বিশ্বাসী লোকে দৈব বলি, নিয়তি বলি, অদৃষ্ট ও ভবিতব্য বলি, তাহারই বিধি-লিপি বলি।

অধ্যাপক টীণ্ডাল,—আকস্মিক মৃত্যু।

বিষম ভ্রম।

বিজ্ঞান ও বিধি-লিপি।

বিধি-লিপি সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, বৈজ্ঞানিক বিধি লিপিতে অতি বৈজ্ঞানিকেরও নিয়তি যে নিয়মিত করে, অধ্যাপক টীণ্ডালের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ তাহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অদৃষ্টবাদীরাই অবশ্য এ দৃষ্টান্ত। অদৃষ্টবাদী যাহাকে এ স্থলে বিধি-লিপি বলিতেছেন, দৃষ্টবাদী বৈজ্ঞানিক তাহাকেই বলেন 'বিভ্রম'। কিন্তু অদৃষ্টবাদী অবশ্য বলিবেন, তুমি যাহাকে বিভ্রম বলিতেছ, তাহার মূলে অন্তরালে বিধি-লিপি না কে বলিল? তোমার এই অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, প্রত্যাতীত বিভ্রমে যদি বিধি-লিপি না থাকিবে, তবে তোমার এত অতি সাবধানতা ও সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম সতর্কতার মধ্যেও এত অধিক অসাবধানতা ও অসতর্কতা আসে কেন? বিধি-লিপি। তাহা তোমার বিজ্ঞানের অতীত! বিজ্ঞানই যদি তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পারিবে, তবে আর তাহাকে বিধি লিপি বলিবে কেন? অদৃষ্ট তো স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্ট নয়, ভবিতব্য যদি তুমি ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিবে, তবে আর তাহা ভবিতব্য কিসে? দুনিয়াদারিতে এমন অনেক দুর্জ্ঞেয় নিগূঢ় রহস্য আছে, যাহা হে বৈজ্ঞানিক! তোমার সমগ্র বিজ্ঞানদর্শন তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অবধারণা এবং স্বপ্নেও কখনও মীমাংসা করিতে পারে না।

কিছুকাল হইতে অধ্যাপক কিছু অসুস্থ ছিলেন। এক ডোজ ম্যাগনিসিয়া গ্রহণ। শ্রান্ত ক্লান্ত স্নিগ্ধ করিবা বিশ্রামের সহায়তা করিবেন। পতি-প্রাণা পবিত্রহৃদয়া পত্নী একমাত্রা ম্যাগনিসিয়া দিলেন। কিন্তু, হায়! তাহা ম্যাগনিসিয়া নয়,—ক্লোরোফ। অসাবধানতাবশতঃ বা অদৃষ্টসূত্রে, ম্যাগনিসিয়া মনে করিয়া নিত্যস্ত তিক্ততর পদার্থে ক্লোরোফ দিয়াছেন। জড়পদার্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর ম্যাগনিসিয়া ভ্রমে ক্লোরোফ কণ্ঠে ঢালিলেন। একমাত্রা ক্লোরোফ পানে অধ্যাপকের অন্ত হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ ক্লোরোফ; ক্লোরোফের কারণ, ভ্রম, অসাবধানতা। ভ্রম অসাবধানতার প্রথম উপলক্ষ অধ্যাপকপত্নী, দ্বিতীয়, অধ্যাপক নিজে। সকল কারণের মূলে কারণাতীত প্রবর্ত্তক বিধি-লিপি বা মনুষ্যপ্রকৃতির মৌলিক প্রমাদ-প্রবণতা, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে।

বিষাদ-পরম্পরা।

অধ্যাপকের বয়ঃক্রম হইয়াছিল। বাঙ্গালা হিসাবে আমরা সে বয়ঃক্রমকে বার্দ্ধক্য বলিতে পারি। কিন্তু বিলাতি লোক প্রায়ই বৃদ্ধ হয়েন না। অতএব বিলাতি হিসাব ধরিয়া আমরা বলিতে পারি যে, অসাবধানতায় অধ্যাপকের আকস্মিক মৃত্যু না হইলে, তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে আরও অনেক কার্য্য করিয়া যাইতে পারিতেন। অধ্যাপক টিণ্ডালের বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। এই ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বিজ্ঞান-অশ্ব বেগে ছুটাইতে ছুটাইতেই অধ্যাপক ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

বয়ঃক্রম।

আয়র্লণ্ডে কার্বলো নগরের নিকটবর্ত্তী লেলিনব্রিজ গ্রামে অধ্যাপক টিণ্ডাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাতার যত্নে ইংরেজী ভাষায় রীতিমত শিক্ষিত হন। অল্প বয়সেই বিষয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম (?) চাকুরী সৈনিক বিভাগে। বৈজ্ঞানিক সৈনিকের কার্য্যে ভর্ত্তি হয়েন। অস্ত্রশস্ত্রপরীক্ষার সিবিল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই পদ প্রাপ্ত হয়েন। পাঁচ বৎসর কাল এই পদে থাকিয়া কর্ম্ম করেন। তাহার পর আরও কতক কাল মাঞ্চেষ্টারের এক রেল কোম্পানীর রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন। পরন্তু ১৮৪৭ সালে টিণ্ডাল কুইন উড কলেজে গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইখান হইতেই অধ্যাপকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরম্ভ।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত।

কুইন-উড কলেজের রেসিডেণ্ট সাহিত্যিক ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ডের সহিত সবিশেষ পরিচয়ের পর হইতেই টিণ্ডাল বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সকল গবেষণাই শেষে তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক জগতে আচার্য্যের আসন, অর্চ্চিত প্রাধান্য ও পূজ্য পদবী প্রদান করিয়াছিল।

অনুরাগ।

শিক্ষকতাগ্রহণের পর বৎসরেই, ১৮৪৮ সালে, টিণ্ডাল ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ডের সহিত মারবর্গ পলিটেকনিকে যাইয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এখান বান্‌সন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পরন্তু তিনি মার্লিনের ম্যাগ্নেসাস লেবরেটারিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন।

বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক —মারবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

চুম্বকাকর্ষণ-বৈচিত্র্য (Dimagnetism) চুম্বকাকর্ষণ-অসাধারণত্বের কেন্দ্রাভিমুখীশক্তি (Polarity of Diamagnetic forces) স্ফটিকের চুম্বকালোক স্বরূপ (Magneto-optic properties of crystals) এবং পরমাণু শূন্যতার সহিত চুম্বকশক্তিসঞ্চিবের সম্বন্ধ—প্রধানতঃ এই সকল গুরুতর বিষয়ের গবেষণায়, মিঃ টিণ্ডাল ম্যাগনাস লেবরেটরিতে রত হয়েন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা — ম্যাগনাস লেবরেটরি।

১৮৫১ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। "রয়াল সোসাইটীর" ফেলো নির্ব্বাচিত হন, এবং ইহার দুই বৎসর পর, "গ্রেট ব্রিটেন রয়াল ইনিষ্টিটিউসনে" প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। জগৎবিখ্যাত ফ্যারাডের পর, ইনি এই বিজ্ঞান-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কপদ প্রাপ্ত হয়েন। অধ্যাপক এই সময়ে গ্লেট শিলার স্বরূপ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন, পদ, প্রতিপত্তি।

১৮৫৬ অব্দে অধ্যাপক টিণ্ডাল তদীয় বৈজ্ঞানিক বন্ধু অধ্যাপক হুয়লির সহিত সুইজার্ল্যাণ্ডে গমন করেন। পার্ব্বত্য তুষারপ্রবাহ পরিদর্শনার্থে। অতঃপর টিণ্ডাল নিলিয়া তুষারপ্রবাহের গতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। ইহার পর আরও কয়েক বার টিণ্ডাল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব্যপদেশে সুইজার্ল্যাণ্ডে গমন করেন।

টিণ্ডাল ও হুয়লি।

নূতন গবেষণা ও আবিষ্কার।

এই সময়ে টিণ্ডাল কেন্দ্র-প্রবাহী তাপ (Radiant Heat) ও তাপকেন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহার ফলে তাপের সহিত ঘনীভূত বাষ্পীয় পদার্থের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। এ সম্বন্ধ ইহার পূর্ব্বে আর কোনও বৈজ্ঞানিকের চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও বদান্যতা,—আমেরিকা গমন।

বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ব্যপদেশে, ১৮৭২ অব্দে টিণ্ডাল আমেরিকায় গমন করেন। এবং তথায় বক্তৃতা করিয়া যে আয় হয়, তাহা মৌলিক গবেষণা-পরায়ণ বৈজ্ঞানিক ছাত্রদিগের সাহায্যার্থে হার্বার্ড ও কলোম্বিয়া কলেজে এবং পেন্‌সেলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি স্থাপন করেন।

বিবাহ।

১৮৭৬ অব্দে অধ্যাপক বিবাহ করেন। বিবাহ হয় উচ্চ ঘরে, লর্ড বংশে। লর্ড ক্লড হ্যামিল্টনের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তিনি পরিণীত হয়েন। দেখা যাইতেছে, অধিক বয়সেই অধ্যাপক বিবাহিত হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদিগের বিবাহে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; কেন না, বিজ্ঞানই তাঁহাদের প্রথমা পত্নী।

উপাধি মর্য্যাদা ও ধর্ম্মমত।

এত বড় অধ্যাপক পণ্ডিতের উপাধিরাশির উল্লেখ করাই অতিরিক্ত। টিণ্ডালের বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপাধি ছিল। তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু বৈজ্ঞানিক সভা ও সমাজের সদস্য ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ ও এডিনবরা, উভয় ইউনিভার্সিটির F. L. D. এবং অক্সফোর্ডের D. C. L. ছিলেন। এই শেষোক্ত উপাধিপ্রাপ্তির সময়ে আপত্তি উত্থিত হয় যে, অধ্যাপক যখন খৃষ্টধর্ম্মোক্ত মতের বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যখন "মিরাকেল" মানেন না, এবং উপাসনা প্রার্থনার উপযোগিতা স্বীকার করেন না, তখন তিনি অক্সফোর্ডের এই উপাধি পাইবার অযোগ্য। কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকের এই আপত্তি সত্ত্বেও টিণ্ডালকে উপাধি দেওয়া হইয়াছিল; ফলতঃ ইহার ন্যায় স্বাভাবিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ উপাধি দ্বারা যত সম্মানিত হউন আর না হউন, উপাধিপুঞ্জ তাঁহাদের সংস্পর্শে সম্মানিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিজপ্রসূত কুলীনের পক্ষে পৃথিবীর কৌলীন্যমর্য্যাদা আর কি হে?

গ্রন্থাবলী।

বলা বাহুল্য, অধ্যাপক টিণ্ডাল বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পর্য্যায়ানুক্রমে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। (১) The Glaciers of the Alps. (২) Mountaineering. (৩) A Vacation Tour. (৪) Heat-considered as a mode of motion. (৫) Radiation. (৬) Sound. (৭) Light. (৮) Faraday as a Discoverer (৯) Notes on Electricity. (১০) Notes on Light. (১১) The Forms of Water in clouds and rivers, ice and glaciers. (১২) Essays on the Floating matter on the air in relation to purifiction and infection ইত্যাদি।

দার্শনিক মত;—প্রবৃত্তিবাদ।

অধ্যাপক টিণ্ডাল বিখ্যাত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন;—দার্শনিক নহে। জড়বিজ্ঞানেই তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ, আলোচনা গবেষণা; মনোবিজ্ঞান তাঁহার সবিশেষে অধ্যয়নের বিষয়ীভূত হয় নাই, সূক্ষ্মতত্ত্ব চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নাই; সূক্ষ্মতত্ত্ব চিন্তার বিষয়ও হয় নাই। তথাচ এত বড় এক জন বৈজ্ঞানিক মানবপ্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও অভিমত সংগঠন করেন নাই, ইহা হইতে পারে না। অধ্যাপক টিণ্ডালের দার্শনিক মত,—প্রবৃত্তিবাদ। মানুষ প্রবৃত্তির বশ, প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির প্ররোচনা এবং তাড়নার সম্পূর্ণ অধীন। প্রবৃত্তির যখন যেরূপ প্রণোদন, পরি-

চালন, অনুরাগ আসক্তি বা ইঙ্গিত ;—প্রবৃত্তির যখন যেরূপ ঝোঁক, মানুষ তখন তদনুযায়ী কার্য্য করে। সে ঝোঁক, সে আসক্তি, সে impulse মানুষ এড়াইতে পারে না। মনুষ্য যাহাই করুক, যাহাই বলুক, যাহাই ভাবুক, প্রবৃত্তিভাবে,—impulse কর্ত্তৃক আবৃত ও অনুশাসিত ও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া করে, বলে ও ভাবে। মনুষ্য প্রকৃতিনিহিত প্রবৃত্তিই মানুষের কার্য্যাবার্য্য চালিত ও শাসিত করে, মানুষ তাহাকে চালিত ও শাসিত করিতে পারে না। পারা মানুষের স্বাভাবিক শক্তির অতীত। অতএব মানুষের কোনও কার্য্যেই যখন তাহার নিজের এক্তিয়ার নাই, প্রকৃতিগত আসক্তি ও প্রবৃত্তিরই প্রভাব, তখন নৈতিক হিসাবে মনুষ্য প্রকৃতিতে প্রশংসনীয় কিছুই নাই।

মানুষ ও পশু।

অধ্যাপক টিণ্ডালের এই প্রবল প্রবৃত্তিবাদ বা দার্শনিক-অভিমত আলোচন করিয়া কোনও কথা কহিতে হইলে, আকাশপাতালব্যাপিনী অনেক কথা উঠে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ পুঁথিপত্রের কথা বাহির করিয়া তাহা আবার পুনরুক্ত করিতে হয়। সে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় আমাদের নাই, তাহার স্থানও ইহা নয়। তবে কোনও তত্ত্বকথা না তুলিয়া অধ্যাপকের এই অভিমত সম্বন্ধে দুই চারিটী খুব চলিত কথা অথচ প্রতি প্রত্যক্ষ সত্য কথা বলা যাইতে পারে। অধ্যাপকের অভিমতের মূলে অবশ্য সত্য আছে ; কিন্তু তাহার মধ্যভাগে এবং মস্তকে সে পদার্থটা বেশি আছে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ প্রবৃত্তির বশ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিও পৃথিবীর প্রয়োজনানুসারে মানুষের একান্ত অবশ নহে। তাহা যদি হইত, তবে নিজেই অধ্যাপক টিণ্ডাল অধ্যাপক টিণ্ডাল হইতে পারিতেন না, সংসার ও সমাজও টিকিত না। মনুষ্য ও পশুতে এক ইঞ্চিও তফাৎ কাহে থাকিত না, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে এবং পূর্ণমাত্রায় পশু হইত। মনুষ্যপ্রকৃতিতে পশুত্ব প্রচুর পরিমাণেই আছে সত্য। মনুষ্য-দেহে যোল আনা রকম পশু, ইহাও সত্য হইতে পারে, তথাচ মনুষ্য পুরাপুরি নয়। কতক মতবড় মানুষ। ইহার কারণ প্রবৃত্তি বা পশুধর্ম্মের। প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপে "নিরোধ" সম্ভব হউক আর না হউক,—যদিও তাহা হওয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য,—প্রবৃত্তি সংযম সম্ভবে ; impulse অতিক্রম করিয়াই, অন্ততঃ [illegible] রাখিতে না পারিলে সে মনুষ্য-নামেরই আদৌ অধিকারী হয় না। মনুষ্যসমাজের [illegible] পারে না। নহিলে, অধ্যাপক টিণ্ডাল যে বিজ্ঞানরাজ্যের সার্ব্বভৌমিক একাধিপত্যের জন্য একান্ত আন্তরিক উপদেশ দিতেন, তাহাও সম্ভবিত না। পক্ষান্তরে, সদসদ্ প্রবৃত্তির ন্যায় পুরুষকারও মনুষ্যপ্রকৃতি নিহিত। তিতে নিহিত। যে পুরুষকার অসৎ প্রবৃত্তি সংযত করিয়া সৎপ্রবৃত্তির সম্প্রসারণ করে, তাহাই লোকব্যবহারে প্রশংসনীয়। তবে এই পুরুষকারও মনুষ্য প্রকৃতি নিহিত বলিয়া যদি তাহার নৈতিক প্রশংসা করিতে না চাও, তবে বটে প্রশংসনীয় কিছুই থাকে না। তাহা হইলে, কিন্তু আর নিন্দনীয়ও কিছু থাকে না। মত বড় সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

প্রবৃত্তি ও পুরুষকার।

নাস্তিকের নীতি-নিষ্ঠা।

কিন্তু, ইদানীন্তন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং মনুষ্য ও মনুষ্য-সমাজপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যতই সাংঘাতিক মত পোষণ ও প্রচার করুন না, তাঁহাদের নৈতিক ও ব্যবহারিক কার্য্যাবলী, তাঁহাদের মতানুযায়ী সাংঘাতিক নহে। তাঁহারা 'অগ্নষ্টিক' বা এগ্নষ্টিক হউন, নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদীই হউন, তাঁহারা সন্দেহবাদী, অজ্ঞেয়তাবাদী বা প্রবৃত্তিবাদীই হউন, তাঁহাদের নীতি নিষ্ঠা অতি বলবতী। নীতি-নিষ্ঠায় তাঁহাদের অনেকেই মনুষ্যসমাজের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ। ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজকগণ সেরূপ নীতিনিষ্ঠ হইলে সংসারের অনেক উপকার হইত।

অধ্যাপক টিণ্ডালের মৃত্যু সমগ্র বৃটিশ জাতির জাতীয় ক্ষতি। বিজ্ঞানালোচনার্থিনী পৃথিবীরই কম ক্ষতি নহে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ জাতি অধ্যাপকের মৃত্যুকে জাতীয় শোক স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সন্তপ্ত। সে দিন অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটনার তদন্ত কালে করোনারের মুখেই প্রথমতঃ এ কথা ব্যক্ত হয়। তবে ধন গৌরব ও রাজকীয় পদ-গৌরব জনিত সম্মান, রাজদ্বারে এবং এই আড়ম্বরময় সংসারে যেরূপ রীতি, বিজ্ঞান দর্শনাদির সম্মান, প্রতিভার সম্মান, সেরূপ সাড়ম্বরে স্বীকৃত নহে। নহিলে, কত পদস্থ পুরে ভেদিয়ার মৃত্যুতে অধিসিংহাসন সাম্রাজ্য শব্দিত হইলেও, এ শতাব্দীর সমুন্নত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা টিণ্ডালের মৃত্যুতে টুঁ শব্দটিও নাই কেন? সংসারের রীতিই এই, ব্যবহারই এই। সংসার যাহা কর্ত্তৃক যত অধিক উপকৃত, তাহা সংসার কর্ত্তৃক তত অধিক উপেক্ষিত,—ইহা সংসার সংহিতার একটি মৌলিক সীবার্য্য। প্রতিভার পরম পূজাপরায়ণ বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ জাতিতেও এখন এ কথা বর্ত্তে, তখন অন্য জাতি সম্বন্ধে আর কথা কি? এখনও লোকের দ্রষ্টব্য, টিণ্ডালের স্মৃতি ও সম্মানার্থে বৃটিশ জাতি কিরূপ অনুষ্ঠান করেন।

স্মৃতি-সম্মান, সংসারের রীতি।

উপস্থিত ইংলিশ মেলে, অধ্যাপকের মৃত্যুঘটনায় করোনারের তদন্তসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র আমাদের সম্মুখে আনীত। যতটা সহৃদয়তার সহিত সম্ভবে, করোনার তদন্তকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। নেহাত অনিবার্য্য বলিয়া অধ্যাপকপত্নী বিবি টিণ্ডাল তদন্তস্থলে উপস্থিত হইয়া করোনার ও জুরির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এজাহার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবি টিণ্ডালের এজাহার বস্তুতই হৃদয়বিদারক। আমরা একাধ স্থলের কয়েকটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। অধ্যাপক তাঁহার এবারের অসুখের সময় অনিদ্রাবশতঃ প্রত্যহ অল্পমাত্রায় ক্লোরাল পান করিতেন, এবং একবার অন্তর একটু করিয়া সলাবট অব ম্যাগনিসিয়া সেবন করিতেন। ৮ঠা ডিসেম্বর ম্যাগনেসিয়া সেবনের দিন। টেবিলের উপর লেবেলযুক্ত দুইটা ক্লোরাল সিরাপের শিশি ছিল; ম্যাগনেসিয়ার শিশিটা কিছু আড়ালে ছিল। বিবি টিণ্ডাল যখন একমাত্রা ম্যাগনেসিয়া ঢালিবার জন্য ভ্রমবশতঃ ক্লোরালের একটা শিশি তুলিলেন, তখনি দেখিলেন, টেবিলের উপর লেবেল আঁটা ক্লোরালের শিশি যেমন তেমনিই আছে, কাযেই তিনি যে ম্যাগনিসিয়ার শিশিই হাতে তুলিয়াছেন, সে বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুই শিশি ক্লোরাল একত্র থাকাতেই বিপত্তি ঘটাইয়াছিল। বিবি টিণ্ডাল ম্যাগনিসিয়া ভ্রমে ক্লোরাল ঢালিয়া স্বামীকে দিলেন। অধ্যাপক তাহা উদরস্থ করার পর বলিলেন,—'অদ্যকার এই ঔষধে যেন কেমন একটু মিষ্ট স্বাদ"—বিবি টিণ্ডালের তখন সন্দেহ হইল। স্বামীকে যে ঔষধ দিয়াছিলেন, নিজে তাহা আস্বাদন করিয়া দেখিলেন। তখন ভুল ধরা পড়িল। করোনারের জিজ্ঞাসায়, বিবি টিণ্ডাল উত্তর দিতেছেন;—

করোনারের তদন্ত; হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

The Coroner: I understand you took up this full bottle of chloral thinking it contained magnesia, because you had seen another bottle labelled "Syrup of Chloral."

Mrs. Tyndall: Yes. I exclaimed "John, I have given you chloral" and he replied, "My poor darling, you have killed your John."

বিবি টিণ্ডাল স্বামীকে প্রদত্ত ঔষধ নিজে চাখিয়া দেখার পরই স্বামীকে সম্বোধন করতঃ, চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"জন, আমি তোমায় ক্লোরাল দিয়াছি।"

অধ্যাপক উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আঃ অভাগিনী আমার, তুমি তোমার জনকে খুন করিয়াছ।"

বিবি টিগুল এতদূর এজাহার দিয়া একেবারে অশ্রুঅভিভূতা হইয়া পড়েন। চিকিৎসকের সহায়তায় অধ্যাপকের উদর হইতে অবিলম্বেই কিয়ৎপরিমাণে ক্লোরাল বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল; উপযুক্ত চিকিৎসা পর করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

ষ্টীন্ এঞ্জিন।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিবিধ ব্যবহারিক বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। ষ্টীম এঞ্জিনের উৎকর্ষ, উপকারিতায় ইহার উচ্চতম সাধন বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ষ্টীম এঞ্জিন এখনও আরও অনেক উন্নতি-সাপেক্ষ। ইহার কোন দিকে কিরূপ উন্নতি আপাততঃ আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, এবং কত দূর উন্নতি এ শতাব্দীতে হইয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়া অধ্যাপক আরষ্টন ইঞ্জিনিয়ারিং নামক পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক, ইহার মতে, কিরূপ উন্নতি এখন আবশ্যক, এবং ইহার কোন্ সমস্যা ইঞ্জিনিয়ারদিগের সাধনীয়। অধ্যাপক লিখিতেছেন;—

The problems remaining to be solved are such as these: securing fuel of minimum volume and weight with maximum heat-producing power; making boilers safe for still higher pressures; extending still more widely the range of thermo-dynamic transformation of the thermal into dynamic energy, reducing still further, and greatly the wastes of the engine, specially its internal heat wastes, and concentrating the mighty power of steam into even less compass and weight, ইত্যাদি।

এরূপ প্রকৃতির ইন্ধন সংগ্রহ, করা [illegible] অত্যল্প পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া এঞ্জিনে অত্যধিক উত্তাপ উৎপাদন করিতে পারে। এরূপ বয়লার নির্ম্মাণ করা চাই, যাহা অধিক তর ও উচ্চতর চাপ-ভার সহিতে হইবে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ হয়; উত্তাপজনিত বেগ-শক্তির শক্তিবেগ আরও অধিকতর নিষ্পত্তি করা চাই; এঞ্জিনের উত্তাপ-অপচয়,—বিশেষতঃ তাহার আভ্যন্তরিক উত্তাপচয় আরও অধিকতর হ্রাস করা চাই; পরন্তু ষ্টীমের বলবতী শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাকে আরও অল্প স্থানে ব্যবহারোপযোগী ও অল্পভার করা চাই।

কিন্তু ইহা কি উপায়ে করিতে পারা যাইতে পারে? অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার কহিতেছেন;—Liquid fuels give about twice as much power as the coals per pound and per cubic foot; boilers composed of many small chambers give greater safety, both from explosion and in case of explosion from high pressure; increased pressures, with further multiplication of engine-cylinders promise further economy and superheating the steam, should this ever be found permanently and safely practicable, gives perhaps the greater promise in this direction; the better kinds of iron and specially of construction-steels, the new alloys constantly coming into sight, and the more skilful use of the materials by the designer, are conspiring to give further concentration of power both in weight and space; and there seems to be no reason to doubt that the immediate futuer holds out promise of continued, perhaps of still accelerated, advances in all these directions.

তাৎপর্য্য। তরল ইন্ধন অল্প মাত্রায়, অধিক পরিমিত কয়লা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ উত্তাপ-শক্তি, (প্রত্যেক পাউণ্ডে এবং প্রতি বন ফুটে) সমুৎপন্ন ও সঞ্চয় করে। বয়েলার অধিক-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত হইয়া বিনির্ম্মিত হইলে অধিকমাত্রায় চাপভারধারণ-ক্ষম হইয়াও নিরাপদ হয়। অধিকসংখ্যক এঞ্জিনসিলাণ্ডারে বর্দ্ধিত চাপভার উত্তাপের পরিমিত ব্যয় সম্পাদন ও অপচয় নিবারণ করে; উৎকৃষ্টতর লৌহে উৎকৃষ্ট এঞ্জিন নির্ম্মাণ-কৌশলে ষ্টীম-শক্তিকে এককেন্দ্রস্থ করিয়া, তাহাকে অল্পভার ও অল্পতম স্থানমধ্যে রক্ষণোপযোগী করিতে পারে। অনুরবর্ত্তী ভবিষ্যতে ষ্টীম এঞ্জিনের এই প্রকার উন্নতি সম্ভাবিত হইবে, অধ্যাপক থার-ষ্টনের তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, এই শতাব্দীতে ষ্টীম এঞ্জিনের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে? উত্তরে আমরা উপরি-উক্ত অধ্যাপকের কথাই আবার উদ্ধৃত করিতেছি। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, সে বিষয় যে ভাষায় লিখিত, তাহা দেওয়া আবশ্যক বলিয়াই মূল ইংরেজি সবিস্তারে উদ্ধৃত করা হইতেছে। জানি, বিজ্ঞানপ্রিয়-পাঠক ইহাতে প্রীত বই অপ্রীত হইবেন না। আশা করি, সাহিত্য-প্রিয় পাঠক সাধারণতঃ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, সাহিত্যেরই অনুরোধে ক্ষান্ত অসহিষ্ণু হইবেন না। ইঞ্জিনিয়র বলিতেছেন,—

উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে।

For the moment, at least, advances of the century have brought us to the construction of steam-engines light enough to compete successfully with the motive organs of the birds, and economical enough to give us a horse power for an hour with even [illegible] ounces of fuel burned in their boilers and to carry a ton a mile, at sea, [illegible] expenditure of one half ounce of coal, quick enough in their rotation to accompany the spinning armature of the dynamoelectric machine and to drive their dispersing energy over miles of wire to give light or power to distant buildings or to cars loaded with hundred passengers. The culmination of human ingenuity and skill seems to be presented in the new ocean steamers.

তাৎপর্য্য। অধুনা, এ শতাব্দীর উন্নতি বিবৃত হইয়াছে, বস্তুতঃ এমনতর হালকা ষ্টীম এঞ্জিন প্রস্তুত হয় যে, তাহা উড়ন্ত পক্ষীর সহিত স্পর্দ্ধিতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে। মিতব্যয়িতা পক্ষেও ষ্টীম এঞ্জিনে বড় কম উন্নতি হয় নাই, প্রত্যেক ২০ আউন্স কয়লা বয়েলারে পুড়িয়া এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত একাশ্ব শক্তি বেগ উৎপন্ন করে এবং এক টন ওজনের জিনিস এক মাইল পথ লইয়া যায়;—পরন্তু উহা সমুদ্র বক্ষে হইলে আধ আউন্স মাত্র কয়লা ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে, ষ্টীম এঞ্জিনের ক্ষিপ্র বেগ এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, উহা আলোক বা বলবিস্তারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র সমভিব্যবহারে বহুমাইলব্যাপী তার অভ্যন্তরে শক্তি বিস্তারিয়া, দূরস্থ অট্টালিকাদিতে আলোক বা বল প্রদান করে। অভিনব সাগর-ষ্টীমার নির্ম্মাণে মানবীয় নৈপুণ্য অত্যুচ্চ স্থানে উত্থিত হইয়াছে।

এই সকল উন্নতি, অধ্যাপক থারষ্টনের নিজেরই উদ্ভাবিত। উপসংহারে তিনি বলিতেছেন

যে, এতাবৎ উন্নতি হইতে অতঃপর যদি বাসায়নিক শক্তি বাস্তিক শক্তিতে পরিণত বা প্রযুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, এবং তাহাতে এরূপকার মত, উত্তাপ বেগ-শক্তির অত্যধিক ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞান-বুদ্ধিবিকাশে বর্ত্তমান সময় ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।

বিমানে নৌ চালন।

কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর (যদিও এ শতাব্দীর আর-দুই-মাত্র বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে) বিজ্ঞানোন্নতির আশা এইখানেই নিবৃত্তা নহে। অধ্যাপক গ্রেহেম বেল বলিতেছেন,—I have not a shadow of a doubt that the problem of aerial navigation will be solved within ten years. That means an entire revolution in the world's methods of transportation and of making war. Electricity in one form or another will undoubtedly be the motive power for air-ships and every advance in electrical knowledge brings us one step nearer to the day when we shall fly. It would be perfectly possible today to direct a flying machine by electricity.

অধ্যাপক গ্রেহেম বেল।

অর্থাৎ "বিমানে নৌ-চালন সমস্যার সিদ্ধান্ত দশ বৎসর মধ্যেই নিশ্চয়ই সুসাধ্য হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। এ সিদ্ধান্তের অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বিবর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত মানুষের গতি বিধি এবং যুদ্ধ-পদ্ধতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ইহা নিঃসংশয় যে, কোনও না কোনও আকারে বিদ্যুতই বিমানগতিচালনার মূল শক্তি হইবে। বিদ্যুৎ প্রত্যেক দিনেরই নূতন জ্ঞান আমাদিগকে সেই দিনের নিকট হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিতেছে, সে দিন আমরা আকাশমার্গে অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইব। বিদ্যুই বিদ্যুৎ-বলে রথ চালনা করিয়া আকাশ উদ্ভ্রীয়মান করা যাইতে পারে।"

বৈদ্যুতিক শক্তি আকাশে নৌকা ও রথ চালাইয়া ক্ষান্ত হইবে না। ইহা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে, শব্দের ন্যায় আলোকও চালাইবে। এখন টেলিফোন দ্বারা শব্দের, অর্থযুক্ত বাক্যের চলাচল হয়; অতিদূরস্থিত স্রোতের সহিত কথাবার্ত্তা কহা যায়, অতঃপর বিদ্যুৎ-বলে শত সহস্র ক্রোশ দূরে আলোকের গতি-বিধি হইয়া শত সহস্র ক্রোশ দূরের সামুষের মুখ দেখা যাইবে! মুখ দেখিয়া, চেহারার দিকে চাহিয়া কথা বার্ত্তা না কহিলে ঠিক আর তৃপ্তি হয় না।

আলোক চালন।

কেবল ইহাই নহে। উপরি-উক্ত অধ্যাপক আশা করেন,—বিদ্যুৎ দ্বারা কেবল বাক্য ও আলোক নহে, চিন্তাও বহু বহু দূরে চলা ফেরা করিবে। তোমার চিন্তা আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারিবে, আমার চিন্তা তোমার নিকট উড়াইয়া দিতে পারিব,—তুমি লণ্ডনে আমি কলিকাতায়।—পরন্তু, বিদ্যুৎবলে বধির শ্রবণ-শক্তি পাইবে; অন্ধের অন্ধত্ব ঘুচিয়া দর্শন-শক্তি পাইবে।

চিন্তা-চালন,—বধিরের শ্রবণ ও অন্ধের দর্শন।

শিল্প।

স্বদেশীয় শিল্প।

এ দেশীয় সূক্ষ্ম শিল্প, আজ কাল নয়, বহুকাল হইল, সংহারগর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাহা কি ছিল, কেমন ছিল, কি উপায়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, কোন কোন প্রকরণ ও প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছিল, পরন্তু, প্রকৃতির কোন অনিবার্য্য প্রক্রিয়ার বা কারণে, অত্যাচারে বা ব্যভিচারে তাহার অবনতি ও ধ্বংস হইল, মহাশয় মাপ করিবেন,—ইহার ইতিহাস নাই,—ইতিহাস কিসেরই বা আছে? কিন্তু তাহা বলিবার যো নাই,—আর্য্যত্বের অপলাপ হইবে। উপরি-উক্ত বিষয়ের ইতিহাস নাই, তাহার ধারাবাহিক একটা উপন্যাসও কেহ জানে না; ধারাবাহিক উপন্যাস অতি দূরের কথা, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন-সূত্র, অসংযুক্ত, অগ্রথিত একটা উপকথাও কেহ বলিতে পারে না। 'কলাবিদ্যা' বলিয়া একটা কথা আমরা কানে শুনিতে পাই, তাহার এক আধখানি শাখা এবং শাখাংশ,—যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ, অল্প স্বল্প গঠন, সূক্ষ্মসূত্রে সুচিক্কণ বস্ত্রবয়ন, ইত্যাদি (যদি উহারা সে কালের "কলার" সাবেক শাখাই হয়) স্বীকার করি আমরা স্বকর্ণে শুনিতেছি ও স্বচক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু উহা ব্যতীত, অন্যান্য কলাবিদ্যাগুলি যে কেমন ছিল,—কে বলিতে পারেন? এ দেশীয় (সংস্কৃত) কাব্য সাহিত্য অবশ্য কতক কতক আছে। কিন্তু, কাব্য সাহিত্য, প্রতীচ্য মতে সূক্ষ্ম শিল্পের অন্তর্গত হইলেও, প্রাচ্য মতে সুকুমার কলার অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা উত্তম। কাব্য সাহিত্য সুকুমার কলার ভিতর গিয়া পড়িলে, তাহার সম্মান বাড়িত না; বিলক্ষণ অবমাননাই হইত। কাব্য সাহিত্যকে কাব্য সাহিত্য নাম দিয়া, সুকুমার বা সুকুমারী কলার ভিতর টানা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার কোনও কোনও (উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট) অংশ কলাবিদ্যার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে চিত্র কলাবিদ্যার একটি বিদ্যাধরী। কিন্তু, কলাকারদের হাতে, এই বিদ্যাধরীটি যেরূপ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত না করিয়া বরং চাপিয়া রাখাই ভাল। চিত্র-বিদ্যা, যিনি এখন কাব্য-কবিতার সম যশঃপ্রার্থিনী, কবি কল্পনার অন্যতমা স্ফূর্ত্তি; আমাদের সে কালের কলাকারদের হাতে পড়িয়া, তিনি নখকাটা, চুলছাঁটা, আলতা-পরাণো, বেণী-বেনানো ও শঙ্খ-সাজানোরই সামিল। কে বলিবে, চিত্রশিল্পের অবস্থা তৎকালে নখ-কাটা ও চুলছাঁটারই মত ছিল কি না? এবং কে বলিবে, তাহা পটুয়ার হাতের পট আঁকার অপেক্ষা বড় বেশি কিছু ছিল? তবে সংস্কৃত কাব্যাদিতে চিত্রবৈশলের কিছু কিছু উল্লেখ আছে বটে—তা, সে কবির প্রয়োজনবশতঃই হউক বা চিত্র-বিদ্যার উৎকর্ষ নিবন্ধনই হউক, যাহা হয় হইবে। চিত্রশিল্পের সবিশেষ সম্মান এ দেশে যে কখন ছিল, এমন বোধ হয় না, বরং ছিল না বলিয়াই ঘোর সন্দেহ হয়। প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের ও ইতালীয়দিগের মধ্যে যৎকালে চিত্র এবং ভাস্কর্য্যের অতুলনীয় উন্নতি, উপযুক্ত আদর এবং সম্ভ্রম, যাহার আদর্শ এখনও বিদ্যমান, দেদীপ্যমান, তৎকালে ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উহার কিরূপ অবস্থা ছিল, কে বলিবে? পরন্তু,

কলাবিদ্যা।

কাব্য-সাহিত্য ও সুকুমার কলা।

চিত্র-শিল্প ও কলাবিদ্যা।

গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ।

উত্তরাধিকার সত্ত্বেও শিল্প-সৌন্দর্য্যস্পৃহাই বা এখনকার এ দেশীয় 'আর্য্যসন্তান' মহাশয়দের মধ্যে বিদ্যমান কই? তাঁহাদের কয় জন আধুনিক যুবোপীয়া শিক্ষা সত্ত্বেও শিল্প-সৌন্দর্য্য, চিত্রমাহাত্ম্য অনুভব করিতে সক্ষম? অতি-মার্জ্জিত আর্য্যও ত ইদানীং দেখিতে পাই, পুরমহিলার পূত মূর্ত্তি পবিত্র আলেখ্যে অঙ্কিত দেখিলে আর্য্যানুরূপ বিশুদ্ধ প্রীতি অনুভবের পরিবর্ত্তে, আর্য্যত্ব উৎসন্ন হইল বলিয়া উদ্বিগ্ন হন, কেহ ইঙ্গিতে উপহাস করেন; কেহ বা প্রকাশ্যে পাপ-হৃদয়ের পূতি-গন্ধ উদ্গার করেন; অথচ শুনিতে পাই, পিতামহ প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে অন্তঃপুরের আলেখ্য-অঙ্কন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহারা শিল্পের সেই নির্ম্মল অধিকারে গৌরবান্বিত ছিলেন, অথচ আমরা দেখিতে পাই, আর্য্য সাহিত্যে, সংস্কৃত কাব্যে এ ব্যাপারের বর্ণনায় এক একটি অধ্যায় পর্য্য-বসিত হইয়াছে, অথচ এখনকার মার্জ্জিত আর্য্য মহাশয়রা আবার আপনারাই রবিবর্ম্মাদির সূক্ষ্ম শিল্পের সমালোচনা আবৃত্তি করিয়া, ইহার সৌন্দর্য্যানুভূতি-জনিত পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রচার, তাহার গুণগরিমার গর্ব্ব, অতুল-নীয় মহিমার কীর্ত্তন করিয়া প্রতিমাপূজা প্রমাণীকৃত ও তাহার প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। ইহা এক দিকে খুব আশ্চর্য্য বটে, অপর দিকে আদৌ আশ্চর্য্য নয়। কেন না, কার্য্যত্ব এবং আর্য্যত্ব, অনেক দিন হইতেই তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুত্বের হেমাকত এখন কেবল বক্তৃতার বন্ধনী এবং প্রবন্ধের প্রগাঢ়তাবর্দ্ধনের জন্য ব্যবহৃত। কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখি না। এক মাত্র ভারতবর্ষই কেবল "কর্ম্মভূমি" বলিয়া যাহারা অনবরত চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দেব-কার্য্যের, পিতৃকার্য্যের বা পার্থিব কার্য্যের পরিমাণ কি, সপ্রমাণ আমরা প্রাপ্ত করিতে পারি কি?

উন্নতির অভাবের নামই অবনতির অভাব। বর্ত্তমানের বা নূতনের সমর্থতা ব্যতীত অতীতের বা পুরাতনের সংরক্ষণ সম্ভবেও না। অনাদিকাল হইতে আমাদের উন্নতির অভাব, অতএব অবনতির অভাব অপরাধ কি? আমাদের নূতনই নাই, তবে আর নূতনের সমর্থতা কি? সুতরাং পুরাতনের সংরক্ষণ হইবে কিরূপে? সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা না থাকিলে সংরক্ষণ করা যায় না। এ দেশীয়দিগের মধ্যে, শিল্পে নূতন সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন শিল্পের ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমাদের নূতন নাই, কাযেই পুরাতনও নাই। পুরা-তনের যদি কিছু থাকে, তবে আছে কেবল তাহার অব্যাখ্যাত শ্রুতি এবং অস্পষ্ট স্মৃতি। সেই শ্রুতি ও স্মৃতি আর্য্য-গৌরবের ঢক্কা বাদ্যে মাত্র ব্যবহৃত হইয়া পদে পদে কেবল ইতরী-কৃতই হইয়া থাকে।

আমাদের স্বদেশীয় শিল্প নাই। বিদেশীয় শিল্পও আমরা বুঝি না। বিদেশীয় সূক্ষ্ম শিল্পের বাহ্য চাকচিক্যেই আমরা চমকিত হই; তাহার আভ্যন্তরিক সার সৌন্দর্য্য অনুধাবন ও অনুভব করিতে পারি না; সে শক্তিই এ দেশে সাধারণতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে।

আধুনিক আর্য্য ও সৌন্দর্য্যানুরাগ।

অন্তঃপুরমহিলার আলেখ্য।

প্রতিমা পূজা,—শিল্প মাহাত্ম্য।

আর্য্যত্ব এবং কার্য্যত্ব।

সৃষ্টি ও সংরক্ষণ।

বিদেশীয় শিল্প স্বদেশে।

বিদেশীয় চিত্র-শিল্পের ইদানীন্তন অবস্থা কিরূপ, বিদেশীয়েরা নিজেই বলিতে পারেন;

য়ুরোপীয় চিত্রবিদ্যা।

য়ুরোপীয় চিত্র-শিল্পে এতাবৎকাল অনেক নূতন সৃজন হইয়াছে; পুরাতনের সংরক্ষণও খুব সমর্থতার সহিত হইয়া আসিতেছে। এ মুহূর্ত্তে চিত্র-কার্য্য, চিত্র-বৈচিত্র্য এবং চিত্র-ব্যবসায়ও তথায় বিপুল প্রসার; চিত্রের প্রচারও অসংখ্য অসংখ্য। আমরা এক একটি বিলাতি ফটোগ্রাফ দেখিয়াই বিস্মিত হই। এক একটি কাষ্ঠচিত্রেই কত কারিগরি, নিপুণতা এবং পরিচ্ছন্নতা। এ সবই সত্য।

য়ুরোপে চিত্রোৎকর্ষের অবনতি।

কিন্তু, এ সব, শিল্প-সমালোচকের চক্ষে, নিম্নতর শ্রেণীর নৈপুণ্য। এই নিম্ন শ্রেণীর প্রসার-প্রাবল্যে এবং আরও অন্যান্য কারণে, কোনও কোনও সমালোচকের বিবেচনায়, সূক্ষ্ম শিল্পে, উচ্চতর আদর্শচিত্রের দিন দিন অবনতি হইতেছে। এ অবনতির একটি কারণ, ফটোগ্রাফীর বহুল প্রচার। কিন্তু অন্যান্য কারণও আছে। পণ্ডিতশিষ্ট পণ্ডিত ফ্রেডরিক হার্বিসন আমেরিকার "ফোরাম" পত্রে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতের কথা শ্রবণীয় এবং বিলক্ষণ শিক্ষণীয়ও বটে।

ফোরাম,—চিত্র-সমালোচনা।

মিঃ ফ্রেডরিক হার্বিসন বলিতেছেন;—

One rarely sees an exhibition of pictures now, specially in France, without plenty of literal transcripts from hospitals, police cells, and dens of infamy. A powerful imagination might find art even there. But the aim of these modern "artists" is not art, but disgust. They give us mere coloured photographs, without grace, pathos, awe, life or invention. Their purpose is to be as ugly, as crude, as photographic, as unpleasant as canvas and dull paint can make it. It is not even grim; it is not sensational; it is not a *tour de force*. Everything is flat, and [illegible] prosaic, nasty. ইত্যাদি।

আধুনিক য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ফরাসিস্ বর্ণচিত্রেরই বাক্যচিত্র,—অতীব কঠিন সমালোচনা। তাৎপর্য্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"আজ কালকার চিত্র-প্রদর্শনীনিচয়ে যে প্রস্তাবের এবং যে প্রকৃতির চিত্রাবলী দেখা যায়, তাহা হাঁসপাতালের, পুলিশ জেলের এবং কলঙ্ক-কূপের বীভৎস ও বিরক্তিকর দৃশ্যাবলীর আলেখ্য ও অনুকৃতি মাত্র। এই প্রকৃতির অনুকৃতি ব্যতীত রুচির তথায় অন্য চিত্র প্রাপ্তব্য। অত্যুচ্চ কল্পনা, এই সকল চিত্রে "সূক্ষ্ম-শিল্প" দেখিলেও দেখিতে পায়। কিন্তু এই সকল চিত্রের চিত্রকরদিগের উদ্দেশ্য শিল্প নহে,—অত্যন্ত অরুচিদায়িনী উত্তেজনা। এই চিত্রকরেরা বর্ণরঞ্জিত ফটোগ্রাফ মাত্র অঙ্কন করেন। ফটোগ্রাফ, চিত্রাঙ্কন ও চিত্রোদ্ভাবন নহে,—প্রাকৃত অনুকরণ। উহাতে সৌন্দর্য্য, করুণা, ভীতি, জীবনীশক্তি অথবা উদ্ভাবন, ইহাদের কিছুই নাই। বর্ণে এবং চিত্রফলকে যত দূর হইতে পারে, উহাদের উদ্দেশ্য, ততদূর কুৎসিত ও কর্কশ, কদর্য্যানুকারী এবং অমনোজ্ঞ হওয়া। উহা উগ্রও নহে, উত্তেজকও নহে, উহাতে শক্তি-সামর্থ্য ও গুণপণার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। উহাতে যাহা কিছু সবল, চেষ্টা— কেমন কুঞ্চিত কদর্য্য, শুষ্ক এবং গদ্যবৎ।"

মিঃ ফ্রেডরিক হ্যাবিসনের এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, অতিরঞ্জিতই বটে। তবে, রিয়ালিষ্টিকের রাজ্যে একাধিপত্য হওয়া অবধি, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায়, য়ুরোপীয় শিল্পও যে কাব্য কবিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া গদ্য-গর্ভের বেশি দূরে যাইয়া পড়িতেছে, সত্যের অনুরোধে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, এই রিয়ালিষ্টিক বা প্রকৃতি-অনুকারী শিল্পের গদ্যাংশের সেবকদিগের কার্য্য গতির পরিচালন-মন্ত্র বা "থিওরি" কি? থিওরি ইহাদের অবশ্যই আছে। এবং সে থিওরি সাহিত্যের রিয়ালিষ্টিক রাজ্যের থিওরিরই তুল্য, অথবা উহারা উভয়ই এক। মিঃ ফ্রেডরিক হ্যাবিসনের বর্ণনা অল্পাধিক অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও, তাঁহারই কথায় এ থিওরির মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শিল্প,—কাব্য কবিতা।

শিল্পের বর্ত্তমান থিওরী।

Art means the representation of Nature. Whatever is found in Nature is the subject of Art. The test of Art is success in representation; nothing else at all. The business of the artist is to show, how cleverly he can use his brush. It matters not what he paints, if it enables him to display dexterity. * * * Art has been ruined by its silly straining after the beautiful, the ideal, the charming and the ennobling. There is in Nature quite as much that is coarse, dull, odd and foul—perhaps much more—and it is far more obvious and intelligible. Art henceforth means the realism of the seamy side of Nature and man. We have been surfeited by the pursuit of grace, beauty and dignity which have led Art into a world of sickly conventions. We are now in for naturalism in its real, crude, naked shape.

রিয়েলেষ্টিক শিল্পের শিল্প থিওরী এইরূপ,—

শিল্প অর্থে স্বভাবের প্রতিলিপি লওয়া,—প্রতিলিপিত করা। স্বভাবে যাহা কিছু প্রাপ্তব্য, সমস্তই শিল্পের বিষয়ীভূত। স্বভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিফলিত করাই শিল্পসাফল্যের লক্ষণ,—উহার কার্য্য এবং কাব্যকবিতার নিদর্শন আর কিছুই নহে। শিল্পী-চিত্রকরের কার্য্যও আর কিছুই নহে,—কত দূর কৌশল্য এবং নৈপুণ্য সহকারে তিনি তাঁহার তুলিকা চালনা করিতে পারেন, কেবল তাহাই প্রদর্শন করা। তিনি কি চিত্র করিলেন, কিসের চিত্র করিলেন, তাহা বিচার করার আদৌ প্রয়োজনাভাব। চিত্রকর যাহাই চিত্র করুন,—চিত্রের বিষয় যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক; চিত্রকরের চিত্র-নৈপুণ্য লইয়াই কথা,—চিত্রিত বিষয় বিবেচ্য নহে। * * * এত কাল চিত্রশিল্পী নির্ব্বোধের মত সৌন্দর্য্যের এবং সৌন্দর্য্যাদর্শের মনোজ্ঞতার এবং মহত্বের অনুসরণ করাতে শিল্পের ধ্বংসই সাধিত হইয়াছে। স্বভাবে সৌন্দর্য্যাদি অপেক্ষা কদর্য্য-কবতা, ঔদাসীন্য জড়তা, বৈসাদৃশ্য এবং কলঙ্ক-কালিমা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান,—এবং তাহাই অধিকতর দেদীপ্যমান এবং বুদ্ধি-বোধগম্য। শিল্প এখন হইতে জড় ও মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিকতা, তাহাদের সত্য সুস্পষ্ট এবং অংশ অক্ষুণ্ণ

অক্ষরে অঙ্কিত করিবে। শিল্প, সৌন্দর্য্যের এবং সৌকুমার্য্য-কারুণ্যের এবং সমুন্নতির অপরিমিত অনুসরণ করাতে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সংকীর্ণ নিয়মাবলীর সীমাবদ্ধ কণ্ঠ বাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সত্যের, প্রকৃতের, কর্কশের এবং কুৎসিতের অনুসরণ করিয়া প্রকৃতির নগ্ন রূপের প্রদর্শনই এখন শিল্পীর উচিত,—শিল্পের উদ্দেশ্য।'

মিঃ ফ্রেডরিক হ্যারিসনের বিবেচনায়, বিযেলিষ্টিক এই থিওরিই সর্ব্বনাশের মূল। ইহাতে স্বাস্থ্যকর এবং সুমহৎ আদর্শ উচ্চ শিল্পের ক্ষয় সাধন হইতেছে। শিল্প-ক্ষেত্রে প্রতিভাও প্রস্ফুট হইতে পাইতেছে না। এই প্রণালীর শিল্পীরা কুৎসিতের অনুরাগী বা পক্ষপাতী বলিয়া উপরি-উক্ত লেখক এ পদ্ধতির নাম দিয়াছেন,—Ugly School.

অতঃপর, এস্থলে আমাদের অতি সংক্ষেপেও বলা উচিত যে, সাহিত্যের ন্যায়, শিল্পে কদর্য্যবাদ মতের মূলে অবশ্যই স্বাভাবিক ও শিল্পীসুলভ সত্য আছে; কিন্তু তাহার মস্তকে অস্বাভাবিক এবং শিল্পবিরোধী মহা মিথ্যা। স্বভাবের অনুসরণ এবং অনুকরণ, শিল্প-সাহিত্য উভয়েরই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বটে; কিন্তু, স্বভাবসঙ্গতি রাখিয়া স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি করাও উহাদের অন্যতম অতি প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যুরোপীয় চিত্রবিদ্যায় রাফেলের সমসাময়িক ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী চিত্রকরদিগের চিত্রচর্চ্চার ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। রোমান্টিক ও বিযেলিষ্টিকের সামঞ্জস্য ও সমীকরণই শিল্পের উদ্দেশ্য। শিল্পে বা সাহিত্যে যদি গদ্য থাকা আবশ্যক হয়, তাহাতে পদ্য থাকা ততোধিক আবশ্যক। তুমি কুৎসিত কদর্য্যের বর্ণন ও অঙ্কন করিতে পার; কিন্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যকে আদৌ উপেক্ষা করিবার তোমার অধিকার নাই। তুমি সৌন্দর্য্য ও সুমহৎকে উপেক্ষা করিতে চাও বলিয়াই তোমার মত দুষ্ট।

আমাদের আলোচনা।

কবিতা-কুঞ্জ।

যাই।

আমার রেখা না ধ'রে কুবাযে এসেছে দিন,
কালের সাগরে আয়ু চাহিছে হইতে লীন,
যেতেছে বরষ-সার পিছনে ডাকিয়া মোরে,
ছিন্ন এ জীবনগ্রন্থি কত আর বাঁধ জোরে?
একটি তরঙ্গাঘাতে যায় তীর, খসে যায়,
আর কেন মায়াবলে ধরিয়া রেখেছ তায়?
প্রকৃতি বাসনা আশা বিদায় দিয়েছে মোরে,
কবিতা কল্পনা সাধ নীরবে গিয়েছে সরে।
সংসার কুহেলিমাখা, হৃদয় হয়েছে হীন,
দিন দিন তিল তিল এ দেহ হতেছে ক্ষীণ।
চ'খে ভাসে চারি দিকে হাহাকার অশ্রুজল,
প্রাণে জাগে হাহুতাশ প্রতিদিন প্রতি-পল।
দিন পরে রাত যায় নীরবে ডাকি;
যাইতে পারিনে, বাঁধা তোমাদের মায়।
এক দিন যেতে হবে কেন তবে টানা,
কত আর রাখিবে গো বেঁধে ক্ষীণ প্রাণ।
কুবায় জীবন বেলা আঁধার আসিছে ঘিরে,
প্রশান্ত মরণ ছায়া নয়নে নামিছে ধীরে;
হৃদয়ে দারুণ ভাব, আর কেন রাখ ধ'রে,
দুঃখের সংসার এ যে, যেতে দাও ত্বরা ক'রে।
যথা অশ্রু হাসি মাঝে লুকা'য়ে একটি দিন
হাসি মুখে থাক চেয়ে দেখে যাই শেষ দিন,
বৃথা আর আকিঞ্চন, মরণ ডাকিছে ওই,
খুলে নাও মায়াডোর অনন্ত বিদায় দাই।

শ্রীপ্রমীলা নাগ।

বাসর।

এখনও সে ছবি জাগে হৃদয়ে আমার,
সুখ আকুলিত সেই বাসরযামিনী।
আলোকমালায় ঘেরা গৃহ চারিধার,
কৌতুকবহস্যময়ী বালিকা কামিনী।
অচেনা অজানা তবু নয়ন আকুল,
একবার আঁখি তুলে দেখিতে মুখানি।
চারিদিক সুবাসিছে সুরভিত ফুল,
কেমন উলসি চিত্ত উঠিল না জানি।
কি যে মোহময় সেই শীতল পরশ,
যখন দুইটি করে ধরেছিলে কর।
তবু সে আবেগমাখা কেমন হরষ
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এ হৃদয় পর।
নবপরিচিত সেই নয়নের ছায়
চির বাঁধা এ পরাণ পড়েছিল হায়।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

সাথী হারা।

আমি যেন চলিয়াছি নিশীথ-সাগরে
সুগভীর আঁধার বাহিয়া;
এরি পর পারে বুঝি উষার ভবন,
তুমি সখি, আছ দাঁড়াইয়া।
তোমারি সহস্র স্মৃতি হৃদয়-আকাশে
শত শত তারকার মত,
ঢালিছে আলোক ছায়া আকুল নয়নে
স্নেহময় মৃদু ভাতি কত।

সে স্বর্গপুরী রয়েছে লুকানো
বিরহের কুহেলিকা-আড়ে,
শ্বাসে আশা অস্ফুটিত স্বরে
কাণে কাণে বলে বারেবারে।
এক খানি যবনিকা প'ড়েছে মাঝারে
দু জনারে করি অন্তরাল,
উঠিলেই দেখা হবে তাই মনে করে'
শান্ত মনে চলি ক্ষণকাল।

আবার প্রেতাত্মা মত হৃদয়ে আসিয়া
ধীরে ধীরে সংশয় দাঁড়ায়;
শূন্য মনোগৃহ মাঝে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
কত শত দুঃস্বপ্ন দেখায়।
বলে যেন এ রজনী ফুরাবে না কভু
এ বিরহ মৃত্যুর সোদর;
চির তরে ছাড়াছাড়ি হ'য়েছে দোঁহার
দেখা শুনা নাই এর পর।

ঝরে অশ্রু বিন্দু বিন্দু কপোল বাহিয়া,
থেকে থেকে কভু মনে হয়,
দুরতার সিন্ধু যদি বিস্মৃতি-প্রবাহে
ভালবাসা ভাসাইয়া লয়;
ছিঁড়ি দিয়ে বন্ধুতার এ সুখ-বন্ধন
দুটি হৃদি দেয় ভেদ করে',
সাথী হারা প্রাণ তবে চলিবে কেমনে
জনপূর্ণ জগতের পরে।

মিলি কি না মিলি, মনে রাখ নাহি রাখ
যেখানেই কাটুক জীবন;
তোরে ঘিরে জেগে থাক্ চির সুমঙ্গল,
চিরোজ্জ্বল আলোক মতন।
শুভ্র শতদল সম হৃদিখানি তোর
নির্দ্দোষতা, পবিত্রতাময়;
সৌরভ, অমিয়া থাক্ চির পূর্ণ তাহে
এই শুধু চাহে এ হৃদয়।

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

উপহার।

এত পুণ্য, এত হাসি, এত কলরব
যে জগতে, সেথানে কি সাজে মোর গান?
তাই ভাই! প্রেম শুষ্ক, সজল নয়ান,—
নিভেছে আশার দীপ, অন্ধকার সব।
এমন সজন ধরা বিজনের মত,
কেহ হাসে কেহ গায়, চাহে না ত ফিরে,
শত চেনা মুখ,—কেহ নহে পরিচিত,
তাই ছিনু এক ধারে আপনাতে মরে।
শুনিনু স্নেহের স্বর, শুনিনু সাহসা;
চাহিয়া দেখিনু সখে, সমুখে তোমার
উজল নক্ষত্র তুমি প্রেম-অমরায়!
স্নেহ ভরে যবে তুমি দিলে ভালবাসা—
সেই দিন স্মরি, এই দীন উপহার
অর্পিছে তোমায় কবে সুহৃৎ তোমার।

১৮ই ফাল্গুন; ১২৯৭।
চন্দননগর।

শাস্ত্র ও যুক্তি।

আরম্ভকালেই বলি যে, আমি অনধিকারচর্চ্চা করিতে বসিয়াছি। কেন করিতেছি, তাহা বলা বৃথা। বলিলে কেহ ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবটা মন্দ নহে, কেবল অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিলে ভাল হইত, তাহা হইলে আমারও এই নিবেদন থাকিল যে, অধিকারী ব্যক্তি যেন এই কার্য্যে ব্রতী হন।

এক সময়ে সনাতন ধর্ম্মের এত দুর্গতি দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য ভাবাতে কোনও বিরুদ্ধ কথা শুনিলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের পরাজয় মানিতে হইত। এখন দেখিতেছি যে, দোষগুণের বিচার করা দূরে থাকুক, কেবল দলাদলি করিবার জন্যেও পাশ্চাত্যের নিন্দাবাদ ও প্রাচ্যের প্রশংসাবাদ হইয়া থাকে। এরূপ আচরণে মন্দ ভিন্ন শুভ সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজা পাশ্চাত্য। বিশেষতঃ এই পাশ্চাত্য রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সত্ত্বেও, ধর্ম্ম এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধেও প্রজার সহিত দলাদলি করিবার অভিরুচি হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমাদের পক্ষে জমাট বাঁধিবার চেষ্টা যোগ্য বিষয়েই প্রযুক্তি করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্যগণ প্রাচ্য বিষয়ের পর্য্যালোচনাস্থলে এখন আর এমন ভাবে সময় করেন না যে, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবার প্রত্যাশা আছে। তাঁহারা এখন কেবল পুরাবৃত্ত অন্বেষণ করেন। তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির প্রাচ্যবিধানের দোষগুণবিচারে প্রবর্ত্তিত হইবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও হয়। ব্যালান্টাইন সাহেব সাংখ্য বেদান্তের খণ্ডন করিবার মানসে যেরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে প্রণালী রহিত হইয়াছে। এখন ম্যাক্সমুলর, কাউএল প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়া কেবল স্বদেশবাসীগণের গল্পের ভাণ্ড রোঝাই করিতেছেন। উপদেশলাভের কামনাতে সংস্কৃতশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মাগ্রের পাশ্চাত্য চক্ষে প্রতিফলিত হয় না। প্রাচ্যগণের দুরবস্থা স্বভাবতঃই অধিকতর; তাহাদের মধ্যে তিন বিভাগ। "শিক্ষিত ভারত" বলিলে ইংরাজি শব্দটা উহ্য আছে, জানিতে হয়। ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে আবার অন্ততঃ দুই ভাগ। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজিত্ব, আর ইংলণ্ড-প্রত্যাগতগণের ইংরাজিত্ব। ইহারাও সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ

অধ্যাপকের নিকট গূঢ় শিক্ষালাভের জন্যে নতশির হইতে সম্মত নহেন। অধ্যাপক মহাশয়েরা মনে মনে কি ভাবনা করেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, কেহ বা শাস্ত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, কেহ বা জন্মান্তরে শ্বেতাঙ্গ পাইবার জন্য তপস্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সুতরাং এক সময়ে পাশ্চাত্যগণের সংস্রবে সংস্কৃতশাস্ত্রের যে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। চতুষ্পাঠীগুলির প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়াই বলুন, কি টাইটেল-পরীক্ষার আড়ম্বরের কথাই বলুন, কিছুতেই জ্ঞানের উন্নতি দেখা যায় না। কালে অবশ্যই এই বিভ্রাটের অবসান হইবে। কিন্তু তত দিন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে কি না, তাহাও চিন্তার বিষয় হইতেছে।

আমি অনেক দিন হইতে কোম্‌তের প্রামাণিক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি। সুতরাং আমার মুখে পাশ্চাত্যবিধানের নিন্দা, এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রশংসা, কিছুই শোভা পায় না। অথচ আমার অবলম্বিত মত অনুসারে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সামঞ্জস্যবিধান অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এক সময়ে মনে করিতাম, পাশ্চাত্য শিক্ষা জীবিত থাকিলে সময়ে অবশ্যই ফলোদয় হইবে, কিন্তু ইদানীন্তন দলাদলির বৃদ্ধি দেখিয়া হতাশ্বাস হইতেছি। আমি না পারি মানিতে যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধনিবারণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, না পারি বলিতে যে "ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান" যে উচ্চতম অক্ষয় বস্তু, তাহা বিলোপের কোনও শঙ্কাই নাই"। আমি সমুদ্রযাত্রার স্বপক্ষতা করিবার জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিপ্লবকারিতা ভুলিতেও পারি না, এবং এ কথাও মনে করিতে পারি না যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বর্ত্তমান কালে উপস্থিত থাকিলে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিতেন। "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের নিকট পাশ্চাত্য বিধানের নিন্দা করা বৃথা; তাঁহারা রাজার অনুকরণে ক্ষান্ত হইলেও প্রাচ্য অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবেন না, এবং প্রাচ্য অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকটে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসিলে কেবল অরণ্যে রোদন নহে, আত্মগ্লানিতে মুখ লুকাইতে হয়। এক শ্রেণী আকাশের মেঘচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন, আর এক শ্রেণী ঋষিগণের নিকটে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের যে বিধি শিখিয়াছেন, তাহা কোনও মতেই বর্ত্তমান গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করিতে পারিতেছেন না।

উপস্থিত বিভ্রাটের মূলীভূত হেতু এই যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা এখন কেবল জ্ঞানযোগ ও আধিপত্যলাভসম্বন্ধে ব্যাপৃত

নহে। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য গার্হস্থ্য বিধান মতে ধনলোভের অসাধারণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বিলাতী বাণিজ্য, কল কারখানা, এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র, সমস্তই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপাদান ধনোপার্জ্জনের সহিত এত জটিল ভাবে মিশিয়াছে যে, তাহাতে যতিধর্ম্মের কিছুমাত্র স্থল দেখা যায় না। সেই বিলাতী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এখন এখানেও বাড়িতেছে। ইহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের এত বিরোধ যে, সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র নূতন করিয়া না গড়িলে এখনকার কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কাহারও নিস্তার নাই। আর রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ বিষয়ে সমগ্র ইউরোপীয় তন্ত্র আমাদিগের শাস্ত্রের বিপরীতভাবাপন্ন। অতএব বিবিধ যোজনার প্রয়োজন হইয়াছে। এক, পাশ্চাত্য রাজার সহিত রাজধর্ম্মের যোজনা করিয়া রাজ্যরক্ষা করা আবশ্যক; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্যগণের সূত্রপাত হইতে যে অভিনব গার্হস্থ্য-প্রণালী এখন জগদ্ব্যাপী হইয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত সনাতন-ধর্ম্ম এবং সনাতন বৈরাগ্যের অভিনব যোজনা করা আবশ্যক। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করিয়া শাস্ত্রকারেরা তপস্যা, যজ্ঞ এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের বিধান করিয়াছিলেন, সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পাশ্চাত্য সংস্রবে এখন অসাধারণ দ্বন্দ্বভাব (Competition) দ্বারা জর্জ্জর হইয়া উঠিতেছে। এই বিষয়ের গূঢ় আলোচনা ব্যতীত সনাতন-ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার পথ দেখিতে পাই না। এই দ্বন্দ্বভাবকে পাশ্চাত্য নাস্তিকতার অঙ্গ বলিতে পারা যায়; কিন্তু দ্বন্দ্ববাদীরা মনে করেন যে, দ্বন্দ্বই ব্রহ্মাণ্ডের বিধান, দ্বন্দ্ববিধান পালন করিয়াই ইউরোপের প্রাধান্য দাঁড়াইয়াছে, এবং দ্বন্দ্ব হইতে যদি সনাতন ধর্ম্মের ধ্বংস হয়, তবে সেই ধ্বংসই শ্রেয়। আমি আমার অবলম্বিত প্রামাণিক ধর্ম্মানুসারে এই মতের বিরোধী। কিন্তু গৃহস্থের ধনোপার্জ্জন-ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বভাব বিসর্জ্জন করিলে, অর্থলোলুপ পাশ্চাত্যগণের হস্তে রক্ষা পাইবার উপায় কি, তাহাও দেখিতে পাই না। প্রামাণিক ধর্ম্ম পাশ্চাত্য রাজ্যে নিতান্ত অভিনব। উহা কত দিনে বিস্তৃত হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, প্রাগুক্ত ধর্ম্মপ্রণেতা কোম্‌ৎ সংস্কৃত শাস্ত্রের কিছুমাত্র না জানিয়াও, প্রকারান্তরে এক অভিনব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কোম্‌ৎ হইতেই সমাজতত্ত্ব পুরাবৃত্তের উপরে সংস্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং অধুনাতন পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তব্যবসায়ীরা সংস্কৃতশাস্ত্রে যে কেবল ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করেন—ধর্ম্মশিক্ষালাভের যে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না, কোম্‌তের সময় হইতে তাহার সূত্রপাত গণনা করিলে অসঙ্গত হয় না, অথচ কোম্‌তের

আমার অনধিকারচর্চ্চা দাড়াইয়াছে। কিন্তু সকল সূক্ষ্ম কথার সার্থকতা স্থির করিবার জন্য স্থূল পরীক্ষা করা বিধেয়। অধ্যাপক মহাশয়দিগের ঔদাসীন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাশ্চাত্য অনুকরণ, এবং প্রামাণিক ধর্ম্মের অপরিচিত কথা, এই তিনের একটি পরীক্ষাস্থল আছে। তিন দলেই তর্কপ্রিয়তা আছে। কিন্তু এখন তর্কের প্রণালী লইয়াও তর্ক চলিয়াছে। এ স্থলে এই স্থূল কথার অবতারণা করিতেছি।

১। শৈশবকালে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য নারীগণ ব্যতীত কাহার উপর ভারার্পণ করা সম্ভব? এবং এ দেশে নারীগণ শিখেন কাহার কাছে, এবং শিক্ষা দেন কিসের বলে?

২। ইংরাজি শিক্ষিতগণ কি কখনও প্রত্যাশা করেন যে, স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য ইংরাজি চর্চ্চা করিবেন। আমরা গর্ব্ব করি যে, ইংরাজি আর আমাদিগের অর্থকরী বিদ্যা নাই, উহা এখন আমাদের অস্থি-মজ্জা হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াও কি ইংরাজি পড়িবেন, আর পাশ্চাত্যবিধানমতে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন? স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ফল দাঁড়ায় যে, পুরুষ স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, তবে তাহার আন্দোলন করিলেই ভাল হয়। কেন না, ব্রাহ্মণগণ এত যে দুরবস্থাপন্ন, তথাপি একপ কাপুরুষগণকে কটাক্ষপাত দ্বারা ভস্মীভূত করিতে পারিবেন। কোমতের দোহাই দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইবে না। পক্ষান্তরে শিশুশিক্ষার ভার স্ত্রীজাতিগণের উপরে রাখিতে হইলে, মাষ্টার মহাশয়ের অত্যাচারনিবারণের উপায় কি?

৩। অধ্যাপক মহাশয়দিগকে বলি, মনু অনুক্রমণস্থলেই যে বলিলেন—

স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।

ইহাতে স্থানাভাববশতঃ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মযোগ তাপস্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন, না তাঁহার অন্য কিছু অভিপ্রায় ছিল? বর্ত্তমানকালে বালকেরা যখন অন্তঃপুরে আসিয়া মাতৃসন্নিধানে হুঙ্কার উদ্গীরণ করে, তখন গৃহ মার্জ্জনা করিবার জন্যে অধ্যাপক মহাশয়েরা কি উপায় নির্দ্দেশ করেন? ইহাতে কি আর "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং" বলিলে ব্রাহ্মণী শিশুপালনকার্য্যে সক্ষম হইবেন। অতএব যদি তাপস্য, মোক্ষ বা সন্ন্যাসের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তবে বর্ত্তমান গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থাতে স্ত্রীগণকে শাস্ত্রবসজ্জ করা বিধেয়।

বাজা পাশ্চাত্য, রাজধর্ম্ম পাশ্চাত্য, ব্যবসায় পাশ্চাত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পশ্চাত্য, দেশের কুশিক্ষা অশিক্ষা পাশ্চাত্য ; এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য তর্ক-প্রণালী ব্যতীত পাশ্চাত্য নাস্তিকতা কিসে নিবারিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। এই নিমিত্তে বলি যে, শাস্ত্রের যুক্তি অবধারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে ; এবং শাস্ত্রের যুক্তি এমন করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যেন শুদ্ধান্তচারিণী নারীগণও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। পাশ্চাত্যগণ এ বিষয়ে তোমাদিগের সাহায্য করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবোধ ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অর্থকর উদ্দেশ্য ভুলিলে আরও অমঙ্গল হইবে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অযথা বিদ্বেষ করিলেও, খবরের কাগজ বিক্রয়স্থলে পাশ্চাত্য অনুকরণ ব্যতীত, আর কোনও ফলোদয় হইবে না।

আবার দেখুন শাস্ত্রের যুক্তি এত যে দুর্লভ হইয়াছে, তাহার হেতু কি ? শাস্ত্রকারেরা হৈতুকী বুদ্ধির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারও বিশিষ্ট কারণ ছিল। এখনও ভারতের রাজনামধারী হিন্দু সর্দ্দারগণের রাজ-সভা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল সভা হইতে শাস্ত্রানুরূপ এবং শাস্ত্রসম্মত আইন এখনও বাহির হইতেছে। পিন্যাল কোড জারি না করিলে নয়, তবুও প্রাগুক্ত রাজন্যবৃত্তিধারিগণ পিন্যাল কোডখানাও গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রাতৃদৌহিত্রের দায়ক্রম নির্ণয় করিবার জন্যে উকীল-সকটের বন্দোবস্ত করেন না, সুতরাং পদে পদে শাস্ত্রের যুক্তি সমালোচনা করিতে হয়। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবককে জিজ্ঞাসা করিলে, "অষ্টিন বলিয়াছেন" শুনিয়া নতশির থাকিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল পোড়া বঙ্গদেশে। অতএব, অধ্যাপক মহাশয়েরা শাস্ত্রীয় যুক্তির অবধারণ বিষয়ে ঔদাস্য করিতে পারেন না। এক সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন করিয়া কি ফল ? সমগ্র শাস্ত্রের যুক্তি অন্বেষণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু আমার আড়ম্বর যত বড়, আসল কথাটা তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। আমি এ কথা বলি না যে, 'ঠাকুর ! যুক্তি না দিলে তোমার কথা শুনিব না।' আমি বলি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধৃষ্টতা শাসন করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। আর বলি যে, প্রথম কল্পে প্রচলিত শাস্ত্রটা কি, তাহা স্থির করুন।

রঘুনন্দন একখানা পুস্তক খাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার যত ভুল ভ্রান্তি থাকুক, উক্ত গ্রন্থ মানিয়া চলিলে আর পাশ্চাত্য ব্যভিচারের নিন্দা থাকে না। কিন্তু রঘুনন্দন যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অনেক

শাস্ত্রীয় তর্ক আছে। সে সকল তর্ক বর্ত্তমান কালে কতক অপ্রয়োজন এবং কতক অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যেখানে রঘুনন্দনের মত সর্ব্ববাদিসম্মত, সেখানে তাহার হেতুবাদ গৌণ কথা। যেখানে মতভেদ চলিতেছে, সেখানে বিভিন্ন বিধান দিলেই আমার প্রস্তাবিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, শাস্ত্রীয় প্রমাণের আড়ম্বর করিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে রঘুনন্দনের লিখিত শাস্ত্রীয় বিধানও দেশাচারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনরুদ্ধার করা সহজ নহে। অথবা, তাহার সহিত একত্রিত থাকে বলিয়া; প্রচলিত দেশাচারের শাস্ত্রীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য হইয়াছে। অতএব, দেশাচারের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ না বাধাইয়া, দেশাচার-অনুগত শাস্ত্র এবং দেশাচার-বহির্ভূত শাস্ত্র, পৃথক করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যটা প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু ইহা অসাধ্য নহে, এবং এই প্রণালীতে শাস্ত্র অবধারণ করিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ্যরক্ষার উপায় সুলভ হইবে। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার যতই নিন্দা করি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে যে, যদি অধ্যাপক মহাশয়েরা এই প্রণালীতে শাস্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরাই পাশ্চাত্য বিচারমল্লতা সহকারে শাস্ত্রের যুক্তি এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যুগপৎ অবধারণ করিয়া দিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

পারস্যের গার্হস্থ্য ও রাজকীয় প্রথা।

এক সময় পারস্যবাসীগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন, এখন তাঁহারা মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত। লৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মে আমাদের দেশের মুসলমানগণের সহিত পারস্যের মুসলমানগণের কোন প্রকার বিভিন্নতা আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কিন্তু একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অতি হীন অবস্থাপন্ন মুসলমান পর্য্যন্ত নিজ নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকনয়নের অন্তরালে রাখিবার জন্য যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করে, পারস্যেও এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। পারস্যের

"রিলিজন্" শব্দের বাঙ্গলা কি ?

হেমন্তে ঊষাকালীন পাদচারণাবসরে একদা দুই জন সুপণ্ডিত পাদরী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কথায় কথায় তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, আমাদের বাঙ্গলাতে রিলিজন (Religion) শব্দের অনুবাদ কি হইবে ? বলা বাহুল্য, পাদরীরা ইংরাজ। পণ্ডিত লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, কিছু বিবেচনায় আবশ্যক হয়। আমার বিবেচনায় যাহা হয়, তাহা এখনি লিখিব ; কিন্তু তাহা যদি সঙ্গত না হয়, ভরসা করি, সাহিত্যের কৃতবিদ্য লেখক ও পাঠকমণ্ডলী হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক উত্তর আসিবে।

এক্ষণে সচরাচর "রিলিজন" শব্দকে "ধর্ম্ম" বলিয়া অনুবাদ করা হয় ; কিন্তু ইহা মনোরম নহে।

"রিলিজন" শব্দের ধাত্বর্থ যাহাই হউক, ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেকগুলি অঙ্গ আছে। প্রথমতঃ, "রিলিজন" বলিলে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এই কথার ধ্বনি পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস দেশভেদে, কাল-ভেদে, সমাজভেদে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার বিশ্বাসেরই সাধারণ নাম "রিলিজন"। দ্বিতীয়তঃ, "রিলিজন" বলিলে, উপাসনা-প্রণালী, এই অর্থের ধ্বনি পাওয়া যায়। উপাসনাপ্রণালীও দেশাদিভেদে বিভিন্ন ; কিন্তু তাহাদেরও সাধারণ নাম "রিলিজন"। তাহার পর, কতকগুলি আচার ব্যবহার, যাহা তাদৃশ বিশ্বাস বা উপাসনাপ্রণালী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যাহা তাদৃশ বিশ্বাস ও উপাসনাপ্রণালীর ন্যায় দেশাদিভেদে বিভিন্ন, তাহাদেরও সাধারণ নাম "রিলিজন"। তাহাতে রিলিজনের সহিত আনন্দ-উৎসব সমারোহ প্রায়শ্চিত্তাদির সংস্রব ঘটিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা "রিলিজন" শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে দেশাদিভেদে বিভিন্ন নানাবিধ "রিলিজনের" মধ্যে কোনও একটিকে সত্য ও প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং অপর সকলগুলিকে মিথ্যা ও নরকে যাইবার পন্থা বলিয়া আশঙ্কা করেন। অমুক রিলিজন true বা সত্য, অমুক রিলিজন false, এই ভাবের আভাস থাকাতেই রিলিজন শব্দকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে।

"ধর্ম্ম" শব্দে মিথ্যার আভাস কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ—যাহা অবশ্য আচরণীয়, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ধর্ম্ম ও আমার ধর্ম্ম এক না হইতে পারে; কিন্তু তোমার ধর্ম্ম তোমার আচরণীয়—আমার ধর্ম্ম আমার আচরণীয়।

ইংরাজিতে Law বলিলে যাহা বুঝায়, ধর্ম্ম শব্দে অনেকটা সেই অর্থ প্রকাশ করে। "ধৃ" ও "ধ্রি" ধাতু পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক। "ধ্রিয়তে"—অর্থাৎ মরিতেছে বা তিরোহিত হইতেছে; "ধ্রিয়তে"—অর্থাৎ জীবিত রহিয়াছে বা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিবর্ত্তমান সংসারে যাহা স্থায়ী, তাহার নাম "ধর্ম্ম"। সেই ধর্ম্মের অর্থ নিয়ম। জগন্নির্ব্বাহক নিয়ম-সকলকে বেদে "ধর্ম্ম" বলিত। যথা;—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥—১। ২২। ১৮ ঋগ্বেদ।

ইহার অর্থ এই যে, অনন্ত ও অসীম আকাশের মধ্যে পরমেশ্বর আপনার তিন বার পদক্ষেপের উপযুক্ত স্থান মাপিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং আপনার সেই ত্রিপাদপরিমিত স্থানে জগন্নির্ব্বাহক বিবিধ নিয়ম স্থাপন করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত সেই সকল নিয়ম, যাহার বলে অগ্নির দাহিকা শক্তি, জ্যোতির প্রকাশিকা শক্তি, পৃথিবীর গুরুত্ব নিয়ম;—যাহার বলে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হইতেছে, প্রাণীগণ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সন্তানের ভোজনের জন্য মাতৃবক্ষে দুগ্ধের সঞ্চার হইতেছে, এবং প্রকৃতিকে অবগত হইবার জন্য জীবাত্মা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত সেই সকল নিয়মের নাম "ধর্ম্ম"। ইহা হইল "ধর্ম্ম" শব্দের শ্রুতিসম্মত অর্থ। স্মৃতিতে যাহা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য ও আচরণীয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অর্থের মিলনস্থান এই যে, উভয় এই ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠাপিত বা ব্যবস্থাপিত বলিয়া গণ্য।

মনু, "ধর্ম্ম" কি ইহার ব্যাখ্যাস্থলে (মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বলেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য, বিদ্বান্ ও সাধুলোকেরা সমাজে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহার নাম ধর্ম্ম। (১) যে সকল আচার শ্রুতিতে, স্মৃতিতে

(১) ধর্ম্ম শব্দের অন্যান্য নানা অর্থ আছে, বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না। বেদ বিজ্ঞানের দুই অংশ—ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। এ স্থলে ধর্ম্ম শব্দে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ

এ মাসের বহি।

সঞ্জীবনী সুধা। *

প্রতি মাসে রাশি রাশি বাঙ্গলা বহি বাহির হয়—কিন্তু সে সকলের সহিত আমাদের "এ মাসের বহি" প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। যে বহিখানি উৎকৃষ্ট ও আলোচনার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে,—আমরা এই প্রবন্ধে সেই বহিখানির পরিচয় দিব।

আমাদের এ মাসের বহি—"সঞ্জীবনী সুধা"। এদেশে, সঞ্জীব বাবুকে সকলে চেনেন,—কঠমালা, মাধবীলতা ও জাল প্রতাপচাঁদের বচয়িতার নূতন পরিচয় আর কি দিব—এই সঞ্জীবনী সুধা,—সেই সঞ্জীব বাবুর "গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ।" বাঙ্গলার বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও উপন্যাসিক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,—এই গ্রন্থের সম্পাদক;—পুস্তকে যে কয়টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা বঙ্কিম বাবুর নির্ব্বাচিত। এতদ্ব্যতীত,—সঞ্জীবনী সুধার প্রারম্ভে,—বঙ্কিমবাবুর প্রণীত, গ্রন্থকার সঞ্জীব বাবুর একটি সুন্দর, সারগর্ভ, নাতিদীর্ঘ ও মনোজ্ঞ জীবনচরিত আছে, এবং জীবনচরিতের পর, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত একটি ক্ষুদ্র সমালোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "বামেশ্বরের অদৃষ্ট" ও "দামিনী" নামক দুইটি ক্ষুদ্র গল্প, এবং "পালামৌ" নামক "বঙ্গদর্শনের" সেই সরল সুন্দর চিত্তহারী ভ্রমণবৃত্তান্ত, এই কয়টি নিবন্ধ লইয়া "সঞ্জীবনী সুধা" নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন,—"ইহাঁর (গ্রন্থকারের) প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।"

সঞ্জীব বাবুর জীবনীর প্রারম্ভে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন,—"প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেয় মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

"ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জীবিত কালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই," বঙ্কিম বাবু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সঞ্জীব বাবুর "এ জীবনী পাঠে তাহা পাঠক বুঝিতে পারেন।"

সঞ্জীব বাবু যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা অনেকে সঞ্জীব বাবুর গ্রন্থ পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকারকে বুঝিতে পারিলে, নির্জ্জীব অক্ষরগুলিকে মসীলিপ্ত রেখা-

---

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ; প্রথম ভাগ। মূল্য ৸৹ বার আনা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শাস্ত্রীয় তর্ক আছে। সে সকল তর্ক বর্ত্তমান কালে কতক অপ্রয়োজন এবং কতক অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যেখানে রঘুনন্দনের মত সর্ব্ববাদিসম্মত, সেখানে তাহার হেতুবাদ গৌণ কথা। যেখানে মতভেদ চলিতেছে, সেখানে বিভিন্ন বিধান দিলেই আমার প্রস্তাবিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, শাস্ত্রীয় প্রমাণের আড়ম্বর করিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে রঘুনন্দনের লিখিত শাস্ত্রীয় বিধানও দেশাচারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনরুদ্ধার করা সহজ নহে। অথবা, তাহার সহিত একত্রিত থাকে বলিয়া, প্রচলিত দেশাচারের শাস্ত্রীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য হইয়াছে। অতএব, দেশাচারের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ না বাধাইয়া, দেশাচার-অনুগত শাস্ত্র এবং দেশাচার-বহির্ভূত শাস্ত্র, পৃথক করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যটা প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু ইহা অসাধ্য নহে, এবং এই প্রণালীতে শাস্ত্র অবধারণ করিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ্যরক্ষার উপায় সুলভ হইবে। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার যতই নিন্দা করি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে যে, যদি অধ্যাপক মহাশয়েরা এই প্রণালীতে শাস্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরাই পাশ্চাত্য বিচারময়তা সহকারে শাস্ত্রের যুক্তি এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যুগপৎ অবধারণ করিয়া দিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

পারস্যের গার্হস্থ্য ও রাজকীয় প্রথা।

এক সময় পারস্যবাসীগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন, এখন তাঁহারা মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত। লৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মে আমাদের দেশের মুসলমানগণের সহিত পারস্যের মুসলমানগণের কোন প্রকার বিভিন্নতা আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কিন্তু একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অতি হীন অবস্থাপন্ন মুসলমান পর্য্যন্ত নিজ নিজ গৃহপ্রাঙ্গণ লোকনয়নের অন্তরালে রাখিবার জন্য যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করে, পারস্যেও এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। পারস্যের

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অন্তঃপুর বহির্দ্দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, রাজপথ হইতে অন্তঃপুর যাহাতে কাহারও দৃষ্টিপথে না পড়ে, এ জন্য প্রভূত সতর্কতা অবলম্বিত হয়; এমন কি, অনেকে গৃহে গবাক্ষ পর্য্যন্তও রাখেন না।

অতএব আমাদের দেশের অবরোধ প্রথার সহিত পারস্যের অবরোধ প্রথার প্রচুর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এ সাদৃশ্যের মধ্যেও একটা বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রবল; আমাদের দেশে সাধারণতঃ বহির্বাটীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বহির্বাটীই আমরা সাধ্যমত সুসজ্জিত করিয়া রাখি; কিন্তু আমাদের অন্তঃপুর—যেখানে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ আজীবন অতিবাহিত করেন, এবং যেখানে আমাদের প্রিয়তম পুত্রকন্যা তাহাদের কোমল বাল্যকাল অতিবাহিত করে,—সেই অন্তঃপুরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমাদের কতটুকু লক্ষ্য, তাহা আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু পারস্যে ধনবান হইতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই আপনাদিগের অন্তঃপুর যথাসাধ্য সুদৃশ্য ও মনোরম করিতে ত্রুটি করেন না. এখানে অধিকাংশ লোকের অন্তঃপুরেই সুন্দর অট্টালিকা, নয়নতৃপ্তিকর উদ্যান, নির্ম্মল জলাশয় এবং হরিৎ বৃক্ষলতা শোভিত রমণীয় কুঞ্জ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু বহির্বাটী হইতে অবরোধের ভিতর এই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব কিছুতেই কল্পনা করা যায় না।

গৃহকর্ত্তা সমস্ত দিন বহির্বাটীতে বসিয়া গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার কাজ শেষ হইলে তিনি সন্ধ্যাকালে অন্তঃপুরে তাঁহার বিরামকক্ষে প্রবেশ করেন; এই সময় যদি কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়; কারণ, অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকিয়া আনা পারস্য দেশে এক প্রকার অসম্ভব। কাহারও অনুসন্ধানে আসিয়া যদি শুনিতে পাওয়া গেল, তিনি "বাড়ীর ভিতর আছেন," তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে কারণেই হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। বলা বাহুল্য, পারস্য অন্তঃপুরে অপর পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহারা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্তঃপুররক্ষার জন্য খোজা প্রহরী নিযুক্ত করেন।

পারস্যের ব্যবস্থাপ্রণালী কোরাণের নীতির উপর সংস্থাপিত। পারস্যে এমন অনেক মহাত্মা উচ্চ ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া এখনও অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে গ্রন্থে এই সকল মহাত্মাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহার নাম "সাহর।"

ইহাকে এক কথায় পারস্যের শাস্ত্র বলা যায়। আমাদের দেশে দেশাচারের কোনও গ্রন্থ নাই, কিন্তু পারস্যে তাহা আছে; এই গ্রন্থের নাম "উরফ্"। "উরফে" শাস্ত্রবহির্ভূত সাধারণ লৌকিক প্রথা ও প্রাচীন দেশাচারের বিবরণ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। সময়ে সময়ে "উরফ্" ও "সাহরে" মতভেদ হয়, এরূপ স্থলে "সাহর"ই গণনীয় হইয়া থাকে।

বাহ্য দৃষ্টিতে পারস্যের ব্যবস্থাপ্রণালী পুরুষের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের পক্ষে পত্নীত্যাগ পারস্যে যত দূর সহজ, রমণীর স্বামীত্যাগ তত সহজ নহে; স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন বার বলিলেন, "আমি তোমায় ত্যাগ করিলাম," তাহা হইলেই স্ত্রী পরিত্যক্তা হইলেন।

প্রচলিত প্রথা অনুসারে পারস্যের পুরুষ ও রমণী চিরজীবনের জন্য বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও, অনেক সময় এখানে মেয়াদী বন্দোবস্তে বিবাহ হইয়া থাকে। এরূপ বিবাহে দম্পতিযুগল নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাও এই বন্দোবস্তে বিবাহ করা সমধিক পছন্দ করেন, তবে তাঁহাদের মতে এই বিবাহবিচ্ছেদের কাল কিছু দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। এরূপ হইলে, বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদের আশঙ্কা দূর হয়, অথচ বিবাহিত জীবনের সুখ ও সুবিধা অক্ষুণ্ণ থাকে।

পারস্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত, এবং ইহা তাঁহাদের মতে নিন্দনীয় নহে। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষকে তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত করিতে হয়; নবযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীর পক্ষপাতী হইয়া কেহ যে তাঁহার নিকট সমস্ত সময় কাটাইবেন, আর তাঁহার অন্য স্ত্রীগণ স্বামীসন্দর্শন আশায় বিফলমনোরথ হইয়া অশ্রু দ্বারা উপাধান আর্দ্র করিবেন, তাহা হইবার যো নাই। কিন্তু কোনও কোনও রমণী তাঁহাদের সপত্নীগণকে বিবিধ উপহারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, নিজের অধিকারের অতিরিক্ত সময়ও স্বামীকে নিজ গৃহে আবদ্ধ রাখেন; বলা বাহুল্য, স্বামীসোহাগিনী না হইলে, কেহই সপত্নীগণের নিকট এতখানি ন্যূনতা স্বীকার করিতে চাহে না। যাহা হউক, পারস্যের দাম্পত্যবিধিমতে, উপরি-উক্ত ব্যাপার যতই সহজসাধ্য হউক না কেন, আমাদের বঙ্গ অন্তঃপুরে কুলীনবিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই কার্য্য সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

পারস্যে স্ত্রীশিক্ষার সম্যক বিস্তার না হইলেও, পারস্য অবরোধে কখনও কখনও অসামান্য বুদ্ধিমতী রমণী দৃষ্টিগোচর হয়; এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গীত,

চিত্রবিদ্যা, কবিতা, সূচীকার্য্য ও রাজনীতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিতে দেখা যায়। কিন্তু পারস্যের সাধারণ মহিলাগণও নির্ব্বোধ নহেন; গৃহস্থলী ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের অধিকার ত যথেষ্ট আছেই, এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহাদের অধিকার অল্প নহে। পারস্যরমণীর চরিত্রের উপর রাজ্যের শুভাশুভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি কেহ কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দ্বারা কিছু অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে চাহে, তাহা হইলে সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিজে অনুরোধ না করিয়া, স্ত্রীর দ্বারা তাঁহার নিকট অনুরোধ করাইলে, অধিক ফল লাভ হয়। পারস্যের অনেক গুরুতর ব্যাপারই এই প্রকার অনুরোধে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক সম্ভ্রান্ত রমণী মূল্যবান উপহার এবং উপহার অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু তোষামোদে বশীভূত হইয়া, নিজ নিজ স্বামীর দ্বারা অপরের স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। সাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে রমণীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলেন; অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, রমণীর অভিপ্রায় অনুসারে, পারস্যরাজতরণী কিয়ৎপরিমাণে পরিচালিত হয়।

পারস্যের রাজপথে অনেক সময়ই দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী রমণীগণকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা প্রায় সকলেই ভদ্রমহিলা। এই সকল আপদমস্তকবস্ত্রাবৃতা রমণীর গমনাগমনে কেহই বাধা দিতে পারে না; এমন কি, পথপ্রান্তে যদি কোনও ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করে, তবে তাহাকে পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু কোনও রমণী কোনও ভাগ্যবান পুরুষকে তাঁহার কমনীয় মুখকান্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে, মুহূর্ত্তের জন্য স্বীয় মুখাবরণ অপসৃত করিয়া থাকেন। ইহাই এ দেশে পূর্ব্বরাগের উপক্রমণিকা, মিলনের অংশ তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তেহারাণের রমণীগণ প্রকাশ্য দিবালোকেও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া যেখানে ইচ্ছা একাকী বিচরণ করিতে পারেন। কেবল রাজমহিষী ও রাজকুলবধূগণ বহুসংখ্যক প্রহরী ও পরিচারিকা পরিবৃত না হইয়া রাজপথে বহির্গত হইতে পারেন না।

রাজপুরমহিলাগণ প্রাসাদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের যে যে পথে গমনের সম্ভাবনা, নগরপাল সেই সকল পথে কিছু কালের জন্য সাধারণের গমনাগমন বন্ধ রাখেন, এবং এই সকল পথ পার্শ্বস্থ বিপণীশ্রেণীও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। রাজান্তঃপুরের মহিলাগণ পথে বাহির হইলে, দৈব-

ক্রমে যদি কোনও পুরুষকে সেই পথে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রহরীবর্গের তীক্ষ্ণ তরবারীতে অবিলম্বে সেই হতভাগ্যের মস্তক দেহবিচ্যুত হয়।

পারস্যের বর্ত্তমান সাহ নছরেদ্দিন সা, একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন নরপতি। পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ, চতুরঙ্গক্রীড়ায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, এবং বন্দুকে তাঁহার অব্যর্থ সন্ধান। সময়ে সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, রাজ্যের স্তূপাকার অহঙ্কারের স্ফীতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ নহে। একদিন তিনি জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুদৃশ্য বাগানবাটীতে উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা করে, আমি কিয়ৎকালের জন্য আমার এই উচ্চ পদাভিমানের ঝঞ্ঝাট দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার ন্যায় শিক্ষিত এবং সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত স্বাধীন ভাবে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হই।"

প্রত্যহ প্রভাতে ছয় ঘটিকার সময় সাহ মন্ত্রীবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাদের সহিত রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় পরামর্শাদি করিয়া থাকেন। অপরাহ্ণে এবং কখনও কখনও সন্ধ্যাকালে, তিনি তাঁহার অনুগৃহীত অমাত্যবর্গের সহিত নানা সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন, এবং মধ্যে মধ্যে বৈদেশিক সংবাদপত্রও পাঠ করিয়া থাকেন। এই সময় অমাত্যবর্গ দুই একটি স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অবসর পান; বলা বাহুল্য, ভূতপূর্ব্ব সাহদিগের নিকট এরূপ মত প্রকাশ করিলে, তদ্দণ্ডেই তাঁহাদের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু নছরেদ্দিন সাহ অতি সহৃদয় ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি।

তেহারানের রাজদরবারে বৈদেশিক রাজদূতকে অভ্যর্থনা করিবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা অত্যন্ত কঠোর। বর্ত্তমান সাহ সেই নিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে বর্জ্জিত করিয়াছেন। সাহ এখন মণিমুক্তাশোভিত প্রশস্ত দরবারগৃহের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া, এই সকল ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করেন। কিন্তু যদি একজন মাত্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে প্রাসাদের অন্য একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহের সমীপবর্ত্তী হইতে হইলে, এই সকল দূতকে প্রাসাদদ্বারে পাদুকা ত্যাগ করিয়া, "জাহিরী দৌলী" অর্থাৎ 'কঞ্চুকী'র সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।

অনন্তর মূল্যবান হীরকরত্নাদিখচিত উচ্চ বেদীতে সাহকে উপবিষ্ট দেখিলেই, দূতগণ দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন, এবং সাহের নিকটবর্ত্তী হইলে পুনর্ব্বার অবনতমস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। সাহই প্রথমে

আলাপ আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার মন প্রফুল্ল থাকিলে রাজদূতের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে।

সাহ ফরাসী ভাষার কথা কহিতে পারেন; দ্বিভাষীর সাহায্য ব্যতীতও তিনি দুই এক সময় বৈদেশিক দূতের সহিত আলাপ করেন, কিন্তু সেটা অল্প কালের জন্য, এবং যে সকল রাজদূতকে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাহাদের প্রতিই এরূপ ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। কোনও দর্শনার্থীকে বিদায় দিতে হইলে ভূতপূর্ব্ব সাহগণ বলিতেন, "আপনি এখন যাইতে পারেন"; কিন্তু বর্ত্তমান সাহ সেরূপ কোনও কথা না বলিয়া, কথাবার্ত্তার পর কিয়ৎকালের জন্য মৌনাবলম্বন করেন, কিম্বা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া যান; ইহাতেই বুঝিয়া লইতে হয় যে, সাহ তাঁহার আর কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না। দর্শনার্থী যতক্ষণ দ্বারের নিকট প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ তাঁহাকে সাহের দিকে সম্মুখীন হইয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ সেই দেড় শত ফিট দীর্ঘ, স্বর্ণ-খচিত-কেদারা-সমাকীর্ণ, পিচ্ছিল গৃহপ্রাঙ্গণে।

এইবার নৌরোজের কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নববর্ষদিনে এই উৎসব আরম্ভ হয়। পারস্যবাসীগণ এখন মহম্মদের শিষ্য, সুতরাং তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষেই এই উৎসবের সূচনা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহম্মদের জন্মের সহিত নৌরোজের কোনও সম্বন্ধ নাই। বসন্তকালের যে দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, সেই দিন নববর্ষের আরম্ভ দ্বারা অগ্নি-উপাসক বহুপ্রাচীন পারস্যবাসীগণ এই উৎসবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। পারস্যের এই প্রাচীন পর্ব্বের এখনও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ নৌরোজের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে পারস্যবাসীগণ এখন পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্তূপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন সেই দিন তাহারা চন্দ্রোদয় হইবার পূর্ব্ব হইতে মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চন্দ্রের আবাহন করে, এবং চন্দ্রোদয় হইলে মুখমণ্ডল হইতে বস্ত্রখণ্ড অপসারিত করিয়া স্থান পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কিয়ৎকালের জন্য উপাসনা করে।

দশ দিন ব্যাপিয়া এই উৎসব চলিয়া থাকে। এই সময় পারস্যবাসীগণ আনন্দমগ্ন হয়, শ্রমজীবীবর্গ সম্বৎসরের কঠোর পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পায়, এবং সকলেই নববস্ত্রে আপনাকে সুসজ্জিত করে। পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবসর

আর নাই। বঙ্গে যেমন দুর্গোৎসব, খৃষ্টানের রাজ্যে যেমন খৃষ্টম্যাস, পারস্যে নৌরোজ সেইরূপ দেশব্যাপী মহা আনন্দের ব্যাপার। নৌরোজের শেষ দিন নাগরিকবর্গ উপনগরে বনভোজন করিতে যায়; দেশস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের সুরম্য প্রমোদ-উদ্যানদ্বার সে দিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়, এবং বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র এই দিনই পারস্যের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তাঁহাদের স্বামীর সহিত প্রকাশ্যভাবে বাহির হইতে পারেন।

সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য মণি-মুক্তাবিমণ্ডিত সুসজ্জিত দরবারমণ্ডপে সমাগত হইয়া, পদগৌরব অনুসারে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ আসনে উপবিষ্ট হন। নাদীর সাহ ভারতবর্ষ হইতে যে মহা-মূল্য ময়ূরসিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, নৌরোজের দিন সেই সিংহাসন এই দরবারস্থলে আনীত হয়। সাহ সিংহাসনের পাদদেশে হীরক-রত্নখচিত সুদৃশ্য গালিচার উপর উপবেশন করেন।

সাহ উপবিষ্ট হইলে, প্রধান খাজা প্রত্যেক অমাত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া নববর্ষের উপহারস্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে মুদ্রাদি প্রদান করেন। সাহের সম্মুখেও নানাবিধ ফল এবং বিবিধ আকারের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাদি রক্ষিত হয়। সূর্য্য মধ্যাকাশ হইতে ঈষৎ অপসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত, সাহ ধূপাধারে ধূপ জ্বালাইয়া থাকেন; সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিবামাত্র কামান ধ্বনি দ্বারা সে সংবাদ রাজধানীতে ঘোষণা করা হয়। সাহও তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থিত এক খানি কোরাণ হস্তে লইয়া তদ্দ্বারা ললাটদেশ, ওষ্ঠ এবং বক্ষঃস্থল স্পর্শ করেন, অনন্তর মোল্লাদের দিকে চাহিয়া বলেন, "মোবারেক বাসেদ"—অর্থাৎ "ইহা দ্বারা আপনাদিগের শুভ হউক।"

তাহার পর, এক জন মোল্লা দণ্ডায়মান হইয়া গভীর স্বরে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ পদমর্য্যাদা অনুসারে ক্রমে ক্রমে সাহের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজহস্ত হইতে উপহার গ্রহণ করেন। সাহের অনুগ্রহ অনুসারে উপহারের তারতম্য হয়।

অনন্তর সভা ভঙ্গ হয়। সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে, সাহ দরবার-গৃহ ত্যাগ করেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে আলোকমালাপূর্ণ সুসজ্জিত প্রাসাদে পুনর্ব্বার আনন্দোৎসব আরম্ভ হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

তারা-মা।

স্থিতামপি ব্যাপ্য চরাচরং ত্বাং
পশ্যামি নৈরাদ্ধতৃষা বতাহং।
প্রযচ্ছ চাক্ষুস্তব পাদপদ্মং
জন্মাদ্য দৃষ্ট্বা সফলং করোমি ॥ ১ ॥

সর্ব্বময়ী তুমি তারা! আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
তবু হায়! অন্ধ আমি দেখিতে না পাই;
দাও চক্ষু হেরি তব চরণ-কমল,
মানব-জনম আজি করি মা! সফল। ১।

আয়ুর্যশোভাগ্যসুতাদিকামঃ
দদাতি লোকঃ কুসুমাঞ্জলিং তে।
অহং তু মাতঃ! পদমেব যাচে
তদেব মে কাঙ্ক্ষিতবস্তু সর্ব্বং ॥ ২ ॥

'আয়ু, যশ, ধন, পুত্র দাও মা! সকলি'
ইহা বলি' লোকে তোমা দেয় পুষ্পাঞ্জলি; (১)
আমি কিন্তু যাচি শুধু ও পদ তোমার,
সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু উহাই আমার। ২।

ত্বৎপাদপদ্মেঽস্মি নিবদ্ধতৃষ্ণঃ
ভবামি ভূয়ো ন ভবপ্রলুব্ধঃ।
শিশুঃ ক্ষুধার্ত্তঃ স্তনলালসঃ কিং
গৃহ্নাতি রম্যাণ্যপি খেলনানি ॥ ৩ ॥

---

(১) ভগবতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় প্রার্থনা করে,—

"আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥"

—হে ভগবতি। আমায় পরমায়ু দাও, যশ দাও, ধন দাও, পুত্র দাও, যা কিছু কামনা সকলি দাও।

ও পদকমলে গো মা! পিপাসা আমার,
সংসারের প্রলোভনে ভুলিব না আর;
স্তনপান তরে শিশু কাঁদিলে ক্ষুধায়,
সুন্দর খেলানা দিলে লইতে কি চায়?। ৩।

হে বিশ্বমোহিনি! বিমোহয়সে জগৎ ত্বং
নান্যৈর্ধনৈর্মম তু শক্ষ্যুস্ত্রি মোহনায়।
জানাসি কিং ন হনুমান্ প্রি দিব্যহারং
সীতার্পিতং সপদি দূরমসৌ নিরাস্থৎ॥ ৪॥

ভুবনমোহিনী! তুমি ভুলাও সবারে,
অন্য ধনে ভুলাইতে নারিবে আমারে;
জান না কি সীতা যবে দিল রত্নহার,
দূরে ফেলি দিল তাহা পবনকুমার। ৪।

আনীয় চন্দ্রং নভসোঽপি দত্তা
শক্নোষি মাং মোহয়িতুং ন মাতঃ!
পদং প্রভানির্জ্জিতকোটিচন্দ্রং
তন্মে হৃদি ত্বং জননি! প্রযচ্ছ॥ ৫॥

আকাশের চাঁদ যদি হাতে দাও তুলি,
তথাপি তাহাতে গো মা! আমি নাহি ভুলি;
কোটি চন্দ্র হারি মানে প্রভায় যাহার,
দাও গো! হৃদয়ে মোর সে পদ তোমার। ৫।

নামৈব তে মৃত্যুহরামৃতং মে
চিন্তা চ চিন্তামণিবৈভবং মে।
ত্বৎপাদপদ্মং মম সত্যলোকঃ
নির্বাণমুক্তিশ্চ ত্বদঙ্ক এব॥ ৬॥

তব নাম মৃত্যুহারী ঔষধ আমার,
তব চিন্তা চিন্তামণি ঐশ্বর্য্যের সার;
উচ্চতম সত্যলোক ও পদ-কমল,
আমার নির্বাণমুক্তি তব অঙ্কতল। ৬।

ধ্যেয়ং চ গেয়ং বরণীয়মেকং
নিত্যং চ নৈমিত্তিকমেব কাম্যং।

হব্যং চ জপ্যং চ তথাসি বেদ্যং
সর্ব্বেশ্বরি! ত্বং মম সর্ব্বমেব ॥ ৭ ॥
তুমিই আরাধ্য বস্তু, তুমি মোর জ্ঞান,
তোমাকেই কবি ধ্যান, তোমাকেই গান,
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, জপ, হোম, বলি,
সর্ব্বেশ্বরি! তুমি মোর সকলি সকলি। ৭।
ত্বমেব সর্ব্বং মম জীবনস্ত
ত্বং জীবনং ত্বমখিলং ভবেহস্তৎ।
অরণ্যবাসং মম সর্ব্বনাশং
মন্যে ত্বদীয়ং বিরহং তু তারে! ॥ ৮ ॥
তুমিই প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব আমার,
থাক্ প্রাণ, ধন, মান, গৃহ, পরিবার;
ওমা! তারা! তোমা হারা হইব যখনি,
সর্ব্বনাশ বনবাস জানিব তখনি। ৮।
ভাবেহস্তপ্রিয়বস্তুভ্যো বিচ্ছেদোঽস্তু পদে পদে।
মা নিমেষার্দ্ধমপ্যস্তু ত্বদ্‌বিচ্ছেদস্তু কেবলম্ ॥ ৯ ॥
যা কিছু স্নেহের বস্তু আছে এ ভুবনে,
বিচ্ছেদ ঘটুক মোর সে সবার সনে;
কিন্তু মা! তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
তোমারে তিলার্দ্ধ যেন আমি না হারাই। ৯।
মাতর্যদি ত্বং ন করোষি কিঞ্চিৎ
অসীতি বুদ্ধির্মম হন্তি ভীতিং।
নশ্যন্তু সর্ব্বাণি মমেন্দ্রিয়াণি
মাঽস্তিত্ববুদ্ধির্দ্ধ্রুবাদ্ ব্যপৈতু ॥ ১০ ॥
কিছু যদি নাহি কর' মা! আমার তরে,
"তুমি আছ" এই জ্ঞান সর্ব্ব ভয় হরে;
ইন্দ্রিয় সকলি মোর হউক বিকল,
"তুমি আছ" এই জ্ঞান থাকুক কেবল ॥ ১০ ॥
তদ্ধ্যানমগ্নস্তব নাম কুর্ব্বন্
ত্রিতাপদাহজ্বলিতো মমাত্মা।

সদ্যঃ প্রলীনাখিলদুঃখরাশিঃ
সুধাময়ে স্রোতসি মজ্জতীব ॥ ১১ ॥
যখনি নিমগ্ন হই তোমার চিন্তায়,
মা-মা বোলে ডাকি আমি যখনি তোমায় ;
ত্রিতাপের সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়,
ডুবে যায় আত্মা যেন সুধার ধারায়। ১১।
সর্ব্বাণি তীর্থানি তপোবনানি
সর্ব্বে চ দেবাঃ সকলাশ্চ বেদাঃ।
একত্র পশ্যামি সমস্তমেব
যদা হৃদি ত্বং পদমাদধাসি ॥ ১২ ॥
ত্রিভুবনে যত তীর্থ, যত তপোবন,
আগম নিগম যত, যত দেবগণ,
সমস্তই একাধারে হেরি বিদ্যমান,
তুমি মা! যখনি হৃদে কর অধিষ্ঠান। ১২।
স্বভাবসংপ্লাবিতচিত্তবৃত্তিঃ
মাতর্ন পশ্যামি ভবে ত্বদন্যৎ।
একার্ণবগ্রস্তমিবাহমস্বং মে
সর্ব্বং জগন্মাতৃময়ং বিভাতি ॥ ১৩ ॥
প্লাবিত তোমারি ভাবে সমস্ত হৃদয়,
তোমা বিনা ভবে কিছু দৃষ্ট নাহি হয় ;
একার্ণবে বিশ্ব যথা হয় জলময়,
তেমনি মা! মাতৃময় হেরি সমুদয়। ১৩।
হে সারদে শঙ্করি কালি তারে!
দুর্গে শিবে শাশ্বতি বিশ্বমাতঃ!
ত্বামেবমাহুর্ন মুহুর্ন তৃপ্তো
ভবামি তৃষ্ণৈব বিবর্দ্ধতে মে ॥ ১৪ ॥
সারদা! শঙ্করি! শিবা! জগতজননি!
কালি! তারা! মহাবিদ্যা! দুর্গা! সনাতনি!
এরূপে তোমারে গো মা! ডাকি আমি যত,
না মিটে মনের আশা, তৃষ্ণা বাড়ে তত। ১৪।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

"রিলিজন্" শব্দের বাঙ্গলা কি ?

হেমন্তে উষাকালীন পাদচারণাবসরে একত্র দুই জন সুপণ্ডিত পাদরী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কথায় কথায় তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, আমাদের বাঙ্গলাতে রিলিজন (Religion) শব্দের অনুবাদ কি হইবে ? বলা বাহুল্য, পাদরীরা ইংরাজ। পণ্ডিত লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, কিছু বিবেচনার আবশ্যক হয়। আমার বিবেচনায় যাহা হয়, তাহা এখনি লিখিব ; কিন্তু তাহা যদি সঙ্গত না হয়, ভরসা করি, সাহিত্যে কৃতবিদ্য লেখক ও পাঠকমণ্ডলী হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক উত্তর আসিবে।

এক্ষণে সচরাচর "রিলিজন" শব্দকে "ধর্ম্ম" বলিয়া অনুবাদ করা হয় ; কিন্তু ইহা মনোরম নহে।

"রিলিজন" শব্দের যে অর্থ হউক, ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেকগুলি অঙ্গ আছে। প্রথমতঃ, "রিলিজন্" বলিলে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এই কথার ধ্বনি পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস দেশভেদে, কালভেদে, সমাজভেদে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার বিশ্বাসেরই সাধারণ নাম "রিলিজন্"। দ্বিতীয়তঃ, "রিলিজন" বলিলে, উপাসনা-প্রণালী, এই অর্থের ধ্বনি পাওয়া যায়। উপাসনাপ্রণালীও দেশাদিভেদে বিভিন্ন ; কিন্তু তাহাদেরও সাধারণ নাম "রিলিজন"। তাহার পর, কতকগুলি আচার ব্যবহার, যাহা তাদৃশ বিশ্বাস বা উপাসনাপ্রণালী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যাহা তাদৃশ বিশ্বাস ও উপাসনাপ্রণালীর ন্যায় দেশাদিভেদে বিভিন্ন, তাহাদেরও সাধারণ নাম "রিলিজন"। তাহাতে রিলিজনের সহিত আনন্দ-উৎসব সমারোহ প্রায়শ্চিত্তাদির সংস্রব ঘটিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা "রিলিজন" শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে দেশাদিভেদে বিভিন্ন নানাবিধ "রিলিজনের" মধ্যে কোনও একটিকে সত্য ও প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং অপর সকলগুলিকে মিথ্যা ও নরকে যাইবার পন্থা বলিয়া আশঙ্কা করেন। অমুক রিলিজন true বা সত্য, অমুক রিলিজন false, এই ভাবের আভাস থাকাতেই রিলিজন শব্দকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে।

"ধর্ম্ম" শব্দে মিথ্যার আভাস কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ—যাহা অবশ্য আচরণীয়, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ধর্ম্ম ও আমার ধর্ম্ম এক না হইতে পারে; কিন্তু তোমার ধর্ম্ম তোমার আচরণীয়—আমার ধর্ম্ম আমার আচরণীয়।

ইংরাজিতে Law বলিলে যাহা বুঝায়, ধর্ম্ম শব্দে অনেকটা সেই অর্থ প্রকাশ করে। "ধৃ" ও "ধ্রি" ধাতু পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক। "ধ্রিয়তে"—অর্থাৎ মরিতেছে বা তিরোহিত হইতেছে; "ধ্রিয়তে"—অর্থাৎ জীবিত রহিয়াছে বা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিবর্ত্তমান সংসারে যাহা স্থায়ী, তাহার নাম "ধর্ম্ম"। সেই ধর্ম্মের অর্থ নিয়ম। জগন্নির্ব্বাহক নিয়ম-সকলকে বেদে "ধর্ম্ম" বলিত। যথা;—

"ত্রীণি-পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥—১।২২।১৮ ঋগ্বেদ।

ইহার অর্থ এই যে, অনন্ত ও অসীম আকাশের মধ্যে পরমেশ্বর আপনার তিন বার পদক্ষেপের উপযুক্ত স্থান মাপিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং আপনার সেই ত্রিপাদপরিমিত স্থানে জগন্নির্ব্বাহক বিবিধ নিয়ম স্থাপন করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রতিস্থাপিত সেই সকল নিয়ম, যাহার বলে অগ্নির দাহিকা শক্তি, জ্যোতির প্রকাশিকা শক্তি, পৃথিবীর গুরুত্ব নিয়ম;—যাহার বলে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হইতেছে, প্রাণিগণ জন্ম-জরা-মরণের অধীন হইয়াছে, সন্তানের ভোজনের জন্য মাতৃবক্ষে দুগ্ধের সঞ্চার হইতেছে, এবং প্রকৃতির অবগত হইবার জন্য জীবাত্মা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত সেই সকল নিয়মের নাম "ধর্ম্ম"। ইহা হইল "ধর্ম্ম" শব্দের শ্রুতিসম্মত অর্থ। স্মৃতিতে যাহা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য ও আচরণীয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অর্থের মিলনস্থান এই যে, উভয় এই ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠাপিত বা ব্যবস্থাপিত বলিয়া গণ্য।

মনু, "ধর্ম্ম" কি ইহার ব্যাখ্যাস্থলে (মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বলেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য, বিদ্বান্ ও সাধুলোকেরা সমাজে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহার নাম ধর্ম্ম। (১) যে সকল আচার শ্রুতিতে, স্মৃতিতে

(১) ধর্ম্ম শব্দের অন্যান্য নানা অর্থ আছে, বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না। বেদ বিজ্ঞানের দুই অংশ—ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। এ স্থলে ধর্ম্ম শব্দে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ

অথবা জনসমাজে সদাচার বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদের নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আচরণ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভ হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আন্তরিক প্রীতি, ইহা দ্বারা ধর্ম্ম কি ও অধর্ম্ম কি, তাহা জানা যায়। যে কার্য্যের আচরণ করিলে, হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন ও বিচিত্র প্রীতির উৎপত্তি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। বর্ণভেদে ও আশ্রমভেদে মনুষ্যের ধর্ম্ম পৃথক হয়; কিন্তু তত্তৎ ধর্ম্ম, ও তত্তৎ বর্ণে বা আশ্রমে পালনীয়। তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের কতকগুলি সাধারণ "ধর্ম্ম" আছে, (ইহাকে দশ লক্ষণ ধর্ম্ম বলে) তাহা সকলেরই পালনীয়। যে সকল ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম বলিয়া পরিকল্পিত, তাহা যদি দেশভেদে বা কালভেদে, বর্ণবিশেষ বা আশ্রমবিশেষের অভ্যুদয়ের অন্তরায়স্বরূপ, এবং অমঙ্গলের কারণ হয়, তবে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ অনুমোদন করিলে, তাহা পরিত্যজ্য বা পরিবর্ত্তনীয় হয়।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, রিলিজন ও ধর্ম্ম, এই দুই শব্দের অর্থ বড়ই ভিন্ন।

তবে যে হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিয়া শুনা যায়, তাহা বাঙ্গালীর কর্ণে খৃষ্টানদের আচার, মুসলমানদের আচার, বা হিন্দুদের আচার, এই অর্থ প্রকাশ করে মাত্র। রিলিজন শব্দে যে সকল আচার ব্যবহার আনন্দ-উৎসব সমারোহ প্রায়শ্চিত্তাদি বুঝায়, তাহা অনেকটা ধর্ম্ম শব্দে প্রকাশ পায় বটে। বড়দিন (Christmas) খৃষ্টানদের ধর্ম্ম, মহরম মুসলমানদের ধর্ম্ম, হোলি বা বসন্তোৎসব হিন্দুদের ধর্ম্ম।

ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, তাহাকে আমরা বলি, "বেদ" বা তত্ত্বজ্ঞান।

যাহা উপাসনাপ্রণালী, তাহাকে আমরা বলি "যজ্ঞ"। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা, আপনাদিগকে যজ্ঞা বা যাজ্ঞিক, এবং অন্যান্য ভারতবাসীদিগকে অযজ্ঞা বা অযাজ্ঞিক বলিতেন। খৃষ্টানেরা (heathen) "হীদেন" শব্দে, বা মুসলমানেরা "কাফের" শব্দে যে অর্থ প্রকাশ করেন, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা "অযজ্ঞা" শব্দে অবিকল সেই অর্থ প্রকাশ করিতেন।

আর ঈশ্বরকে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট রকমে বিশ্বাস না করিয়া, অন্য রকমে বিশ্বাস করিলে, কিম্বা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উপাসনা না করিয়া, অন্য

বুঝায়, এবং সেই ক্রিয়াকলাপ জন্য এক অতীন্দ্রিয় সংস্কার বুঝায়। ধর্ম্মের ঈদৃশ বহুবিধ পারিভাষিক অর্থ থাকাতে, ইহাকে religion শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া ধরিলে ভ্রমপ্রমাদের বিশেষ আশঙ্কা।

নিয়মে উপাসনা করিলে, মনুষ্য যে নিরয়গামী হব, এ কথা কোনও বাঙ্গালীই বিশ্বাস করে না, সুতরাং "বেদ," "যজ্ঞ" বা ধর্ম্মে"র সঙ্গে তাদৃশ ভাবের কোনও সংস্রবই নাই।

বাঙ্গালীরা ভগবানকে বলিতে শুনিয়াছেন ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে লোকেহস্মিন্ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন ;—

"মনুষ্যেরা যে যে পন্থায় আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই সেই পন্থাতেই সাক্ষাৎকার প্রদান করি। ভজনার পন্থা বিভিন্ন হইলেও, সকলেই আমাতে মিলিত হইয়াছে।"

যদি বল, ভজনার পন্থা ভিন্ন কেন—তাহার কারণ বুদ্ধি ও রুচির উৎকর্ষ অপকর্ষ। সুবুদ্ধি ও সুরুচি লোকে এক প্রকার ভজনামার্গ অবলম্বন করে, কুবুদ্ধি ও কুরুচি লোকে অন্য প্রকার ভজনামার্গ অবলম্বন করে।

অতএব বলিতে গেলে, রিলিজন শব্দের অবিকল প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় নাই বলিতে হইবে। তবে কোনও প্রকার ভজনামার্গই নিরয়ের কারণ নয়, এই কথা স্মরণ রাখিয়া, রিলিজন শব্দকে "পন্থা" বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে। আমরা, কবিরের প্রবর্ত্তিত ভজনামার্গকে যাঁহারা অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কবিরপন্থী বলি, নানকের প্রবর্ত্তিত ভজনামার্গকে যাঁহারা অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে নানকপন্থী বলি। অতএব "পন্থা" এই শব্দটি নূতন নহে। (২) বেদেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ;—

---

(২) অস্মদ্দেশে জনসাধারণে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক অবগত আছেন, যথা ,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

এস্থলেও পন্থা শব্দের ব্যবহার প্রায়ই religion শব্দের তুল্য। এমন কি, ধর্ম্ম কি তাহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া পন্থা শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ধর্ম্ম কি তাহা জানি না, পন্থা কি তাহা জানি। খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজন সকল যে পথে গিয়াছেন, তাহা এক একটি পন্থা বা religion। আমাদের দেশের ঋষি নামক মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাও একটি পন্থা বা religion।

ফলতঃ, ধর্ম্ম ও পন্থার বিশেষ এই যে, ধর্ম্ম এক, পন্থা অনেক। religion এক নহে, অনেক। তাই ধর্ম্ম অর্থে religion বা religion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

আরবী ভাষায় religion শব্দের প্রতিশব্দ "মজহব্"। মুসলমানেরা Religion অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। জহব=গমন—ধাতু হইতে মজহব্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং মজহব্ ও পন্থা প্রায় তুল্যার্থক শব্দ।

"অয়ং 'পন্থা' অনুবিত্তঃ পুরাণো
"যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।"

এ স্থলে "পন্থা" শব্দের দুই অর্থ, সাধারণ পথও বটে, এবং সাধুসেবিত ধর্ম্মমার্গও বটে।

আমার বিবেচনায়, পাদরী মহাশয়েরা এক্ষণে যাহাকে (Hindu Regilion) "হিন্দুধর্ম্ম" বলেন, তাহাকে "বেদপন্থা" ও হিন্দুদিগকে "বেদপন্থী" বলিলে ভাল হয়। আমরাও তাঁহাদিগকে "খৃষ্টপন্থী" ও তাঁহাদিগের ভজনামার্গকে "খৃষ্ট-পন্থা" বলিতে পারি। তদ্রূপ, মহম্মদীয়দিগকে "মহম্মদপন্থী" ও তাহাদের ভজনামার্গকে "মহম্মদপন্থা" বলিতে পারি। ইহাতে আমার বিবেচনায় উভয় পক্ষেই লাভ আছে। "হিন্দু" শব্দ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মুখে অবজ্ঞাসূচক কথা; খৃষ্টান ও মুসলমান শব্দও তদ্রূপ হিন্দুদের মুখে অবজ্ঞাসূচক কথা। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বেদপন্থী, খৃষ্টপন্থী, মহম্মদপন্থী এইরূপ সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে আর অবজ্ঞা প্রকাশ পাইবে না; আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সদ্ভাব ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের বৃদ্ধি পাইয়া, আমাদের সকলেরই মঙ্গলসাধনের হেতু হইতে পারে।

আর খৃষ্টান ও মুসলমান শব্দে যাহা হউক একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দু শব্দের অর্থ কুজ্ঝটিকাবৃত। "হিন্দু কে?" মুসলমানেরা মুসলমান ভিন্ন সমুদয় ভারতবাসীকেই হিন্দু বলিত। এক্ষণে কি খৃষ্টান মুসলমান ছাড়া সমুদায় ভারতবাসীই হিন্দু? এ কথা লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটে।

যে সকল লোক সৃষ্টিকর্ত্তাকে "ভগবান," কিম্বা "হরি," কিম্বা "পরমাত্মা" কিম্বা "বিষ্ণু," কিম্বা "মহেশ্বর," কিম্বা "পরমেশ্বর," কিম্বা "বিশ্বেশ্বর," কিম্বা "জগন্নাথ," কিম্বা "জগদম্বা," কিম্বা "জগদীশ্বরী," এই সকল নামে আহ্বান করেন এবং পূজা করেন, তাঁহারা শাক্তই হউন, শৈবই হউন, বৈষ্ণবই হউন বা ব্রাহ্মই হউন, তাঁহাদের সকলকেই "বেদপন্থী" বলা যায়; এই সকল শব্দই বৈদিক; এই সকল শব্দেরই মূলে বেদ ও বৈদিক ভাব নিহিত।

বর্ত্তমান সময়ে বেদপন্থীগণের প্রধান দেবতার নাম "জগন্নাথ"। তাঁহার মন্দির উড্রদেশে পুরী নগরে। তাঁহার আয়তনকে "শ্রীক্ষেত্র" বলা যায়। বেদ-পন্থীরা বলেন;—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসৃতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি।" ১০। ৮২। ৭ ঋগ্বেদ।

অর্থাৎ, হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে তোমরা সম্যক্‌রূপে জান না। তোমরা মনে মনে তাঁহার যে সকল মূর্ত্তি কল্পনা কর, সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সে মূর্ত্তির কোনও সাদৃশ্য নাই। তোমরা যেন কুজ্ঝটিকার মধ্যে বাস করিয়া এক পদার্থকে অন্যরূপ দেখিয়া নানাবিধ জল্পনা কর, এবং তাঁহার উদ্দেশে নানা ভাবে স্তুতি উচ্চারণ করিয়া প্রাণের তর্পণ করিতে থাক!

তাঁহারা আরো বলেন,—

"অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যের অচিন্ত্য অপ্রমেয় পদার্থ। তাঁহার অংশ বা অবয়ব নাই। উপাসকগণ উপাসনাকার্য্য সিদ্ধির জন্য, তাঁহার একটি যেমন বুদ্ধি তেমনতর রূপ কল্পনা করিয়া লয়েন।"

কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধিতে যতই উন্নত হউক না কেন, সৃষ্টিকর্ত্তাকে কেবল উৎকৃষ্ট মনুষ্যের আকার ভিন্ন আর কোনও আকার দিতে পারে না। শ্রীক্ষেত্রে যে এক দারুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, সেই বিগ্রহের সহিত মনুষ্যের যেমন সাদৃশ্য, মনুষ্যকল্পিত শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির সহিত জগন্নাথের তদপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য নাই!!!

আর শ্রীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান। বেদপন্থীরা জাতিভেদ দূরে রাখিয়া তথায় প্রবেশ করেন। মনুষ্যের চক্ষে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর প্রজ্ঞা ও পৌরুষের উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকায় জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের সমাজে মানুষে মানুষে ছোট বড় ভেদ চিরকালই থাকিবে; কিন্তু মহান ঈশ্বরের চক্ষুতে কীটানুকীট মনুষ্যসংখ্যার মধ্যে কোনও ভেদ নজরে পড়ে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকা যাহা দেখে, হস্তী তাহা দেখিতে পায় না। মনুষ্য যে ভেদ দেখে, ঈশ্বর তাহা দেখেন না। সুতরাং বেদপন্থীরা বলেন, সমাজে জাতিভেদ থাকিলেও,—এমন কি অপরিহার্য্য হইলেও, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সমক্ষে জাতিভেদ নাই। এক্ষণে অন্য জাতিতে আমাদিগকে বেদপন্থী বলুন বা নাই বলুন, যদি ইংরাজীতে আমাদিগকে তোমার Religion কি জিজ্ঞাসা করেন, আমরা স্বয়ং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ ও অন্যান্য শূদ্রগণ, আপনাদিগকে "বেদপন্থী" বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত আছি কি না?

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

এ মাসের বহি।

সঞ্জীবনী সুধা। *

প্রতি মাসে রাশি রাশি বাঙ্গলা বহি বাহির হয়—কিন্তু সে সকলের সহিত আমাদের "এ মাসের বহি" প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। যে বহিখানি উৎকৃষ্ট ও আলোচনার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে,—আমরা এই প্রবন্ধে সেই বহিখানির পরিচয় দিব।

আমাদের এ মাসের বহি—"সঞ্জীবনী সুধা"। এদেশে, সঞ্জীব বাবুকে সকলে চেনেন,—কঠমালা, মাধবীলতা ও জাল প্রতাপচাঁদের রচয়িতার নূতন পরিচয় আর কি দিব—এই সঞ্জীবনী সুধা,—সেই সঞ্জীব বাবুর "গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ।" বাঙ্গলার বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,—এই গ্রন্থের সম্পাদক;—পুস্তকে যে কয়টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা বঙ্কিম বাবুর নির্ব্বাচিত। এতদ্ব্যতীত,—সঞ্জীবনী সুধার প্রারম্ভে,—বঙ্কিমবাবুর প্রণীত, গ্রন্থকার সঞ্জীব বাবুর একটি সুন্দর, সারগর্ভ, নাতিদীর্ঘ ও মনোজ্ঞ জীবনচরিত আছে, এবং জীবনচরিতের পর, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত একটি ক্ষুদ্র সমালোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "বানেশ্বরের অদৃষ্ট" ও "দামিনী" নামক দুইটি ক্ষুদ্র গল্প, এবং "পালামৌ" নামক "বঙ্গদর্শনের" সেই সরল সুন্দর চিত্তহারী ভ্রমণবৃত্তান্ত, এই কয়টি নিবন্ধ লইয়া "সঞ্জীবনী সুধা" নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন,—"ইহাঁর (গ্রন্থকারের) প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।"

সঞ্জীব বাবুর জীবনীর প্রারম্ভে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন,—"প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী; তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

"ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জীবিত কালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই," বঙ্কিম বাবু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সঞ্জীব বাবুর "এ জীবনী পাঠে তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।"

সঞ্জীব বাবু যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা অনেকে সঞ্জীব বাবুর গ্রন্থ পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকারকে বুঝিতে পারিলে, নির্জ্জীব অক্ষরগুলিকে মসীলিপ্ত রেখা-

---

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ, প্রথম ভাগ। মূল্য ৸৹ বার আনা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রাজা পাশ্চাত্য, রাজধর্ম্ম পাশ্চাত্য, ব্যবসায় পাশ্চাত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পশ্চাত্য, দেশের কুশিক্ষা অশিক্ষা পাশ্চাত্য; এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য তর্ক-প্রণালী ব্যতীত পাশ্চাত্য নাস্তিকতা কিসে নিবারিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। এই নিমিত্তে বলি যে, শাস্ত্রের যুক্তি অবধারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে, এবং শাস্ত্রের যুক্তি এমন করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যেন শুদ্ধান্তচারিণী নারীগণও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। পাশ্চাত্যগ! এ বিষয়ে তোমাদিগের সাহায্য করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবোধ ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অর্থকর উদ্দেশ্য ভুলিলে আরও অমঙ্গল হইবে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অযথা বিদ্বেষ করিলেও, খবরের কাগজ বিক্রয়স্থলে পাশ্চাত্য অনুকরণ ব্যতীত, আর কোনও ফলোদয় হইবে না।

আবার দেখুন শাস্ত্রের যুক্তি এত যে দুর্লভ হইয়াছে, তাহার হেতু কি? শাস্ত্রকারেরা হৈতুকী বুদ্ধির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারও বিশিষ্ট কারণ ছিল। এখনও ভারতের রাজনামধারী হিন্দু সর্দ্দারগণের রাজসভা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল সভা হইতে শাস্ত্রানুরূপ এবং শাস্ত্রসম্মত আইন এখনও বাহির হইতেছে। পিন্যাল কোড জারি না করিলে নয়, তবুও প্রাগুক্ত রাজন্যবৃত্তিবাবিগণ পিন্যাল কোডখানাও গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রাতৃদৌহিত্রের দায়ক্রম নির্ণয় করিবার জন্যে উকীল-সঙ্কটের বন্দোবস্ত করেন না, সুতরাং পদে পদে শাস্ত্রের যুক্তি সমালোচনা করিতে হয়। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবককে জিজ্ঞাসা করিলে, "অষ্টিন বলিয়াছেন' শুনিয়া নতশির থাকিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল পোড়া বঙ্গদেশে। অতএব, অধ্যাপক মহাশয়েরা শাস্ত্রীয় যুক্তির অবধারণ বিষয়ে ঔদাস্য করিতে পারেন না। এক সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন করিয়া কি ফল? সমগ্র শাস্ত্রের যুক্তি অন্বেষণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু আমার আড়ম্বর যত বড়, আসল কথাটা তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। আমি এ কথা বলি না যে, 'ঠাকুর! যুক্তি না দিলে তোমার কথা শুনিব না।' আমি বলি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধৃষ্টতা শাসন করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। আর বলি যে, প্রথম কল্পে প্রচলিত শাস্ত্রটা কি, তাহা স্থির করুন।

রঘুনন্দন একখানা পুস্তক খাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার যত ভুল ভ্রান্তি থাকুক, উক্ত গ্রন্থ মানিয়া চলিলে আর পাশ্চাত্য ব্যভিচারের নিন্দা থাকে না। কিন্তু রঘুনন্দন যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অনেক

আমার অনধিকারচর্চ্চা বাড়াইয়াছে। কিন্তু সকল সূক্ষ্ম কথার সার্থকতা স্থির করিবার জন্য স্থূল পরীক্ষা করা বিধেয়। অধ্যাপক মহাশয়দিগের ঔদাসীন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য অনুকরণ, এবং প্রামাণিক ধর্ম্মের অপরিচিত কথা, এই তিনের একটি পরীক্ষাস্থল আছে। তিন দলেই তর্কপ্রিয়তা আছে। কিন্তু এখন তর্কের প্রণালী লইয়াও তর্ক চলিয়াছে। এ স্থলে এই স্থূল কথার অবতারণা করিতেছি।

১। শৈশবকালে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য নারীগণ ব্যতীত কাহার উপর ভারার্পণ করা সম্ভব? এবং এ দেশে নারীগণ শিখেন কাহার কাছে, এবং শিক্ষা দেন কিসের বলে?

২। ইংরাজি শিক্ষিতগণ কি কখনও প্রত্যাশা করেন যে, স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য ইংরাজি চর্চ্চা করিবেন। আমরা গর্ব্ব করি যে, ইংরাজি আর আমাদিগের অর্থকরী বিদ্যা নাই, উহা এখন আমাদের অস্থি-মজ্জা হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াও কি ইংরাজি পড়িবেন, আর পাশ্চাত্যবিধানমতে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন? স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ফল দাঁড়ায় যে, পুরুষ স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, তবে তাহার আন্দোলন করিলেই ভাল হয়। কেন না, ব্রাহ্মণগণ এত যে দুরবস্থাপন্ন, তথাপি একপ কাপুরুষগণকে কটাক্ষপাত দ্বারা ভস্মীভূত করিতে পারিবেন। কোমতের দোহাই দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইবে না। পক্ষান্তরে শিশুশিক্ষার ভার স্ত্রীজাতিগণের উপরে রাখিতে হইলে, মাষ্টার মহাশয়ের অত্যাচারনিবারণের উপায় কি?

৩। অধ্যাপক মহাশয়দিগকে বলি, মনু অনুক্রমণস্থলেই যে বলিলেন—

স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।

ইহাতে স্থানাভাববশতঃ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মযোগ তাপস্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন, না তাঁহার অন্য কিছু অভিপ্রায় ছিল? বর্ত্তমানকালে বালকেরা যখন অন্তঃপুরে আসিয়া মাতৃসন্নিধানে হুঙ্কার উদ্গীরণ করে, তখন গৃহ মার্জ্জনা করিবার জন্যে অধ্যাপক মহাশয়েরা কি উপায় নির্দ্দেশ করেন? ইহাতে কি আর "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং" বলিলে ব্রাহ্মণী শিশুপালনকার্য্যে সক্ষম হইবেন। অতএব যদি তাপস্য, মোক্ষ বা সন্ন্যাসের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তবে বর্ত্তমান গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থাতে স্ত্রীগণকে শাস্ত্রজ্ঞ করা বিধেয়।

মাত্র না ভাবিয়া, তাহার মধ্যে গ্রন্থকারের সত্তা অনুভব করিতে পারিলে, লেখককে বুঝিতে পারা যায়; যাঁহার যাহা প্রাপ্য গৌরব, তাঁহাকে তাহা দেওয়া যায়। কিন্তু, সে শক্তি বাঙ্গালী পাঠকের নাই। আমরা "মাধবীলতা" "কণ্ঠমালা" পড়িয়াছি,—কিন্তু সঞ্জীব বাবুকে বুঝি নাই। বুঝিলে, সাহিত্যে তাঁহার উপযুক্ত আসনের জন্য কালের প্রতীক্ষা করিতে হইত না। লোকে বলে,—বাঙ্গালী প্রতিভার আদর জানে না। প্রতিভা কি, বাঙ্গালী তাহাই অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না। যে গুণগ্রহণই করিতে পারে না, সে গুণপক্ষপাতী হইবে, যে প্রতিভার গৌরব বুঝিতে পারে না, সে প্রতিভার আদর করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট জড়ভাবাপন্ন বাঙ্গালীর চরিত্রে, গুণের প্রতি প্রতি উপেক্ষাই বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গুণের অনাদর, প্রতিভার অসম্মান, বাঙ্গালীর ইচ্ছাকৃত আচরণ নহে—তাহার মূলে জ্ঞানকৃত পাপের সংস্পর্শ নাই। বাঙ্গালী পারে না বলিয়াই করে না,—সেটা তাহার অক্ষমতার পরিচায়ক,—অনিচ্ছার কার্য্য নহে। যাহার শক্তি নাই, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; সে বরং কৃপাপাত্র।

সঞ্জীব বাবু কেন প্রতিভার উপযুক্ত পুরস্কার পান নাই,—তাঁহার সমালোচকও তাহা দেখান নাই। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর সমালোচনায় আমিও তাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুও এ বিষয়ে নীরব, সাধারণতঃ প্রতিভা কেন অপুরস্কৃত থাকে, তিনি কেবল সাধারণ ভাবে তাহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর বিশ্বাস, সঞ্জীব বাবুর জীবনী আলোচনা করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কিন্তু, প্রতিভার পুরস্কার কি? ঐশ্বর্য্য, প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভক্তিই কি প্রতিভার পুরস্কার? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সঞ্জীব বাবুর মত দুর্ভাগ্য কেহ নাই। কেন না, যে ওজস্বিনী প্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন, তাঁহার তদুপযুক্ত প্রশংসা হয় নাই; তিনি ধনবান্ ছিলেন না, তাঁহার যশোভাগ্যও তেমন উজ্জ্বল নয়,—তাঁহা অপেক্ষা অনেক অংশে হীন, এমন অনেক গ্রন্থকারও সঞ্জীবচন্দ্রের অপেক্ষা অধিক প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।—কিন্তু প্রতিভা পুরস্কার প্রতিভার চরিতার্থতায়। সে হিসাবে তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখা মন্দ নহে।

সঞ্জীব বাবু, কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা, এই দুইখানি উপন্যাস, বামেশ্বরের অদৃষ্ট ও দামিনী, এই দুইটি ছোট গল্প, যাত্রা সমালোচনা ও জাল প্রতাপচাঁদ, এই কয়খানি বাঙ্গলা বহি বাহির করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কিছু রচনা, পুরাতন বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে আছে। এই সকল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহার প্রতিভার কতদূর অনুশীলন হইয়াছিল। কাহারও প্রতিভা সাংসারিক, তাহা সংসারের কার্য্যে লাগে। সঞ্জীব বাবুর প্রতিভার যে অংশ অনুজ্জ্বল, অন্ধকার; তাহা কার্য্যকরী নহে। তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন নাই, রাজকর্ম্মে তাঁহার কোনও রূপ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিভা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অতএব, তাঁহার কৃত সাহিত্য দেখিয়া, তদীয় প্রতিভার পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে।

বঙ্কিম বাবু, সঞ্জীব বাবুর জীবনীতে অপুরস্কৃত প্রতিভাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম,—"যাঁহাদের কার্য্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী।" সঞ্জীব বাবুর সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। হয় ত তিনি যে সৌন্দর্য্যদৃষ্টি লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার আবির্ভাবকাল তদনুরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করা যায় না; তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবি এ হিসাবে অল্পবিস্তর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দ্বিতীয়,—"যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।"

সঞ্জীব বাবুর সম্বন্ধে এ কথাও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাঁহার রচনায় লোকরঞ্জনচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং তাঁহার রচনা হইতে লোকহিতকামনার অনেক প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করা যায়। দৃষ্টান্ত, "যাত্রা"র সমালোচনা। "যাত্রার" মত প্রিয় বস্তু বাঙ্গলায় কি আছে—বিদ্যাসুন্দরের টপ্পার মত চলিত গান আর কি শুনিতে পাও? কিন্তু সঞ্জীব বাবুর তাহা ভাল লাগিল না, তিনি শ্লেষময়ী ভাষায় তাঁহার অনভিমত ব্যক্ত করিলেন। যে দেশের অধিকাংশ লোক যাত্রা-খোর, সে দেশে এ অনভিমত উপেক্ষিত হইলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যাহারা লোকরঞ্জন করিয়া হাততালি লইতে চাহে, তাহারা একপ সাধারণে বিরোধী মত প্রকাশ করে না। সঞ্জীব বাবুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেও এই ভাব দেখিতে পাই। তিনি লোকহিতকে সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। সেখানেও তাঁহার লেখক ও পাঠকদের প্রিয় সমালোচক হইবার ইচ্ছা নাই, তাহাতেও কেবল কর্ত্তব্যপালনপ্রবৃত্তির বিকাশমাত্র নয়নগোচর হয়।

বঙ্কিম বাবুর শেষ ও তৃতীয় বিভাগ, যে "প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, * * * তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না, কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।" এ বিভাগের প্রতিভা লইয়া আমরা আলোচনা করিব না। বঙ্কিম বাবুর রচিত জীবনচরিতে, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার অন্ধকার ও আলো, স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। তবে তাহা তাঁহার সমগ্র জীবন অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু যেমন সমগ্র জীবনে, তেমনই তাঁহার সমগ্র সাহিত্যশরীরেও এইরূপ প্রতিভার ক্ষণপ্রকাশ ও চকিত নির্ব্বাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সঞ্জীব বাবু একাগ্রচিত্তে, একাদিক্রমে কখনও পাঠকসমাজে দীর্ঘকাল বিরাজ করেন নাই। তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয়, লিখিয়া উপভোগ করিব,—এই মনে করিয়া তিনি কলম ধরিতেন। একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া, উদ্দেশ্য গড়িয়া তুলিয়া, পাঠকসমাজে জয়জয়কার লইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিছুতেই আমার তাহা মনে হয় না। সঞ্জীব বাবুর সমস্ত জীবনে যেমন একটা উদাস নিরুদ্যম ভাব,—যেমন একটা স্রোতে ভাসিয়া যাইবার ইচ্ছা, সংসারবিমুখ "প্রীতিপরবশ" বালকের সরলতা,—তাঁহার রচনাতেও তাহার সম্পূর্ণ ছায়া আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনপ্রবাহ যেমন অলস মন্থর ভাবে বহিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রতিভার গতিও সেইরূপ। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য, তাই সঞ্জীব বাবু এ প্রতিভার উপযুক্ত অনুশীলন করেন নাই। নিরুদ্যম জীবন ও সাধনাবিমুখ প্রতিভায় যাহা সম্ভব, সঞ্জীব বাবুর স্বল্পসংখ্যক পুস্তকে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিভার যে কয়টি ফল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও অসামান্য, অনন্যসাধারণ। তাই দুঃখ হয়, এই অসাধারণ প্রতিভার ফলস্বরূপ আমরা আরও কিছু পাইলাম না কেন?

প্রতিভার পুরস্কার তাহার চরিতার্থতায়, যদি এ কথা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভাও অপুরস্কৃত নহে। সঞ্জীব বাবুর জীবনে যতদূর সম্ভব, তিনি তাহা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। কণ্ঠমালা, মাধবীলতা, পালামৌ, জাল প্রতাপচাঁদ, তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার। সৌভাগ্য থাকিলে লোকে ঐশ্বর্য্যশালী হয়,—অকারণে বা অল্প কারণে প্রভূত কীর্ত্তি লাভ করে, কিন্তু প্রতিভা না থাকিলে, কেহ স্বদেশীয় সাহিত্যকে সঞ্জীব বাবুর গ্রন্থের মত বরেণ্য উপহার দিয়া যাইতে পারে না। এমন দিন আসিবে, যখন লোকে তাঁহাকে কীর্ত্তিমন্দিরের উচ্চ সিংহাসনে বসাইবে। তখন হয় ত এখনকার অনেক নিন্দা প্রশংসার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান থাকিবে না।

আমার বোধ হয়, সঞ্জীব বাবুর মত ভাবুক ও সহৃদয় লেখক বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। প্রতিভার সহিত ভাবুকতার মিলনে, তাঁহার রচনায় গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের মত রমণীয়তা

দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ভাবুক হইয়া যাহা অনুভব করিতেন, ভাষায় তাহা প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ভাবুকের উপভোগ,—তাহা কেবল সৌন্দর্য্যসাধনার ফল নহে। ক্ষুদ্র ফুল, চঞ্চল ছাগবৎস, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ, তরঙ্গিত সমুদ্র, সমীরকম্পিত পল্লবন, শীতবাহী সমীরণ, প্রখর রৌদ্র,—এ সকল কেবল তাঁহার সূক্ষ্মদর্শনের বিষয়ীভূত ছিল না; সূক্ষ্মদর্শন প্রকৃতির যাহা কিছু তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত করিত, তিনি ভাবুক-সুলভ আগ্রহে তাহা হৃদয়ে সঞ্চিত রাখিতেন, এবং ধীরে ধীরে তাহা উপভোগ করিতেন। তাই তাঁহার রচিত সাহিত্যেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের সহানুভূতিও উদার্য্য,—সৃষ্টিকুশলী ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, সাধু, পাপী, পাগল পাগলী, কোথায় তাঁহার সহানুভূতির অভাব? যেখানে সঞ্জীব সুখের বর্ণনা করেন, সেখানে বোধ হয় যে, পাঠকও সে আনন্দের একজন অংশী। যেখানে তিনি দুঃখের কথা বলেন, তখনও যেন আমরা তাঁহার চোখে জল দেখিতে পাই। তাঁহার চিত্রিত পাপীর সঙ্গে পরিচয় হইলে পাপীর প্রতি ঘৃণা হয় না, বরং পতিতের জন্য সমভাব, করুণায় হৃদয় দ্রব আসিয়া আসে। উদারতা সাহিত্যের প্রাণ, এবং সঞ্জীবচন্দ্র সেই উদারতার উত্তম উদাহরণ।

"জাল প্রতাপচাঁদ' পড়িয়া কাহার না চোখে জল আসে? সঞ্জীবচন্দ্র ভিন্ন আর কোন্ ঐতিহাসিক এমন করিয়া প্রতাপের প্রতি মমবেদনার সৃষ্টি করিতে পারিতেন? হৃদয় না থাকিলে কে প্রতাপের জন্য এত কাল পরে রাশীকৃত নথীপত্র হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে যাইত।

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা এবং রচনাপ্রণালীও তাঁহার নিজের। তাঁহার ভাষা ধীর, ললিত, মধুর, রচনাপ্রণালী সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। ভাবের মত ভাষাতেও একটা অনায়াস সৌন্দর্য্য দেখা যায়। তাহা কৃত্রিমতাদুষ্ট নহে, অথচ তাহাতে অনায়াসলব্ধ শিল্পসৌন্দর্য্যের সুষমা আছে। চন্দ্রনাথ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"তাঁহার সকল লেখাই আবেগশূন্য, আয়াসশূন্য, ধীরগতি, শান্ত-ভাবাপন্ন। তিনি তাঁহার অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী কথাও যেন 'অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে' লিখিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের জ্ঞান শান্তস্বভাব বালকের ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে নিরলঙ্কার তুঁহারি সমান অতি অল্পই দেখিতে পাই।"

সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন,—"তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেবল মাত্র তত্ত্ব নয়, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এই জন্যই তিনি পালামৌর সেই বাইজীতে গেঙ্গোখালির মোহানার সেই পাখীটির রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোলকামিনীদিগের দেহে 'কোলাহল' দেখিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার বামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। * * সৌন্দর্য্যের এই সুবিস্তৃত সুপ্রসারিত জাতিভেদশূন্য সর্ব্বসমন্বয়কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উদার।"

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ছিল, হৃদয় ছিল। হৃদয় ও প্রতিভায় মানুষের যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনেও সে শিক্ষা আছে। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে সামান্য হইলেও, বাঙ্গালী তাহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিবে।

বিস্তারিত সমালোচনা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেন না, লেখকের তদুপযুক্ত ক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাব। আমরা কেবল "সঞ্জীবনী সুধার" সংবাদ দিলাম, আশা করি, অতঃপর পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অধ্যয়ন করিয়া, সাহিত্যানন্দ উপভোগ করিবেন।

মাধুরী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'মঙ্গলের উষো বুধে পা'—সে দিন যাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ভোর-বেলা কোথা হইতে এমনই স্বপ্নসঙ্কুল ঘুম আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, কিছুতেই আর সময়ে উঠা হইয়া উঠিল না। তা, উষা আসিল। জানালার ফাক দিয়া সেই ঘুমন্ত স্বপ্নচকিত মুখ খানির দিকে চাহিয়া, টীপিয়া টীপিয়া হাসিয়া সে পলাইয়া গেল। তার পর অরুণ আসিল, সূর্য্য আসিল, সূর্য্যের চূর্ণ কিরণ গিয়া গৃহের মেঝের উপর খেলিল, তবু ঘুম ভাঙ্গিল না। সহসা স্বপ্নাবেশে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব আতঙ্কে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ধড়মড় করিয়া ভুবন শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। আপনার চারিধারে চাহিয়া বুঝিলেন, সে আতঙ্ক অমূলক—স্বপ্নবিজৃম্ভণ মাত্র। কিন্তু, এ কি! এত বেলা হইয়াছে, তিনি কখন যাত্রা করিবেন? তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ভুবন বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিতে প্রথমেই মুকুন্দরামের সঙ্গে দেখা হইল। বুড়া দেখিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল।

ভুবন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বড় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

বুড়া বলিল, "সে কি আমার দোষ?"

ভুবন। গাড়ী কি তৈয়ার আছে?

মুকুন্দ। তৈয়ার তো ছিল, কিন্তু এত বেলায় গেলে, পৌঁছিবেন কখন?

ভুবন। তাতে দোষ কি, না হয় একটু বেলাই হইল।

মুকুন্দ। তাও কি হয়? বিশেষ পুরোহিত ঠাকুর বলেন, বুধে বাণদ্বিতীয়কং—বার বেলা হয় বলিয়া, তার পরই রোহিণী নক্ষত্র—আজ আর যাওয়া নিষিদ্ধ।"

ভুবন বড়ই গোলে পড়িলেন। সে কি! তবে উপায়? আজ কি একেবারেই যাওয়া ঘটিবে না। বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

দুষ্ট বুড়া কিন্তু মনে মনে বড়ই খুসী হইল।

এই সময় হাসিতে হাসিতে সেইখানে এক পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত

হইল। বলিল, "ও মা, এই যে ইনি দাঁড়াইয়া, রাণী মা আবও আমাকে পাঠাইয়া দিলেন যে, বা দেখে আয়, বুঝি বা না বলেই রাত থাকিতে চলে গেছেন।"

ভুবন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলেন। মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলেন। ছি ছিঃ! ভোরবেলায় কেন অমন অঘোর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম? কেন উঠিতে পারিলাম না? এখনই বাড়ীর ভিতর গেলে সখীরা সব টিটকারি দিবে। মাধুরীই বা কি মনে করিবে?—মাধুরী!—আবার ভাবিলেন—মাধুরী! মাধুরীর মনোভাব তো তিনি জানিতে পারিযাছেন, কিন্তু সে কি সত্য? বিশ্বাস হইবাব যোগ্য? না সে পরিহাস? না না, তেমন নিষ্ঠুব পরিহাস সেই স্বরগপুতলীর দ্বারা সম্ভবে না। তাহাতে অপ্রত্যয়—সে তো নাস্তিকতা। তিনি স্পষ্ট শুনিয়াছেন, সেই সান্ধ্যসমীরকম্পিত স্বর্গীযপরিমলমিশ্রিত বীণানিক্কণতুল্য মধুর কথা এখনও যেন কাণে বাজিতেছে—সে কি ভুল হইবার? আর আজ যে কারণে যাওবা ঘটিল না, সেই যে স্বপ্ন, সেও তো তাহারই কথা লইযা। কি সুখময সে স্বপ্ন! সেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সময়ে ঘুম ভাঙ্গিল না বলিয়া দুঃখ! কিন্তু তারও চেয়ে আরও কত দুঃখ, সেই ঘুমেব সহিত সেই চিত্তবিনোদন স্বপ্ন পলাইল বলিয়া! তখনও ভুবন ভাবিতেছিলেন, কি করিলে আবার সেই স্বপ্ন ফিরিয়া আসে?

পরিচাবিকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিয়দ্দূব গিয়াই সে আবার ফিরিযা আসিল। মুকুন্দরামকে বলিল, "আপনার কাছে একজন স্ত্রীলোক আসিতে চায়। দ্বারবান তাহাকে ধরিযাছে—সে কিন্তু বড়ই পীড়াপীড়ি কবিতেছে।"

মুকুন্দরাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইযা উঠিলেন। "স্ত্রীলোক—আমার নিকট আসিতে চায়! কি প্রকার স্ত্রীলোক?"

যাহা হউক, মুকুন্দরাম তাহাকে আনিতে আদেশ কবিলেন। প্রহরী লইয়া আসিল। ইঙ্গিতমাত্রে প্রহরী ও পরিচারিকা তথা হইতে চলিয়া গেল। যে আসিল, সে আসিবামাত্র একটা টিপ্ করিযা প্রণাম কবিল। তার পর, গলায কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই ধর্ম্ম, এমন কর্ম্ম কবিবেন না, করিবেন না, করিবেন না। হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিবেন, সেও ভাল, তবু অমন পাত্রে কন্যা অর্পণ কবিবেন না।"

মুকুন্দরাম তাহার ভাব গতিক দেখিয়া ও কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া

গেলেন। সে স্ত্রীলোক আবার বলিতে লাগিল, "সাবধান, খুব সাবধান। কারও কথায় ভুলিবেন না। অতি কুপাত্র—অতি কুপাত্র।"

মুকুন্দরাম ভাবিলেন, বলে কি? প্রথম পাগল বলিয়া বোধ্ হইয়াছিল, কিন্তু বেশ করিয়া ঠাহরিয়া দেখিলে তাহা তো অনুমান হয় না। এ তবে কে? কার কথা বলে? পাত্র কে? পাত্র তো ভুবন। তবে ইহাঁর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চায়? মুকুন্দরাম প্রথম স্থির করিলেন, তাহা যদি হয়, তবে সমক্ষে না হইয়া ইহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া সব খুলিয়া জিজ্ঞাসা করা ভাল। আবার ভাবিলেন—না, এ যখন বলিতে আসিয়াছে, তখন স্পষ্ট মুখের উপরই বলুক না, সত্য মিথ্যা তাহার এখনই মীমাংসা হইবে। তখন, মুকুন্দরাম রাশ ভারি করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি কে, কাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছ?"

এই গাম্ভীর্য্যপূর্বিত কথা শুনিয়া সে স্ত্রীলোক একটু থতমত হইল। তার পর বলিল, "ঐ যে সেই পাত্র, যার সঙ্গে আপনারা রাজকুমারীর সম্বন্ধ স্থির করেছেন, সেই সোণার চেংড়া অমূল্যকুমার!"

"অমূল্যকুমার!" বস্তুতঃ মুকুন্দরাম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। "অমূল্যকুমার কে?"

"সে আবার কি গা? মনোহরপুরের হরিহর বাবুর ছেলে অমূল্য। যার বড় ভাই ভুবনের সঙ্গে আগে কথা হইয়াছিল। এখন তো সেই ভুবনকে না দিয়া এই অমূল্যকেই রাজকুমারী সমর্পণ করিবেন, স্থির করেছেন। ছি ছি! এমন সম্বন্ধও করে? মূর্খ নেশাখোর উড়নচণ্ডী—আর—আর তার কোন্ দোষটাই বা না আছে? রূপে গুণে অমন সোণার চাঁদ ছেলে ভুবনকে রেখে, এই—" সহসা ভুবনের প্রতি নজর পড়িল। বহুদিনের নির্ব্বাপিত চিতার ভস্মরাশি ভেদ করিয়া কোনও পরিচিতপূর্ব্ব মৃত মনুষ্যকে সহসা সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলে লোকে যেমন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, তেমনি বিস্মিত হইয়া সে স্ত্রীলোক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল—"এ কি, দাদা বাবু আপনি—আপনি এখানে?"

ভুবন বলিলেন, "হ্যাঁ ক্ষেমা, আমি এখানেই আছি।"

ক্ষেমা বুঝি ভাবিয়াছিল, তা মানুষের মত মানুষও তো থাকে, এ হয় তো সেই ভুবন না হইতে পারে, কিন্তু সেই ভুবন যখন স্পষ্টরূপে সেই শ্রুতিপরিচিত স্বরে তাহার নাম ধরিয়া কথা কহিল, তখন তো আর সে সন্দেহ রহিল না। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার বিস্ময় আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। সে কথা

অর্থসোভী দুর্য্যোধন ঠাকুর! এক দিন আমিও তার সেই অর্থের ভাগ লইয়াছি। সে কি গিছে?

মুকু। গিছে—যাহা শুনিয়াছ বা যাহা জান, তাহার সকলই গিছে। দুর্য্যোধন খুব তুখোড় লোক স্বীকার করি, কিন্তু মুকুন্দরামের চোখে ধুলি দেওয়া নিতান্ত সহজ নয়।

ক্ষেমা বস্তুতঃ যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে কিছু উত্তর করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মুকুন্দরাম ক্ষেমার এ হতবুদ্ধিতার কারণ বুঝিলেন। আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তখন, ক্ষেমা যাইবার জন্য বিদায় মাগিল। ভুবন অবাক্ হইয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন, ক্ষেমা যখন চলিয়া আসিবার কথা পাড়িল, তখন তাহাকে ডাকিয়া পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেমা যথাযথ সমস্ত বিবৃত করিল। সেই প্রাচীন বয়সে ব্রাহ্মণ পুত্রহারা হইয়া কি কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, কত স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছে, নিজে আতিপাতি করিয়া কত দেশ বিদেশ অনুসন্ধান করিয়াছে, শেষে হতাশ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিরূপে চোখের জল ও দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দিন কাটাইতেছে, উগ্রস্বভাব পত্নীর তাহার উপর কতই গঞ্জনা ও তাড়না—বৃদ্ধ গুমরিয়া গুমরিয়া সারা হইয়া যাইতেছে। বুকের ভিতর আগ্নেয়গিরি পুষিয়া দিনে দিনে সেই আগুনে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। সেই যে দেহ—উন্নত, লাবণ্যমার্জ্জিত, বার্দ্ধক্যে প্রৌঢ়ভাবাপন্ন, তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। সেই যে শ্রী—সুন্দর, নয়নানন্দবর্দ্ধন, কাঠিন্যে কোমলতাময়, তাহা একেবারে কালি মাড়িয়া দিয়াছে: দেখিয়া শত্রুরও দুঃখ হয়, কিন্তু তবু দুর্ম্মুখা স্ত্রীর ভৎর্সনার নিবৃত্তি নাই। তিনি যে আর কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিলে মারা পড়িবেন, ইহা স্থির। ক্ষেমা আর কত কথা বলিল। ভুবনকে না পাইয়া বাড়ী বিবিসা আসিয়া তাঁহার সেই 'ভুবন ভুবন' করিয়া স্ত্রীলোকের রোদন, সেই মৃত পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বক্ষে করাঘাত—কত কথা বলিল। শুনিয়া ভুবন কাঁদিয়া উঠিলেন। হায় হায়, সেই স্নেহময় পিতাকে ফেলিয়া তিনি অন্যত্র রহিয়াছেন। তাঁহারই জন্য তাঁহার পিতা মুমূর্ষুদশাপন্ন, আর তিনি—সন্তানকুলের কলঙ্ক—তিনি কি না সুখস্বপ্নে বিভোর! ভুবন আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলেন। তার পর মুকুন্দরামকে বলিলেন, "আপনি রাজা মহাশয়কে বলিবেন, আমি চলিলাম।"

ভুবনকে রোরুদ্যমান ও তাহাকে কাতর দেখিয়া বৃদ্ধ মুকুন্দরাম অন্তরে অন্তরে গলিয়া গেলেন। পিতার জন্য পুত্র যদি এমন ব্যাকুল না হইল, তবে সে পুত্রের না থাকাই শ্রেয়ঃ। মুকুন্দরাম বলিলেন, "তাও কি হয়? আপনি কোথায় যাইবেন?"

ভুবন বলিলেন, "কোথায় যাইব?—পিতা আমার জন্য প্রাণে মরেন, আর আমি কোথায় যাইব! সে কি কথা, দেওয়ানজি, আপনারও তো পুত্র আছে, আপনি কি তাহাকে এইরূপ পিতৃভক্তি শিক্ষা দেন!"

মুকুন্দরাম অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, আমি সে জন্য নিষেধ করি নাই। আমার বলার উদ্দেশ্য, আপনি গিয়া অনর্থক আপনার পিতাকে আরও অধিক তিরস্কারের পাত্র করিবেন। আপনাকে দেখিলে তিনি সুখী হইবেন সত্য, কিন্তু মনে করুন, আপনার বিমাতা এখন তবু আপনার নিরুদ্দেশে অনেকটা সুস্থ মনে ও নিরুদ্বেগে আছেন, বৃদ্ধকে অধিক যাতনা দেন না, কিন্তু আপনি পুনরায় গিয়া উপস্থিত হইলে বলুন দেখি, তাঁহার মনের ভাব কি রূপ ধারণ করিবে, ও স্বামীকে আপনার পক্ষপাতী জানিতে পারিয়া কতই না যাতনা দিবে? তাই বলি, আপনি না গিয়া বরং কৌশল করিয়া তাঁহাকে এখানে যাহাতে আনা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা যাউক।"

ভুবন বলিলেন, "আমিই তেমন তেমন দেখিলে তাঁহাকে লইয়া আসিব।"

মুকুন্দরাম একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আজিও বালক, তিনি আসিবেন কেন?"

ভুবন। তবে—তবে কি করিবেন?

মুকু। তাই ভাবিতেছি, কাহাকে পাঠাই। যাকে তাকে পাঠাইলে গোল হইবার সম্ভাবনা।

ক্ষেমা। আর, তাহা হইলে সে যে মেয়েমানুষ, সিন্দুকের ভিতর বন্ধ করিয়া না রাখিলে বাঁচি।

ভুবন। তবে উপায়?

মুকু। উপায় হয়, যদি ইনি রাজি হন?—

মুকুন্দরাম ক্ষেমার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন।

ক্ষেমা বলিল, "আমি? আমি রাজি হইলে হয়? বলুন, আমি কি করিলে আপনাদের উপকার হয়?"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "কাজ তেমন শক্ত নয়। তুমি হরিহর বাবুকে গোপনে

কহিতে পারিল না। আবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বোকার মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভুবন বলিলেন, "তা, আশ্চর্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তুমি, ক্ষেমা, তুমি যে আরও আমাকে অধিকতর আশ্চর্য্য করিয়াছ। তুমি এখানে কেন? কি বলিতে আসিয়াছ?"

এতক্ষণে ক্ষেমা আপনার স্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইল। বলিল, "কেন আসিয়াছি—কি বলিতে আসিয়াছি, তাহা তো শুনিলেন। শুনিলাম, তোমাকে ঠেলিয়া সেই গণ্ডমূর্খ আদরগোঁড়াকে ইঁহারা জামাই করিবেন, ইহা কি জানিয়া শুনিয়া কেহ কখন করিতে দিতে পারে?"

মুকুন্দরাম একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় পরহিতৈষিণী, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, অন্দরমহলে না গিয়া, সে কথা বলিতে আমার কাছে আসিয়াছ কেন?"

ক্ষেমা উত্তর করিল—"অন্দরমহলে রাণী মার কাছেই যাব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, না গিয়া ভাল করিয়াছি।"

ভুবন বলিলেন, "হাঁ ক্ষেমা, ভালই করিয়াছ। তোমরা আসিয়া আমার যে উৎকট রোগ সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ভয় দেখাইয়া গিয়াছিলে, তাহা ইঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই সকলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।"

ক্ষেমা মাথা হেঁট করিল। তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, তার পর বলিল, "তা, তখন যাহার ভয় করিতাম, তাহার ভয় আর করি না। কেন গা, আমার কিসের লাভ? কি প্রত্যাশা? যেখানে গতর খাটাইব, সেখানেই অমন চাকরি অনেক মিলিবে, তাই বলিয়া তাঁহার জন্য কেন পরের মন্দকারী হইব? আমার পরকাল কি নাই গা?"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "তাই ত, ইহার মধ্যে তোমার পরকালের উপর এতটা ঝোঁক!"

ক্ষেমা সে কথায় কাণ না দিয়া বলিতে লাগিল, "তা, দাদা বাবু, আমি কিছু আর জানিতাম না যে, আপনি এখানে আছেন; আপনাকে দেখাইয়া বলিব বলিয়া কিছু আসি নাই। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মনটা কিন্তু বড়ই খারাপ হইয়াছিল। আগে রহস্য বুঝি নাই, তার পর বুঝিলাম, আপনাকে সরাইয়া আপনার গুণধর কনিষ্ঠকে এই বিবাহ দিবার জন্যই এইরূপ

প্রতারণা। সেই দিন হইতে মন আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আপনি চলিয়া আসিলেন। ওদিকে সম্বন্ধেরও ধূম পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, আর বিলম্ব করিব না। রাজবাড়ীতে গিয়া সকলের চোখ ফুটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই কাহাকেও না বলিয়া, লজ্জা খাইয়া, গোপনে এখানে আসিয়াছি। আমাকে তিরস্কার করিবেন না।"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক, তোমার সহিত বেশি কথা কহা সঙ্গত নয়, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে অনর্থক মিথ্যা বলিয়া কতকগুলা লোককে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিলে, ইহাতে কি পরের কথা ছাড়া তোমার নিজের কথা কিছু ছিল না? আর ভুবন বাবু যখন জীবিত কি মৃত তাহাই তুমি জান না, তখন আজ হঠাৎ কেন তাহার হইয়া আর এক জনের নিন্দা করিতে আসিয়াছ?"

মুকুন্দরাম ক্ষেমার প্রতি একটা তীব্র দৃষ্টি করিলেন। ক্ষেমা একটু জড়সড় হইল। মাথা হেঁট করিয়া ক্ষণেক কি ভাবিল, তার পর পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "মিছা কথা বলিব না। আমি যে কেবল পরের জন্যই এই দুষ্কার্য্যে রত হইয়াছিলাম, তাহা নহে। আমারও স্বার্থ ছিল। তা, সে প্রলোভন আর নাই। আমার মোহের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি, তাই এত পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি। আপনি রাজমন্ত্রী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান—আমি অধিক কথা কি বলিব, যাহাতে এ বিবাহ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিবেন। সে অতি দুষ্ট, অতি পাষণ্ড—অতি কদাচার।"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "ভাল, আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। তুমি যে সম্বন্ধ ও পাত্রের কথা বলিতেছ, আমি তো তার কিছুই অর্থ বোধ করিতে পারিতেছি না। হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় পুত্রের কি বয়স, নাম কি, কি করেন, তাহার কিছুই আমরা জানিতাম না। এ সম্বন্ধের কথা তোমায় কে বলিল?"

ক্ষেমা কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, "সে কি, প্রগল্‌ভা রমণী বলিয়া আপনি আমার সহিত পরিহাস করিবেন না। এ সম্বন্ধ তো এক রকম পাকাপাকিই হইয়া গিয়াছে, শুনিয়াছি।"

মুকুন্দরাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিয়াছ? কে এ সম্বন্ধ করিল?"

ক্ষেমা। কে? জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে এ সম্বন্ধ জুটাইল? কেন সেই

ক্ষেমা বলিল, "বেশি কিছু বলিতে হইবে না, পাত্রের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলেই তাহারা আপনা হইতে সরিয়া পড়িবে।"

দুর্য্যোধন বলিল, "সে কি কথা, তুমি আমাকে মাথা খোওয়াইতে বল? আমি তা পারিব না।" দুর্য্যোধন কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। ক্ষেমা ভাবিল, তাই ত কি করি? দুর্য্যোধন ভাবিল, ছুঁড়ি আমায় ঠকাইতে আসিয়াছে, আমি যদি এইটা না বুঝিয়া চলিতে পারিব, তবে বৃথায় আমার নাম দুর্য্যোধন শর্ম্মা।

ক্ষেমা তখন অন্য উপায় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল। তখনও অমূল্য বাড়ী ফেরে নাই। তারাসুন্দরী পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেমা বলিল, "এত খুঁজিলাম, কোথায়ও সন্ধান পাইলাম না।" শুনিয়া তারাসুন্দরী বড় ব্যাকুল হইলেন। ক্ষেমা আর না দাঁড়াইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। সে দিন সে দুটা ভাতও মুখে তুলিতে পারিল না। সে দিন রাত্রির মধ্যে অমূল্য একবারও বাড়ীতে আসিল না। তখন গৃহিণী যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার সময় ক্ষেমাকে আবার একবার সন্ধান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ক্ষেমা যাইতে চাহে না। অশেষ নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আবার বাহির হইল। বস্তুতঃ, সমস্ত দিনের পর তখন তাহার রাগটা অনেক নরম পড়িয়া আসিয়াছিল। তখন অমূল্যের জন্য একটু ভাবনাও হইয়াছিল, এবং কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা জানিবার জন্য মনের ভিতর একটা ধড়ফড়ানি হইয়াছিল। ক্ষেমা একেবারে সেই আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, অমূল্য তুনি নেশায় চুর হইয়া একা বসিয়া রহিয়াছে, সঙ্গীরা সব কে কোথায় গিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া ক্ষেমা একেবারে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া অমূল্য হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, "কি আপদ! তুই এখানে কেন?" ক্ষেমা মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিল, "এইখানেই কি থাকিবে, বাড়ীতে যে কান্না পড়িয়াছে—চল, বাড়ী চল।" ক্ষেমা কত অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই অমূল্য নড়িল না। তার পর সে ভয় দেখাইল, বলিল, না যাইলে মা আসিবেন। তাহাতেও অমূল্য নড়িল না। সে হাসে, আর কেবল এক কথা—"যাব না।" ক্ষেমা শেষে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। এই সময়ে পাশের ঘরের কপাট খুলিয়া কে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষেমা চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। পূর্ব্বরাত্রে যে বারবনিতাকে সেখানে মাতাল অবস্থায় গড়াগড়ি যাইতে দেখিয়াছিল, সেই। রাগে ঘৃণায় তার মুখ চোখ লাল

হইয়া উঠিল। অমূল্য তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইতে গেল। অসাবধানে একটা ঘুসি গিয়া ক্ষেমার নাকের উপর লাগিল। কপাল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। অপমানে ক্ষেমা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া সেই বারবিলাসিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যও তাহার সহিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বাহিরে থাকিয়া ক্ষেমা তাহা শুনিল। সে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া গেল। পূর্ব্বের সেই ঘৃণা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আপনার কালা মুখ আপনিই লুকাইতে ইচ্ছা করিল। আশা যাক, লোভ যাক,—একটা বালকের হাতে এই অপমান! সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া শেষকি না গোষ্পদে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইল! ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ এ লালসায়! ক্ষেমা মনে মনে এক বিষম সংকল্প আঁটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তারাসুন্দরী ব্যগ্রতার সহিত পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষেমা সংক্ষেপে অনেক ছাঁট ছুট দিয়া আসল কথাটা জানাইল। মর্ম্মাহতা হইয়া তারাসুন্দরী চুপ করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিঃশব্দে ক্ষেমা তথা হইতে চলিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে রাত্রি জলবিন্দু পর্য্যন্ত মুখে দিল না। সমস্ত রাত্রের মধ্যে এক লহমার জন্যও দুটি চোখের পাতা এক হইল না। প্রভাত না হইতেই কাহাকেও না ডাকিয়া ক্ষেমা রাজবাড়ীর দিকে চলিয়া আসিল।

তখন মনের আবেগবশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই জ্ঞান ছিল না, আপনার অনিদ্রাজনিত দুর্ব্বলতার প্রতিও লক্ষ্য হয় নাই, বরাবর হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এখন কিন্তু আর সহিতে পারিল না। মাথা যেন টলিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষুধায় শরীর ধুঁকিতেছিল, পা দুটা মুচড়াইয়া পড়িবার যো হইতেছিল—ক্ষেমা আর ইতস্ততঃ না করিয়া সইয়ের বাড়ী অভিমুখে চলিল।

সই তখন পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া স্নানান্তে উনান্ জ্বালাইয়া সবে মাত্র ছেঁচকিতে ফোড়ন দিয়াছেন, এমন সময়ে ক্ষেমা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হাঁড়ি নামাইয়া সইয়ে সইয়ে আলাপচারির খুব একটা ধুম পড়িয়া গেল।

সই বলিল—"ছি ভাই, বড় লোক হইলেই কি এমনি করিয়া ভুলিয়া থাকিতে হয়?"

ক্ষেমা বলিল—"নে, তোর আর ঠাট্টায় কাজ নেই। এক দণ্ড কি সময় পাবার যো আছে যে আস্‌বো।"

সই। তা, না এস, বড় লোকের হিল্লেয় আছ—ভাল আছ, এই ভাল।

ক্ষেমা। আরে তোর ভাল থাকার পোড়া কপাল! বড় লোকের বাড়ী থাকা যে কি জ্বালা, তা আর তোকে কি বল্‌বো বল্? সাত জন্ম ঘুঁটে কুড়িয়ে খেতে হয়, সেও ভাল, তবু যেন কেউ কখন বড় লোকের বাড়ী না থাকে।

সই। সে আবার কি? শুনিছি, তোর খুব আদর যত্ন। নিজে গিন্নি তোকে যার-পর-নাই ভাল বাসেন—গিন্নির ছেলেও নাকি ক্ষেমা দিদি ক্ষেমা দিদি করে খুন হয়—তবে তোরও—"

বাধা দিয়া ক্ষেমা বলিল—"নে, তুই আর জ্বালাস্ নে, থাম। এখন মাথা ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে; একখানা তেল দে, নেয়ে আসি।"

সই তাহার সহজের মেজাজটা কেমন যে খপিস রকমের, তাহা জানিত। আর কিছু না বলিয়া বাটি করিয়া তেল আনিয়া দিল।

ক্ষেমা তেল মাখিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া, দাঁত মাজিতে মাজিতে স্নান করিতে চলিয়া গেল। সেই তখন তাড়াতাড়ি দুই এক জন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে কিছু কিছু দ্রব্যাদি আনিয়া, আগে জলখাবারের জোগাড় ও তৎপরে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল।

এখন, ক্ষেমা যখন স্নান করে, তখন এক জন লোক দেখিল, সে জলে নামিবার আগে কাপড় হইতে একখানি কাগজ খুলিয়া ঘাটের ধারে একটা ঝোপের ভিতর রাখিল, তার পর স্নানান্তে উপরে উঠিয়া গা হাত পা মুছিয়া, সেই কাগজখানি মুঠার ভিতর করিয়া চলিয়া গেল। যে দেখিল, সে তখন দূরে বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল, ক্ষেমা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তার পর, ক্ষেমাও আসিয়া বাড়ীতে রান্নাবান্না সাড়িতেছে, আর সেই লোকটা ঘাসের মোট মাথায় করিয়া বাড়ীতে আসিল। মোট ফেলিয়া, "কেও—সইমা!" বলিয়া ক্ষেমাকে টিপ করিয়া নমস্কার করিল। ক্ষেমা বলিল, "কি ভজ! ভাল আছ তো?"

ভজ, অর্থাৎ ভজহরি সইয়ের ভিক্ষাপুত্র। সই চিরবন্ধ্যা, সে জন্য তাঁহার ক্ষোভ ও মনস্তাপের পরিসীমা ছিল না। স্বামী একখানি মুদিখানার দোকান করিতেন, তাহাতে বেশ দু পয়সা উপায়ও হইত; কিন্তু বিস্তর ওষুধপাতি করিয়াও যখন একটিও সন্তান হইল না, তখন পতিপত্নীর বড় অসুখে দিন কাটিতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া গুরুর পরামর্শে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, মনে-মনে স্থির করিলেন। কিন্তু সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে সই বিধবা হইলেন। তখন আর পোষ্যপুত্র লওয়া হয় না, এদিকে একটা

সংসারের বন্ধনও আবশ্যক; সেই তাহার মাসতুতো দেবরের একটি ছেলেকে ভিক্ষাপুত্র গ্রহণ করিলেন। সেই ছেলে ভজহরি। ভজহরি যখন নূতন মার নিকট আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। নিজের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, এত বয়স পর্য্যন্ত যারপরনাই দুঃখে গিয়াছে, এখানে আসিয়া আদর যত্ন পাইয়া দুদিনের মধ্যে সুখের পায়রা হইয়া উঠিলেন। শেষ এত দূর হইয়া উঠিল যে, সেই ভাবগতিক দেখিয়া মুদিখানার দোকান বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বেচিয়া যে টাকা হইল, তাহা আপনার নিকট রাখিয়া কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পয়সার টানাটানি দেখিয়া কাজেই ভজহরিকে পূর্ব্ব প্রভুদের দল ছাড়িতে হইল, যা তাহা-রাই একে একে ছাড়িতে আরম্ভ করিল। এখন সে সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখে, কয়েকটা গোরু পুষিয়াছে, তাহাদের লালন পালন করে, আর দুধ বেচে। তাহাতে যাহা হয়, তাহা কিন্তু সংসারে দেয় না। তবে বদখেয়ালি না করিয়া সে যে তাহা লইয়া নিবিষ্ট থাকে, সেই তাহাতেই সন্তুষ্ট। তিনি হাত-কর্জ্জায় টাকা ধার দিয়া তাহার সুদে ও ভজহরের মেহন্নতে এক রকমে কায়ক্লেশে সংসার চালাইয়া থাকেন।

ভজহরি দেখিল, ক্ষেমা কাপড় ছাড়িয়া আঁচলে আবার সেই কাগজখানি গিরা দিয়া বাঁধিল। সে স্থির করিল, ইহা নিশ্চয়ই নোট ভিন্ন আর কিছু নয়। নহিলে অত যত্ন ও সাবধানতা কেন? ক্ষেমা বড়মানুষের বাড়ী চাকুরি করে, বেশ দু পয়সা পায়, তাহার নিকট দু পাঁচখানা নোট থাকা অসম্ভব নয়। লোলুপ দৃষ্টিতে ভজহরি তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে একটা মতলব আঁটিল। তার পর, আহারাদি করিয়া, সেই ঘরের দাবার উপর একটা মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল, ও দুই রাত্রি জাগরণের পর নিদ্রায় অঘোর হইয়া পড়িল; ভজহরি টীপি টীপি আসিয়া একবার তাহার মাকে চৌকি দিল। তিনি তখন বাসন মাজিতে ঘাটে গিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া আঁচল হইতে সেই কাগজখানি খুলিয়া লইয়া, ভজহরি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। পাছে কেহ কোথা দিয়া দেখিতে পায়, এই ভয়ে তখন খুলিয়া দেখিতে সাহস পাইল না। সই বাসন মাজিয়া বাড়ীতে আসিলেন, তখনও ক্ষেমার নাক ডাকিতেছিল, তিনি তাহাকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলেন। ক্ষেমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখে—বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি তখন সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সে আর কালবিলম্ব না করিয়া—বিলম্ব করিলে পাছে ক্ষেমা তাহার আগে গিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায়, তাড়াতাড়ি সেই বেশেই মনোহরপুর গ্রামের দিকে দৌড়িয়া চলিল। এত ছুটিল যে, মাঝে মাঝে হাঁপ লাগিয়া দম আটকাইবার যো হইল, তবু তাহা গ্রাহ্য করিল না।

ক্ষেমা একে মেয়ে মানুষ, তার পথ চলা কখন অভ্যাস নাই, তার উপর শরীর অসুস্থ, তবু যত দ্রুত পারিল, চলিতে লাগিল। কিন্তু সে যখন আধ ক্রোশ হাঁটিয়া অনেকটা চলিয়াছে বলিয়া একটু বসিয়া বিশ্রাম করিবার জায়গা খুঁজিতেছিল, ভজহরি তখন এক ক্রোশের অধিক পথ অতিবাহিত করিয়াছিল।

অল্পক্ষণ হইল সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সবে মাত্র ধূসরে পরিণত হইয়া আসিতেছে, গ্রাম্যবধূ সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে ভজহরি আসিয়া হরিহর বাবুর বাড়ী উপনীত হইল। ফটকে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দ্বারবান হাঁকিল। ভজহরি বলিল, "বড় দরকার, বাবুর নামে একখানা চিঠি আছে।" বাবু তখন কার্য্যবশতঃ গৃহে ছিলেন না। দ্বারবান পত্র রাখিয়া যাইতে বলিল। ভজহরি এ সব বিষয়ে বেশ সেয়ানা, সে বলিল—"না, আমি নিজে তাঁহার হাতে দিব, না হয় বসিতেছি।" দ্বারবান বলিল, "খুসি তোমারি।" ভজহরি বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া ভজহরি ভাবিল, তাই ত, দেরি হইতেছে, ইহার মধ্যে যদি ক্ষেমা আসিয়া পড়ে, আর বাড়ীর ভিতর খবর দেয়, তাহা হইলেই তো তার এত কষ্ট সব পণ্ডশ্রম হইবে। সে দেলসুখ খানসামাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "এই পত্রে একটা খবর আছে, কিছু বকশিস্ পাইবার সম্ভাবনা, যাহা পাইব, সিকি তোমার। বাবু তো আসিলেন না, তুমি যদি এ খানা ভিতরে গিন্নি মার কাছে লইয়া যাইতে পার?" দেলসুখ লোকটাকে ঠাহরিয়া ঠাহরিয়া দেখিল, বলিল, "কোথা হইতে আসিতেছ?" ভজহরি বলিল, "রাজবাড়ী হইতে।" দেলসুখ বুঝিল, হাঁ, বকশিস্ পাইবার চিঠি বটে। সে জানিত, গৃহিণী রাজকুমারীর সঙ্গে অমূল্যের সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আগ্রহসহকারে পত্র লইয়া, সে তাহা তারাসুন্দরীকে গিয়া প্রদান করিল।

তারাসুন্দরী পড়িতে জানিতেন। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার চৈতন্য লোপ হইবার উপক্রম হইল। এ কি ভয়ানক সংবাদ! ভুবন রাজবাড়ীতে! যে ভুবন মৃত বা চিরদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট মনে করিয়া তিনি অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন ও

নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সেই ভুবন রাজ-অট্টালিকায় রাজভোগে পরিপুষ্ট হইতেছে; ও অচিরাৎ রাজ-জামাতা হইবে বলিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে! তিনি তবে এতদিন কিসের স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলেন? কি আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন? কি প্রতারণা! কি ভুল! দন্তে দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত করিয়া অবনত মস্তকে তারাসুন্দরী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভ্রূভঙ্গী ও নাসিকাকুঞ্চনে সেই সুন্দর মুখ অতি ভীষণ দেখাইতে লাগিল। কত ক্ষণের পর কি মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া মাথা তুলিয়া দেলসুখকে বলিলেন, "যে পত্র আনিয়াছে, তাহাকে লইয়া আয়।"

অল্প ক্ষণ পরেই দেলসুখ, ভজহরিকে সেখানে লইয়া আসিল। সে আসিলে তারাসুন্দরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

প্রশ্নের সে স্বর শুনিয়া ভজহরি থতাইয়া গেল। কি বলিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। দেখিয়া তারাসুন্দরীর সন্দেহ হইল। বলিলেন, "স্পষ্ট বল, এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে?"

বস্তুতঃ, ভজহরি ইতিপূর্ব্বেই বড়মানুষের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও লোক লস্কর দেখিয়া মনে মনে একটু ভয় পাইয়াছিল, এখন তারাসুন্দরীর গম্ভীর ও তীব্র প্রশ্নে আরও ভীত হইয়া পড়িল। বলিল, "তা, মা ঠাকুরুণ, আমি যেখানেই পাই, খবরটা ঠিক, সত্য মিথ্যা একটা লোক পাঠাইলেই এখনই জানিতে পারিবেন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "এ চিঠি তুমি কুড়াইয়া পাইয়াছ, না কেহ তোমাকে দিয়াছে? ঠিক বলিও, মিছা বলিলে মারা পড়িবে।"

ভজহরি ভাবিল, পুলিসের দারোগা কনেষ্টেবল মরিয়া কি বড়মানুষের বৌ ঝি হয়! সে তখন, বেশি গোলে না গিয়া, যথাযথ সমস্ত বিবৃত করিল।

শুনিয়া তারাসুন্দরী বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন। কিছু ক্ষণ কোন কথা বলিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ নির্নিমেষ নেত্রে ভজহরির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কি প্রতারণা—চাতুরী—দাগাদারি! দুর্য্যোধনের এত কথা—এত আশ্বাস—এত ঘটকালি, সব কি কেবল ছল মাত্র! শুধু ছলনা নয়, বিশ্বাস-ঘাতকতা! পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে, তিনি তাহাকে গণিয়া দিয়াছেন, সে কি এই জন্য? কেন?—স্ত্রীলোক বলিয়া? স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়? আর ক্ষেমা? ক্ষেমার এই কাজ? তার তিনি কি করিয়াছেন? সে তবে এ বিপ-ক্ষতা করিল কেন? কেন সে ক্ষুদ্র পতঙ্গ হইয়া এই জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে

উদ্যত হইত? স্বভাবতঃ ক্রোধশীলা তারাসুন্দরীর সর্ব্ব শরীর দুর্জ্জয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বড় বড় দুই চক্ষু অনলকণা উদ্গীরণ করিতে লাগিল, খগচঞ্চুবৎ সেই নাসা স্ফীত হইয়া বিষম আকার ধারণ করিল, ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল, একটা আঙ্গুল কামড়াইয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। রাগে সেই পত্র তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া পদতলে দলিত করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু তখনই ভজহরির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনেক মেয়ে মানুষের রাগ সে দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সে কখন দেখে নাই। ভাবিতেছিল, "কি ঝক্‌মারি করিয়াই এ লোভ করিয়াছিলাম।" সভয়ে ধীরে ধীরে সে তখন চলিয়া যাইবার পথ খুঁজিতেছিল, তারাসুন্দরী সামলাইয়া তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তার পর বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "যে খবর আনিয়াছ, তাহার জন্য এই পুরস্কার লও। দেবসুখের কাছে তোমার ঠিকানা বলিয়া যাইও, আবশ্যকমত ডাকাইলে আবার আসিও।"

টাকা পাইয়া যত না হউক, সে যে ছুটী পাইল, ইহাতেই ভজহরি বাঁচিয়া গেল। একটি প্রণাম করিয়া আড়ে আড়ে পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে ভজহরি প্রস্থান করিল।

তারাসুন্দরী আবার ভাবিতে লাগিলেন, না না, ইহা কখনই সম্ভব নয়। ইহাও কি কখন হয়? সকলে তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে কেন? দুর্য্যোধন যখন যাহা চাহিয়াছে, তিনি তখনই তাহাকে তাহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, তবে কেন সে এ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে? ক্ষেমাই বা কেন তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া গোপনে রাজবাড়ী যাওয়া আসা করিবে? ভুবন যে সেখানে আছে, এত দিনও কি সে তাহা জানিত, আর তাহার নিকট একটিও কথা ভাঙ্গে নাই। তাও কি কখন সম্ভব? কেন? তাহাতে তাহার লাভ কি? না না, এ নিশ্চয়ই মিথ্যা—নিশ্চয়ই কোন শত্রুর কারসাজি। কিন্তু কে সে শত্রু? কার সে শত্রু?—তাঁর, ক্ষেমার, না দুর্য্যোধনের? তারাসুন্দরী আবার সেই পত্র পড়িয়া দেখিলেন। পত্রের প্রথমেই হরিহর বাবুর নাম লেখা। তাঁহার নিকট এ পত্রপ্রেরণে তো কোন শত্রুতাই বুঝায় না। এ তো পরিষ্কার লেখা; তাঁহাকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ! শত্রুতার কথা ইহাতে কিছুই নাই। তবে এ কি প্রহেলিকা? কি মনে হইল, তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া তারাসুন্দরী

আর একখানি পত্র বাহির করিলেন—সে পত্র ভুবনের সহিত সম্বন্ধভঙ্গ উল্লেখ করিয়া মুকুন্দরাম লিখিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখিলেন, লেখা তো একই হাতের। দুই পত্রের সহি এক জনের ভিন্ন কখনই অন্যরূপ সন্দেহ হয় না। আবার রাগে শরীর জ্বলিয়া উঠিল। রাগ ভুবনের উপর—কেন সে আজিও তাঁহার পথের কণ্টক হইয়া রহিল? রাগ দুর্য্যোধনের উপর—কেন সে বুড়া প্রতারণা করিল? মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া আসও তাঁহাকে মাতাইয়া দিল? রাগ ক্ষেমার উপর—কেন সে কালামুখী বিনা কারণে এই কৃতঘ্নতা করিল? শেষ রাগ বিধাতার উপর—কেন বিধাতা তাহাকে স্ত্রীলোক করিয়া গড়িলেন? তাহা না হইলে এই সব অপদার্থ নারকীগুলার উপর নির্ভর না করিয়া, এত দিনে তিনি একাই তো সকল কাজ সমাধা করিতে পারিতেন!

তারাসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। এ সংসার যে স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক লোকে পূর্ণ, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। আপনার বুদ্ধিতে ফতুর হইবেন, সেও স্বীকার, তবু আর কাহার পরের বুদ্ধি লইবেন না। বিশেষ দুর্য্যোধন ও ক্ষেমা—যে তাহাদের নাম করিবে, তিনি তাহাদের পর্য্যন্ত মুখদর্শন করিবেন না। চাকর নফরদিগকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিলেন—সাবধান, বাবুর অবর্ত্তমানে যেন দুর্য্যোধন ঠাকুর বাড়ীতে আসিতে না পাবেন, যে তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইবে, তাহার চাকুরি যাইবে। দাসীদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—খবরদার, ক্ষেমা যেন বাড়ীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে, যদি কখন আসে, ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিবে। হুকুম শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দাসীমহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "তা হবে না, বাড়ালেই পড়িতে হয়।" কেহ বলিল, "ধর্ম্ম আয় কত সব বল, আজও রাত দিন হচ্চে, চন্দোর সূয্যি উঠ্‌চে।" কেহ বলিল, "হ্যাঁ লা, বড় লোক কি আর অমনি যে সে হতে পারে? ওদের বুদ্ধি কত, বিচের কত। গিন্নির আমাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিচের!" বামুন ঠাকুরণ বলিলেন, "ছুঁচো ছুঁড়ী আবার আমার উপর টেক্কা দিতে চায়—বলে, বামুনদিদি, তুমি দুটো বৈ আর বুঝি রূপকথা জান না? না, তা আমি জান্‌বো কেন? তিনি জানেন। তা এইবার এসে রূপকথা বল না—বল না—বল না—বল না।" বামুনদিদি সহজপ্রকট দশনপঙ্‌ক্তি বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আর সূক্তনী দিয়া তাম্রকূটভস্মসুধা অনর্গল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দাসীমহলে যখন এই আদেশ লইয়া এইরূপ ঘোরতর সমালোচনা স্রোত বহিতেছিল, তখন এই আদেশকর্ত্রী একাকিনী শয্যার উপর বসিয়া মনে মনে মতলব আঁটিতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া এক একটা উপায় স্থির হইতেছিল, আবার পরক্ষণে রাগে মাথাকে এমনি তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল যে, সমস্তই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গলিত তুষারাশির ন্যায় কোথায় গড়াইয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিতেছিলেন, আবার পরক্ষণে প্রতিহিংসার প্রণোদনায় সব গোলমাল হইয়া গিয়া যেই হাবাইয়া ফেলিতেছিলেন। কিছুতেই সহজে মনটাকে স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। শেষ ভাবিলেন, "দূর হউক, ও পথ ছাড়িয়া দিই। আমার বৃথা চেষ্টা—বৃথা দুরাশা। ছেলে মানুষের মত হইল না। তাহারা কি দেখিয়া মেয়ে দিবে? সে রাজা, তার এক জন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর যাহা আছে, হয় ত তাহা আমার নাই—আমি অর্থের চটক তাহার কাছে কি দেখাইব? ছেলেটা পড়া শুনা না করুক, যদি তাহার সুনীতি সুধারা হইত, তাহা হইলেও কি আর এ সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়? না, আমি কাহারও খোসামোদের তোয়াক্কা রাখি? সে নিতান্ত হতভাগা, তা আমি চেষ্টা করিয়া মরিলে কি হইবে? কিন্তু—তারাসুন্দরী আবার ভাবিলেন—কিন্তু, তাই যেন না হইল, তা বলিয়া চিরদিনই কি নিরাশায় ডুবিয়া থাকিব? কেন? বুড়ো রাজা আর কত দিন? তাহার পর মাধুরীরই তো সব। মাধুরীর হইলেই কাজেই তাহার স্বামীরও হইবে, সেই জন্যই তো অমূল্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলাম, নহিলে তার রূপ লইয়া কি আমি ধুইয়া খাইতাম? আমি চাই তার রাজ্য ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সে সম্বন্ধ তো ঘটিল না। তাই বলিয়া কি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিব? ভুবন রাজত্ব করিবে, আর অমূল্য আমার ভাসিয়া যাইবে, আর আমি তারাসুন্দরী তাহা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিব? তার পর, ভুবনের ছেলেরা রাজসিংহাসনে বসিবে, আর অমূল্যের ছেলেরা হয় ত পেটের দায়ে মাথায় মোট বহিবে, বাঁচি যদি তাহাও আমাকে এই চক্ষে দেখিতে হইবে? ধিক্ আমাকে! তার চেয়ে আমি সূতিকাগৃহেই মরিলাম না কেন? স্তন্যপান না করাইয়া অমূল্যকে শৈশবে দুই ঢোক বিষ গিলাইয়া দিলাম না কেন? সত্য সত্যই কি ইহার প্রতিবিধান নাই? আমার নিরাশার কি নিরাশাই পরিণাম? না না, কখনই তাহা হইবে না। ইহার উপায় অবশ্যই করিতে হইবে। এই বেলা তাহার গোড়া বাঁধা দরকার। তা, আমি কি করিব? একের অপরাধে

সন্ধান না পাইয়া, নিরাশ হইয়া শুষ্কমুখে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে পথে দেখিলেন, গুণধর পুত্র অমূল্য দুই জন ইয়ার লইয়া মদ খাইয়া লাফালাফি করিতেছে, আর কাতার দিয়া বহুলোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। হরিহর মনে মনে করিলেন, হে ইন্দ্র! এই দণ্ডে কেন আমার মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করিলে না? হে মা বসুন্ধরে! কেন তুমি দ্বিধা হইয়া এই নরাধমকে স্থান দান করিলে না? একটা কঠোর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পাষণ্ড ইয়ার দুটির মধ্যে এক জন আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "কি খুড়ো, ছেলের সন্ধান করে বাড়ী ফিরেছ?" হরিহর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ যে সেই ব্যক্তি, যে দুই প্রহরের সময় গিয়া তাঁহাকে ভুবনের খবর দিয়া আসিয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই অমূল্যের কাণ্ড। বস্তুতঃ, অমূল্যই বুড়াকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার নাকাল দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে একে ওকে তাকে ভুবনের মিথ্যা সন্ধান বলিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। হরিহরকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সেই পাষণ্ডটা আবার বলিল, "কি খুড়ো, কথা কচ্ছো না যে, ছেলে তোমায় কি বল্লে?" রাগে দুঃখে ঘৃণায় হরিহরের কান্না আসিবার উপক্রম হইল। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া অমূল্যের বড় আমোদ হইল, সে হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিহর আর থাকিতে পারিলেন না; হাতে একগাছি যষ্টি ছিল—রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাপিতে তাহা লইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন। অমূল্য বলিল, "আমায় রাস্তায় একা পাইয়া মারিতে আসিয়াছ, বাড়ী গিয়া মাকে বলিয়া দিব।"

হরিহর বলিলেন, "তুই গুণ্ডটা মর, যে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

অমূল্য বলিল, "আমি মলে তোমায় ভূত হ'য়ে থাকিতে হইবে যে।"

কথা শুনিয়া ও তদধিক অমূল্যের ভাবভঙ্গি দেখিয়া, একটা বালক হাসিয়া উঠিল। তাহার পিতা তাহাকে হাত নাড়িয়া চোক রাঙাইলেন। অমূল্য আবার বলিল—"বড় ছেলে তো অন্তর্দ্ধান, এখন আমি মলে কাচা বাঁধিয়া তোমার শ্রাদ্ধ করিবে কে? তা, মনে করো না যে, বৃষোৎসর্গ করিব, তুমি যেমন কৃপণ, কেবল আমাকে ফাঁকি দিবার মতলব, আমিও তিলকাঞ্চনের উপর আর উঠিতেছি না, বাবা।" আবার অমূল্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গী দুটা আবার সেই হাসিতে যোগ দিল। রাগে হরিহরের আপন হাতে আপনার মাথা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

এই সময়ে হন্ হন্ করিয়া একজন স্ত্রীলোক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে জনতা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সব দেখিল, আর থাকিতে না পারিয়া পাশ দিয়া গিয়া হরিহরের হস্ত ধারণ করিল। বলিল—"আপনি চলিয়া আসুন, দেখিতেছেন না ওদের অবস্থা।"

হরিহর সে স্ত্রীলোককে চিনিলেন। সে—ক্ষেমা। তিনি তখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচেন—আর কালবিলম্ব না করিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ক্ষেমার অনুবর্ত্তী হইলেন। দেখিয়া, অমূল্য গাহিল—

আমার বাপ ছিল সাপুড়ে,
শেষ বয়সে ঢোঁড়ার বিষে পড়লো ঘাঁটি বুড়ে।

গান শুনিয়া এক জন ইয়ার বলিল, "তাই ত, বাবা, এ যে সম্বন্ধটা সাফ ফিরিয়ে নিলে।"

আর এক জন বলিল, "ভায়ার আমার জোর কপাল, একেই বলে এড়া বোঝা বাপের ঘাড়ে।"

অমূল্য বলিল, "ঠিক বলেছ বাবা, ধর্ম্ম রক্ষে করেছেন, কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার হয়েছে। চল, এখন ক্ষেমা ক্ষেমীর কল্যাণে আর কিছু খাওয়া যাক্‌গে যাক্।"

তখন, হল্লা করিয়া সেই পাষণ্ডগুলা অন্যত্র চলিয়া গেল। তাহাদিগের উদ্দেশে গালি দিতে দিতে লোক সকলও ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

পথে যাইতে যাইতে ক্ষেমা ও হরিহর বাবুতে অনেক কথা হইল। ক্ষেমা ভুবনের সংবাদ জানাইল। হরিহর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভুবনের কথাও ভাল লাগিতেছিল না, বিশেষ ঐ এক কথা কহিয়া অনেকে তাঁহাকে বিস্তর নাজেহাল করিয়াছে, এ বুড়া বয়সে আর সহ্য হয় না; তিনি মনে মনে আপনার মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন। ক্ষেমার সকল কথায় কান দিলেন না। ক্ষেমা তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় সেই কথা পাড়িল বলিল—"বাড়ী না গিয়া চলুন বরাবর রাজবাড়ী যাই।"

হরিহর তবু কিছু না বলিয়া, ক্ষেমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। তিনি ক্ষেমাকে তারাসুন্দরীর আদরের দাসী বলিয়া জানিতেন। সে যে ভুবনের সংবাদ জানিবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ভাবিলেন, বুঝি আবার কোনও নূতন চক্রান্ত হইতেছে। কিছু না বলিয়া আবার নীরবে গৃহাভি-

মুখে চলিতে লাগিলেন। ক্ষেমা ভাবিল, তাই ত, ইহাঁর কি বিশ্বাস হইল না? সে বলিল, "আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন পত্র, পাঠ করুন, স্বয়ং মুকুন্দরাম ইহা লিখিয়াছেন।"

হরিহর পত্রের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "কৈ, দাও, দেখি। মুকুন্দরামের লেখা কি না দেখিলেই আমি চিনিতে পারিব।"

ক্ষেমা তাড়াতাড়ি বসনাঞ্চল হইতে সেই পত্রখানি খুলিতে গেল। হরি হরি! সে পত্র নাই! ক্ষেমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার বাক্‌শক্তি লোপ হইল। কি বলিবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া হরিহর ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "বুঝিয়াছি, কালামুখী তুই আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িয়াছিস্। দূর হ—খবরদার, আর আমার ত্রিসীমায় আসিস্ না।"

হরিহর চলিয়া যান, ক্ষেমা বলিল, "আমায় গালি দিতে হয়, গালি দিউন। গালি খাওয়াই আমার উচিত, নহিলে সে পত্রখানি হারাইব কেন? কিন্তু শুনুন—বিশ্বাস করুন—মিথ্যা বলি নাই। এত স্থান নিজে খুঁজিয়াছেন, না হয় সেখানে একটা লোক পাঠাইয়া দিয়াও খবর লউন। আমার উপর রাগ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন না।"

ক্ষেমা আরও কত কি বলিল, হরিহর কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন বাড়ীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন—ক্রোধে, ঘৃণায়, মনের আবেগে, ততোধিক নূতন কোনও ষড়যন্ত্রের ভয়ে, দ্রুত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্ষেমা বোকার মত রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

দূর হইতে সহচরী ঝি তাহাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "তা বোন্ অমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে আর কি হইবে বল। বড়মানুষের বড় কথা, কখন্ যে কিরূপ মেজাজে থাকে, তাহা বলা ভার।"

ক্ষেমা চিরকালই গর্ব্বিতা, বিশেষ দাসীমহলে তাহার রাশ ভারি গরম। সে সামলাইয়া বলিল, "সে কি, সহচরি?"

সহচরী বলিল, "এই তোমার কথা ধরিয়াই বলিতেছি। আমরা তো ভাই হুকুম শুনেই অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এই ক্ষেমা—ক্ষেমা—ক্ষেমা। উঠিতে ক্ষেমা, বসিতে ক্ষেমা, খাইতে ক্ষেমা, শুইতে ক্ষেমা—ইহার মধ্যেই আবার কড়া হুকুম জারি হইল, খবরদার, সে যেন বাড়ীতে মাথা গলাইতে

না পারে—ঝাঁটা মেরে—" জিভ কাটিয়া সহচরী বলিল, "এ কি রকম বড়মানুষী ভালবাসা ভাই?"

ক্ষেমা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বলিল, "বলিস্ কি, সহচরী?"

সহচরী বলিল, "ও মা, তুমি তা কিছু জান না। আমি বলি সব শুনেছ। শুনে এখানে এসে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ।" সহচরী তখন ক্ষেমার নিকট সেই তারাসুন্দরীর আদেশের কথা সব বিবৃত করিয়া বলিল, "আমি আরও সেই পর্য্যন্ত তোমার জন্য চারি ধার খুঁজিয়া মরিতেছি—বলি, পাছে কেহ তোমার অপমান করে।"

ক্ষেমা শুনিয়া আপনার কর্ণকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিল না। ইহাও কি কথা? কিন্তু এ কথা যদি সহচরী না বলিয়া অপর কেহ বলিত, তাহা হইলে ক্ষেমার বিশ্বাস হইত না বটে, কিন্তু সে জানিত, সহচরী তাহাকে বড় ভালবাসে, মনের কথা কিছুই তাহার নিকট ছাপিয়া রাখে না। বলিতে কি, তিনিও যে সে কারণে তাহাকে একটু আধটু স্নেহ না করিতেন, তাহা নহে। ক্ষেমা অবিশ্বাস করিবার কারণ পাইল না। তারাসুন্দরী কি তবে জানিতে পারিয়াছেন যে, সে তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া রাজবাড়ীতে গিয়াছিল। তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? একটা খট্‌কা, পত্র কি হইল? আঁচল হইতে যে খুলিয়া পড়িবে, ইহা অসম্ভব। কিন্তু খুলিবাই বা লইবে কে? যাহা হউক, ক্ষেমা ভাল বুঝিল না। সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া সহচরীকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি সব জানি, কাল এমনি সময়ে একবার আসিব, যেন দেখা পাই।" তখন ক্ষেমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সহচরীও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

ক্ষেমা কথাটা আর ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কোথাও না গিয়া খিড়কির পুকুরে গেল। দেখিল, বামন ঠাকরুণ একা জলে নামিয়া হেঁট হইয়া চাল ধুইতেছেন। তখন রোদ হইয়া আসিয়াছিল। টিপি টিপি পিছন দিক্ দিয়া গিয়া ক্ষেমা ডাকিল, "বামন দিদি—বামন দিদি।" বামন দিদি চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষেমা। বলিলেন, "কে, ক্ষেমা? আর দিদি, শুনে পর্য্যন্ত আমার গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কি অরাজক—কি অরাজক, আর সব আবাগীর আহ্লাদ হয়েছে, তা, তোমা বিনে আমারই দেখছি কেবল এ বাড়ী টেঁকা ভার হইবে। কার কাছেই বা মনের কথা বলে পেট খালি করিব, আর কেই বা তেমন নিবিষ্ট হয়ে আমার রূপকথাগুলি শুনবে।"

ক্ষেমা বুঝিল, সহচরীর কথা একটিও মিথ্যা নহে। বলিল, "তা দিদি! অন্ন জলের বরাত, ভগবান যত দিন যেখানে মাপাবেন, ততদিন সেখানে থাকবো, ইহাতে আর দুঃখ ক্ষোভ করিয়া ফল কি?"

ক্ষেমা আর দাঁড়াইল না—"তবে আসি দিদি"—বলিয়া প্রস্থান করিল। বামনী দিদি সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "কি অংখার—কি ঠ্যাকার, বলে, ভাঙ্গে তো মচ্‌কায় না।"

'বটে, তারাসুন্দরি, বটে! ক্ষেমার সঙ্গে বিবাদ! কে কত বড় মেয়ে বুঝা যাবে।'—ক্ষেমা চলিয়া গেল, কিন্তু মনে মনে একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা আঁটিতে আঁটিতে বিদায় হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

একবার হরিহরের দিকে চাহিয়া দেখ। সে রূপ, সে লাবণ্য, সে শ্রী, সে সব, আর কিছু নাই। সর্ব্বাঙ্গে চিন্তার কালি মাড়িয়া দিয়াছে। দেহ এমন যে উন্নত, সর্ব্বাবয়বপরিপুষ্ট ও ভূবিষ্ঠবলসম্পন্ন, তাহা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহুকাণ্ডশোভিত উচ্চশীর্ষ প্রকাণ্ড মহীরুহ অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকায় যেমন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভাবনার প্রবল প্রকোপে দেহ তেমনি মুচড়াইয়া পড়িয়াছে। যে চক্ষু সদা উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধকিরণবর্ষী ছিল, যাহা দেখিলেই বুঝা যাইত, সে আপনার অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া পরের অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই ঢল ঢল ভাসমান চক্ষু দুটি এখন কোটর-বিবিষ্ণু, কালিমালিপ্ত, ও সম্পূর্ণ জ্যোতিঃহীন। যে মুখ সদা হাসি-হাসি ও প্রফুল্লতা-মাখান ছিল, যাহা হইতে ঈষৎধনগর্ব্বমিশ্রিত-স্বচ্ছন্দের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি ফাটিয়া পড়িত, সেই মুখ এখন অস্থিচর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিলে বন্ধুজনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, পাছে ইহার অধিক আরও কোনও অমঙ্গল ঘটে।

তা, কত দিনই বা? গণনা করিলে দুই মাসের অধিক হইবে না ভুবন চলিয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে এত পরিবর্ত্তন—ইহা কেহ কখন দেখে নাই। দুই মাস কেন, দুই বৎসরের জন্যও তো কত লোকের পুত্র বিদেশে যায়। কিন্তু, একি তাই? অপরের পুত্র যেমন যায়, ভুবন যদি তেমনি যাইত, তাহা হইলে কি আর তিনি এত শোকাচ্ছন্ন ও চিন্তায় অহর্নিশি দগ্ধ হইতেন? ভুবন কি অবস্থায় যে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা কি তিনি জানিতেন না, না

কিছু বুঝেন নাই? দুঃখ আপশোষ কষ্ট এত অধিক তো সেই জন্য। ভুবন কি তেমনি ছেলে? কি স্বভাব—শান্ত সুধীর বিনয়নম্র। অল্প বয়সে কত বুদ্ধি, কত বিজ্ঞতা। উঁচু নজরে চাহিতে জানিত না, উঁচু কথা কহিতে পারিত না, নম্রতা যেন তাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে। কাহারও সঙ্গে মেশে না, কাহারও কথায় থাকে না, অথচ আবশ্যক হইলে তোমার উপকার বুক দিয়া পড়িয়া করিবে। সে স্বভাব, সে গুণ, সে রূপ দেখিলে আততায়ী শত্রুরও মনে স্নেহের উদয় হয়, আর দুঃশীলা তারাসুন্দরী তাহাকে কত কুবচন বলিত, কত দুর্ব্যবহার করিত, কত শাপ মন্দ দিত, তবু ভুবন কখনও একদিনের তরেও একটিও উঁচু কথা বলে নাই, চুপ করিয়া সকলই সহ্য করিত, বড় কষ্ট হইলে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া যাইত। কত দিন হরিহর নিজে তারাসুন্দরীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া নিভৃতে ভুবনকে ডাকিয়া কোন কথা বলিতে গিয়াছেন, অমনি সে "মা আমার পাগল" বলিয়া একটু মলিন হাসি হাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এমন পুত্রও কি কাহারও হয়? আর সেই পুত্র কি সামান্য বেদনায় তাঁহাকে না বলিয়া রাতারাতি চলিয়া যায়? হায় হায়, সে একবার কেন তাঁহার নিকট আসিল না, আসিয়া তাহার হৃদয়বেদনা জানাইল না, তিনি তাহা হইলে তাহাকে বুকে করিয়া এ পাপপুরী হইতে পলাইয়া যাইতেন।

দিবসের অল্পাধিক্যে কি দুঃখের অল্পাধিক্য পরিমিত হয়? আজ দুই মাস হরিহর ভুবনকে দেখেন নাই, তাঁহার নিকট দুই যুগেরও অধিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যেন দেখিতে পান, তাঁহার সম্মুখে ভুবন দীনভাবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে। কখন বা বোধ হয়, যেন সে একাকী বিরলে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপনার পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাতেই তদ্গত হইয়া আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ আভাসে তাঁহার সাড়া পাইবামাত্র তখনই ত্রস্তে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনে রত হইতেছে। একবার তাঁহার বড় অসুখের সময় ভুবনের সেবা তিনি দেখিয়াছিলেন, থাকিয়া থাকিয়া কখনও বা সেই কথা মনে পড়িত, আর বোধ হইত, যেন তিনি সেইরূপ পীড়িত হইয়া শায়িত রহিয়াছেন, আর ভুবন সব ভুলিয়া কত দিন ধরিয়া দিবারাত্রি এক স্থানে এক ভাবে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে; তাহারও উপর দুষ্টা তারাসুন্দরী আসিয়া শেষ করিয়া মাঝে মাঝে কত কটু বলিতেছে, সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বিরসমুখে

তাঁহার মুখের প্রতি সেই ছল ছল চক্ষু দুটি স্থাপিত করিয়া নির্ব্বাকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহার পীড়ার ঘোর কাটে নাই, কিন্তু সেই অবস্থায় তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। হায় হায়, সে পুত্র আজ কোথায়? আছে কি নাই, তাহারই ঠিকানা নাই, আর তিনি এখনও খাইয়া শুইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতেছেন।

মনে পড়ে—কোন কথাটা তাহার ভুলিবার?—মনে পড়ে, শৈশবে ভুবন যখন প্রথম পাঠশালে যাইত, লিখিতে গিয়া সেই সোনার অঙ্গে কত কালির আঁচড় লাগিত, বালকসুলভ স্বভাবদোষে কত ধূলা মাখিত, কাদা ঘাঁটিত, তারাসুন্দরী একবার ফিরিয়াও দেখিত না, তিনি তাহাকে পরিষ্কার করিবার স্বতন্ত্র চাকর দাসী রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাও তারাসুন্দরীর ভয়ে ও ধমকে তেমন যত্ন করিতে পারিত না, কতদিন বালক সন্ধ্যার পরও ধূলা মাটী মাখিয়া থাকিত। মাঝে মাঝে কোন কোন দিন তিনি নিজে গামছা দিয়া মুছাইতে যাইতেন, অমনি কোথা হইতে তারাসুন্দরী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন তাহার নূতন রূপ, নূতন যৌবন—তিনি প্রভুমত খাইয়া অমনি গামছা-খানি গাড়ুর উপর রাখিয়া দিতেন। বালক বোধ হয় সেই সময়ে একবার আপনার মাতৃহীনতার কথা বুঝিতে পারিত, অমনি বড় বড় দুটি চক্ষু ছল ছল করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিতেন, কিন্তু ভয়ে তাহার অধিক কিছু করিতে সাহস কুলাইত না। সকল কথা মনে করিয়া বড় হইয়া কি ভুবন আর তাঁহার কাছে কিছু বলিত না? তাই কি বড় ব্যথা পাইয়া অভিমানভরে তাঁহাকে না বলিয়া কহিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

আ মরি মরি! সেই রূপ—স্নিগ্ধচন্দ্রকিরণোজ্জ্বল অকৃত্রিম দ্রবিণসমৃদ্ধ নব-কার্ত্তিকেয়তুল্য মধুর মনোরম তাপীজনতাপনিবারণ সে রূপ কোথায় গেলে তিনি দেখিতে পাইবেন? সেই কথা—সুললিত পীযূষপূরিত চিত্তবিনোদন সেই কথা তিনি আবার কেমন করিয়া শুনিতে শুনিতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবেন? সেই মুখ—সুন্দর সারল্যপরিপূর্ণ সদাপ্রফুল্ল ও চিরহাস্যময়—সেই মুখ তিনি আবার কবে দেখিবেন? এই জরাগ্রস্ত দুঃখভারপীড়িত অবসাদ-ভগ্ন দেহে প্রাণ থাকিতে কি সে সুখ আর কখনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে? কত সন্ধান লইলেন, তন্ন তন্ন করিয়া নিজে রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া কত স্থান অন্বেষণ করিলেন, কোথায়ও তো দেখা মিলিল না। এমন লোকও

তো দেখিলেন না যে, কেহ কোনও সম্বাদ বলিতে পারিল। থাকিয়া থাকিয়া মনে কত কুথানা গায়, কত আশঙ্কার কথা উদয় হয়, তাহা ভাবিতে গেলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, দুই চক্ষু দিয়া জল উছলিয়া পড়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে যেন সূচ বিদ্ধ হয়। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, ঝঞ্ঝা বৃষ্টির তাড়নায় যখন পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইতে পারে নাই, সেই সময়ে একেলা সে চলিয়া গিয়াছে, সে কষ্টে মানুষ কি বাঁচে? এত করিয়াও যখন কোনও খবর পাইতেছেন না, জনপ্রাণী ঠিক্ উদ্দেশ বলিতে পারিতেছে না, তবে কি সে বাঁচিয়া নাই? সেই দিন ঝড় একটু থামিলে হরিহর একবার জানালা খুলিয়া দেখিয়াছিলেন, একটা নারিকেলবৃক্ষের পত্রের ভিতর বসিয়া একটি পক্ষী ভয়চকিত হইয়া অতি সাবধানে আপনার শাবকটিকে বক্ষে করিয়া, পক্ষপুটে আবরণ করিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য মনে পড়ে, আর আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকেন। হায় হায়, বনের পাখী আপনার সন্তানকে পাখায় ঢাকিয়া রাখিল, আর তিনি—পশু হইতেও অধম—তিনি কি না সে সময়ে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে পর্য্যঙ্কের উপর শুইয়া, তাঁর প্রাণসম পুত্র ঝড়বৃষ্টিতে উলটি পালটি খাইয়া পথের মাঝখানে নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া প্রাণে মরিতেছে! ধিক্ ধিক্ তাঁহার জীবনে। হয় ত সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়াই মারা গেল; হয় ত বজ্রাঘাতেই সে জীবনকুসুম চিরকালের জন্য শুখাইয়া গেল; হয় ত বা ঝটিকাবশতঃ কোনও ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের চাপেই মারা পড়িল। ভাবিতে ভাবিতে আর ভাবনা আসে না। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, মাথা ঘুরিয়া আসে, সমস্ত ঘোর অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। সেই অন্ধকারমধ্যে কখন কখন দেখিতে পান, যেন ভুবনের স্বর্গীয়া মাতা ভ্রূকুটী করিয়া তাঁহার প্রতি তিরস্কারদৃষ্টি করিতেছেন। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষ যেন ডাক ছাড়িয়া সে কাঁদিয়া বলিতেছে—"কৈ, আমার ভুবন কৈ? আমি মরিবার সময় তাহাকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলাম—বাছা আমার কোথায়?" সেই কান্না শুনিয়া হরিহরেরও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তখনই কে যেন আসিয়া গলা চাপিয়া ধরে, দম আটকাইবার উপক্রম হয়।

ইদানীং এই ভাবেই হরিহরের দিন যায়। দুঃখে ও চিন্তায় নিদ্রা তো নাই, আহারও একরূপ বন্ধ হইবার যো হইয়াছে। ইচ্ছা তো নাই, তবে পাঁচ জনে জিদ করিয়া বলিতে বলিতে একবার ভাতে গিয়া বসেন, কিন্তু এক গ্রাস অন্ন

না তুলিতেই মনে পড়ে, ভুবন বা অনাহারেই মারা পড়িয়াছে, আর দ্বিতীয় গ্রাস তুলিতে প্রবৃত্তি হয় না। বৈঠকখানায় দিবারাত্রি এত তাস পাশা চলিত, তাহাও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকের ভিড় আর তেমন নাই, তবে কেহ কেহ নেহাত পূর্ব্বের খাতিরে পড়িয়াই হউক, অথবা সময় কাটাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়াই হউক, এক একবার পায়ের ধূলা দিতে আসেন। হরিহরের আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। অধিক সময় তিনি আপনার চিন্তা লইয়াই থাকেন, তবে ভদ্রতার অনুরোধে দুই একটা কথা কহেন। তাঁহারা দেখিয়া দেখিয়া, এটা ওটা সেটা করিয়া কয়েকটা কথা পাড়িয়া, দশ ছিলিম তামাক পোড়াইয়া, উঠিয়া চলিয়া যান। নিস্তব্ধতা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, হরিহর মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পাঠ করিতে বসেন, কিন্তু কিছুতেই মনে তিলমাত্র শান্তি হয় না, তখন তাহা মুদ্রিত করিয়া আবার ভাবনায় মগ্ন হন।

অধিক সময় বাহিরেই কাটিয়া যায়, অন্দরে যাইতে বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না। পত্নীর সঙ্গ ও আলাপ বিষবৎ বোধ হয়। যে তারাসুন্দরীকে এক দণ্ড না দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন, এক মুহূর্ত্ত এক যুগ বলিয়া বোধ হইত, যাহার রূপসাগরে ডুবিয়া তিনি স্বর্গমর্ত্তপাতাল সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন, যাহার মুখে এক বিন্দু ঘাম দেখিলে, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, যাহার একটুমাত্র মুখভারে বিষম প্রলয় বোধ হইত—সেই তারাসুন্দরী, সেই রূপ, সেই হাসি, সেই কথা লইয়া তাঁহার সম্মুখে এখন আসিলে তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, ত্রাসে পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকেন। বাহিরে আপনার চিন্তা লইয়া সময় কাটাইতে পারেন, কিন্তু অন্দরে আসিয়া পত্নীকে দেখিলে সে চিন্তা করিতেও ভয় হয়। মন্দভাষিণী তারাসুন্দরী ভুবনের কথা পাড়িয়া বিদ্রূপ করিয়া কত কটু বলে, তিনি চুপ করিয়া শুনেন, একটিও কথা মুখে আসে না, কেমন যেন হইয়া যান, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, কেবল পলাই পলাই বোধ হয়। কিন্তু কে জানে তবু কেন পলাইতে পারেন না। কয়েদীর মত কে যেন দুটা পায়ে শৃঙ্খল আঁটিয়া দেয়। একান্ত উপায়হীনের ন্যায় নীরবে ভীতনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। বাহিরবাড়ীতে আসিলে তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

কখন কখন অমূল্যের কুচরিত্র ও উপদ্রবের কথা লোকের মুখে শুনিতে পান, একটি কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মাত্র, পুত্রকে শাসন করিতে যান না, পত্নীকেও সে কথা উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন না—সে সময়ে আরও ভুবনের

কথা মনে জাগিয়া উঠে, দুটি চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। সেই কুসন্তান কখন কখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়াও বেল্লিকপনা করিত, তিনি মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেন, কোন কথাই বলিতেন না। মনে মনে কেবল আপনার মৃত্যু কামনা করিতেন। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া অমূল্য আরও বেশি বাড়াইয়া উঠিয়াছিল, সে জন্য তারাসুন্দরী স্বামীকে বলিয়া বলিয়া যখন কোনও ফল দেখিলেন না, তখন অগত্যা তাহাকে শাসন করিবার ভার আপনার হস্তেই লইলেন। অমূল্য মাকে ভয় করিত, কিন্তু মাও যে ছেলেকে ভয় না করিতেন, তাহা নহে। তবে তখন দুর্যোধন রাজকন্যার সহিত তাহার সম্বন্ধ করিতেছিলেন, এই একটা কথা পাড়িয়া, কতক ভয় দেখাইয়া, কতক ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া, কতক বা স্তুতিমিনতি করিয়া; তাহাকে গৃহে রাখিবার চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু গোপাল তো ছাঁদনদড়ি মানিল না। তারাসুন্দরী ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। হরিহরের কিন্তু সে সব কোন চিন্তাই ছিল না। আজ কয় দিন সেই কুলাঙ্গারের মুখদর্শন করিতে হয় নাই, ইহাতে বরং তিনি সুখী ছিলেন। হঠাৎ পথের মাঝখানে তাহাকে দেখিয়া ও তাহার পশুবৎ আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া গৃহে আসিয়া কতখনই মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখে কষ্টে সাপসেরের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া খালি যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে সজল নয়নে বলিতেছিলেন, "হে ভগবান, এই কি আমার দুষ্কৃতির শাস্তি? আমি পূর্ব্বজন্মে কি করিয়াছিলাম বলিয়া, তাহার মুখ না চাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়া; কি সেই পাপের এই প্রতিফল? শুনিয়াছি, তুমি ধর্ম্মাসনে বসিয়া যে যেমন পাপী দেহান্তে তাহাকে তেমনি দণ্ড প্রদান কর। যে কপালসার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য থাকে, তাহাকে গলিতধাতুময় রমণীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে দাও; যে নেইমকতা বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রের প্রতি কুব্যবহার করে, তাহাকে যমদূতেরা ধরিয়া এক বিষ্ঠাকূপে ফেলিয়া দেয়, আর শত শত কৃমি পুত্ররূপ ধরিয়া আসিয়া দংশন করে। কিন্তু আমি কি পাপ করিয়াছি যে, জীবন্তে আমার এই নরকযাতনা ঘটিল? কি করিলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?" বলিতে বলিতে হরিহরের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। ভৃত্যেরা গৃহে আলো দিয়া গিয়াছিল। বহুদিনের খানসামা দেলসুখ প্রভুর সাড়া পাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দরজার নিকটে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া

সে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। আজ কতদিন ধরিয়া সে তো হরিহরের চিত্তবৈকল্য ও শোকাচ্ছন্ন মূর্ত্তি দেখিতেছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া সেও কতদিন দুঃখে ভাসিয়াছে, কিন্তু এরূপ ভাব আর তো কোন দিন দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে তাহার নয়নকোণে জল আসিল। কেন আসিল, সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, তবু সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। বাবুকে ডাকিবে কি না, দুই একবার ভাবিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তারাসুন্দরী বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামীর যে আগেকার ন্যায় সে ভাব আর ছিল না, তাহা তিনি জানিতেন। দিন ছিল, যখন না ডাকিতেই হরিহর শতবার অন্তঃপুরে আসিতেন। দিন ছিল, যখন গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি ব্যাকুল ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া বেড়াইতেন। দিন ছিল, যখন তাঁহার ঘনঘন সম্বোধন ও ভালবাসা দেখানর জ্বালায় তারাসুন্দরী নিজে হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইতেন। স্বামী আঁচলে আঁচলে লুটাইবে, আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সদাসর্ব্বক্ষণ পাছে পাছে ফিরিবে, এক ভালবাসার কথা পাড়িয়া অষ্টপ্রহর ঘ্যানর ঘ্যানর করিবে, এ বিষম বালাই বলিয়া একদিন তিনি কতই না ক্ষেপ করিয়াছেন। আর সে দিন—সেই যে দিন লবঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়াছিল, তিনি স্বামীকে আসিয়া কতই ভৎর্সনা করিয়াছিলেন—তা, সে সব দিন আর নাই। সে আদর, সে আদরের ডাক, সে আদরমাখান কথা—সে সব আর নাই। সে হরিহর নাই, সুতরাং সে সব আর কিছুই নাই। এতদিন তারাসুন্দরী তাহা দেখিতেন না, বুঝিয়াও কিছু বুঝিতেন না। রাজকন্যার শাশুড়ী হইবেন, এই আশায় বড়ই প্রফুল্লিতা ছিলেন। স্বামীর কথা দূরে থাক, পুত্র অধঃপাতে যাইতেছে, সে দিকেও তাঁহার বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। আপনার আনন্দে আপনিই মত্ত ছিলেন। আজ সে মত্ততা গিয়াছে, নিরাশায় সে ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, তারাসুন্দরী আজ এক একবার বুঝিতেছেন, তাঁহার আগেকার দিন যথার্থই যেন চলিয়া গিয়াছে। দিন গিয়াছে বৈ কি, নহিলে তিনি আজ স্বামীর আগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া, আর এতক্ষণ হইয়া গেল, সে স্বামীর উদ্দেশমাত্র নাই কেন? কথাটা মনে উঠিতেও তিনি শিহরিয়া উঠি-

লেন। একবার চারি দিকে চাহিলেন, সেই গৃহ, সেই খাটপালঙ্ক, সেই বাতির আলো গিয়া গৃহসামগ্রীর উপর পড়িয়াছে, কিন্তু সে শোভা যেন আর নাই। আপনার পানে চাহিলেন—সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই সাজসজ্জা, কিন্তু সে মোহন ভাব যেন আর তাহাতে নাই। প্রাণটা বড়ই কেমন করিয়া উঠিল। সে কল্পনা তাঁহার অসহ্য হইল। বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেহের ভিতর হইতে কেমন যেন একটা ভাব উঠিতে লাগিল, বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী আসিতেছেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য একবার মুখ বাড়াইয়া সিঁড়ির পানে চাহিলেন। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। রাগে ও ঘৃণায় ফুলিতে ফুলিতে একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। সেজের আলোকে সে মূর্ত্তি বড় ভীষণ দেখাইতে লাগিল।

এই সময়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বহির্বাটী হইতে দেলসুখ আসিয়া ডাকিল,—"মাজি!"

তারাসুন্দরী কিছু না বলিয়া, তাহার প্রতি এক তীব্র দৃষ্টি করিলেন। গরিব ভৃত্য ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল। কিন্তু ভয় অপেক্ষা বাবুর চিন্তা তখন তাহার বেশি হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে হরিহরের অবস্থার কথা বলিল। শুনিয়া, তারাসুন্দরী বিস্মিতা হইলেন। অন্য দিন হইলে অবশ্যই বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই ছিল না; তবে আজিকার ঘটনায় তিনি অন্যরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। সন্দেহটা বড়িও মনে বেশ লাগিতেছিল না, কিন্তু তবুও থাকিয়া থাকিয়া খট্‌কা হইতেছিল, ক্ষেমা ও দুর্য্যোধনের সঙ্গে তাঁহার হয় ত বা ষড়যন্ত্র ছিল। তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই হয় ত বা ঐরূপ দুঃখের ভাণ করিতেন। হয় ত সন্ধান করিতে যাই বলিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া ভুবনকে গিয়া দেখিয়া আসিতেন। তা ছাড়া, বিস্মিত হইবার আরও বিশেষ কারণ, তারাসুন্দরী জানিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষেমার সহিত আজ হরিহরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এক জন চাকর তাহা গোপনে দেখিয়াছিল, দেখিয়া সে এক জন দাসীকে বলিয়াছিল, দাসী আসিয়া তাঁহাকে তাহা জানাইয়াছিল। তারাসুন্দরী অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া ক্ষণেক কি চিন্তা করিলেন। তার পর, দেলসুখকে বলিয়া দিলেন, সে যেন বহির্বাটী হইতে সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া, বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া দেয়, তিনি শীঘ্রই যাইতেছেন। আজ্ঞা পাইয়া, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া দেলসুখ চলিয়া গেল।

তখন, ধীরে ধীরে সেই পত্রখানি লইয়া তারাসুন্দরী বৈঠকখানায় গমন করিলেন। তখনও হরিহর সেই ভাবে বসিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিলেন। তখনও কোন কথা না কহিয়া তারাসুন্দরী নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। তবু হরিহর তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিলেন না। আস্তে আস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন,—"একেলা বসিয়া ও কি হইতেছে?"

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হরিহর চাহিয়া দেখিলেন, তারাসুন্দরী। দেখিবামাত্র প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, তাহা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কিছু বলিতে না পারিয়া, বোবার ন্যায় পত্নীর মুখের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"এস, ঘরে যাই এস।"

পত্নীর কোমল ভাব ও দয়ার স্বর শুনিয়া হরিহর আরও অধিকতর আকুল হইয়া পড়িলেন। তারাসুন্দরীর সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রচণ্ড স্বর শুনিয়া তিনি ভয় পাইতেন বটে, তবে তখন তিনি তাহাকে বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু সেই মূর্ত্তি যখন কোমলতা আশ্রয় করিত, আর গলার সুরটা খুব নরমে নামিত, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িতেন। ভবিষ্যৎ বিভীষিকায় অন্তরাত্মা আরও অধিক কাঁপিয়া উঠিত। এত যে দুঃখ, তবু আজ পত্নীর সেই স্বভাবাতীত ভাব দেখিয়া, আরও না জানি ইহার মনে কি আছে, ইহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তা, অবাধ্য হইবার যো তো নাই। মরুন আর বাচুন, চিরকাল তিনি তারাসুন্দরীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, চিরকাল তাহাই করিতে হইবে। কত দিন তিনি ভাবিয়াছেন, আর তাহার মুখ দর্শন করিবেন না; কাছে আসিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবেন, কিন্তু তাহাকে দেখিলেই আর সে প্রতিজ্ঞা মনে থাকে না। ইচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। সে যেন চুম্বক, আর তিনি যেন একখণ্ড জীর্ণ লৌহ, চুম্বকের কাছে লৌহের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সে কি যাদুকরী? নহিলে কেন তাহার হাতে তিনি এমন খেলার সামগ্রী হইয়া পড়িবেন? তিনি যে কিছু বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নহে। সব বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কেন যে কিছু করিতে পারিতেন না, সেইটা কেবল সহস্র চেষ্টা করিলেও বুদ্ধিতে আসিত না। তাই তারাসুন্দরীকে দেখিলে তিনি আরও এত অধিক ভীত হইয়া পড়িতেন। হরিহর কিছু না বলিয়া, নিঃশব্দে অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "হা ভগবন্, কাঁদিয়াও মানুষ যে সুখ পায়, সে সুখেও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ!"

তারাসুন্দরী চোখের পাতার ফোঁটা কত জল আনিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আমার মরণটা হয় তো বাঁচি, আর তোমাদের এক এক জনের এক এক রকম জ্বালায় জ্বলিতে পারি না। তাকে যেন পেটেই ধরি নাই, কিন্তু সে গিয়া অবধি যে কি মনের কষ্টে আছি, তা গুরুদেবই জানেন। তার পর যে পেটের ছেলে, সে তো হলো একটা কাল শত্রু। আর তুমিও যদি তার উপর এমনি করিয়া পড়িয়াছ, তবে বল হয় বিষ খাই, না হয় গলায় দড়ি দিয়া মরি।" সেই আবদারপ্রেরিত অশ্রু ফোটা ফোটা করিয়া পদ্মাগ্রভাগ হইতে হরিহরের পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল। তবু হরিহর কোন কথা কহিলেন না।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "আমার আরও দুঃখ এই যে, লোকের কথা ধরি না, কিন্তু তুমিও ভাব, আমা হইতেই ভুবন গৃহছাড়া হইল। তা তোমার কি বলিব বল? বলিলে বিশ্বাস তো হইবে না। ঐ জন্যই তো রাগে নবীন জ্বলিয়া যাইত। আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া তুমি ভুবনের জন্য কাঁদিতে, আর আমি তোমাকে বিদ্রূপ করিতাম; কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই ভুবনের জন্য আমি গোপনে নিত্য কত কান্না কাঁদিয়াছি। তুমি ভাব, আমারই সব দোষ। আমি ভুবনকে ছাঁটিয়া অমূল্যর সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলাম, তার পর রাজারা ভুবনের সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলে আমি গোপনে অমূল্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিতেছিলাম। স্বীকার করি, প্রথমটা আমার দোষ, কিন্তু মা ছেলের উপর স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া যে দুর্ব্বলতা দেখায়, সেটা আমার সেই দোষ ভিন্ন আর কিছু নয়। দ্বিতীয়টা যে আমার কি বিশেষ দোষ, তাহা বুঝিতে পারি না। অত বড় সম্বন্ধটা একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই তাহারা অন্যত্র দিত, তাহা না হইয়া যদি অমূল্যকেই দেয়, তবু রাজার সঙ্গে কুটুম্বিতা হইবে, এই ভাবিয়া তাহা করিতে গিয়াছিলাম। তা ছেলের আমার গুণগুলি উত্তরোত্তর যে রূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া সে প্রবৃত্তি আর নাই। কেন পরের মেয়ের খোয়ার করিব? অমূল্যের জ্বালা যে এখন আমার কি হইয়াছে, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি তো পেটে ধর নাই, তুমি তার কি বুঝিবে বল? হা কপাল—" তারাসুন্দরী বলিতে বলিতে দুঃখে এমনই আর্দ্র হইয়া,

পড়িলেন যে, আর অধিক কথা সরিল না, চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া হরিহর হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তারাসুন্দরী আঁচলে চোখের জল মুছিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন, "তাই ভাবি, দূর হোক, যখন আপনার ছেলের দশাই এই, তখন পরের ছেলের কথা আর ভাবিব না। কিন্তু মন বুঝে কৈ? ভুবন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া লোকের সেন-প্রাণে কত ব্যথা লাগিয়াছে, আর আমার বেলা কিছুই হয় নাই। লোকে এমনই মুখে স্নেহ জানায়, যেন তারাই তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া অতবড়টা করিয়াছে, আর আমি যেন কিছুই তার কিছু নই। আমার দোষ, আমি মুখে অমন মমতাপনা জানাইতে পারি না। সেই জন্যই তো এতদিন কোন কথা ফুটি নাই। ভাবিয়াছিলাম, আমি মন্দ, মন্দই থাকি। যতদিন না ঈশ্বর দিন দিবেন, ততদিন ফুটিব না। তুমি স্বামী—তোমাকে শেষ বিদ্রূপ করিয়াছি—তুমি কি জানিতে, কতদিন ভুবনের জন্য লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়াছি; কতদিন গোপনে তাহার অনুসন্ধানে কত স্থানে লোক পাঠাইয়াছি। শেষে যখন বুঝিলাম, পুরস্কারের লোভে সবাই আসিয়া মিছা কথা কয়, তখন ক্ষেমাকেই পাঠাইলাম। আজ তো সে এখনও আসিল না। পথে তার সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছে? কিছু কি তার মুখে শুনিয়াছ? দেখ—"

হরিহর কোন কথা না বলিয়া পত্নীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন। তখনই আবার মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তবে তো তিনি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য। তারাসুন্দরীর দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যে ক্ষেমা তাঁহাকে পথে ধরিয়া সেই সব মিথ্যা কহিয়াছিল, ইহাতে আর কোনও ভুল নাই। বড় ঘৃণা হইল। আবার মাথা তুলিয়া কটমট করিয়া পত্নীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। চোখ দুটা কেমন বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল, সর্ব শরীর কি এক তাড়িত আঘাতে যেন কাঁপিতেছিল। কথা কহিলে বোধ হয় মনের সে ঘোরতর বিকার অনেকটা লাঘব হইত। কিন্তু কথা মুখে আসিতেছিল না। সে বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ প্রাবৃট্‌মেঘভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তারাসুন্দরীও অন্তরে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা হ্যাঁগা, অমন করিতেছ কেন? বল না, তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া থাকে তো সে কি বলিল? ভুবনের কি দেখা পাইয়াছ? সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা লোক আমাকে এই পত্রখানা দিয়া গেল, বলিয়া গেল,

রাজবাড়ী হইতে আসিয়াছে। তা তুমি তো বাড়ী ছিলে না; আমি মেয়ে মানুষ কি করিব বল? এত থাকিতে বলিলাম, সে থাকিল না। পত্র মুকুন্দরামের লেখা। ভুবন নাকি রাজবাড়ীতেই আছে।"

তারাসুন্দরী পত্রখানি খুলিয়া হরিহরের হাতে দিলেন। বিস্ময়সহকারে হরিহর সে পত্রখানি দেখিলেন। শিরোনামা তাঁহারই নামে, সহি মুকুন্দরামের। সে সহি তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন, অবিকল সেই সহিই বটে। বিস্ময় আগ্রহে পরিণত হইল। তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরিহর জিজ্ঞাসিলেন, "বল, এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে?"

তারা। আমি তো বলিয়াছি।

হরি। মিনতি করি, সত্য বল।

তারা। ইহাতেও অবিশ্বাস! কেন? তোমাকে প্রতারণা করাই কি আমার ব্যবসা? ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে। এত অবিশ্বাস ও ঘৃণার মাঝে বাঁচা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়।

স্বভাবদর্পিতা তারাসুন্দরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ভয়ে হরিহর এতটুকু হইয়া গেলেন, কিন্তু পত্নীর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে অন্য ভয়েরও উদয় হইল। ভাবিলেন, "তবে কি যথার্থই এই পত্র আসিয়াছে? ক্ষেমা তাঁহাকে সত্য বলিয়াছে? হইতে পারে, কেহ পুরস্কারের লোভে ক্ষেমার আঁচল হইতে এই পত্র খুলিয়া লইয়া থাকিবে। কিন্তু এমন দিন কি হবে? ভুবন আমার বাঁচিয়া আছে? রাজপুরে আছে? তা, এই কি তার উচিত? কিন্তু তাকে কি বলিব বল, স্বয়ং ভগবানই যখন মথুরায় গিয়া রাজা হইয়া, যে নন্দ তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছু জানিত না, কিছু চাহিত না, সেই স্নেহময় পিতাকেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহাকে আর কি দুষি বল? সব দোষ আমার কর্ম্মফলের। সে যে আমার প্রাণে আছে, ভাল আছে, এই আমার পরম লাভ।"—সে সব কথা ভাবিতেও হরিহরের হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠিল। নয়ন দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা, আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, একবার এক জন তোমার বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া কেন জান না,—না হয় নিজেই কেন যাও না, সেই তো কত স্থান খুঁজিয়া আসিতেছ, আর তাহারাও এত করিয়া লিখিয়াছে।"

হরিহর কোনও উত্তর করিলেন না। উত্তর দিবার সময় তখন তাঁহার ছিল

না। তিনি তখন ভুবনের চিন্তাতেই তদ্গত ছিলেন। যেন তিনি রাজবাড়ী গিয়াছেন, ভুবন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া কাঁদিতেছে, তিনিও হেঁট হইয়া তাহাকে দুই হাতে বক্ষে ধরিয়া অজস্র ধারে রোদন করিতেছেন। কত কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিছুই বলা হইতেছে না। কেবল উভয়ের চোখের জলে উভয়ের বুক ভাসিয়া যাইতেছে। উত্তর দিবেন কি, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাগে তারাসুন্দরীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগের পালা অনেক হইয়া গিয়াছে—আজ রাগ দেখাইতে তিনি আসেন নাই। হাসিমুখে কাজ হাসিল করিবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়। অন্তরের ভাব গোপন করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা, তোমায় বলিব কি, আমিও তার কথা যত মনে করিতেছি, ততই কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু এখন তো আর চুপ করিয়া কাঁদা উচিত নয়। এখন, কাল যাহাতে সকালেই তুমি আমার ভুবনকে আমার কাছে আনিয়া দিতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ।"

হরিহর কিছুই বলিলেন না। তারাসুন্দরীর রকম দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই ঘৃণার উদয় হইল। একবার তাঁহার দিকে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া, মনের কথা মনে চাপিয়া, ধীরে ধীরে অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি না উঠিলে, আমি তো যাইব না।"

হরিহর আর কিছু না বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সে রাত্রি হরিহরের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। নিদ্রা তো কত দিন হইল ছিল না, কিন্তু অন্য দিন যে জন্য নিদ্রা হইত না, আজ সে কারণ না হইলেও শত চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিলেন না। আজিকার রাত্রিটা এত দীর্ঘ হইল কি জন্য, কি করিলে ইহা শীঘ্র পোহাইবে, শুইয়া পড়িয়া মুদিতচক্ষে হরিহর ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। আর মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল, সেই মুখ—ভুবনকে সেই কতদিন দেখি নাই, কত মধুর সেই মুখ। এক শয্যায় শয়ন করিয়াও তখন পত্নীর কথা মনে একবারের জন্যও আসিল না।

শেষরাত্রে হরিহর আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। তারাসুন্দরী অনেকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীপাধারে ক্ষীণালোক তখনও অতি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল, সেই আলোক গিয়া তারাসুন্দরীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। বড় সুন্দর

দেখাইতেছিল। উঠিতে সেই দিকে হরিহরের দৃষ্টি পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তারাসুন্দরী ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই সুন্দর ঘুমন্ত মুখে হাসির মৃদু রেখা আরও সুন্দর দেখাইল। হরিহর দাঁড়াইয়া আর একবার তাহা দেখিলেন। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দেলসুখকে বলা ছিল, সে প্রস্তুত ছিল, ডাকিরা মাত্র ছুটিয়া আসিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া প্রভুর সঙ্গে বাহির হইল।

সেই প্রাসাদসদৃশ অচিরনির্ম্মিত অট্টালিকার বহির্ভাগে আসিয়া, তৎপ্রতি চাহিয়া, হরিহর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "দেখা পাই ফিরিব, নহিলে ভুবনও আমার যে পথে, আজ হইতে আমিও সেই পথে চলিলাম।"

সহযোগী সাহিত্য।

প্রজানীতি; কংগ্রেস।

ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল কংগ্রেস নামধেয় ভারতের জাতীয় মহাসমিতি এখনকার প্রসিদ্ধ প্রজা-পঞ্চায়েৎ। এই প্রজা-পঞ্চায়েত পাশ্চাত্য প্রণালীতে গঠিত, প্রকাণ্ড। কংগ্রেসের কতকটা প্রতাপ ও প্রভাবও আছে। এ দেশে, রাজশক্তির অতিমাত্র প্রবল পরাক্রম, তাই বলিয়া প্রজাশক্তি একেবারে সামর্থ্যবিরহিতা নহে; তাহা হইতে পারে না। রাজশক্তির ন্যায় প্রজাশক্তিও ত শক্তি বটে। সামর্থ্য শক্তিমাত্রেরই সাহচর্য্য করে। শক্তির অনুপাতেই সামর্থ্যের মাত্রা। উপরি-উক্ত প্রজা-পঞ্চায়েত যে পরিমাণে প্রজাশক্তি সংগৃহীত ও সঞ্চিত করিতে পারিয়াছে, রাজশক্তির নিকট সেই পরিমাণে ইহার সামর্থ্য ও সম্ভ্রম আছে, তাহার অধিকও নাই, অল্পও নাই, কিন্তু তাহা যে একেবারেই নাই, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। যে বলে, সে হয় অন্ধ, নয় মিথ্যা-ব্যবসায়ী। যে যাহাই বলুক, বৃটিশ-সিংহের রাজশক্তি কোনও কালে, প্রকৃত প্রজাশক্তির প্রতিকূল নয়; উহা কোনও কালেই মূল প্রজাশক্তির দমন ও দলন করিবার চেষ্টা করে নাই। দুর্ব্বল অথচ দুরন্ত রাজনীতিই এরূপ করিয়া থাকে। সবল ও সুস্থ বৃটিশ রাজনীতির তাহা রীতিবিরুদ্ধ। ইংরেজ রাজশক্তি, প্রজাশক্তিকে উপেক্ষা করে না। প্রজাশক্তির সৃষ্টি ও সমষ্টীকৃত ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করে। প্রজাশক্তি সৃষ্ট ও সমষ্টীকৃত হইলে, তাহার সহায়তা লইতে ও তাহাকে তাহার শক্তির অনুরূপ সত্বাধিকার দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতি পুরাতন ইতিবৃত্ত নহে, অতি আধুনিক ভারতীয় শাসনেতিহাসই ইহার সাক্ষী। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য কংগ্রেসই ইহার সাক্ষী।

প্রজা-পঞ্চায়েত।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি।

কংগ্রেস যে পরিমাণে এবং যে প্রকৃতির প্রজাশক্তি স্বকীয় দেহে সংগৃহীত ও সঞ্চিত করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে, বা হইবার সম্ভাবনা আছে,—সেই পরিমাণে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে হউক, রাজশক্তি এই প্রজা-পঞ্চায়েতের পরামর্শ পরিপাক করিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত, ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন সংস্কার, সে সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের সত্বাধিকার, এক কথায় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রসার। ইহা উপেক্ষণীয় উদাহরণ নহে। রাজশক্তি সমবেত প্রজাশক্তিকে অবহেলা করে না, তাহার আর একটি অতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, জুরি-প্রথা-পরিবর্ত্তন-বিজ্ঞাপনের প্রত্যাহার। কংগ্রেস বা যে কোনও প্রজা-পঞ্চায়েত প্রকৃত প্রস্তাবে এবং উপযুক্ত পরিমাণে প্রজাশক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে, রাজশক্তি নিশ্চয়ই তাহাকে "স্বাগতং" বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু, কংগ্রেস বা তদনুরূপ পঞ্চায়েত বা প্রতিনিধিসভা যদি প্রজাশক্তি বা প্রজানীতির নাম করিয়া একটা উদ্ভট পদার্থ উপস্থিত করেন, মুষ্টিপ্রদাষবিশেষের বা অত্যল্পসংখ্যক লোকের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সেই স্বার্থকে প্রজাসাধারণের স্বার্থ বলিয়া প্রতিভাত করেন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, রাজশক্তি তাহা মানিবে না,—সেই তথাকথিত প্রজানীতি বা গায়ে-পড়া প্রজাপ্রতিনিধিত্ব টিকিবে না,—কংগ্রেস বা পঞ্চায়েত নিশ্চয়ই অপদস্থ হইবেন, অতি-রাৎ পঞ্চত্ব পাইবেন। আমাদের তথা অভিধেয় এক আধটি (কয়টিই বা আছে?) প্রজা-সমিতি সম্পূর্ণরূপে, এবং কংগ্রেস নিজে কিয়ৎপরিমাণে এরূপ বিপদে নিপতিত, ইহা বিজ্ঞ শোমুখী প্রজানীতির পক্ষে মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে প্রজানৈতিক উন্নতি নিশ্চয়ই বহু কাল পশ্চাতে যাইয়া পড়িবে।

সাধনানুসারে সিদ্ধি।

নিরর্থক নামে অমঙ্গল।

অগ্রেই বলিয়াছি, রাজনীতি কংগ্রেসের প্রজানীতিকে গণনার মধ্যে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। পরন্তু, সে প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক এবং উচিত যে, এই কংগ্রেস এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় সভা সমিতি, বৃটিশ রাজশক্তি হইতেই উদ্ভূত। রাজশক্তির এক অংশে শাসন এবং অপর অংশে পালন। যে এক বিন্দু প্রজা-নীতি বা প্রজাশক্তি আজ আমরা এ দেশে দেখিতেছি, তাহা বৃটিশ-সিংহের পালনশক্তির প্রসাদেই শাসনশক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই প্রজানীতিতে যদি কোনও প্রকারে পাপস্পর্শ হয়, তাহা হইলে উহা রাজনীতির অনুসরণ করিতে পারিবে না, রাজশক্তি কর্ত্তৃক কেবল উপেক্ষিত নয়, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে। প্রজানীতির পাপ দুই প্রকার। এক রাজবিদ্রোহ, অপর প্রজাবিদ্রোহ। যদিও প্রথম প্রথম এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা সমালোচক এবং রাজপুরুষদিগের কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিলেন—কংগ্রেসের প্রজানীতি প্রথমোক্ত পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু,-উহা দ্বিতীয়োক্ত পাপে লিপ্ত হইতে পারে,—হইবার লক্ষণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রজানীতির প্রজাবিদ্রোহ নিতান্ত নূতন কথা নয়। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করা যাইতেছে।

রাজনীতি ও প্রজানীতি।

প্রজানৈতিক পাপ।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের এবং ইংরেজ রাজনীতির যতই দোষ থাকুক, উহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা প্রজাপুঞ্জের মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য করা। জন কোম্পানী হইতে লর্ড এলগিন পর্য্যন্ত, আবহমান কাল এ আকাঙ্ক্ষা বলবতী, এবং এই আকাঙ্ক্ষানু-রূপ আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থাও প্রস্তুত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আইন কানুন বিধি ব্যবস্থায় সময়ে সময়ে ভ্রম প্রমাদ অবশ্যই ঘটিয়াছে। তা ঘটুক;—নেটিব ও সাহেব, কৃষ্ণ ও শ্বেতের সত্বাধিকারে ইতরবিশেষ হইয়াছে

স্বার্থসমীকরণ।

এবং আছে, তা হউক, এবং থাকুক; এবম্বিধ অবস্থায় তাহা হইয়াই থাকে।—ইংরেজ রাজনীতির প্রজাপালনের মূলে স্বার্থসমীকরণাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বথা বিদ্যমান। শ্বেত-কৃষ্ণের সম্ভ্রমাধিকারে ইতরবিশেষ আছে বটে, তা সেরূপ ইতরবিশেষ কৃষ্ণে-কৃষ্ণের সম্ভ্রমাধিকারেও আছে; জিতে বিজিতে এবং উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টে ভেদজ্ঞান যত কাল থাকিবে,—সাম্যনীতি বা ব্রহ্মজ্ঞান, মনুষ্যপ্রকৃতির অহঙ্কার যত কাল গ্রাস না করিবে, অন্ততঃ ততকাল ঐ ইতরবিশেষ ঘুচিবে না। সাম্যনীতি বা ব্রহ্মজ্ঞান অকস্মাৎ উদিত হইয়া সংসারের ও সমাজের দম্ভ দেমাক একেবারে উদরস্থ করিবার সম্ভাবনা না কি-অতি অল্প। সুতরাং উপরি-উক্ত ইতর বিশেষ ভাব ঘুচিবার সম্ভাবনাও অসম্ভব। সম্ভ্রম সম্বাধিকারে উনিশ বিশ, বা তদপেক্ষাও বেশী-কমি থাকুক, কিন্তু স্বার্থের সম্বাধিকারে ইতরবিশেষ করা, ইংরেজ রাজনীতির উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য নহে বলিয়াই ইংরেজ রাজত্ব এ দেশে স্থায়ী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সাম্যনীতি,—ব্রহ্মজ্ঞান।

কিন্তু, স্বার্থের ইতরবিশেষ অর্থ কি? স্বার্থসমীকরণ বা স্বার্থসাম্য অর্থে, পৃথিবীর সমস্ত ধন ধান্য সমান অংশে সকল লোককে বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা নহে, অন্ততঃ সে ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা কথা কহিতেছি না,—ইংরেজ রাজনীতিও—কোনও কালে সে ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। স্বার্থসাম্য অর্থে আমরা বুঝাইতে চাহিতেছি, যাহার যাহাতে যতটা ও যত টুকু স্বার্থ আছে, তাহা ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সমভাবে রক্ষা করা। রামের স্বার্থ বোল আনা, আর শ্যামের স্বার্থ ছয় আনা নহে; উভয়েরই স্বার্থ ষোল আনা রকম রক্ষিত হইবে। দুই জনের জন্য দুই ব্যবস্থা হইবে না, এক ব্যবস্থাই সব হইবে না। শ্রীযুক্ত ধনকুবের রায় বাহাদুর কে, সি, এস, আই, মহাশয়ের নিজের ধনভাণ্ডারে যেরূপ অধিকার, পুঁটে তেলীর নিজ তৈলভাণ্ডে বা পিক সেথের নিজের শস্যক্ষেত্রে তাহাদের তেমনি আপন আপন অধিকার। ধনকুবের মহাশয় ধনহীন ও বলহীনের উপর অত্যাচার করিয়া তাহার সম্বল-কণা আত্মসাৎ করিবার অধিকারী নহেন। ইংরেজ আইনের স্থূল উদ্দেশ্য এই। এই উদ্দেশ্যের যথাসম্ভব সাধনার্থেই ইংরেজ রাজনীতি আইন করিয়া থাকে। ইংরেজ আইনে বাঘ বকরিকে এক ঘাটে জল খাইতে হয়। কিন্তু বকরিকে আহার করাই বাঘের অভ্যাস। হিন্দু রাজত্বে কার্য্যতঃ কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই; কিন্তু মুসলমান বাদসাহীতে বাঘের উপরি-উক্ত অভ্যাস পূর্ত্তিই পাইয়াছিল। দৃষ্টান্ত অনেক আছে। একটা দৃষ্টান্তই গ্রহণ করুন। মুসলমান আমলে, বাদসাহ, জমিদার ও রেয়তের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? পরস্পরে বাঘের বকরি-ভক্ষণ সম্বন্ধই বিদ্যমান ছিল। বাদসাহ ইচ্ছা হইলেই জমিদারের জমিদারী এক গ্রাসে উদরস্থ করিতেন, জমিদারও যথেচ্ছাচারে রেয়তরূপ শত শত বকরি বদনে দিতেন। ইংরেজী আইন এ সম্বন্ধের বিরোধী। এ সম্বন্ধের উচ্ছেদের জন্যই কর্ণওয়ালিস জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ বন্দোবস্তে বাদসাহের সহিত জমিদারের সানুকূল সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জমিদারের সহিত রেয়তের সম্বন্ধ প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিয়া গিয়াছে। কর্ণওয়ালিস তখন বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে পারিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা জমিদারের সহিত না করিয়া, বোধ হয়, রেয়তের সঙ্গেই করিতেন। কিন্তু, বুদ্ধির ভুল কে গণ্ডায়? কাযেই বাঘের উদর হইতে বকরিকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে এখন বিষম বেগ পাইতে হইতেছে।

বাঘ ও বকরী।

বাদসাহী ব্যবস্থা।

কর্ণওয়ালিস কীর্ত্তি।

কংগ্রেসের প্রজানীতির এবং স্থানীয় প্রজাসমিতির অধুনা যেরূপ গতি দেখা যায়, তাহাতে

উহারা গবর্ণমেণ্টের উপরি-উক্ত সৎকার্য্যের সহায়ক নহে, বরং বিলক্ষণ বিরোধী হইয়াই দাঁড়াইতেছে। উদাহরণ, স্থানীয় প্রজাসমিতি "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'

সৎকার্য্যে বাধা।

বিহার সার্ভে-বিলের প্রাণপণ প্রতিবাদ করে, স্বয়ং কংগ্রেস বঙ্গদেশের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত করিবার প্রয়াসী। ইহা সাধের মুখে বকুনি প্রদানেরই ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থামূলক প্রজানীতির নিশ্চয়ই পতন হইবে, তা, সে তথাকথিত democratic spiritএর যতই ভান করুক না।

প্রজানীতির পক্ষে রাজনীতি অপেক্ষা অধিক, অন্ততঃ তাহার সমতুল্য অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতা থাকা-প্রয়োজন। তাহা থাকিলেই প্রজানীতি রাজনীতির সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে,

অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতা।

রাজনীতির সহিত চলা ফেরা করিতে সমর্থ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে প্রজানীতির অভিজ্ঞতা, রাজনীতি অপেক্ষা অধিকাংশ বিষয়ে অত্যন্ত অল্প, পক্ষান্তরে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাহার নিরপেক্ষতারও অতিশয় অভাব। এমত অবস্থায়, উহা রাজার বিরক্তিকর ও প্রজার অনিষ্টকর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কংগ্রেসের কলরব প্রকাণ্ড বটে, কেন না, হিমালয় হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে আফগান সীমা পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি। কংগ্রেস প্রকাণ্ড, কিন্তু মূল প্রজাশক্তি—দেশের কৃষীবল দ্বারা পরিপুষ্ট নহে। সেই জন্যই বোধ হয়, কৃষীবল ও কৃষকের প্রতি

কংগ্রেস ও কৃষীবল।

উহার উপেক্ষা। কিন্তু কৃষীবলই প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রজাশক্তির মূলাধার। কংগ্রেসে প্রজাসাধারণের মূল শক্তির অভাব এবং শক্তির শাখাপ্রশাখা লইয়াই কংগ্রেস্ কার্য্য করিতেছে, শাখাপ্রশাখার অভাব আকাঙ্ক্ষারই মূল প্রস্রবণের প্রতি কংগ্রেসিক প্রজানীতির দৃষ্টি নাই, পরন্তু, প্রজাশক্তির যাহা অস্থিমজ্জা, তাহার প্রতিও উহা উদাসীন। অস্থিমজ্জা মানে ঠিক মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন অল্পসংখ্যক লোক নহেন, তন্নিম্নস্তরস্থ এতদ্দেশীয় অসংখ্য ভদ্র সাধারণ। কৃষিজীবী ইতর সাধারণ এবং এখন এতদ্রূপ উপজীবিকা-বিহীন ভদ্র সাধারণের অভাব আকাঙ্ক্ষার প্রতি কংগ্রেস আদৌ মনোযোগী।

প্রজাশক্তির মূল ও মজ্জা।

উহাদের সহিত কংগ্রেসের অত্যল্প সাধারণ সম্বন্ধ থাকিলেও, সবিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। অথচ, উহাদিগকে লইয়াই দেশের ৮৯১৯৮০ কংগ্রেস এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ন্যায় সমিতিনিচয়ের দেশস্থ ৮৯১৯৮০ পরিমিত প্রজার সহিত সবিশেষ সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধ, উপস্থিত অবস্থায়, ক্রান্তিমাত্রপরিমিত লোকের সহিত। সুতরাং সমগ্র দেশের, বিশেষতঃ কৃষিজীবী ইতর ও

প্রতিনিধিত্বের প্রবঞ্চনা।

নিঃস্ব ভদ্র সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহারা যেন আর পরিচয় না দেন। দেশের এই দুই বিরাট বিভাগের অদ্যাপি মুখ ফুটে নাই, চোখও খুলে নাই। রাজনীতি তাহাদের চোখ মুখ ফুটাইতে বদ্ধপরিকর হইলে, প্রজানীতি যেন বাধা দিতে না যান। শাখাপ্রশাখা লইয়াই তিনি আপাততঃ কার্য্য করুন, মূল ও মজ্জা তফাতেই থাক।

আমাদের কোনও বিশিষ্ট কবি ও বর্দ্ধিষ্ণু সমালোচক, ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল কংগ্রেসকে "নব নির্ম্মিত জয়ঢাক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এ আখ্যা উত্তম। ইহা এক কথায় কংগ্রেসের ভাব ও স্বভাবব্যঞ্জক। এই নবনির্ম্মিত জাতীয় জয়ঢাকে অনেক রবের

জাতীয় জয়ঢাক।

উচ্চ আওয়াজ হয়। আওয়াজ হওয়াই দরকার। এখনকার রাজনৈতিক ও প্রজানৈতিক ব্যাপারে, তাহাদের কার্য্য এবং কার্য্য-উদ্ধারার্থে, আওয়াজ অত্যাবশ্যক। কেবল কামানের নহে, বাক্যের আওয়াজও বহুল ও বিলক্ষণ চাই।

আমাদের এই "জাতীয় জয়ঢাকে" তালে-বেতালে অনেক গতেরই সঙ্গত হয়, বিবিধ বাদ্যই বাজে। বাজে না কেবল পূর্ব্বকথিত দুই খানা বাজনা। ঐ দুই খানা বাজনা সম্বন্ধে ঢাকটি অত আওয়াজদার হইয়াও "ঢাকের পিঠের বাঁওয়ার মত" একেবারেই কানা, নিঃশব্দ। ঢাকের পিঠের বাঁওয়া নিজে বাজে না, অথচ উহা ঢাকের অপর দিকের আওয়াজের অপরিহার্য্য হেতু হয়।

ঢাকের পিঠে বাঁওয়া।

উহা নহিলে ঢাক ঢাকই নয়। কবি-উপমা এক বিন্দু অগ্রসর করিয়া বলিতে পারি, ভারতের মৌলিক ও মজ্জাগত প্রজাশক্তি কংগ্রেস-রূপ ঢাকের বামভাগের বামারৎ ব্যবহৃত। তাহার অস্তিত্বের ও নামের জোরে কংগ্রেস ঢাকে অন্যের দিকে বাদ্য হয়, তাহার নিজের দিকে এক বিন্দুও বাজে না। প্রজাশক্তির পূর্ণ ও পবিত্র নাম গ্রহণ করাতেই কংগ্রেস জীবিত আছে, নহিলে, প্রকাশ্যে না, গোপনে ধনকুবেরদিগের অকিঞ্চিৎকর অর্থসাহায্যে উহা এক দিনও বাঁচিত না। কিন্তু উহার উপরি-উক্ত নামগ্রহণ নিরর্থক। কংগ্রেস নির্ব্বাক প্রজার নাম নিরর্থক কেন নয়?

ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল কংগ্রেস তাহার বিগত (৯ম) বার্ষিক লাহোরী অধিবেশনে যখন বেরকমের বিস্তর বোল বাজাইয়াছে। বিস্তর বাজে বকুনিও বকিয়াছে। সে সব বোল আর বকুনি তাহার, এক দুই কবিয়া গণিয়া, এক কুড়ি মন্তব্য বা রেজলিউশনে ব্যক্ত। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন ও কমন্স প্রভার বৃটিশ পার্লামেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান হইতে বিহারী রায়তের মৃত্যুপ্রাত ও অন্তর্জলীকরণ পর্য্যন্ত মন্তব্যাবলীতে মূর্ত্তিমান। তাহাতে সথের-সেনা, সিবিল সার্ভিস, সিবিল মেডিকেল সার্ভিস, মিলিটারী খরচ, পুলিশ সংস্কার, নির্ব্বাচন প্রসার, বাণিজ্যের বেহা, বিনিময় সমস্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক চিজই আছে। তিন তিনটা রেজলিউসন কেবল এক ধন্যবাদ প্রদানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবশিষ্টের অধিকাংশই খোস-পোষাকী রেজলিউসন, এক আধখানা মন্তব্যে কাজের কথা, দেশের ও দশের প্রকৃত হিতের কথা যাহা এক আধটু আছে, তাহাও এত অনির্দ্দিষ্ট ও অনভিজ্ঞতাব্যঞ্জক যে, তদ্দ্বারা সংসারের কিছুমাত্রও কার্য্যসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব, গবর্ণমেণ্টের তাহা গ্রাহ্য ও গণনার মধ্যে আসা সম্ভবে না। কংগ্রেস ইহার অষ্টম ও দ্বাদশ মন্তব্যে দেশের দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু সে উল্লেখমাত্র, অনির্দ্দিষ্ট উদাসীন্যময় একটা ঢালোয়া বকমের কথা, উক্তি মাত্র। তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র উপকৃত হইবেন না; সুতরাং দুর্ভিক্ষপীড়ক দেশও হইবে না। দেশে, দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, সকলেই জানে, উপস্থিত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রাতেই জানেন, এবং তাহার দমনার্থে যথাসাধ্য এবং যথারীতি চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কংগ্রেসের প্রজানীতি এ সম্বন্ধে এমন একটা পাকা পরামর্শ দিউক না, যদ্দ্বারা রাজনীতির সহায়তা হয়। কিন্তু, কংগ্রেসের সে চিন্তাশীলতা নাই, অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যকারিণী কল্পনাও নাই। কংগ্রেসের অধিকাংশ উক্তিই কল্পনা, এরূপ নিরর্থক উক্তি কে গ্রাহ্য করে, তুমি আমিই করি না, তা গবর্ণমেণ্ট করিবেন কেন? এক একটা উক্তি কল্পিতে ও শুনিতে ভাল, কিন্তু মনুষ্যলোকে কার্য্যে পরিণত হইবার একান্ত অনুপযোগী, তাহাতে সে উপকরণের আদৌ অভাব।

তৃতীয় মন্তব্য, পুরাতন উক্তিরই পুনরুক্তি; কিন্তু পুরাতন বিষয়েও কংগ্রেস কোনও নূতন আলোক দিতে পারেন নাই। বয়ঃক্রমের সহিত লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে,—সকল বিষয়েরই বেশি বেশি জ্ঞান জন্মে; কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিছুমাত্রও জন্মিতেছে না; জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই; কারণ, দেশের অবস্থা এবং শাসনের আভ্যন্তরিক

পুরাতন ও নূতন মন্তব্য।

৯ম অধিবেশন, মন্তব্যাবলী।

অবস্থা সম্বন্ধে উহার আদৌ অনুসন্ধানের অভাব। এই রেজলিউসনের প্রথম কয়েকটা দফা, দেশের কোনও কোনও অভাব অভিযোগের কথা বটে; যথা লবণের কর, ইনকমট্যাক্স, আবগারি ও ফৌজদারি বিধি ইত্যাদি; কিন্তু, উহার শেষ দফাগুলা, যথা অস্ত্র-আইন, মিলিটারী কলেজ, মিলিসিয়া সার্ভিস্ ও বলন্টিয়ারিং, এক কথায় কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। চতুর্থ মন্তব্য, সিবিল মেডিক্যাল সার্ভিস,—সাইমলটেনিয়াস সিবিল সার্ভিসের সহোদর অথবা বৈমাত্রেয় হইবে। ১ম, ৫ম, ১৯শ, এবং ২১শ রেজলিউসনে ধন্যবাদ প্রদান। প্রথমে লর্ড ল্যান্সডাউন, পঞ্চমে পার্লামেণ্ট, সপ্তদশে নর্থব্রুক, ঊনবিংশে ওয়েডারবার্ণ, এবং বিংশে ফিন্লবাবির নির্ব্বাচকসম্প্রদায়। এই ধন্যবাদপ্রদানের কার্য্যটা একটা রেজলিসনে সারিলে কি বাসর-সজ্জার ব্যাঘাত হইত? দ্বিতীয় ও অষ্টাদশ মন্তব্যে, পঞ্জাবে ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট বসাইবার কথা, ৬ষ্ঠ ফৌজদারি শাসন হইতে ফৌজদারি বিচার বিভাগ কে পৃথক্ করিবার কথা, ৭মে বাণিজ্যের মেয়াদ। ৮ম ও ১২শ মন্তব্যের অল্প আভাস আমরা উপরে দিয়াছি। ৮ম মন্তব্য উপলক্ষে কংগ্রেস দেশের অসংখ্য উমেদারদিগের কথা উত্থাপন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু দেশের যে অতি বৃহৎ অভাব স্থূল দৃষ্টিতেও দেদীপ্যমান, তাহা কংগ্রেসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও ঠেকে না। উচ্চ ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে প্রতি বৎসর যে দেশে অপরিমিত উমেদার বৃদ্ধি হইতেছে, উপায়হীন, আশাহীন অতএব অসন্তুষ্ট এক জাতীয় লোকের সৃষ্টি হইতেছে, যাহারা রাজনীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই একটি বৃহৎ সমস্যার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উপায়বিধানের বিধিব্যবস্থা কল্পনা ও আলোচনা সম্বন্ধে কংগ্রেস উদাসীন। তাহা উঁহার দৃষ্টির অগোচর, বুদ্ধির অগম্য। অথচ তাহারাই উপস্থিত অবস্থায় দেশের অস্থিমজ্জা। দ্বাদশ মন্তব্যে শিক্ষা ও শ্রম সম্বন্ধীয় কথা আছে। কংগ্রেস উচ্চ শিক্ষা, নিম্নশিক্ষা উপরেই জোর দিয়াছেন; রায়ত সন্তানদিগের নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে নাই। কেনই বা কহিবেন? চাষী রায়ত, কুলি মজুরের সহিত বড়লোক কংগ্রেসের সম্বন্ধ কি? তাহাদের সম্বন্ধে পরোক্ষে যে কথা, তাহা তাহাদের সর্ব্বনাশেরই কথা। বিশেষতঃ, কংগ্রেস প্রবাণ কাও, কালেজ ও হাযার ক্লাশ স্কুলের কথাই তাহার পদোচিত, গ্রাম্য পাঠশালা কাযেই তাহার অগ্রাহ্য। তবে গ্রাম্যনির্ব্বাচনের জন্য সে লালায়িত বটে। নহিলে যে প্রতিনিধিত্ব হয় না। কেবল নির্ব্বাচনে আর প্রতিনিধিত্বেই দেশ উদ্ধার হইবে; কিন্তু নির্ব্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব প্রসাদের জন্য মূলে যে শিক্ষা প্রয়োজন, তাহার আবশ্যক। কংগ্রেস বুঝুক না বুঝুক, ইহা বোধ হয়, নিশ্চয় বুঝিয়াছে যে, দেশের লোকের—বিশেষতঃ রায়তসন্তানের চোখ কান ফুটিলে কংগ্রেসপ্রবর্তিত প্রজানীতির আদৌ ভরসা নাই।

কংগ্রেসের নবম মন্তব্যে অবশ্য আইনের কঠোরতার কথা, ত্রাসদায়ক শাসন ও বিচার বিভাগের সংঘর্ষসমস্যা। ১৪শ ও ১৫শ মন্তব্যে কংগ্রেস অস্ত্রের মিণ্ট ব্যবস্থা ও বিনিময়-বিভ্রাটে রাজপুরুষদিগের অতিপুরাণের প্রতিবাদ করিয়াছে। শেষোক্ত প্রতিবাদের কারণ-প্রদর্শন অপ্রয়োজন। কিন্তু, প্রথমোক্ত বিষয়ে কংগ্রেস কি কারণে প্রতিবাদ করিল, কিছুই বলিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট ভালমন্দ যাহা কিছু করুন, তাহাতে প্রাণপণ প্রতিবাদ করাই এখনকার রীতি, সুতরাং কংগ্রেস সে জটিল বিষয়ের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মিণ্ট ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছে. অথচ এই মিণ্ট আইন সৃষ্ট হইবার জন্য কংগ্রেসের কত কত লোক মেকাই-আইনে স্বাক্ষর করিয়াছিল!! তা কংগ্রেসের একপ আত্মবিরোধী ও অসঙ্গত ভাবের অভাব নাই। কংগ্রেসের সমবেত সভামণ্ডলী তাহাদের সর্ব্বপ্রধান মন্তব্যেই লর্ড ল্যান্সডাউনকে ধন্যবাদ করিলেন, আবার সেই কংগ্রেসের লোকেরাই দুই চারি দিন পরে উক্ত লর্ডকে অভিনন্দনপ্রদানপ্রস্তাবের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অপূর্ব্ব প্রজা পঞ্চায়েত! প্রতিনিধিদের এ অভূতপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিবে?

পরন্তু, কংগ্রেসের ১৬শ মন্তব্যে "বেগার" ও "রশদের" কথা। ইহা অতি উত্তম কথা। কংগ্রেসবিরোধী কোনও এক ব্যক্তির উক্তি হইতেই কংগ্রেস এ কথাটা পাইয়াছে বা পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে কি?

বেগার ও রশদ।

কংগ্রেস জানে কি যে, তাহার পৃষ্ঠবল ও পৃষ্ঠপোষক জমিদারের জমিদারীর মধ্যেই "রশদ ও বেগার" প্রথা বার মাস প্রবলভাবে প্রবাহিত, আর সরকারি কর্ম্মচারীদের সাময়িক শফরকালে জমিদার ও তাহার জরদস্ত কর্ম্মচারীরাই উহার অধিকতর প্রশ্রয় দেয় ও একটা "দাও" পাইয়া আপনারাও দশ টাকা করিয়া লয়? কংগ্রেস এ তথ্যের কোনও খবর রাখে কি? আর ইহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে সে সাহসী হইতে পারিবে কি?

আমরা দুইটি ব্যতীত কংগ্রেসের আর সমস্ত মন্তব্যেরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের বিশ্লেষণ ও সবিশেষ সমালোচনা করিলে কংগ্রেসের কার্য্যগতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আরও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা করিবার স্থান ও অবকাশ নাই, আর তাহা করিয়া ফলই বা কি? কিন্তু, এখনও উহার ১০ম ও ১১শ মন্তব্যের কথা কিছুই বলা হয় নাই। এই দুই মন্তব্যে এবারকার কংগ্রেস প্রজার বিপক্ষে,—বিশেষতঃ নির্ব্বাক নিষ্পাপ বিহারী রায়তের বিপক্ষে—মহা পাপ করিয়াছে।

প্রজানৈতিক মহাপাতক, পতন অবশ্যম্ভাবী।

এই মহাপাপেই কংগ্রেসের পতন ও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তা দু' বৎসর আগেই হউক, বা দশ বৎসর পরেই হউক। মুষ্টিমেয় ধনবান ও স্বার্থপরায়ণ লোকের করতলগত হইয়া, তাহাদের নীচ স্বার্থসিদ্ধি উপলক্ষে, তাহাদের ইচ্ছা ও অনুজ্ঞা মত অসৎকার্য্য করিয়া সরকার বাহাদুরের সৎকার্য্যে বাধা দেওয়া ও প্রজার পবিত্র নাম লইয়া ও সে নাম পাপকলুষে কলঙ্কিত করিয়া প্রজাপ্রাণবধের প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা কংগ্রেসের পক্ষে আর কি কলঙ্ক হইতে পারে?

দেশের দুঃখী রায়ত প্রকৃত কৃষিবল কংগ্রেসের খবর রাখে না, কংগ্রেস কি পদার্থ জানে না, যাহাতে তাহারা ক্রমে কংগ্রেসকে জানিতে পারিত, চিনিত ও মানিত, তাহা কংগ্রেস এত কালের মধ্যে (নয় বৎসর নেহাত কম কাল নহে) কখনও করেন নাই। পরন্তু দেশের যে সকল লোক দুঃখীদের খবর রাখে, কৃষিজীবি রায়তের মর্ম্ম কথা জানে ও প্রাণের ব্যথা বুঝে, প্রথমতঃ তাহারা ভাবিয়াছিল, কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রধানতঃ রায়তেরই ইষ্টসাধনও উন্নতি হইবে, কেন না, রায়তের উন্নতিই, প্রকৃত প্রস্তাবে, দেশের উন্নতি ও উদ্ধার সাধন,—তাহারা ভাবিয়াছিল, কংগ্রেস একটা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা বা "বিহার ল্যাণ্ড হোলডার্স" সমিতিতে পরিণত হইবে না, কিন্তু, তাহাদের এখন, এই বর্ত্তমান বৎসরেই, সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। তাহারা অতঃপর বিলক্ষণ রূপেই বুঝিয়াছে যে, জমিদারী নামধারী প্রকাশ্য জমিদার সভা বরং ভাল, কিন্তু প্রজাপক্ষীয়ের, নাম-ধারী গোপন জমিদারী সভা রূপ কংগ্রেস বড়ই ভয়ঙ্কর। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের আর কিছু মাত্র আস্থা নাই; কংগ্রেস এখন তাহাদের অতিশয় আতঙ্কেরই আস্পদ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস এখনই গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন ছিল না; এ বৎসর (উহার ১০ম ও ১১শ মন্তব্যে) অতিশয় অবিশ্বাসভাজনই হইল। কংগ্রেস অতঃপর দুইটা অযথার্থের মধ্যে, একটা যথার্থ কথা কহিলেও, সে যথার্থ কথাটাতে কর্ণপাত করিতে গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্তি হইবে না। ইহা কিন্তু তত বেশি ভাবনার বিষয় নহে, যত ভাবনা অপর দিকে।

রায়ত, গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস।

কংগ্রেস এখন যে পথে দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে উহা রাজার বিরক্তি-কর ও প্রজার

অনিষ্টকর। ধনবানের [illegible] পালিত হইয়া, নির্ধনের রক্ষণকার্য্যে উহা এখন গবর্ণমেণ্টকে পদে পদে বাধা দিবে। উহা, উহার অসৎ কার্য্যের সহায়তার জন্য বৃদ্ধ পার্লামেণ্টের, অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন, অব্যবস্থিতচিত্ত, অর্থপ্রলুব্ধ, অথচ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলোলুপ মেম্বরদিগকে নাচাইবে। এক দিকে এই, অপর দিকে নবীন ইণ্ডিয়া ও নব বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বরেরাও গবর্ণমেণ্টের (সব কার্য্যে সুতরাং) সৎকার্য্যের বিঘ্ন হইবেন; কেন না, ইহাঁরা কংগ্রেসেরই সৃষ্ট জীব। অতএব বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্যানুবোধে, ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া দুঃখী প্রজার স্বার্থ রক্ষা ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে অন্নবিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, সে চেষ্টা শীঘ্র ফলবতী হইবে না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল দেশের পক্ষে কি হইতে পারে?

কংগ্রেস,—রাজা ও রায়ত উভয়েই শত্রু।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বিগত এক শত বৎসরের অতীত ইতিহাস দেখাইয়া, জমিদারদের বর্ত্তমান ব্যভিচার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষ করিয়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সদ্বের শত শতটা নজির দিয়া, পরন্তু, বিহারী প্রজার দুঃখ দারিদ্র্যের অবিরল চিত্র আঁকিয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণে ও পরীক্ষাতে [illegible] জমিদারের অত্যাচার ও অতিশোষণ-জনিত প্রমাণীকৃত করিয়া ও রায়ত সম্বন্ধে জমিদারের জাল জুয়াচুরি হাতে হাতে ধরিয়া দিয়া, (Vide minute of the Bengal Government. September, 1893) চোখে আঙ্গুল দিয়া শাস্ত্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বিহার জরিপ করিয়া বাবতি সত্ব কায়েম করা একান্ত অনিবার্য্য প্রয়োজন নহিলে বিহারের চিরস্থায়ী অন্নকষ্ট কিছুতেই কমিবে না; পরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সদ্ অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, এই জরিপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঙ্গে একবিন্দুও আঘাত লাগা দূরে থাকুক, এ প্রকার জমাজমি নির্ণয় করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অঙ্গীকারের আনুষঙ্গিক। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ণকুহরে এই রায়তি স্বার্থসমর্থনের কথা প্রবেশ করিল না। গবর্ণমেণ্ট দুঃখীর দুঃখ দেখাইয়া, ন্যায়ের পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষ ও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজধর্ম্মানুসারে বলিলেন, টেনেন্সি আইনকর্ত্তা লর্ড রিপনের নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, বিহার জরিপে জমিদার ও রায়তের স্বার্থ, গবর্ণমেণ্টের নিজের কোনও আর্থিক স্বার্থ তাহাতে নাই, তবে পারমার্থিক স্বার্থ আছে, সে পারমার্থিক স্বার্থ "মনুষ্যজাতির দুঃখ-পতিত মনুষ্য-সাধারণের দুঃখক্লেশ নিবারিত বা হ্রাসীকৃত করা,—"The diminution or prevention of human suffering"

রায়তের স্বার্থ, গবর্ণমেণ্টের নিজের কোনও আর্থিক স্বার্থ তাহাতে নাই, তবে পারমার্থিক স্বার্থ আছে, সে পারমার্থিক স্বার্থ "মনুষ্যজাতির দুঃখ-পতিত মনুষ্য-সাধারণের দুঃখক্লেশ নিবারিত বা হ্রাসীকৃত করা,—"The diminution or prevention of human suffering"

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়,—বিহার জরিপ।

এ কথা লর্ড রিপনের নিজ মুখে উচ্চারিত কথা। এ কথায় তখন যাহারা কান দিয়াছিল, তখন যাহারা এই কথা অনুসারে কার্য্য করিতে অনুশাসন হইয়াছিল, লর্ড রিপন প্রদত্ত আত্মশাসনপ্রাপ্তির পর তাহারাই এ কথার প্রবল প্রতিবাদ করিতেছে! হা আত্মশাসন। হা আত্মসম্মান। হা লর্ড রিপন! হা মিঃ ব্রাডলার প্রেতাত্মা! ব্রাডলা, তুমি এ পৃথিবীতে শরিয়ৎ প্রজার হিতার্থে জন্মিয়াছিলে। পরলোক হইতে তোমার প্রেতাত্মা বারেক দেখুন, তোমারই খাড়া আইনের নির্ব্বাচিত সভ্যেরা রায়তকুল ধ্বংসের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত। লর্ড রিপন, তুমি ত আজও এ জগতে জীবিত, একবার বিচার কর না প্রভু,—তোমারই সৃষ্ট আত্মশাসন অহঙ্কারী জীবেরা তোমার প্রাণপ্রিয় রায়তবংশের সর্ব্বনাশসাধনে ব্যস্ত। তুমিই ত প্রভু টেনেন্সি এক্ট তৈয়ার করিয়া গিয়াছিলে, আর তাহাতে জমাজমি জরিপ করিয়া "রেকর্ড অব রাইট" প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলে! আর তোমারই সময়ে ত ঐ সব লোকের অনেকেই তোমার টেনেন্সি বিল সমর্থন করিয়াছিল। সে আজ কয় বৎসরেরই বা কথা?

বিপণ ও ব্রাডলা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বহুতর প্রমাণে প্রমাণিত করিয়া বলিলেন,—বিহার জমিদারেরা "are rich, active and influential and amid the often refuted contentions which they attempt to revive, the true issues are apt to be lost sight of, and the voice of reason and justice to remain unheard. এ কথাও কংগ্রেসের কর্ণকুহরে ঢুকিল না। ন্যায় ও বিবেকের বাণী,—Voice of reason and justice সম্বন্ধে জমিদারেরা যেমন বধির, কংগ্রেসও কার্য্যগতিকে তেমনি "বন্ধ কালা" * সুতরাং আমরা অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাহিত্যে যে সন্দেহ ও শঙ্কা করিয়াছিলাম, কংগ্রেস তাহাই করিল। কংগ্রেস তাহার ১০ম মন্তব্যে বিহার রায়তের সর্ব্বনাশসাধনে নিজ মৃত্যুর বীজ বপন করতঃ লিখিয়াছে,—

১০ম ও ১১শ মন্তব্য,—উপসংহার।

"Express the profound alarm which has been created by the action of the Government in interfering with the existing parmanent settlement in Bengal and Behar, by the introduction of the suing and other cases) ইত্যাদি।

মাদ্রাজী বন্দোবস্তের [illegible] বাঙ্গালা বন্দোবস্তের অন্তর্গত নহি; অতএব সে সম্বন্ধে কোনও কথা কহিব না, কংগ্রেসের কথাও উদ্ধৃত করিলাম না। পরন্তু, বাঙ্গালাতেও এখন জরিপ হইতেছে না, জরিপ হইতেছে—বিহারে; তবে বাঙ্গালা ও বিহারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একই বটে। বিহারে জরিপ করিলে, তজ্জন্য বাঙ্গালার গায় ব্যথা লাগিতে পারে। কিন্তু, এই জরিপ ব্যাপারে, [illegible] কাহারই বন্দোবস্তের গাত্রে ত ব্যথা লাগেই না। তবে এই কল্পিত ব্যথার আরোপ কেন? এ ব্যথাটা তোমরা কেহ প্রমাণ করিতে পার কি কংগ্রেসওয়ালা? বিগত অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মাদুজাই নৌরজী হইতে নিঃ মূল্যহীন "নোবডি" ডেলিগেট বাবুদিগকে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। চিরবন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ হইতেছে কিসে? সনন্দ ও রিপোর্টের প্রতিজ্ঞা অথবা সনন্দপত্রের সর্ত্ত ভঙ্গে, খুলিয়া বলুনই না কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদীর্ঘ সাহিত্য কংগ্রেসের কেহ কখনও পাঠ করিয়াছে কি? তাহার অঙ্গীকার ও সনন্দপত্র কখন স্বচক্ষে দেখিয়াছে কি? স্যর রোপার লেথব্রীজ হইতে ইণ্ডিয়ান সিভিলের মূর্খ লেখক পর্য্যন্ত বহুলোকই ত চেষ্টা করিতেছে, দ্বারভাঙ্গার রাজা, তাঁহার ম্যানেজার বেল সাহেবকে দিয়াও ত মিনিট লেখাইয়াছেন, জরিপ ও রেকর্ড অব্ রাইটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মারা পড়ে, কই অদ্যাবধি ত কেহই দেখাইতে পারে নাই, তবুও কংগ্রেস অন্ধ হইয়া অমন মন্তব্য কেন করিল? কেন করিল, তাহা জানি, করিল কার্য্যগতিকে।

একাদশ মন্তব্য ও নথর মন্তব্যেরই "কনক্লুসন"। মানে,—"সব লাল হইয়া যাউক, যত জমি আছে, সবই জমিদারের হউক, এক-বিন্দু ভূঁইও যেন অন্যের না থাকে। বাযত জমিদারের গাড়ী, জুড়ী ও ভুড়ীর জন্য অনন্তকাল গাবার খাটুনী খাটুক," ইহাই কাংগ্রেসিক প্রজানীতির অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য।

* সাহিত্য অগ্রহায়ণ ১৩০০ সাল, ২৫৬ পৃষ্ঠা, ৩য় প্যারা।

সাহিত্য,—শ্রমসমস্যা।

সাহিত্যাখিকারে, কাব্য-কবিতা, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, চিত্র-চরিত্র, বিশ্রাম-বিলাস সাধারণতঃ আলোচিত হইয়া থাকে। দুঃখ-দয়া পাপ-তাপ, পুণ্য-পবিত্রতা, করুণা-কাঠিন্যও সচরাচর আলোচিত হয়। কিন্তু সাহিত্যের সহিত শ্রমের সম্বন্ধ কিরূপ, সংসার ও জীবনের সহিতই বা শ্রমের সম্পর্ক কেমন? শ্রমের উপকারিতার আনুষঙ্গিক কোনও উপকারিতা আদৌ আছে কি না,—যদি থাকে, তবে সে কিরূপ অপকারিতা? সাহিত্য-সূত্রে শ্রমের বিষয় এবার আমাদের আলোচ্য।

সাহিত্য ও শ্রম।

শ্রমসম্বন্ধে, বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকের, [illegible] দুই অগ্রগণ্য নবেলিষ্ট কবির, পরস্পরবিরোধী অভিমত [illegible] এ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শ্রমের সুফল ও কুফল, উভয়ই সবিশেষ ব্যাখ্যাত হইবে; পরন্তু, একই বিষয়ে দুই সুচিন্তাশীল, বিশিষ্ট এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি, দুই দিক দিয়া বিচার করিয়া কিরূপে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহাও বিলক্ষণ বুঝা যাইবে। এই নবেলিষ্ট কবিদ্বয়ের এক জন ফরাসী, অপর রুষ;—প্রথম এমিলি জোলা, দ্বিতীয় কাউণ্ট টলষ্টয়।

শ্রম ও নবেলিষ্ট কবি।

এমিলি জোলা ফরাসী নবেলিষ্ট, প্রাচীন পন্থিটিবিষ্ট। এমিলি জোলার উপন্যাস এখানে অনেকেই পড়িয়া থাকেন; ইহাঁর পুস্তিচয় আমরাও [illegible] দিয়াছি। প্যারিস "ছাত্র সমাজ"কে সম্বোধন করিয়া শ্রমধর্ম্ম প্রচার ও শ্রমের [illegible] উপকারিতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। শ্রমের উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা অবশ্য আবহমান কাল হইতে প্রচলিত সাধারণ সত্যেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু তথাচ এ প্রতিধ্বনিতেও প্রতিভা-লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। এমিলি জোলা ঐকান্তিকতাসহকারে কহিতেছেন,—

"যুবকবৃন্দ, শ্রম-ধর্ম্মে বিশ্বাস কর, আমি তোমাদিগকে বিনীতে বলিতেছি। যুবকবৃন্দ! শ্রম কর, শ্রম কর, আমি তোমাদিগকে আন্তরিক স্নেহে, আদরানুনয়সহকারে কহিতেছি। শ্রম কর, কল্যাণ হইবেই হইবে।"

"আমার এ উপদেশ, আমার এই পরামর্শ পুরাতন,—অতি পুরাতন. জীর্ণ, জরাগ্রস্ত, আমি জানি। কিন্তু তথাচ, তত্রাপিও আমি, তোমাদিগকে উপদেশ দিতে, অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি যে, তোমরা এ পরামর্শ পালন কর, এ পরামর্শের প্রতি মনোযোগ দাও, এ বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে চিন্তা কর। আমি আমার আত্মজীবনের কথাও তোমাদিগকে কহিতে সাহস করিতেছি। আমি আর কিছুই নহি, কেবল মাত্র জনৈক শ্রমকারী। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি আমার জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ, সুকঠিন শ্রম হইতে কি অধিক পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। কষ্টের জীবন কঠোরতার আমি সংসারে প্রবেশ করি,—আমার জীবন-কার্য্য আরম্ভ হয়। দুঃখ দারিদ্র্যের প্রচণ্ড প্রকোপ আমার জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে; নিরাশার নিদারুণ দংশন আমি অনেক সহিয়াছি। দুঃখ কষ্টের বিষয় আমি বিলক্ষণই জানি,—প্রথম জীবনে বিলক্ষণই তাহাতে জ্বলিয়াছিলাম। উহার পরে আমি যে জীবন যাপন করিয়াছি, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে এক যুদ্ধময় জীবন,—সেই বিষম যুদ্ধময় জীবন আমি

সুদীর্ঘ শ্রম,—এমিলি জোলার আত্মজীবনী।

অদ্যাপিও বহন করিতেছি,—আমি নিন্দিত, ঘৃণিত, কুৎসা ও গ্লানিতে আচ্ছন্ন, আবৃত। এই জীবন-যুদ্ধে, সংসারসংগ্রামে, এত নিন্দা, এত কুৎসা, এত গ্লানি-গঞ্জনা, এত নির্য্যাতন-নির্য্যাতন, লোকের এত বিষ-দৃষ্টির মধ্যে, আমার একমাত্র বিশ্বাস বজায় আছে, এক-মাত্র দুর্গ অটুট আছে। আমার এই বিশ্বাস,—শ্রম; আমার এই অটুট দুর্গ,—কার্য্য। শ্রমই আমি সর্ব্বসহিষ্ণু হইয়াছি; কার্য্যই এই জীবনসমরে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। যে সুবৃহৎ শ্রম, দুর্জ্জয় খাটুনি, আমি আপনি আপনার উপর অর্পণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি টিকিয়া আছি। ঐ সম্মুখে,—সম্মুখে আমার,—আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার আসল গন্তব্য স্থল, আমার উদ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট নিশান,—ঐ নিশান লক্ষ্য করিয়াই আমি ছুটিয়াছি, অনবরত অবিশ্রান্ত ছুটিয়াছি। যখন জীবনযাতনা, জীবনের বিঘ্নবিড়ম্বনা আমায় নির্ব্বল করে, অবসাদে অবসন্ন করে;—এ নিশান, নিশানই আমায় পুনর্জ্জীবিত ও পুনরুদ্যমী করে, উহা আমায় পুনর্ব্বার বল দেয়, জীবনী-শক্তি দেয়, সাহস, সামর্থ্য ও উৎসাহ দেয়, আমি গন্তব্য স্থল উদ্দেশে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকি।"

শ্রম,—অস্ত্র, কার্য্য,—দুর্গ।

"আমি যে কার্য্যের কথা কহিতেছি, ইহা দৃঢ়, নির্দ্দিষ্ট নিরূপিত কার্য্য;—ইহা প্রাত্যহিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। ইহা নিজের উপর নিজে নির্দ্দিষ্ট এবং অর্পিত কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কার্য্য প্রতি প্রহরে, প্রতি মুহূর্ত্তে, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়, এক এক পাদ ফেরিয়া অগ্রসর করে।"

নির্দ্দিষ্ট দৈনিক শ্রম।

এক এক দিন জীবনজ্বালায় জর্জ্জরিত, শারীরিক ও মানসিক যাতনায় দেহ মন অবশ, অবসন্ন, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে, পৃথিবীভর ভিন্ন গ্লানির গুরুভার বহিতে পারিতেছি না, দেহ দমিয়া গিয়াছে, চাঞ্চল্যসাগরে চিত্ত ডুবিয়া রহিয়াছে,—প্রাতঃকালে কাজ করিতে বসিলাম, হাত চলে না, তবুও চালাইতেছি; অল্প কয়েক মিনিটমাত্র কাজ করিতে করিতেই একটু শোয়াস্তি আসিল, কিছু শান্তি হইল। কাজ করিয়া উঠিবার পর, এত সন্তাপ সত্ত্বেও সান্ত্বনা পাইয়াছি। তখনও গ্লানি যাতনা হয় ত আছেও, কিন্তু তবুও সুখ শোয়াস্তি আরাম বোধ করিয়াছি। এমন কত দিন হইয়াছে, কত কত দিনই হইয়াছে।"

শ্রমে, স্বাস্থ্য।

"যুবকবৃন্দ, স্মরণ রাখিও যে, শ্রম এ পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়ম, শ্রমই সংসারের সর্ব্বময় ব্যবস্থা। শ্রমই কৃষ্ট পদার্থকে জীবনের উদ্দিষ্টের দিকে লইয়া যায়। মনুষ্যজীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই, কারণ নাই, অর্থ নাই; অভিপ্রায় এবং অর্থ এবং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সকলেই ইহসংসারে স্ব স্ব জীবনের শ্রম ও নিরাশার অংশ নির্দ্দিষ্ট করিব।"

সংসারের সর্ব্বময় আইন,—শ্রম।

"যিনি যে ব্যথায় ব্যথিত হউন, যে দুশ্চিন্তায় দুঃখিত হউন, যে উদ্বেগেই উদ্বিগ্ন হউন, শ্রমে শান্তি পাইবেন, আরাম অনুভব করিবেন। এমন অনেক লোক আছেন, আমি জানি, যাঁহারা অনন্তের এবং অজ্ঞেয়ের চিন্তায় অস্থির, অসুস্থ, উদ্বিগ্ন, এরূপ লোকদিগকেও আমি পরামর্শ দিতেছি যে, তাঁহারা এমন কোনও সুদীর্ঘ শ্রমসাপেক্ষ সুবৃহৎ কার্য্য গ্রহণ করুন, যাহা তাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত রাখে, এবং যাহা তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে সমাধা না হয়। শ্রম তাঁহাদের অমিতাচারী মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য সাধন করিবে। শ্রম সামঞ্জস্যসাধক, শ্রমে মনুষ্য মেজাজের তরল ঠিক রাখে, কোনও দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় পতিত হইতে দেয় না।"

শ্রমে শান্তি, সামঞ্জস্য।

"সাম্যবাদের উত্থান এবং উন্নতি কি বিধান করিয়াছে, দেখিতেছ না? বিধান করিয়াছে,

সাম্যবাদ ও শ্রম।

শ্রম,—শ্রম—শ্রম। সকলের পক্ষেই শ্রম বিধি। যুবকবৃন্দ, জীবনের কার্য্য আরম্ভ কর; পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হও। সাংসারিক অবস্থা যতই ক্ষুদ্র হয় হউক, সকলেরই জীবন-কার্য্য, জীবনশ্রম সংসারে সমান উপকারী। শ্রমে সত্য পথে রাখিবে, সন্তোষের পথে রাখিবে, জীবনকে দণ্ডায়মান রাখিবে; দমিতে দিবে না। বিজ্ঞানে বিশ্বাস কর, শ্রমে বিশ্বাস কর; শ্রম কর।"

কাউণ্ট টলষ্টি রুষ নবেলিষ্ট। এমিলি জোলার বিজ্ঞানবাদ ও শ্রমবাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিয়াছেন। কাউণ্ট এই মর্ম্মে কহেন:—

বিজ্ঞানে বিশ্বাস সম্ভবে না।

"এমিলি জোলা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে কহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে সবিশেষ বিশ্বাস কিরূপে সম্ভবে? বিজ্ঞানের নিজেরই স্থিরতা নাই, সময়ের পরিবর্ত্তনে স্থায়িত্বও নাই। বিজ্ঞান তাহাদের স্বভাবে এবং শ্রেণী-সংসারে পরস্পরে বিরোধী, স্বতঃ অস্থির এবং অস্থায়ী। যাহা অস্থির ও অস্থায়ী, তাহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস, আদৌ কোনও বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। পরিশ্রমই বা কেমন করিয়া একটা সত্য ধর্ম্ম হইতে পারে? পরিশ্রম পুণ্য কার্য্য, ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যই হই। শ্রম স্বভাবতঃ অন্যায় ও অসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রম পুণ্যস্বরূপ কিসে? তাহা হইলে আহারের পুষ্টিকারিতাও একটা পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে।"

শ্রম সত্যধর্ম্ম নহে।

"এমিলি জোলা বলেন, 'শ্রমে মানুষকে সত্যপরায়ণ ও ক্ষমার্দ্রচিত্ত করে।' আমি কিন্তু ইহার বিপরীতই দেখি। জোলার কথায় আমার ঐতিহাসের পিপীলিকার কথা মনে পড়ে। পরিশ্রমে পরিশ্রমে পিপীলিকা যেমন পাষাণ কঠিন হয়, অতি শ্রমে মনুষ্যহৃদয়ও তেমনি বর্ম্মের হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, অতি দুর্বৃত্ত নরপিশাচেরাও ত দেখি দিবারাত্রি অনবরত শ্রম করিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত তাহাদের কার্য্য বা অকার্য্য হইতে বিশ্রাম নাই। তবুও বলিবে, শ্রম স্বভাবতই একটা অতি সৎকার্য্য?"

শ্রমের অপকারিতা কুফল।

কাউণ্ট টলষ্টি পুনশ্চ বলেন:—Labour is not only not a virtue, but in our falsely organised society it is mostly an anæsthetic remedy like smoking or wine, to hide from oneself the irregularity and depravity of our life. When am I to discuss philosophy, morality and religion with you? I must publish a paper having half a million subscribers, I must build the Effel Power, organise the Chicago Exhibition, dig the Panama canal, finish writing the twenty-eighth volume of my works, my opera, finish painting my picture.

"শ্রম পৃথক একটা পুণ্যকর্ম্ম ত নহেই; বরং বর্ত্তমান সমাজের অবস্থানুসারে উহা পুণ্যকর্ম্মের হন্তারকই হয়। লোকে যেমন তামাক ফুঁকিয়া মদ খাইয়া মনের গ্লানি আবৃত করে, শ্রমের দ্বারাই ত দেখিতে পাই, সেইরূপ করা হয়। আমি দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা কখন করিব? ধর্ম্মসাধনই বা কেমনে করি; সময়াভাব। সংবাদপত্র আমার অবশ্যই বাহির করিতে হইবে, তাহার এক লক্ষ্য গ্রাহক।' আমাকে আজ ইয়েল-টাওয়ার তৈয়ার করিতে হইবে, কাল সিকাগোর মেলা সাজাইতে হইবে, পরশ্ব পানামা কেনাল কাটিতে হইবে। আমাকে আমার গ্রন্থের অষ্টাবিংশ বালাম বাহির করিতে হইবে, নাটক লেখা ও পিক্‌চার আঁকা সমাপ্ত করিতে হইবে। অবিশ্রান্ত শ্রমে ইদানীং এত্যন্ত সময়াভাব। প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম

উপস্থিত সংখ্যায় বৌদ্ধ-গ্রন্থ সমিতির কার্য্যবিবরণ এবং লব্ধাতীত অনেকগুলি প্রবন্ধ, পত্র, পদ্য, গদ্য পদ্যের অনুবাদ ও পরিশিষ্টে বিবিধ বৌদ্ধ তত্ত্ব আছে। পুনর্জ্জন্মবাদ, সংসারচক্র, প্রাণিলোক, প্রেতলোক ও বৌদ্ধ নরক প্রভৃতি প্রবন্ধ পুরাতনতত্ত্বপিপাসু পাঠকবর্গের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ। ঐ সংখ্যায় বৌদ্ধসম্প্রদায় চতুষ্টয় ও তাহাদের অষ্টাদশ শাখার নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে ও বোধিপথ ধারাবাহিক ভাবে চলিয়াছে, এবং 'ধর্ম্মপদম্' মৌলিক কবিতা সটীক প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক কোনও কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বও এ সংখ্যায় বিষয়ীভূত। ইহার প্রতি পত্র জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের গদ্যানুবাদ (ইংরেজী) সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী। বৌদ্ধ নরক বড়ই ভয়ানক, তবে হিন্দু ও খৃষ্টীয় নরকও ভীষণত্বে কম নহে। এই পত্রের বিষয়ীভূত তত্ত্বনিচয় এত গভীর এবং বিস্তৃত যে, অল্পকথায় তাহার কোন একটিও বিবৃত করা অসম্ভব; সুতরাং আমরা তাহাতে নিরস্ত হইলাম। এই পত্রের পাণ্ডিত্য ও গুরুত্বের কথা ছাড়িয়া দিলাও ইহা বলা যাইতে পারে যে, পাঠশ্রিয় প্রতি মাত্রেরই ইহা সবিশেষ প্রলোভনের জিনিস। ইহার প্রত্যেক পংক্তিই প্রাচীনত্বের অভিনব ভাবে চিত্তাকর্ষণ করে। তবে একটি কথা আছে। কথাটি এই যে, এই—সকল প্রাচীন বৌদ্ধ তত্ত্ব,—বিশেষতঃ ইহার আধ্যাত্মিক ও পৈশাচিক অঙ্গ, অল্পাধিক আধুনিক আলোকে উজ্জ্বলীকৃত বা বিশ্লিষ্ট করিয়া না বুঝাইতে পারিলে, শঙ্কা হয় সাধারণ-বুদ্ধিতে অলীক উপন্যাসবৎ প্রতীত হইবে। পৌরাণিক উপন্যাসে ও অদ্ভুত রসে যতটা চিত্তাকর্ষণ করে, তাহার অধিক আর কিছু করিতে পারিবে, এমন ভরসা হয় না।

৩। The chaitanya Library Journal. Edited by Rev. Alex. Tomory. M. A. vol. I Part I. December 1893.

এ সংখ্যায় মিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সমালোচনাসম্বলিত মিঃ প্রমথনাথ বসুর "হিন্দু ও বিলাতি সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা, একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, কয়েকটি "বিবিধ বক্তব্য" ও "বৈজ্ঞানিক টীকা টিপ্পনী" আছে।

মিঃ বসুর বক্তৃতাটি তাঁহার সবিশেষ চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচায়ক। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তিনি হিন্দু ও ইংরেজ সভ্যতার সমালোচনা করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, হিন্দু সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা ও বিষয়বৈরাগ্যমূলক, পরন্তু ইংরেজী সভ্যতা শ্রম ও বিষয়বাসনাময়ক। একে নম্রতা-সরলতা, বিষয়-বিরক্তি,—বৈরাগ্য, অপরে সম্পদ, বৈভব, সংসারিক উন্নতি। বক্তার বিবেচনায়, এই দুয়ের সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সুপরিমিত সংমিশ্রণের উপরেই এ দেশের এবং এ দেশীয়দিগের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে। বক্তৃতা বলেন, বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে এই দুই সভ্যতার অল্পবিস্তর সামঞ্জস্য হইতে আরম্ভ না হইয়াছে, এমত নহে। এ স্থলে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন,—

A Hindu of Hindus in many of the distinctive traits of his character, he had much of the grit made of the Englishman in him. He was active, persevereing and resolute. He saught to remove the defects of the Hindu society with English energy. He acquired an immense fortune. He worked hard like an Englishman for it. But he spent it like a Hindu, not on his own comforts and luxuries or those of his family but on charitable objects. Simple and self-sacrificing he spent what he earned in relieving distress, in feeding, clothing and educating those that stood in

need of food and clothing and education. &c. &c. &c. অর্থাৎ, হিন্দুর হিন্দু হইয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় আদর্শ ইংরেজের উৎকৃষ্ট অংশের অধিকারী ছিলেন। শ্রমপটু, কার্য্যকুশল, অধ্যবসায়শীল, সুদৃঢ়চিত্ত,—বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজানুরূপ উৎসাহ উদ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজের ন্যায় অতি কঠিন শ্রমে অর্থ-রাশি উপার্জ্জন করিয়া, হিন্দুর মত মুক্তহস্তে সে অর্থ দুঃখীর দুঃখবিমোচনার্থে ব্যয় করিতেন। সবলম্বভাব এবং আত্মত্যাগী, নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের সুখ, স্বচ্ছন্দ, বিলাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল পরদুঃখ, পরের অভাব বিমোচনে, অন্নদানে, বস্ত্রদানে ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ব্যক্তি ও জাতি নির্ব্বিশেষে প্রবাহিত হইত। এক দিকে ইংরেজী সভ্যতার শ্রম, উদ্যম ও অপর দিকে হিন্দু সভ্যতার আত্মত্যাগ, বৈভববৈরাগ্য; বিদ্যাসাগর মহাশয়ে মিলিত হইয়াছিল।

ইংরেজীসভ্যতা-হিন্দুসভ্যতাকে যে পরিমাণে অনুশাসন করিতেছে, হিন্দুসভ্যতা ইংরেজী-সভ্যতার উপর সে পরিমাণে প্রভাব দেখাইতে পারিতেছে না কেন, তাহার কারণ বক্তা অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পরন্তু বিলাতি সভ্যতা হিন্দুসমাজে প্রবেশ না করিয়া, উৎকৃষ্টের স্থান যে সকল অপকৃষ্ট ফল উৎপন্ন করিতেছে, তাহাও এই বক্তৃতায় বিজ্ঞ-হিন্দু-উচিত ভাবে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্তার সহৃদয়তা, সুশীলতা এবং নিরপেক্ষতা তাঁহার চিন্তা-শীলতারই সমান। এ বক্তৃতা বহুল পরিমাণে পঠিত হওয়া উচিত, ইহার বঙ্গানুবাদ হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বথা শিক্ষাপ্রদ। বিশেষতঃ, দেশী বিলাতী সভ্যতার এই সুতীক্ষ্ণসংঘর্ষণসময়ে।

এ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিও শিক্ষাপ্রদ ও মনযোগযোগী। ইহা যে মনযোগযোগী, তাহা বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় নিজে বিশেষ না জানিলেও না জানিতে পারেন। জানুন বা না জানুন, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তিনি এই সময়োপযোগী প্রবন্ধটি লিখিয়া বসিয়াছেন। সময়োপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু এ প্রবন্ধের সরলভাবে বিবৃত প্রস্তাব কি কেহ প্রস্তুত? আর সে শিক্ষানুসারে কার্য্য করিতে কি কেহ সম্মত? হায় তাহা নহে। ইহাই বড় দুঃখ। নহিলে, নবীন যুবক নহে, আমাদের পরিণতবয়স্ক প্রজানৈতিক "পলিটিসিয়ন"রাও মিঃ টমরীর এই প্রবন্ধে অনেক শিক্ষা পাইতেন; রাজনৈতিক সংবাদপত্র সম্পাদক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি নামধারী সভাসমিতিরও ইহা শিক্ষাস্থল হইত; স্বয়ং কংগ্রেসের কর্ত্তব্যনীতি ও কার্য্যকলাপ এতদ্বারা নিয়মিত হইতে পারিত।

মিঃ টমরীর এই প্রবন্ধটির নাম "The Relation of Ethics to Public Life." অর্থাৎ "সাধারণের কার্য্য-রথ-সারথিদের জীবন-চরিত্রের সহিত সুনীতির সম্বন্ধ বিচার।" চৈতন্য-জর্নাল-সম্পাদক মিঃ টমরী, এ বিচার বিশদরূপে করিয়াছেন।

সাধারণের কার্য্যরথের পরিচালক সারথি কাহারা? রাজা, রাজকর্ম্মচারী, পার্লামেণ্টের মেম্বর, সাধারণতন্ত্রের সেনেটের প্রজাতান্ত্রিক সভাসমিতি, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সভাসমিতির সভ্য-সদস্য, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন, সাধারণ কার্য্য-রথের এই সকল সারথিগণের চরিত্র যদি সুনীতিপ্রবণ, ও সুনীতি-পরিচালিত না হয়, এক কথায় ইহারা যদি সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ না হন, প্রলোভনে পরাজিত ও অর্থে ও উৎকোচে আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে প্রকৃতিপুঞ্জের পদে পদে বিপদ, জন-সাধারণের সর্ব্বনাশ হয়। পরন্তু, সাধারণ কার্য্যের পরিচালকদিগেরও পতন হয়। কলঙ্ক কেলেঙ্কারী বাহিরার স্থান থাকে না। দৃষ্টান্তচ্ছলে রেবারেণ্ড টমরী সহযোগী ইতিবৃত্তের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে দিনকার ফরাসী ব্যভিচার,—পেনামা-কেনাল-সংক্রান্ত বিরাট উৎকোচব্যাপার, সত্যের তীব্রোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তিনি আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের উদাহরণ দিয়াছেন। আমেরিকার public life আজও পঙ্কিল। ইংলণ্ড এখন অনেকটা সংস্কৃত হইয়াছে। পার্লামেণ্টারী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকদিগকে উৎকোচ দান নিবারণ কল্পে কঠিন আইন হইয়াছে, পরন্তু, লাম্পট্য ব্যভিচার অপরাধে পার্ণেল ও ডিল্‌কির public lifeএর দুর্গতি, ইংলণ্ডের এ সম্বন্ধীয় উন্নতির দৃষ্টান্তস্থল। লেখকের কথা প্রকৃত। ইংলণ্ড এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নৈতিক উন্নতির এখনও অনেক বাকী। উৎকোচাদি ব্যতীত আরও অনেক জিনিস আছে, যদ্দ্বারা public life পঙ্কিল হইতে পারে। এ মুহূর্ত্তে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ও বৃটিশ প্রেসে তাহা হইতেছেও। অর্থে না উৎকোচে না হইতে পারে, অজ্ঞতায়, আহাম্মুকিতে, যশোলিপ্সায় বা তোষামোদ তদ্বিরে,—চক্ষুলজ্জায়, চাটুকারিতায়, বা স্বার্থপরতায়—কুঅভিসন্ধি-চতুরতায় তাহা হইতেছে। ইঙ্গিতে উদাহরণ "বিহার কেডাষ্ট্রাল সার্ভে"। কি কারণে, কোন জ্ঞানে ও নীতি অনুসারে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের কোনও কোনও মেম্বর ও বৃটিশ প্রেসের কোনও কোনও লেখক এই সার্ভে ব্যপদেশে ধনাঢ্য জমিদার পক্ষের অবিশ্রান্ত ওকালতি ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সৎকার্য্যের প্রবল প্রতিবাদ করিয়া দরিদ্র বিহারী প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশসাধনে সংকল্প করিয়াছেন ও আপনাদের public life পঙ্কিল করিতেছেন? বিহারি জমিদারের "ব্রিফ" ভিন্ন তাঁহারা এ বিষয়ের কোনও বার্ত্তাই ত জানেন না। তাঁহারাও জানেন না, আমাদের এখানকার কার্য্য-রথী কংগ্রেসওয়ালারাও জানেন না। অথচ অনায়াসে দক্ষিণ হস্তে করিয়া "পাবলিক লাইফে" পাপ-পঙ্ক মাখিতেছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজেই এ ব্যাপারে মুখ ফুটিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"The story of the hardships of the Behar peasant is a thrice-told tale which it would be unnecessary to repeat, were it not that we have on the side of the raiyats nothing but ignorance, poverty and helplessness, while we have on the side of the Zemindars education, wealth and power and *all the trained intelligence and advocacy that wealth can purchase*". (the italics are ours.)

অর্থের দ্বারা অসৎ অভিসন্ধি যতটা অগ্রসর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইতেছে। আর এই trained intelligence ও advocacyর অন্তর্গত আমাদের সাধারণ কার্য্যরথের সারথিগণ। কিন্তু আমরা বলি, কেবল বিহার জমিদারের welth নয়, সারথিদিগের স্বার্থপরতাও নয়, সুতরাং সুনীতির সম্যক্ অভাবও নয়,—তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা, চক্ষুলজ্জা ও বিহার জমিদারের চতুরতা ইহার জন্য দায়ী। যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা public life পাপযুক্ত হইতেছে।

মিঃ টমরী ইংলণ্ডের public lifeএর সদৃষ্টান্ত দিয়া, এ দেশীয়দিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি উপসংহারে লিখেন;—

There is no hope for the man or the body of men, for the institution or the country that tampers thus with moral principle and that glosses over inmorality with the veneering of apparent success. Sooner or later, the doom of the morality in efficient will overtake him or them, and the moral canker will by its own law of development result in disease and death.

এ কথা কয়টি ব্রহ্মমন্ত্রের মত আমাদের "সারথি"দের সর্ব্বথা স্মরণীয়। এ দেশে এখন public lifeএর অঙ্কুরমাত্র। এখনি তাহা আবর্জ্জনা কণ্টকে আচ্ছন্ন ও কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হইলে, পরাজিত জাতির public lifeএর আশা আদৌ থাকিবে না।

৪। The Calcutta University Magazine, Edited by the secretaries of the Society for the Higher training of young men. Vol I. Part 1, January 1894. এই অভিনব মাসিকপত্রের আবির্ভাবে আমরা আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়াছি। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির এত কাল কোনও পত্র পত্রিকা ছিল না, এই পত্র য়ুনিভার্সিটীর উচ্চ নামে অলঙ্কৃত, উচ্চতর-নীতি-সঞ্চারিণী-সভার সম্পাদকদিগের কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অতএব বলা বাহুল্য, এই মাসিক ম্যাগাজিন, বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের, গবেষণা ও গাম্ভীর্য্যের অত্যুচ্চ স্থান হইতে উদ্ভূত এবং উচ্চাদপি উচ্চ সম্পাদকীয় সুবিধা লইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত। আমরা আশা করি, ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ, এই উচ্চতানুরূপ আয়োজনে, উচ্চতম সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ইহাকে এদেশীয় সাময়িক পত্রের আদর্শস্থানীয় করিতে সমর্থ হইবেন। প্রবাদবাক্যে পণ্ডিতসমাজের সংসর্গে থাকিয়া, পণ্ডিতসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, ইহা মূর্খের ম্যাগাজিন হইলে চলিবে না। কেবল তাহাই নহে। এই ম্যাগাজিনকে সাধারণত্বের ছায়ায় বা সংস্পর্শে ইতরীকৃত হইতে দিলে চলিবে না, কেবল য়ুনিভার্সিটীর কার্য্যাকার্য্যাবলীর জর্নালমাত্র করিলেও চলিবে না। জর্নালের সহিত যুগপৎ ইহার ম্যাগাজিন নামের সার্থকতাও দেখান চাই। সে সার্থকতাও যৎসামান্য নহে। বিবিধ বিদ্যার আকরস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহতী সার্থকতা। সে সার্থকতা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাগাজিনে সংসাধিত হইবে না। য়ুনিভার্সিটী ম্যাগাজিনের উচ্চ শ্রেণীর আদর্শ ম্যাগাজিন, পুরা প্রথম শ্রেণীর পত্র হওয়া চাই, নহিলে য়ুনিভার্সিটীর অগৌরব হইবে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেই কত কলঙ্ক আছে, আরও কত কলঙ্ক রটিবে।

"ইণ্ডিয়ান নেশনের" সম্পাদক মিঃ ঘোষ, "য়ুনিভার্সিটী ম্যাগাজিনের য়ুনিভার্সিটী নাম-গ্রহণাধিকারে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন; এবং এ অধিকারপ্রদানে য়ুনিভার্সিটীর নিজের অধিকারসম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়াছেন। মিঃ ঘোষের আপত্তি একেবারে অমূলক না হইতে পারে। কিন্তু উহা "দূর অস্ত"-মূলক। সুনীতি বা উচ্চতর নীতি সঞ্চারিণী সভা যখন য়ুনিভার্সিটীর সহিত অল্পাধিক সংলিপ্ত, য়ুনিভার্সিটীর অঙ্গ মধ্যেও যখন কার্য্যতঃ উহার একটি অতিরিক্ত অনুষ্ঠান, তখন এরূপ অর্পণ ও গ্রহণাধিকারে ন্যায়তঃ আপত্তি করা যায় না। য়ুনিভার্সিটীর আদেশ লইয়া সুনীতি সভার অনুমোদনে পত্রের নাম য়ুনিভার্সিটী ম্যাগাজিন হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

যাহা হউক, য়ুনিভার্সিটী নামের সম্মানরক্ষা হওয়াই এখন বাঞ্ছনীয়। উপস্থিত প্রথম সংখ্যার সে সম্মান সুরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। এ সংখ্যা তৃতীয় শ্রেণীর পত্র অপেক্ষা উচ্চ নহে, বরং কিঞ্চিৎ নিম্ন। তবে, ইহা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া তৃতীয় হইতে দ্বিতীয়ে, এবং দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উত্থিত হইবে, অবশ্যই এরূপ আশা করা যাইতে পারে, আশা করিবার বিলক্ষণ অবসর আছে, কেন না, এই পত্রের সুবিধা ও সম্ভাবনা বিস্তর। শিক্ষাসংক্রান্ত টীকা, সাধারণ টীপ্পনি, কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা ও একটি বক্তৃতানুবাদ বাদে এ সংখ্যায় সবে একটিমাত্র প্রবন্ধ, তা ছাড়া একটি পদ্যও দেখিলাম। প্রবন্ধটি গতাসু অধ্যাপক টিণ্ডাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক লিখিত, চলনসই গোছের। এই পত্র সম্বন্ধে ইহার অধিক আপাততঃ আর কিছু বলা যাইতে পারে না। ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক স্যর ফ্রেডরিক পলকের আইন-অধ্যাপনার প্রথম লেকচার ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বরং এবার, য়ুনিভার্সিটী পত্রের সৌন্দর্য্য ও সার। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা বক্তৃতার ইংরেজী মর্ম্মানুবাদে, শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যানুরূপ বিশেষ কিছুই দেখিলাম না। বক্তৃতার উপসংহারে বক্তা "insisted on the necessity of a society for the promotion of good literature.

সোসাইটী বা সভার কথাই আজ কাল আমরা সর্ব্বত্র শুনি। সুনীতির জন্ত সভা চাই, সাহিত্যের জন্তও চাই সভা। সাহিত্যোন্নতির জন্য বীমস্-সাহেবী সভার কথা আমরা বহু কাল হইতেই শুনিতেছি। কিন্তু, কলিকাতার শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি একরূপ একটা সভা করিয়াছেন। শাস্ত্রী-মহাশয় কি সে সংবাদ পান নাই? আর সেই সভা দ্বারা কি আপাততঃ কাজ চলিতে পারে না?

৫। The Bengal Academy of Literature. Nos. 4—6. Shova Bazar Rajbatti, Calcutta.

আমরা এখনি যে বেঙ্গল একাডেমির কথা বলিতেছিলাম, এই একাডেমি সেই একাডেমিরই মাসিকপত্র। ইহা আকারে অতি ক্ষুদ্র সম্বাদপত্রের মত। ইহাতে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয়ই আছে। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাহিত্যে আমরা এই পত্রের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমরা এ পত্র দেখি নাই। কিন্তু উপরি-উক্ত চারি সংখ্যা দেখিয়া সুখী হইতে পারি নাই। আসল কথা, উহা কিছুই হয় নাই। উহার ভবিষ্যতের আশা আমরা অবশ্যই করি, কিন্তু নমুনা আশাপ্রদ নহে। উহার ইংরেজী অংশ বরং পদে আছে, কিন্তু বাঙ্গালা অংশ বটতলার বাঙ্গালা অপেক্ষাও অঘন্য; অথচ ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলাও একাডেমিতে পাস হইয়া সাধারণ লেখকশ্রেণীর শিক্ষা-সাধন-উদ্দেশে, তাহার পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আক্ষেপ যে, এতগুলি বড় লোক মিলিত হইয়াও একখানা চলনসই পত্রও প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। আমরা বলি, বেঙ্গল একাডমি বরং ইংরেজীতেই হউক। অবোধ্য বিকলাঙ্গ, বিকট বাঙ্গালার বিড়ম্বনায় প্রয়োজন নাই। এবার স্থানি নাই, সময়ান্তরে বেঙ্গল একাডমির বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার ভাব উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইবে।

দুটি তারা।

হায়েনা।

যুগ যুগান্তর ধরি জাগে প্রতি নিশি
ম্লান মুখে দুটি তারা সুনীল অম্বরে;
অপাঙ্গে চাহিয়া দোঁহে দোঁহা মুখপানে,
মিলনে বিষাদ তবু চিরপ্রেম ভরে।

উপাসি নয়ন দিয়া অপূর্ব্ব ভাষায়
নিতি পরকাশে দোঁহে মরমের ব্যথা,
ধরার মানুষ হায় বুঝিল না কেহ
নীরব আঁখির ভাষা, তারকার কথা।

আমিই বুঝেছি ওই নয়নের ভাষা—
মিলনের তরে কাঁদে দুইটি পরাণ,
মুখপানে চেয়ে আছে রজনী জাগিয়া
আমারি দেবতা ও যে প্রিয়ার বয়ান।

ইরাণীর মৃত্যু।

(গল্প)

প্রচণ্ডদাবানলপ্লাবিত গগনপ্রাঙ্গণে রবি একখণ্ড দ্রবীভূত জ্যোতিষ্কণার ন্যায় ঝুঁকিতেছিল। চৌদিকে গিরি, উপত্যকা, মরু, বন, নদী, পশুপক্ষী, তপনের দারুণ উত্তাপে ক্লিষ্ট ও মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

দুই খণ্ড অগ্নিনিশ্বাসী শৈলপদতলে তমালবেষ্টিত নীল হ্রদ। সেই হ্রদকূলে বোখারার সুলতানের গ্রীষ্মপ্রাসাদ। প্রাসাদমধ্যে স্ফটিকনির্ম্মিত একটি শীতল কক্ষ; চৌদিকে খস্ খস্ প্রভৃতি সুগন্ধি তৃণ আচ্ছাদনে সযত্নে রবিকিরণ অপসৃত। গৃহতলের কিয়দংশ সুকোমল বহুমূল্য পারস্য গালিচায় আবৃত, নানাবিধ সরাব, সরবৎ ও অন্যান্য শীতল পানীয় চৌদিকে ছড়ান রহিয়াছে।

কক্ষমধ্যে দুইটি মাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি। গালিচার উপর বহুমূল্য বেশমি শয্যায় উপর বসিয়া, বোখারার সুলতান করিম সাহ। অস্পষ্ট আলোকে মুখাবয়ব পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। শয্যাপ্রান্তে অনাবৃত মর্ম্মরে অর্দ্ধশয়নে, সুলতানের আবব্য দাসীকন্যা—ইরাণী। সর্ব্বাঙ্গ শীতল পদ্মপত্রে আচ্ছাদন করিয়াছে, মসৃণ কুঞ্চিত অবেণীবদ্ধ আর্দ্র কেশকলাপ সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। গবাক্ষরন্ধ্র হইতে রশ্মিকণা আসিয়া ইরাণীর মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে, সেই অস্পষ্ট আলোকে তাহার নয়নযুগল সর্পিণীর মস্তকনিহিত মণির ন্যায় জ্বলিতেছে। দুই জনেই নিস্তব্ধ।

করিম প্রথমে কথা কহিল। "মায়াবিনী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই; এখনও মনে করিয়া দেখ, তোমার আর কিছু অভিলাষ আছে কি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যাহা চাহিবে অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

"বাদসাহ আলম, দাসীর শ্রীচরণে আর কোনও ভিক্ষা নাই, কৃপা করিয়া একটি অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া, আজ অনেক আশায় সে নিধি পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি।"

"ব্যস্ত হইও না, করিমের কথা কখনও বৃথা হইবে না; তোমার নিধি তুমি পাইবেই, কিন্তু মনে করে দেখ ইরাণী, চিরজন্মের জন্য আজ আমায় ছাড়িয়া চলিলে, এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমায় তোমার হৃদয়ে স্থান দিবে না?"

"বাদসাহ আলম, আমি আপনার দাসীমাত্র; আমার দেয় যা কিছু, তা এত দিন সকলি আপনাকে দিয়াছি, এখনও যা আজ্ঞা করেন, আমার শিরোধার্য্য।"

"কুহকিনী, তোমার শরীর যৌবন তীব্র বিষ; হৃদয়ের তৃষ্ণা আর তাহাতে মেটে না, তোমার হৃদয়—ভালবাসা—এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার হৃদয় আমাকে দাও।"

"বাদসাহ আলম, দাসীর তাহা অসাধ্য,—বৃথা সে আজ্ঞা করিতেছেন; আমার দেহ কলুষিত, এ অপবিত্র গৃহ ছাড়িয়া হৃদয় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহাকে কোথায় পাইব?"

করিম আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় সরোষে চীৎকার করিল, "পিশাচিনী, হৃদয়—তোমার হৃদয়—করিমের কথা কখনই মিথ্যা হইবে না; তোমার হৃদয়েশ্বরকে এখনি পাইবে। আবদুল্লা, বন্দীকে—উন্মাদ প্রেমিক বন্দীকে এই দিকে লইয়া আয়।"

আদেশমাত্র আরও দুই জন গৃহে প্রবেশ করিল। বাদসাহ করিম সাহ আপনি উঠিয়া একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলেন। রবি-কিরণ সমস্ত গৃহ প্লাবিত করিল। এক হস্ত গবাক্ষের উপর রাখিয়া করিম ফিরিয়া দাঁড়াইল। নয়নে বন্যপশুর হিংসানল—অধর স্থিরবদ্ধ; সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা দুরন্ত পাশবিক হিংস্র ভাব। বর্ণ গভীর কৃষ্ণ, সুবিশাল দেহ, ক্ষুদ্র স্কন্ধোপরিস্থ মস্তকে কেশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র;—জনতা চিরদিন করিমকে 'পিশাচ করিম' বলিয়া ডাকিত।

পূর্ণযৌবনা, বিদ্যুৎরূপিণী রমণী, তেমনি সর্পিণীর ন্যায় গুটাইয়া নিশ্চল দক্ষিণ হস্তে মাথা রাখিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবদুল্লা ও তাহার বন্দী। বন্দীর বিশীর্ণ শরীর—নয়নে ভাবহীন, হৃদয়হীন চাহনি। শূন্যের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্!

রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সমস্ত হৃদয়ের আকুল আবেগ লইয়া বাহুযুগল বন্দীর দিকে প্রসর্পিত হইল। সে একবার ফিরিয়াও চাহিল না—তেমনি নিশ্চল! নয়নে সেই জড় বুদ্ধিহীন চাহনি।

রমণীর নয়ন আপনি মুদিয়া আসিল। তড়িৎ স্বপ্নের মত স্মৃতিপথে সেই এক পূর্ণকৌমুদীপ্রতিভাসিত শুভ্র শীতল সৈকতশয্যার কথা মনে পড়িল। কণ্ঠের রজ্জুবদ্ধ অঙ্গে অঙ্গে সেই সুশীতল স্পর্শ, লজ্জা, প্রেম, লালসা কৌমুদী-আলোকে কৃষ্ণ নয়নের সেই রক্তিম কোমল বিভা, আজ অশরীরী গন্ধের ন্যায় প্রাণে-

মুহূর্ত্তের জন্য বহিয়া আসিল। সেই বীর কোমলকান্তি পুরুষের পরিবর্ত্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কে? এই কি সেই? যদি উন্মাদ—তবে কি নৃশংস বিষপানে এই দুর্গতি হইয়াছে?

কিন্তু এ পূর্ব্বস্মৃতি, নিরাশা ভয় জীবনান্ধ ক্রোধ সুধু নিমেষের জন্য। পর-মুহূর্ত্তেই সেই রবি-কিরণপূরিত গৃহে বিদ্যুৎশিখার মত কি ঝলসিয়া উঠিল। চক্ষের নিমেষে জানুতলে করিমকে ফেলিয়া, সেই মৃণালকোমল করে ছুরি-কার বিলোল সুতীব্র ধার রবি-কিরণে ঝলসিতে লাগিল, কিন্তু বাহু নাবিল না।

"নরকের কুক্কুর, মরণ তো তোর মহা অব্যাহতি—জীবনই তোর নরক—তোমাকে মারিয়া-সে-মহাপাপ আমি করিব না।"

তার পর, সেই নিশ্চল, নিষ্পন্দ মূর্ত্তিকে হৃদয়ে টানিয়া লইল। পর মুহূর্ত্তে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে দুইটি কোমল হৃদয়পদ্ম ছিন্ন করিয়া দুই জনে অনন্ত বাসর-শয়নে ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—পৌষ। প্রথমেই, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, "কর্ত্তব্যনীতি" নামক একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। "বিনি পয়সায় ভোজ" রবীন্দ্রনাথ বাবুর আর একটি রচনা এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, আদ্যান্ত উজ্জ্বল ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ ও বিলক্ষণ আমোদজনক। হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হাস্যসম্বরণ করা যায় না। এরূপ নির্দ্দোষ সুন্দর রহস্য বাঙ্গলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। স্থানাভাব না হইলে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। "মহাভিনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্তে" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত অবলম্বনে লিখিত এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি অতি মনোরম হইতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি প্রবন্ধ, "ইংরাজের আতঙ্ক।" প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও আলোচনার উপযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ ও ভারতবাসীর ভিতর যে সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের মনে যে বিরুদ্ধ ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, এবং তাঁহারা যেরূপে ভারতকে ভয় দেখাইয়া জবরদস্ত শাসনে নিষ্পেষ্ট করিয়া রাখিয়া, নিজেরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে চান, তাহা লেখক অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "নিরুদ্দেশ যাত্রা" রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা। কবিতাটি অতি চমৎকার, রবীন্দ্রনাথ বাবুর পক্ষেই এরূপ কবিতাসৃষ্টি সম্ভবে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, ইহার সকলই সুন্দর। যে ভাষার ভাণ্ডারে এরূপ কবিতারত্ন সঞ্চিত হইতেছে, সে ভাষার দৈন্য চিরদিন থাকিবে না, আমরা অনায়াসে এ আশা করিতে পারি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "সাংখ্যদর্শন" বেশ হইতেছে। লেখক তাঁহার দুরূহ বক্তব্য বিষয় এমন সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় বুঝাইতেছেন

যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বারাণসী" একটি চলনসই প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফরাসী-লেখক "পল ব্যুদেল" হইতে একটি গল্প অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটির নাম,—"এক বাটি দুধের জন্য।" গল্পটি অতি সুন্দর। অনুবাদের ভাষাও মন্দ হয় নাই। গল্পটির আগাগোড়া এমন একটি স্বাভাবিক সুর আছে যে, তাহাকে গল্প বলিয়া মনে হয় না। এ কৌশল বোধ করি, কেবল ফরাসী লেখকদের গল্পেই দেখা যায়। এ সংখ্যার "সারসংগ্রহ" আমাদের ভাল লাগিল না। এবারকার "স্বরলিপির" গানটি অতি সুমিষ্ট।

নব্যভারত। পৌষ। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" ষষ্ঠ প্রস্তাব, এবারকার নব্যভারতের প্রথম প্রবন্ধ। লেখক, এই অধ্যায়ে "অশ্ব্য ও গবাদি জন্তুর খাদ্য-প্রধান প্রধান কতকগুলি ফলবৃক্ষ বর্ণনা" করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের "গৌড়োদ্ধারাদি কলিঙ্গ কোসল-পতি শ্রীহর্ষদেব" প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক রচনা। প্রত্নতত্ত্বে কৈলাস বাবু সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অনেক ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তাঁহার গবেষণা ও ঐতিহাসিক তত্ত্বে প্রগাঢ় অধিকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক দিন পরে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর "স্ত্রীশিক্ষাবিবরণের" দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হইলে ইহা হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। লেখক যদি লিপিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত এ সব কথার অধিকাংশ লুপ্ত হইত। এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস যে বিশেষ আদরের সামগ্রী, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বৌদ্ধ নিদান" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও নব্যভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ। লেখক কঠোর পরিশ্রমে যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা অনায়াসে ও সহজে সে তত্ত্ব অবগত হইতেছি। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, এই সংখ্যায় তাঁহার "মুসলমান সাহিত্য" প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন। লেখক মুসলমান সাহিত্যের মোটামুটি সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মুসলমান সাহিত্য সম্বন্ধে যত না হউক, মুসলমান ভাষা সম্বন্ধে তিনি এই প্রস্তাবে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যত্ন করিয়া পড়িবার সামগ্রী। আমরা উপস্থিত প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত 'কবিতাকুসুমাঞ্জলির" সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র স্থলে ও বারান্তরে 'কবিতাকুসুমাঞ্জলির" সমালোচনা করিব, সুতরাং এ স্থলে সমালোচকের মতামতের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সমালোচনার এরূপ প্রণালী আমাদের অনুমোদিত নহে। সংযম সমালোচকের একটা প্রধান গুণ। বর্ত্তমান সমালোচনায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব। লেখক নিজের উচ্ছ্বাস সংযত করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ সমালোচনাটি অকর্ম্মণ্য ও বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক। লেখক এক স্থলে বলিতেছেন,—"গিরীন্দ্রমোহিনী বয়োজ্যেষ্ঠা, কামিনী সর্ব্বকনিষ্ঠা। জ্যেষ্ঠার হৃদয়ের কাতরতা নিশ্বাসে অনুভব করিতে হয়, মধ্যমার বাশরীর সুরে, কনিষ্ঠার অভিমানে। গিরি পূর্ব্বরাগে, কামিনী মানে, মানকুমারী বিরহে শ্রেষ্ঠ।" গ্রন্থকারের এ মত সমীচীন কি না, আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহিতেছি না। আমরা কেবল ভাষার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—লেখক যে ভাবে সাময়িক মহিলাকবিদের নাম করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা রুচিবিরুদ্ধ, অশিষ্টতার পরিচায়ক। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের কাছে আমরা সামাজিকতার আদর্শ দেখিতে চাই, তাঁহাকে এরূপ অসাবধান হইয়া সাধারণের উপহাসভাজন হইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই, তাই এই কয়টা কথা বলিলাম।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "একদিন" নামক একটি এক পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্য। ইহাতে না আছে ছন্দ, না আছে ভাব। এটি না কবিতা, না পাঁচালী। কেন মুদ্রিত হইল, বলিতে পারি না। অজাতশ্মশ্রু বালকদের কবিতা লেখা, লম্বা চুল রাখা, আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা প্রভৃতির কারণ আমরা বুঝিতে পারি, এবং তাহাদের "কবিতাও" আমরা সহিয়া থাকি। কিন্তু চিন্তাশীল মোহিনী বাবুর এ বিড়ম্বনা কেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। কবিতার অপব্যবহার অপেক্ষা তাঁহার কবিবার উপযুক্ত আরও অনেক কার্য্য আছে,—যাহা সম্পন্ন করিলে, সত্য সত্যই আমরা উপকৃত হই। ভারতী-আফিসের "লরেল" পাইলেই কেহ কবি হইতে পারে না,—লেখককে আমরা সবিনয়ে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি। "ধর্ম্ম ও বুদ্ধি" বাবু বণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। "এই প্রবন্ধটি কেবার্ডের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' অবলম্বন করিয়া লিখিত; যাহারা ইংরাজী পড়েন না, তাঁহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত" হইয়াছে। আমরা এরূপ প্রবন্ধের পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্রের "রহস্য" আমাদের বেশ লাগিয়াছে। প্রবন্ধটিতে নূতনত্ব আছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "অঘোরী বা অঘোরপন্থী" মন্দ হয় নাই, আর একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "শেষচিত্রে" ব্রহ্মদেশের শেষ দশা চিত্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভূতপূর্ব্ব Record-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিদ্ধিমোহন মিত্রের "মুসলমানের আচার উল্লেখযোগ্য মৌলিক প্রবন্ধ। সিদ্ধিমোহন বাবু বহুকাল হায়দ্রাবাদে আছেন, নানা শ্রেণীর মুসলমানদের সমাজে মিশিয়াছেন। তাহার বহু দিনের অভিজ্ঞতা বাঙ্গালীদের উপহার দিয়া তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধের শেষ, সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "কর্ণপ্রয়াগের পথে" বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "সহবৎ শিক্ষা" বেশ হইয়াছে। কাজের কথার এইরূপ আন্দোলন আলোচনার বাস্তবিকই উপকারের ও সুফলের সম্ভাবনা। "অর্গলা বঙ্গভূমি" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। কিন্তু তিনি যিনিই হউন, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গালয়ের দুর্দ্দশা বাস্তবিকই শোচনীয়, তাহাদের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার বস্তুতঃই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে উপস্থিত প্রবন্ধের সুদক্ষ লেখক এই প্রসঙ্গের আলোচনা অবতারিত করিয়া বাস্তবিকই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কোনও কাগজেই বঙ্গালয়ের প্রকৃত সমালোচনা হয় না, আমাদের অকর্ম্মণ্য বাঙ্গলা সাপ্তাহিক ও দৈনিকগুলি নির্জ্জলা খোসামুদী করিয়া বিনামূল্যে থিয়েটার দেখিবার অধিকার অব্যাহত রাখেন। এমন কি, "ইণ্ডিয়ান্ মিরারের" মত উচ্চদরের পত্রেও জবন্য প্রহসনাদির প্রশংসা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই "ভারতী" পত্রে, বহুপূর্ব্বে, "তাজ্জব ব্যাপার" নামক এক খানি কুরুচিপূর্ণ প্রহসনের সুখ্যাতি বা সমর্থন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। শিক্ষিত মহিলাদের গালি দেওয়াই যে কুরুচিপূর্ণ প্রহসনের উদ্দেশ্য, এক জন শিক্ষিত মহিলার সম্পাদিত পত্রে তাহারই প্রশংসা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়াই আমাদের নটদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আশা করি, 'ভারতী"র এই সমালোচনা বঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। সমালোচক বলিতেছেন, তিনি ক্রমে অন্য অন্য থিয়েটারে অভিনীত-পুস্তকেরও সমালোচনা করিবেন। আমরা সাগ্রহে তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। সমালোচককে অনুরোধ করি, তিনি প্রতি মাসে বঙ্গালয়ের সমালোচনা করিয়া আমাদের বিপন্ন সমাজকে উপকৃত করিবেন।

মধুচ্ছন্দার আজ্যশস্ত্র।

সাহিত্যে যে বৈদিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, ইহা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত না হইয়া, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, খণ্ডশঃ প্রকাশিত হওয়াতে যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইতেছে, তাহা অনেকের বোধগম্য হইতেছে না। পূর্ব্বের সহিত পরের সম্বন্ধ অনেকে ভুলিয়া যাইতেছেন। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু যদি কোনও পাঠক ইহা যত্ন করিয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন, তবে পূর্ব্বের সহিত মিলাইয়া পড়িলেও পড়া যাইতে পারে।

উক্ত বন্ধু আরও লেখেন যে, এই বৈদিক প্রবন্ধমালায় বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার, সমাজনীতি প্রভৃতি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিলে ভাল হইত। সে বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বৈদিক সময়ের ইতিহাস লেখা, এ প্রবন্ধমালার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য বেদপাঠে ব্যাপৃত হয়েন, তাঁহারা কেবল নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করেন মাত্র। পাঠকের মনে রাখা উচিত যে, ঋষিরা ইতিহাস বা সমাজনীতি শিখাইবার জন্য বেদবচন করেন নাই। বেদ হইতে ইতিহাস বাহির হয় হউক; কিন্তু বেদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। "ধর্ম্ম" ও "ব্রহ্ম" কি পদার্থ, তাহাই প্রচার করা বেদের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি বেদ পড়িয়া "ব্রহ্ম" কি, "ধর্ম্ম" কি, ইহা অবগত না হইল, তাহার বেদপাঠ ব্যর্থ। দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি বাঙ্গলা ও ইংরাজিতে বেদের যেরূপ অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে বেদের মর্ম্ম বিশদ না হইয়া, মলিন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই অনুবাদে ব্যাপৃত, তাঁহারা "ঐতিহাসিক" বেদে ইতিহাসের কি কথা আছে, ইহা জানিবার জন্য যত ব্যস্ত, বেদের আসল মর্ম্ম কি, তাহা জানিতে বা জানাইতে তত ব্যস্ত নহেন। তাঁহাদের অনুবাদে বেদ প্রকৃতির উপাসনা (অর্থাৎ জড়োপাসনা) বা কৃষকগীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সে নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত যত্ন করা এই প্রবন্ধমালার এক উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদকগণ অগ্রে বেদের অর্থ আবিষ্কার না করিয়া, তাহা হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়াছেন। এরূপ যত্নও সফল হইবার নহে।

বেদবিদ্যা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অগ্রে বেদ কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা কর; পরে তাহার ভিতর যদি কিছু ইতিহাস পাও, তাহা প্রচার করিও।

খৃষ্টানেরা কি যিহুদীদের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য বাইবেল পড়েন, না মুসলমানেরা আরবের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য কোরাণ পড়েন? বেদ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অক্ষয় জীবন-লাভের উপায়স্বরূপ অন্ন সঞ্চিত আছে। আর বহুকাল সেই ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ থাকায়, এবং তাহাতে মনুষ্যসমাগম প্রায় বন্ধ হওয়ায়, মূষিকের ন্যায় কতকগুলা ক্ষুদ্র জীবে তাহা মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে সেই ভাণ্ডারের প্রশস্ত দ্বার অপাবৃত করিয়া, তন্নিহিত আবর্জ্জনা সকল পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ঋগ্বেদ, তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই মহর্ষি মধুচ্ছন্দার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অতএব, সাহিত্যের পাঠকবর্গের সহিত মধুচ্ছন্দার পরিচয় করাইয়া দেওয়া, এই প্রবন্ধমালার এক উদ্দেশ্য।

মধুচ্ছন্দা এক জন সোমযাজী ঋষি। অতএব, এই প্রবন্ধমালার প্রথমেই "বৈদিক সোম" কি পদার্থ, "সোমযাগ" কীদৃশ, তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎপরে মধুচ্ছন্দা কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কোন্ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি শিক্ষিত না অশিক্ষিত লোক ছিলেন; তাঁহার শ্রোতারা সামান্য কৃষক ছিল, না রাজাধিরাজ শ্রেণীর লোক ছিল, ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, যৎকালে মধুচ্ছন্দার পিতা প্রসিদ্ধ বিশ্বমিত্র বা বিশ্বামিত্র ঋষি জীবিত ছিলেন, তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে পিজবনের পুত্র সুদাস নামে এক জন দিগ্বিজয়ী রাজর্ষি একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সুদাস, বেদরচয়িতা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি-ঋষিগণকে সম্মানিত ও দানাদি দ্বারা পূজিত করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত তৎকালে সভ্যতার সমুন্নত সোপানে অধিরূঢ়। এই রাজর্ষির সময়ে কিম্বা তাঁহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে, ঋগ্বেদের অধিকাংশ রচিত হয়। তৎকালে ঋষিরা রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং তাঁহাদের পরিষদ্ বা College, বহুসংখ্যক ছাত্রে পরিপূর্ণ থাকিত। মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র, বৃদ্ধ জমদগ্নির পরিষদে বিদ্যাভ্যাস করিয়া, তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; এবং সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক ঋক্‌সূক্ত রচনা করেন।

মধুচ্ছন্দা স্বীয় পিতার পরিষদেই বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং পিতার নিকটেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; কিন্তু পুত্র মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা অভ্যাগত আর একটি শিষ্যকে বিশ্বামিত্র সমধিক বুদ্ধিমান্ ও নিষ্ঠাবান্ দেখিয়া স্বীয় পরিষদের প্রাধান্য প্রদান করেন। সেই শিষ্যের আদিম নাম "শুনঃশেফ"। বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই কুৎসিত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে "দেবরাত" এই নাম প্রদান করেন। বিশ্বামিত্রের বিবেচনায়, দেবরাত মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা সমধিক প্রতিভাসম্পন্ন। আমরা যদি সময় পাই, তাহা হইলে পরে এই দেববাতের "বেদ" কীদৃশ ছিল, তাহাও সমালোচনার চেষ্টা করিব।

কিন্তু মধুচ্ছন্দা সবার বড় না হউন, বিশ্বামিত্রের পরিষদের তিনি এক জন প্রধান ছাত্র ছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "পবমান স্তোত্রের" অনুবাদ দিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। উক্ত পবমান স্তোত্রের ষষ্ঠ ঋক্ বেদভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন বিবেচনায়, তাহার প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ যদি তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মধুচ্ছন্দার ব্রহ্মজ্ঞান অতীব সমুন্নত ছিল। মধুচ্ছন্দা বলিয়া গিয়াছেন যে, তর্ক বা বিচারের দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্রেক হয় না। স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের বীজ বপন করেন; মনুষ্যহৃদয়ে "শ্রদ্ধা" নামক যে বুদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা অন্তর্যামী ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বরের কন্যাস্বরূপ। ঈশ্বরই সেই বুদ্ধির উৎপাদক। মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য, তিনি সেই বুদ্ধি উৎপাদন করেন। সেই বুদ্ধির প্রভাবেই মনুষ্য ভগবদ্ভক্তি এ ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদনলাভে সমর্থ হয়। এবং সেই প্রেম ও সেই ভক্তির আস্বাদই মনুষ্যের নবজীবনের সূত্রপাত করে।

সাময়িক পত্রে এই প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হওয়ায় যদি কোনও কোনও পাঠকের অসুবিধা হইয়া থাকে, তথাপি অন্যান্য পাঠকের ইহাতে সুবিধার সম্ভাবনা। কেন না, পুস্তকে এক কথার বারম্বার পুনরুক্তি, দোষের মধ্যে পরিগণিত। অথচ, সাধারণ পাঠকের অবধানের জন্য অনেক স্থলে, বিশেষতঃ বেদব্যাখ্যার ন্যায় দুরূহ স্থলে পুনরুক্তির আবশ্যক হয়। সাময়িক পত্রে পূর্ব্বোক্ত কথার আবৃত্তিতে তত বিরক্তি বোধ হয় না। এবং পূর্ব্বে যাহা বিস্তারিত বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে আবার তাহা বলা চলে। এটি একটি সুবিধা মনে করি। আর এই সঙ্গে যদি কেহ কোনও কথার প্রতিবাদ করেন, তাহারও উত্তর দেওয়া চলে।

এক্ষণে আমরা মধুচ্ছন্দার আজ্যশস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিখ্যাত "অগ্নিমীড়ে "পুরোহিতং" ইত্যাদি সূক্তই মধুচ্ছন্দার "আজ্যশস্ত্র" বলিয়া পরিগণিত।

"আজ্য" শব্দের সাধারণ অর্থ ঘৃত। আর যে মন্ত্র গানের দ্বারা গীত না হইয়া কেবল পদ্যের আকারে পঠিত হয়, তাহা নাম শস্ত্র। আজ্যশস্ত্রের ন্যায় কতকগুলি আজ্য "স্তোত্র"ও আছে। (স্তোত্র=যাহা গীত হয়।) কিন্তু মধুচ্ছন্দা কোনও আজ্য স্তোত্র রচনা করেন নাই। অথবা তাহা পরিরক্ষিত হয় নাই।

"আজ্যশস্ত্র" শব্দে "আজ্য" অর্থে বোধ হয় ঘৃত নহে। নিরুক্ত শাস্ত্রে "আজিম্ ইয়ুঃ তস্মাৎ আজ্যানাং আজ্যত্বম্ ইতি", এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। "আজি" শব্দের এক অর্থ—যুদ্ধ বা সংগ্রাম। আর এক অর্থ—মর্য্যাদা বা সীমা। যাহাকে ইংরাজিতে goal বলে। সেকালে ঐরূপ একটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, লোকে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া কে আগে পৌঁছিতে পারে বলিয়া পদচারে বা অশ্বারোহণে ধাবমান হইত। ইহার নাম আজিধাবন বা আজিসরণ, অর্থাৎ ইংরাজিতে foot-race বা horse-race। লোকে অলঙ্কার দিয়া বলিত যে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলেই দেবতারা "কে আগে পৌঁছিতে পারে" বলিয়া আজিধাবনে ব্যস্ত হইতেন। এই জন্যই যজ্ঞারম্ভক "শস্ত্রের" নাম "আজ্যশস্ত্র" হইয়া থাকিবে।

অপিচ যে কার্য্যে বলের আবশ্যক, তাহাকেও "আজি" বলিত। "অতো বা অন্যানি বীর্য্যবত্তিকর্ম্মাণি যথা অগ্নেঃ মন্থনং আজেঃ সবণং দৃঢ়স্য ধনুষ আচমনম্।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) ইহাতে অগ্নিমন্থনের নামও আজি। এবং অগ্নিমন্থনক্রিয়াতে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম আজ্যশস্ত্র। এই অর্থই আমার বিবেচনায় সমীচীন মনে হয়।

বিশ্বামিত্র এই অগ্নিমন্থনক্রিয়া অবলম্বন করিয়া একটি বিস্তীর্ণ সূক্ত (ঋগ্বেদ ৩।২৯) রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম ঋক্ এই,—

"অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতং।
"এতাং বিশ্পত্নীম্ আভর অগ্নিং মন্থাম পূর্ব্বণা॥"

ইহাতে দেখা যায়, বিশ্বামিত্রের সময়েও কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যজ্ঞীয় অগ্নি সম্পাদন করা একটি প্রাচীন প্রথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিমন্থনের উল্লেখ দেখিয়া, অনেকে যে সময়ে বিশ্বামিত্রাদি বেদরচয়িতারা বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়কে অসভ্য আদিম সময় বলিয়া মনে করেন; ইহা ভ্রম।

সোমরস প্রস্তুতকরণের ন্যায় যজ্ঞে অগ্নিমন্থন তৎকালে কেবল অতি প্রাচীন প্রথার অনুসরণমাত্র ছিল। বাস্তবিক কিন্তু লৌকিক ব্যবহার জন্য ঐরূপ ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত না।

মধুচ্ছন্দার আজ্যশস্ত্রের প্রথমেই "অগ্নিম্" এই শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ কি? এই কথা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে অনেক বাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় দুই জন প্রধান পণ্ডিতে এই বিষয় লইয়া বিবাদ চলিয়াছে। স্বর্গীয় দয়ানন্দ সরস্বতী এই বিবাদস্থলে বাদী; পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহোদয় বিবাদী; ইশু, "এই অগ্নি শব্দের অর্থ 'পরমেশ্বর' কি না।" এরূপ অসাধারণ-পণ্ডিতদ্বয়ের যে স্থলে মতদ্বৈধ ঘটে, সে স্থলে মীমাংসার ভার মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের গ্রহণ করা ধৃষ্টতার কার্য্য। তবে বাদী ও প্রতিবাদী কি বলেন, তাঁহাদের উভয়ের মতের সামঞ্জস্য সম্ভব কি না—এবং তর্কস্থলে প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমরা বারান্তরে তাহা বুঝিবার যত্ন করিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

অসভ্যজাতির সমাজনীতি।

প্রথম প্রস্তাব।

প্রাণীমাত্রেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চাহে। সঙ্গীহীন জীবন অত্যন্ত দুর্ভর, তাই পৃথিবীতে কেহ একাকী থাকিতে চাহে না, এবং এই জন্যই সমাজবন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মধ্যে যাহারা দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত প্রবল; এমন কি, সুবিখ্যাত ডারউইন সাহেব বানর হইতে মানবজাতির উৎপত্তিসম্বন্ধীয় অভিব্যক্তির যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মূলেও এই সমাজবন্ধনের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; কারণ, তাঁহার মতে গরিলা প্রভৃতি পরাক্রান্ত উগ্রপ্রকৃতির অসামাজিক বানরবংশ অপেক্ষা, সিম্পাঞ্জীজাতীয় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, কিন্তু সামাজিক বানরবংশই মানবের পূর্ব্বপুরুষ হইবার অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। (১)

(১) The Descent of Man. End of Chapter II. pp. 63, 64. 2nd Edition.

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন অসভ্য মানবজাতি পর্ব্বতগুহায় কিম্বা বৃক্ষ-কোটরে বাস করিত, যখন প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় ঘোর অজ্ঞানতিমির ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করে নাই, তখনও পৃথিবীতে সেই সকল অসভ্য জাতি যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অন্তর্গত হইয়া বাস করিত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক স্তর হইতে তাহার প্রভূত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া, যদি আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর অসভ্যতম জাতিদিগের আচারব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলেই দেখিতে পাই যে, সামাজিকতা যেমন সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ, ইহা জীবন-ধারণের জন্য সেইরূপ একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান, এবং এই জন্যই যত্ন ও স্নেহ, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বিষয়ে, অসভ্যজাতিকে সুসভ্য মানব-মণ্ডলী অপেক্ষা অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়।

উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতিপয় অসভ্যজাতির সামাজিকতার পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের অসভ্যজাতির মধ্যে আফ্রিকা দেশস্থ 'বুশমেন' বা 'বন্যজাতি', সভ্যতাসোপানের অতি নিম্নস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; ইহারা এরূপ পশুভাবাপন্ন যে, বাসের নিমিত্ত সামান্য কুটীর পর্য্যন্তও নির্ম্মাণ করিতে জানে না; ইহারা মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তাহারই ভিতর পশুর ন্যায় বাস করে, কদাচ গর্ত্তের দ্বারে সামান্য আচ্ছাদন দেয়। ক্রমে ইয়ুরোপীয়গণ ইহাদিগের আবাসস্থানের সন্নিকটে আসিয়া মৃগয়াকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ইহারা সুবিধা পাইয়া, তাহাদিগের গোমেষাদি অপহরণ পূর্ব্বক সেই খৃষ্টান অতিথি-দিগের সহিষ্ণুতায় হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল; এই জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, এই বন্য জাতির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাহাতে পাঁচ শত, এবং ১৮০৮ ও ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে প্রায় তিন সহস্র 'বুশমেন' নিহত হইয়াছিল। ইহাদিগকে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, তাহার বিবরণ পাঠ করিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; অনেক সময় ইউরোপীয়গণ ইহাদিগকে যেমন অবস্থায় দেখিয়াছে, সেই অবস্থাতেই গুলি করিয়া, আরণ্য পশুর ন্যায় নিহত করিয়াছে। (২)

কিন্তু তথাপি এই বুশমেন জাতি সুসভ্য মানবজাতি অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের পর্য্যটনকাহিনীপাঠে অবগত

(২) Col. Collins, in Philip's Researches in South Africa.

হওয়া যায় যে, ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এক জন সর্দ্দারের অধীনে বাস করে, কিন্তু সকল দল একত্র হইয়া শিকার, উৎসব প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যে যোগদান করে। শিকার ভাগ করিবার সময়, ইহাদের মধ্যে কোনও প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয় না। ইহারা কখনও আহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না, সহচরবর্গের প্রতি ইহাদের সুগভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লিটেনষ্টেন নামক এক জন পর্য্যটক লিখিয়াছেন, এক জন 'বুশম্যান' একবার জলে ডুবিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার সহচরবর্গ তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া আপনাদিগের পশুলোমনির্ম্মিত গাত্রবস্ত্র দ্বারা তাহার শরীর আবৃত করিয়া দিল, এবং তাহাকে অগ্নিতে সেঁকিয়া, তাহার শরীরে উষ্ণ চর্ব্বি মাখাইয়া, বিবিধ প্রকার সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। একবার এক দল 'বুশমেন' এক জন ইউরোপীয়ের নিকট একটু সদ্ব্যবহার পাইয়াছিল, এ জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। বর্শেল ও মোফাট নামক পর্য্যটকদ্বয়, তাহাদিগকে সরলহৃদয়, নিঃস্বার্থপর, সত্যব্রত এবং কৃতজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের সন্তানবাৎসল্যও অত্যন্ত অধিক। একদা এক জন ইউরোপীয় যুবক, একটি 'বুশম্যান' রমণীকে দাসীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায়, তাহার পুত্রকে অপহরণ করে; পুত্রপ্রাপ্তির আশায়, স্ত্রীলোকটি স্বেচ্ছাক্রমে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকার হটেণ্টট জাতি, উল্লিখিত 'বুশমেন' জাতি অপেক্ষা উচ্চ অবস্থাপন্ন নহে। লবক্ সাহেব বলেন, "ইহারা যৎপরোনাস্তি অপরিষ্কার জন্তু।" বাস্তবিক অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার। গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক খণ্ড মৃগচর্ম্ম ইহাদের অদ্বিতীয় পরিচ্ছদ। যতদিন পর্য্যন্ত একটি পরিচ্ছদ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহারা তাহা পরিত্যাগ করে না। ইহাদের কুটীর কয়েক খানি বংশদণ্ডের সমষ্টি, তাহার উপর সামান্য আচ্ছাদন থাকে মাত্র। যদিও ইহাদিগকে গো মেষাদি পশু প্রতিপালন করিতে দেখা যায়, এবং ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্ব হইতে ইহারা লৌহের ব্যবহার অবগত ছিল, তথাপি সভ্যতার ইতিহাসে নাম লেখাইতে ইহাদের এখনও বহুকালের 'অনুকরণ' ও 'উন্নতি' আবশ্যক। কিন্তু তথাপি যাঁহারা ইহাদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাদের স্বজাতিপ্রিয়তা ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া-

ছেন। কোনও হটেণ্টটকে কোনও দ্রব্য প্রদান করিলে, ইহারা উপস্থিত সকলের মধ্যেই তাহা ভাগ করিয়া দিয়া, তবে নিজে এক অংশ গ্রহণ করে। ফিউজিয়ানদিগের এই প্রথা দেখিয়া, ডারউইন সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। হটেণ্টটগণ যতই ক্ষুধিত হউক, পথের লোক ডাকিয়া তাহাদিগকে কিয়দংশ না খাওয়াইয়া, নিজে কোনও দ্রব্য আহার করে না। পর্য্যটক কোল্‌বেল সাহেব ইহাদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহার এক জন অনুচরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, "ইহাই হটেণ্টটগণের জাতীয় প্রথা।"—কিন্তু এই প্রথা শুদ্ধ হটেণ্টট জাতির মধ্যেই আবদ্ধ নহে, অসভ্য জাতিমাত্রেই এই প্রথা অল্পাধিক পরিমাণে সাধারণ।

কোব্‌লন সাহেব ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহারা সত্যবাদী, ইউরোপের কূটনীতি এবং অর্থনিষ্ঠতা ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; ইহারা অতি শান্তভাবে দিনপাত করে, কখন কাহারও সহিত বিবাদ করে না। পরস্পরের প্রতি ইহাদের দয়া ও সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক। স্বজাতিস্থ কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিলে, ইহারা প্রচুর আনন্দ অনুভব করে। কর্ত্তব্যজ্ঞান, সত্যপ্রিয়তা এবং সতীত্ব বিষয়ে ইহারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (৩)

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণও এই সকল দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী অপেক্ষা কিছুমাত্র উন্নত নহে। তাহাদের কুটীরগুলি হটেণ্টট জাতির ন্যায় অতি বৎসামান্য। আহারাদিবিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা নরমাংস আহার করে; এমন কি, কখনও কখনও ইহাদিগকে দুর্গন্ধময় গলিত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। যখন ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান, সে সময় ইহাদের মধ্যে লৌহের প্রচলন ছিল না, প্রস্তর এবং অস্থির দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য চালাইত; ইহাদের কোন কোন জাতি নৌকা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে জানিত না, এবং দ্রব্য বিনিময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে ইহাদের কোনও জ্ঞান ছিল না। (৪)

কিন্তু ইহাদের অনেক কার্য্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করে, কিন্তু মৎস্য ও পশুশিকারের

(৩) P. Colben, The Present state of the Cape of Good-Hope, translated from the German by Mr. Medley Vol. I. pp. 59, 71 &c.

(৪) The Folklore, Manners, of Australian Aborigines. p. 11

সময়, কি
প্রভৃতি ; রয়ে
ইহারা তৎ-
সম্বন্ধীয় প্রাণীতত্ত্ব-
সমিতি হইতে হইতে প্রত্যা-
গত সুমহজ না- কট প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে,
তিনি তদুত্তরে বলে- -ত্রাভাব অত্যন্ত প্রবল ; ইহারা যত্নের
সহিত রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করিয়া থাকে, রুগ্ন ব্যক্তি কখনও পরিত্যক্ত কিম্বা হত
হয় না। ইহারা নরমাংসভোজী, কিন্তু ইহারা স্বজাতির মাংস ভোজন করে না।
পিতা মাতা সন্তান সন্ততিকে অত্যন্ত স্নেহ করে, তাহাদিগের সহিত খেলা
করে, এবং নানাপ্রকারে তাহাদিগকে আদর দেয়, কিন্তু শিশুহত্যাপ্রথাও
ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বৃদ্ধেরা অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়,
কখন তাহাদিগকে নিহত করা হয় না। ইহাদিগের কোন ধর্ম্ম বা দেবদেবী
নাই, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে মৃত্যুভয় অত্যন্ত প্রবল। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-
প্রথা প্রচলিত আছে। কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে, কাষ্ঠনির্ম্মিত ঢাল
ও তরবারীর সাহায্যে দ্বৈরথযুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা হয়। ইহাদের মধ্যে দাস-
ব্যবসায় প্রচলিত নাই। মৃৎপাত্র প্রস্তুত প্রভৃতি কোন প্রকার শিল্প সম্বন্ধে
ইহাদের অভিজ্ঞতা নাই। ইহাদের কোন পরিচ্ছদ নাই, কেবলমাত্র স্ত্রী-
লোকেরা শরীরের কিয়দংশ বৃক্ষপত্রের দ্বারা আবৃত রাখে। ইহারা চারিটি
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।(৫)

পাপুয়াদ্বীপের আদিম অধিবাসীগণও এই অষ্ট্রেলিয়া-বাসীগণের ন্যায়
অসভ্য, কিন্তু তাহাদের নানাবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষ সাহেব
১৮৭১ সাল হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল ইহাদিগের মধ্যে বাস
করিয়াছিলেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "ইহারা সামাজিক, এবং সদাপ্রফুল্ল ;
সর্ব্বদাই ইহাদিগকে হাসিতে দেখা যায়, ইহারা অত্যন্ত ভয়প্রবণ। নিজের
দলের লোককে ইহারা অত্যন্ত ভাল বাসে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের প্রতিও
ইহাদের অসীম যত্ন। কেহ কাহারো নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋণ পরি-
শোধ করিতে না পারিলে, অধমর্ণের বন্ধুবান্ধবগণ সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া

(৫) Grey's Journals of two Expedition of Discovery in North-west and Western Australia Vol. II. pp. 237, 298.

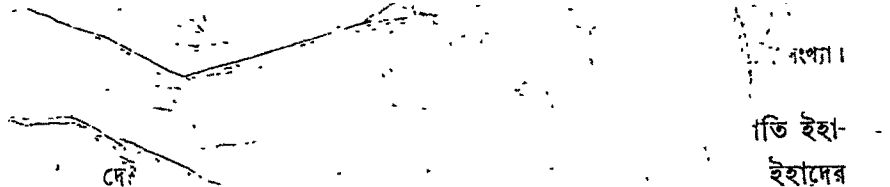

ংখ্যা।

াতি ইহা-
ইহাদের
তাহা
কে দাস-
পরিবারের
রে তাহার অর্থ-
রী) প্রদত্ত হয়।
সাধারণে জমী আবাদ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি বীজ বপন করে, সেই শস্যের অধিকারী হয়। ইহারা নৃপোত্র প্রস্তুত করিতে জানে, এবং ইহাদের মধ্যে বিনিময়বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত আছে। অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ইহারা শত্রুকে হত্যা করে, কখনও কখনও নামোটোটির রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকে; রাজা অপরাধীর অর্থদণ্ড করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন।"

সদয় ব্যবহার করিলে এই পাপুয়াবাসীগণ অত্যন্ত বাধ্য থাকে। ইহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না, এবং এমন কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় না, যাহা ইহারা রক্ষা করিতে অসমর্থ। সাগ্নিকের ন্যায় ইহারা অহর্নিশি নিজ নিজ কুটীরে অগ্নি রক্ষা করে, কারণ স্থানান্তর হইতে কিরূপে অগ্নি আনয়ন করা সম্ভব, তাহা ইহাদের জ্ঞানের অতীত। প্রতিদিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট, এবং তদতিরিক্ত আহারোপার্জ্জনের জন্য ইহারা পরিশ্রম করিতে সম্পূর্ণ কাতর। অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায়, ইহারা অত্যন্ত নৃত্যানুরাগী, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করে। প্রত্যেক গ্রামে এক খানি 'বারলা' বা 'বাগাই' (দৌড়ঘর) আছে, অবিবাহিত যুবকগণ সেখানে একত্র সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করে, প্রয়োজনানুসারে এ সকল স্থানে সামাজিক বৈঠকও বসিয়া থাকে।

গ্রীনল্যাণ্ডবাসী এস্কিমো জাতির বিষয় আলোচনা করিলে আমরা পৃথিবীর আদিম মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আজও মৎস্য ধরিতে শেখে নাই, সাধারণতঃ তাহারা বর্ষা দিয়া মাছ মারে। (৬) অতি অল্প দিন ইহারা লৌহের ব্যবহার অবগত হই-

---

(৬) Captain Holm's Expedition to East Greenland.

যাছে। সমুদ্রে তুষাররাশির উপর কোথাও একখানি ভাঙ্গা জাহাজ দেখিলেই ইহারা তাহা হইতে লৌহ সংগ্রহ করে। ইহাদের সমাজের গঠনপ্রণালী অতি প্রাচীন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই স্বামীস্ত্রীর পরিবর্ত্তন হয়; অনেকে এক পরিবারভুক্ত থাকে, এবং পরিবারস্থ সকলে একযোগে কাজ করে। উত্তর-পূর্ব্ব গ্রীনল্যাণ্ডের চিরহিমানীমণ্ডিত প্রদেশেও এই অসভ্য জাতির মধ্যে জীবনসংগ্রামের প্রাবল্য অনুভূত হয়, কাহারো কাহারো মতে ইহাদের পারিবারিক একতার ইহাই অন্যতম কারণ। এক একটি সুদীর্ঘ গৃহেও অনেক পরিবারকে একত্রে বাস করিতে দেখা যায়; এই সমস্ত গৃহের প্রবেশদ্বার একটি, পশুচর্ম্ম ঝুলাইয়া বিভিন্ন পরিবার নিজ নিজ বাসস্থানের পার্থক্য সম্পাদন করে। অনেক গৃহের আকার × এইরূপ, চারি দিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার বাস করে, মধ্য স্থলে অগ্নি রক্ষিত হয়, এই অগ্নি সাধারণের সম্পত্তি। অনেক পরিবার এইরূপে একত্র বাস করিলেও, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যায় না। গালাগালি দেওয়া কিম্বা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করা, ইহাদের মতে অত্যন্ত অভদ্রতার পরিচায়ক। সামাজিক হিতের প্রতি ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। সাধারণের মতামতেই ইহাদের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এবং জনসাধারণের নিকট অপদস্থ হওয়াই, এখানে অপরাধীর অতি গুরুতর দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। (৭)

এস্কিমো জাতির জীবন সামাজিক ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। শিকার দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চিত হয়, তাহা দলস্থ ব্যক্তিবর্গের সাধারণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে প্রতি বৎসর একটি করিয়া প্রদর্শনী খোলা হয়, এই প্রদর্শনীতে সকলের বার্ষিক উপার্জ্জন রক্ষিত ও সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। কোন ব্যক্তির বার্ষিক সঞ্চয় কিছু অধিক হইলে, সে তাহা নিজে ব্যবহার করে না; অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া মহা সমারোহে তাহাদিগকে ভোজ দেয়, এবং তাহার পরও যদি কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করে। আলাস্কাদেশে ইউকন নদীর তীরে, ডল্ সাহেব এক পরিবারকে এইরূপ এক ভোজ দিতে দেখিয়াছিলেন। ভোজের পর সমবেত ব্যক্তিদিগকে যে উপহার প্রদান করা হয়, তাহার মধ্যে দশ খানি চর্ম্মপরিচ্ছদ, দুই শত ছড়া কাঠের মালা, দশ খানি ভল্লুকচর্ম্ম ও দুই শত খানি বিভর-চর্ম্ম ছিল। এই সমস্ত উপহার দেওয়া হইলে, সেই দানশীল পরিবার

(৭) Dr. Rink's The Eskimo Tribes vol. XI. p. 26.

ইহাদের নৈতিক নিয়ম অনুসারে, "মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া, শত্রুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, শত্রুকে না মারিয়া মরা, চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হওয়া, বন্দরে নৌকা ডুবাইয়া ফেলা, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্রযাত্রায় ভীত হওয়া, দীর্ঘপথ পর্য্যটনকালে পথিমধ্যে ক্ষুধায় কাতরতা প্রকাশ করা, স্ত্রীর নিকট গোপনীয় কথা ব্যক্ত করা, দুই জন শিকারে বাহির হইয়া শিকারের উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্গীকে না দেওয়া, কোনও ভাল কাজ করিয়া অহঙ্কার করা, কাহারও প্রতি ঘৃণার সহিত অপমানসূচক কথা প্রয়োগ করা, ভিক্ষা করা, অন্যের সাক্ষাতে স্ত্রীর আদর করা, স্ত্রীর সহিত নৃত্য করা, নিজের দ্রব্য নিজে বিক্রয় করা, ইহারা অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করে। দ্রব্যাদি বিভাগ কালে যদি কেহ অংশবিশেষ লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে অংশীদারগণ সেই লুব্ধ ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ অংশগুলিও ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লজ্জিত করে। সূচীকার্য্য, নৃত্য, প্রভৃতি রমণীসুলভ শিল্পকলাদিতে জ্ঞান না থাকা এস্কিমো স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা; কোনও রমণী তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে আদর করিলে, কিম্বা অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাতে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিলে, তাহাকে নিন্দার ভাজন হইতে হয়।"

এই এস্কিমো জাতির নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান শতাব্দীতে ৪০ বৎসরে ৬০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে একটি মাত্র লোক খুন হইয়াছে। তিব্বতের কি বিদ্রূপ উপলক্ষে ইহারা কাহারও প্রতি কখনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে না। বালক বালিকাগণ পর্য্যন্তও ঝগড়া মারামারি করে না। যদি কোনও বালক অপরের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার শক্ত গালাগালি—"তোর মা শেলাই জানে না," কি "তোর বাবা এক চোখে দেখতে পায় না।"

এই সমস্ত অসভ্যদিগের স্বজাতিপ্রেম এবং জাতিগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ উল্লেখ করা গেল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু ইহাও অবিসম্বাদিত রূপে সত্য যে অনেক অসভ্য জাতিই শিশুহত্যাপাপে লিপ্ত থাকে, অনেকে পরিবারস্থ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করে, এবং রক্তপাতের দ্বারা রক্তপাতের প্রতিশোধ লয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপীয়গণ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না যে, নানাবিধ সদ্‌গুণে যাহারা অলঙ্কৃত, তাহাদের মধ্যে এরূপ গুরুতর দোষ থাকা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু যে সকল দোষের জন্য ইউরোপীয়গণ ইহাদিগকে মনুষ্যসমাজের ভিতর স্থানদান করিতে অসম্মত,

আমরা আগামী বারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল দোষ অপরিহার্য্য, এবং প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদিগকে এই সকল দোষের জন্য যত দূর অপরাধী বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহারা সেরূপ নহে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

১৮৯৬ সনের সূর্য্যগ্রহণ।

ইহা সচরাচর জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যথাক্রমে পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যার ১৪½ দিন পরে, আবার অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা ঘটিয়া থাকে, এবং পূর্ণিমাকালে চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যাকালে সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত বক্রভাবে অবস্থিতি করাতে, (ঐ বক্রত্বের পরিমাণ ৫°.৯) সকল সময় চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াতে, কিম্বা পৃথিবী চন্দ্রের ছায়াতে নিপতিত হইতে পারে না, যদি তাহা হইত, তবে আমরা প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ ও প্রতি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ দেখিতে পাইতাম। ইহার জন্য জ্যোতিষরাজ্যে একটি বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; তদনুসারে চন্দ্র যখন স্বীয় কক্ষপথে চলিতে চলিতে, তাহার সহিত ধরাকক্ষের যে সম্পাতবিন্দুদ্বয় আছে, তাহাদের সন্নিহিত হয়, তখনই যদি তাহা পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রস্থ হয়, তবে গ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

ইহাতে কয়েকটি বিশেষ বিবেচনার কথা রহিয়াছে;—(১) চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে, (২) পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে, (৩) চন্দ্রের "কক্ষপাত" দ্বয় * ধরাকক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া থাকে, অর্থাৎ চন্দ্রের কক্ষপাত স্বয়ং গতিশীল। ইহাদিগের গতিবিচার পূর্ব্বক পরস্পর সমন্বয় করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা বৎসরে যতগুলি গ্রহণ আদৌ সম্ভাব্য বলিয়া অনুমান করিতে পারি, প্রকৃত পক্ষে তাহা ঘটিতে পারে না। যদি তাহা ঘটিত, তবে আমরা যে মহাবিপন্ন হইতাম, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই; প্রতি

* চন্দ্রকক্ষ যে দুই বিন্দুতে ধরাকক্ষকে অতিক্রম করিয়া থাকে, ঐ সম্পাতবিন্দুদ্বয়কে তাহার "কক্ষপাত" বলা যায়।

অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হইলে, আমরা ঐ দিবস "দিনে অন্ধকার" দেখিতাম! প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইলে, আমরা ঐ রজনীতে জ্যোৎস্না উপভোগে বঞ্চিত হইতাম! তাহা হইলে আমাদের জীবনের অর্দ্ধেক কবিত্ব শুষ্ক হইয়া মরু হইয়া যাইত! তাই বিধাতার নিয়তি অন্যরূপ।

উল্লিখিত গণনাসমন্বয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যখন সূর্য্যবিম্ব চন্দ্রের কক্ষপাত হইতে ১৮½ অংশমিত স্থানের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া চন্দ্রের সহিত সমসূত্রে অবস্থিতি করে, তখন ঐ অমাবস্যায় আমরা সূর্য্যগ্রহণ আশা করিতে পারি; কিন্তু এ স্থলেও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের তারতম্যানুসারে, গ্রহণসংঘটনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; কারণ চন্দ্রের কক্ষপথ পূর্ণগোলাকার না হওয়াতে, তাহার সহিত পৃথিবীর দূরত্বের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি অমাবস্যাকালে চন্দ্র ও সূর্য্য কক্ষপাত হইতে ১৫½ অংশের অন্তর্বর্ত্তী হয়, তবে গ্রহণ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ চন্দ্রগ্রহণ কালেও যদি পূর্ণিমাদিনে কক্ষপাত হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ৯½ অংশের ন্যূন হয়, তবে চন্দ্রগ্রহণ অবশ্যই ঘটিবে; এবং যদি ঐ দূরত্ব ১২ অংশের অধিক হয়, তবে তাঁহা কখনই ঘটিবে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গ্রহণসংঘটনের সম্ভাবনাকে আমরা অতি সঙ্কীর্ণ সীমার অভ্যন্তরে আনিয়া ফেলিতেছি।

চন্দ্রের পাত প্রতিদিন প্রায় ৩½ কলা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিয়া থাকে, এবং সূর্য্যের দৈনিক আপাত-দৃশ্য গতি প্রায় ৫৯½ কলা, অতএব একের সহিত তুলনায় অপরের গতিপরিমাণ প্রায় ৬২½ কলা। ইহাতে গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, উভয়ে একবার মিলিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইলে, তৎপর পুনরায় একত্র সমাবিষ্ট হইতে প্রায় ৩৪৬½ দিন অতিবাহিত হইবে। যে হেতু চন্দ্র প্রতি মাসে দুই বার করিয়া "পাতস্থ" হয়, কিন্তু সূর্য্য কেবল ৩৪৬½ দিবসান্তে দুই বার "পাতস্থ" হইয়া থাকে; অতএব যখন উভয়েই একত্রে পাতসন্নিধানে সমাগত হইবে, তখনই গ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। এ দিকে সূর্য্য বৎসরে দুই বার "পাতস্থ" হওয়াতে, উক্ত উভয় সময়েই গ্রহণ ঘটিবে, আশা করা যায়।

এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ২৯½ দিনে এক "চান্দ্রমাস" হইয়া থাকে। এইরূপ দুই চান্দ্রমাস পূর্ণ হইতে ১৭৭ দিন লাগে; কিন্তু সূর্য্য এক পাত অতিক্রম করিয়া, অপর পাতে পৌঁছিতে ১৭৩ দিনের কিঞ্চিদধিক সময় লাগে। অতএব, সূর্য্য এক পাতে থাকিতে যদি চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, তবে তাহার অপর পাত অতিক্রম করিবার ৪ দিবস পরে পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ ঘটিতে পারিবে,

কারণ ৪ দিনে সূর্য্য যে পথ চলিবে, তাহা গ্রহণোপযোগিনী সীমার বহির্ভূত হইবে না। এইরূপে আমরা বৎসরে দুই বার মাত্র চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পারি; কিন্তু চন্দ্রগ্রহণোপযোগিনী সীমা অতি অল্প পরিমিত হওয়াতে, আমরা সকল বৎসরে ঐরূপ ঘটিবার আশা করিতে পারি না।

যদি একবার সূর্য্য "পাতস্থ" হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, তবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী উভয় অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ ঘটিতে পারে; কারণ, সূর্য্যগ্রহণের সীমা ঊর্দ্ধে ১৮½ অংশেরও উপর, ঐ স্থান চলিতে সূর্য্যের প্রায় ১৮ দিন লাগে; অতএব ঐ ১৮ দিন পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে একবার চন্দ্রগ্রহণ হইলে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যা তাহার ১৪½ দিন পূর্ব্বে ঘটাতে, উভয় গ্রহণই সীমাস্থ হইয়া থাকে। এইরূপ দেখা যায় যে, ঐরূপ স্থলে প্রত্যেক পাতে সূর্য্যসমা পর্যায়ক্রমে তিনটি করিয়া গ্রহণ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ ঐ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি গ্রহণ হইতে পারে। কিন্তু এই ছয় গ্রহণ পূর্ণ করিয়া সূর্য্য পুনরায় প্রথম সূর্য্যগ্রহণ সীমান্তর্ব্বর্ত্তী হইতে ৩৪৬½ দিন লাগিবে, এবং তৎপর ১২ চান্দ্রমাসান্তে অর্থাৎ ৩৫৪ দিন পরে, একবার অমাবস্যা ঘটিবে; অতএব তখন আর একটি সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাইতে পারে। তাহার পর চন্দ্রগ্রহণের সময় অর্থাৎ পূর্ণিমা আসিতে ১৪½ লাগিয়া যাইবে, অতএব তাহা যোগ করিয়া ৩৬৫ দিনের বেশি হইয়া যায়। এইরূপে দেখা যায় যে, এক বৎসরে কিছুতেই ৭টির অধিক গ্রহণ হইতে পারে না, এবং দুইটির অধিক চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না। ইহাও লক্ষিত হইবে যে, প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইটি সূর্য্যগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।

ইহা স্বীকার্য্য হইলে আমি সহজেই জবাব দিতে বাধ্য হইয়া পড়ি যে, "যদি প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইটি করিয়া সূর্য্যগ্রহণ অবশ্য ঘটিবে, এবং ৫টি ঘটাও আশ্চর্য্য নহে, তবে আমি কেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্টের সূর্য্যগ্রহণের কথা তুলিয়া পাঠকদিগকে জ্বালাতন করিতে বসিয়াছি? ইহার ভিতরে যে আরও কতটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়া যাইবে!" ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, (১) সকল গ্রহণ একরূপ দৃষ্ট হয় না; কোনটা পূর্ণ এবং কোনটা আংশিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। (২) সকল গ্রহণ সকল স্থান হইতে একরূপ দৃষ্ট হয় না, পৃথিবীর সহিত চন্দ্র ও সূর্য্যের তুলনায় স্থিতিভেদে গ্রহণেরও স্বরূপ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কোনও সূর্য্যগ্রহণই পূর্ণ দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; আগামী ৫ই এপ্রিল একটি সূর্য্যগ্রহণ ঘটিবে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা পূর্ণ দৃষ্ট

হইলেও ছায়ার চতুর্দ্দিকে অনেকটা সৌরবিম্ব বিকশিত থাকিয়া জ্যোতির্বীদিগকে পর্য্যবেক্ষণে অসমর্থ করিবে। তৎপরে ২৮শে সেপ্টেম্বর আর এক সূর্য্যগ্রহণ হইবে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল একাদশ সেকেণ্ড মাত্র! এবং তাহাও ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত ভিন্ন অপর কোথাও পূর্ণরূপে দেখা যাইবে না! অতএব ইহাও পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ হইবে না। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, জ্যোতির্বীগণের পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী যে সকল সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়া থাকে, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করা যাইতে পারে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট যে সূর্য্যগ্রহণ ঘটিবে, তাহা কেবলমাত্র নরওয়ে দেশে পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইবে। "তবেই ত! নরওয়ে দেশে যে গ্রহণ পূর্ণ দৃষ্ট হইবে, তাহা লইয়া আমাদের কিম্বা অন্য কোনও জাতির মাথা ব্যথা কেন?"—কথাটা গুরুতর বটে; কিন্তু 'মাথা ব্যথা' কেবল 'মাথাবান্' লোকের পক্ষেই খাটে, আমাদের 'মাথা' কোথায় যে, 'ব্যথা' করিবে? যাহাদের 'মাথা' আছে, তাহাদের যে 'ব্যথা' ধরিয়াছে, তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গত ডিসেম্বরের "The Observatory" কাগজে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে; তাহার অনুবাদ এইরূপ;—

"অনেকেই এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আগামী ১৮৯৬ খৃঃ অঃ ৮ই আগষ্টের সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নরওয়ে দেশে একদল জ্যোতির্বিদানুধায়ী প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে; এই হেতু আমি সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আমরা 'কুক' কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া একখানা জাহাজ যাত্রীদলসহ প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। সম্প্রতি 'কুক' কোম্পানির নিকট হইতে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

(১) অন্যূন ১৫ জন যাত্রী হইলেই তাঁহারা একখানা জাহাজ রওয়ানা করিতে পারিবেন, ইংলণ্ড হইতে তথায় যাইতে ও কার্য্যসমাপনান্তে পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মোট ৩৩ দিন লাগিবে, এবং তাহার ব্যয় (জাহাজ ভাড়া ও আহারাদির যাবদীয় ব্যয় সহ) প্রত্যেকের ৩৫ পাউণ্ড (এক্ষণকার হারে ৫৬০ টাকা) করিয়া লাগিবে।

(২) ২১শে জুলাই ইয়র্কের অন্তর্গত 'হল' নগর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ২৩শে 'বার্গেন্' বন্দরে, ২৬শে লাফোদেন্ দ্বীপপুঞ্জে, ও ২৭শে 'ত্রণ্ডসো' বন্দরে পৌঁছিবে; তথা হইতে এক নূতন জাহাজ দুই দিনে 'বাদ্সো' নগরে পৌঁছিবে।

(৩) 'বাদ্সো' পর্য্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত জাহাজ তথায় থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণকারীদিগের হোটেলের কার্য্য করিবে।

(৪) ঐ জাহাজ সকল প্রকারে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিবে, এবং নরওয়েবাসীদিগের সহিত কথোপকথনের সুবিধার জন্য তাহাতে একজন 'দোভাষী' থাকিবে।

যাঁহারা যাত্রীদলভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অগ্রেতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

১ম—গমনেচ্ছু যাত্রীর নাম, ধাম ইত্যাদি।

২য়—কিরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনস্থ করেন?

(ক) কেবলমাত্র নেত্রযোগে, কিম্বা (খ) ফটোগ্রাফ দ্বারা, অথবা (গ) দূরবীক্ষণ ব্যবহার পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন?

৩য়—যাত্রী পূর্ব্বে কোনরূপ গগনপর্য্যবেক্ষণ কার্য্য করিয়াছেন কি না?

এত পূর্ব্বে এই সকল তত্ত্বসংগ্রহের তাৎপর্য্য এই যে, সংবাদ পাইলে আমি বহুবিধ সুবিজ্ঞ এবং পর্য্যবেক্ষণপারদর্শীদিগের সাহায্যে, পর্য্যবেক্ষণের ধারা ও বিধানাদি সংগ্রহ করিয়া, যাঁহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে পারি। ইহাতে অনেক কৌতূহলী ব্যক্তি যাইবার পূর্ব্বে কার্য্য শিক্ষা করিয়া যাত্রী হইতে সক্ষম হইবেন। ইতি—

লণ্ডন,
নবেম্বর, ১৮৯৩।

ই, ব্রাউন।
ব্রিটিশ এস্‌ট্রোনোমিক্যাল্ এসোসিয়েশনের
'সৌরশাখার' পরিচালক।"

এত দূরেও যিনি এই প্রবন্ধপাঠে বিরত হন নাই, তিনি হয় ত বলিবেন, 'আচ্ছা, বাপু, এত অনাহূত মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কি? ইহা কি মস্তিষ্কের বিকার নহে? গ্রহণ ত কত দেখিয়াছি, আরও কত দেখিব, তার জন্য এত তাড়া কেন?'—মাথা ব্যথাটা কেন, তাহা পরে বলিতেছি। মস্তিষ্কের বিকার তাহা ঠিক, কিন্তু চিন্তা ও গবেষণা মাত্রেই মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া গণ্য হয়। গ্রহণ ত অনেকই দেখা গিয়াছে, কিন্তু কোনটার জন্য মাথা ত ব্যথা করে নাই। এখন মাথা-ব্যথার কারণটা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি; কিন্তু তাহাতে একটু তাড়া আবশ্যক এই জন্য যে, কাজটা যত শীঘ্র সারিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল, শেষে যদি জীবনে না কুলায়।

মাথা ব্যথাটার কারণ একটি মাত্র নহে। প্রথমতঃ, চন্দ্রগ্রহণকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যকতা, এবং দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণগ্রাস পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যকতা, এতদুভয়ই বিবেচনাসাপেক্ষ হইতে পারে। পূর্ণগ্রহণ-কালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই ছায়ান্তর্ব্বর্ত্তী হওয়াতে, তাহাদের আলোক নেত্রে প্রবিষ্ট কিম্বা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না; এই হেতু তাহাদের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু ক্ষীণালোকে প্রদীপ্ত সামগ্রী রহিয়াছে, তাহা সহজে অবলোকন করা যাইতে পারে; অন্যথা, তাহারা সৌর কিম্বা চান্দ্রালোকে ঢাকা পড়িয়া যায়। পূর্ণগ্রাসে উক্তবিধ আলোকের সম্পূর্ণ অভাব; সুতরাং তাহা ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

সূর্য্য ও চন্দ্র, এই দুয়ের মধ্যে চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে দ্রষ্টব্য জিনিস অতি অল্পই আছে, এবং যাহা আছে, তাহা সচরাচর পর্য্যবেক্ষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের সন্নিধানে এখনও অনেক বিষয় জ্ঞাতব্য রহিয়াছে,—

—

(১) বুধকক্ষাভ্যন্তরে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া কোনও গ্রহ বিচরণ করিতেছে কি না, তাহা একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। ইহা লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা চলিতেছে, অতএব ইহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। (২) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে "মুকুট"-মালা বিরাজ করিতেছে, তাহা একমাত্র পূর্ণগ্রহণকাল ভিন্ন অপর কোনও সময়ে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, এবং কেবলমাত্র ঐ সময়ই তাহারা "রূপে দিক্ আলো করিয়া থাকে;"—ইহাদের স্বরূপ এখনও জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, তাই তাহার পর্য্যালোচনার্থ, পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। (৩) গ্রহণের 'স্পর্শ', 'বিকাশ', 'পূর্ণগ্রাস', 'অব্যাহতি' ও 'মোক্ষ', এই পাঁচ অঙ্গের বিচার ও তাহাদের কাল-গণনা দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্ণয় করা যাইতে পারে; যদি গণিতফলে কিছু ভুল থাকে, তবে তাহা প্রত্যক্ষফলের সহিত মিলাইয়া গণনার উৎকর্ষ সাধন করা যায়। (৪) গ্রহণকালে যথাক্রমে আলোকের মাত্রা পরিমাপ ও তাহা দ্বারা সূর্য্যের আলোকবিতরণক্ষমতা, এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। (৫) এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে বাষ্পাবরণ রহিয়াছে, তাহাদের 'আলোকবিতরণ' এবং 'আলোকপ্রতিফলন'ক্ষমতার বিচার।

এই কারণগুলি পাঠ করিয়া কি কাহারও ব্যথা করিবার জন্য একটা মাথা গজাইয়া উঠিবে?

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হিয়োন্‌সাঙ।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতদেশীয় গ্রন্থসমূহের আংশিক অনুবাদ করিয়া ভারতপুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তিব্বত দেশে "দুব-থঃ সেলক্‌ই মেলোন" (Dub-thah Selkye Melon) নামে একখানি গ্রন্থ আছে; সেই গ্রন্থের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া শরত বাবু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর ত্রৈমাসিকে, "চীনদেশে জীন বা বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং উন্নতি" ইতিশীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতবাসী যে সকল শ্রমণ চীনদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং যে সকল চীনদেশবাসী ভিক্ষু ভারতে আগমন পূর্ব্বক

ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উক্ত প্রবন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রবন্ধের এক স্থলে "থান্-সেন-সান" নামক জনৈক প্রধান পণ্ডিতের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণ পাঠ করিবামাত্র আমাদের দৃঢ়রূপে উপলব্ধি হইয়াছে যে, ইনি বিখ্যাত পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। কিন্তু শরত বাবু ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয়, শরত বাবু অজ্ঞাতসারে হিয়োনসাঙের বিবরণ অনুবাদ করিয়াছেন। এজন্য, সেই প্রবন্ধের কতকগুলি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের বর্ণিত "থান-সেন-সান" এবং জগদ্বিখ্যাত পরিব্রাজক হিয়োন, ভিন্ন ব্যক্তি নহেন।

"থান-সেন-সান" নামের অর্থ করিতে গিয়া শরত বাবু লিখিয়াছেন ;—

The name Than-Ssan-tsan means "the knower of the three Pitakas in the kingdom of Than."—*Sarat Chandra Das' Buddhism in China.*

সিউকি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, হিয়োনসাঙের উপাধি "ত্রিপিটকাচার্য্য"। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক ডাক্তার বিল সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ;—"A Doctor of the three Pitakas." তান্ বা তাং-বংশীয়দিগের শাসনকালে হিয়োন-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত (সিউকি) গ্রন্থ শ্রমণ পিয়েন-কি দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। উক্ত রাজবংশের উপাধি-অনুসারে হিয়োনসাঙের নিবাসভূমি তাং দেশ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই তাং দেশকে তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার "থান দেশ" লিখিয়াছেন। সুতরাং তাং বা থান দেশীয় ত্রিপিটকাচার্য্য, হিয়োন সাঙ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। বিশেষতঃ, চীনদেশীয় যে সকল ভারত-ভ্রমণকারী ভিক্ষুর নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে হিয়োন সাঙ ব্যতীত অন্য কেহই "ত্রিপিটকাচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের বাল্যজীবন, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন ;—

He was admitted into the order of monkhood at a very early age. Being of saintly origin, in intelligence, quickness, sharpness of mental faculties and aptitude for learning, he was unrivalled by any boy of his age.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

উল্লিখিত বর্ণনার প্রতিপোষক বাক্য, শ্রমণ হওইলি এবং যেন-সুং প্রণীত "হিয়োনসাঙের জীবনচরিত" গ্রন্থে রাশি রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিলে এক সংখ্যা সাহিত্যে তাহার স্থান হইবে না। সুতরাং আমরা

হিয়োনসাঙের বাল্যজীবনের দুইটি বর্ণনামাত্র উক্ত জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

অনুবাদ;—"বাল্যকালেই হিয়োনসাঙের আকৃতি ও প্রকৃতিতে রাজোচিত গাম্ভীর্য্য এবং অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইত। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি একদা স্বীয় পিতার নিকট বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। "সং-সেউ"র বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি দাঁড়াইলে কেন? পুত্র উত্তর করিল, "সং সেউ" তাঁহার গুরুর নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন, আর হিয়োনসাঙ কি তাহার পরম গুরু পিতার সমক্ষে সুখাসনে উপবেশন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবে? পুত্রের এইরূপ উত্তরশ্রবণে পিতার বদন আনন্দে ভাসিয়া গেল। তিনি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই পুত্র হইতেই আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।"—*Life of Hiuen-Tseang. p. 2.*

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি কিরূপে ভিক্ষুপদ লাভ করেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

"এই সময় রাজকীয় বৃত্তিভোগী চতুর্দ্দশ জন শ্রমণ লোয়ংএর মন্দিরে নিযুক্ত করিবার জন্য, একদল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। কয়েক শত আবেদনপত্র তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয। হিয়োনসাঙ তৎকালে দ্বাদশবর্ষীয় বালক মাত্র। এরূপ একটি অল্পবয়স্ক বালক কখনই এই পদের প্রার্থী হইতে পারে না। সুতরাং বালক হিয়োনসাঙ সেই মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সকল ঘটনা দর্শন করিতেছিলেন। রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারী চইং-সেন-কো সেই দ্বার দিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি বালক হিয়োনসাঙকে দর্শন করিয়াই দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. হে বন্ধু, তুমি কে? বালক আত্মপরিচয় প্রদান করিল। বালকের উত্তর শুনিয়া সেন-কো তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই পদ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা কর? বালক বলিল, ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু বালক বলিয়া সকলেই আমাকে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেন-কো বলিলেন, কি অভিপ্রায়ে তুমি ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। বালক বলিল, ভগবান তথাগতের পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই আমি বুদ্ধপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। বালকের উত্তরশ্রবণে সেন-কো নিতান্ত প্রীত হইলেন,

এবং তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, পুস্তক হইতে অন্যের উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া তাহা বমন করা অতি সহজ কর্ম্ম, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থরূপ সাগর মন্থন পূর্ব্বক অমৃত উত্তোলন করিয়া তাহা বিতরণ করিবার জন্য অসাধারণ ব্যক্তির প্রয়োজন। যদি আপনারা এই বালককে মনোনীত করেন, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ইনি এক জন সেই অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। যখন এই নবীন নীরদ হইতে ধর্ম্মামৃতরূপ বারিধারা পতিত হইয়া জগদ্বাসী নর-নারীর হৃদয় সুশীতল করিবে, তখন আপনারা কিম্বা আমি স্বয়ং জীবিত থাকিব না বলিয়া আমার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, এই মহামহিমচরিত্রসমন্বিত বালকের মহত্বচন্দ্র কখনই কলঙ্করাহুগ্রস্ত হইবে না বলিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

"আহা, মহানুভব সেন-কো! তোমার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হইয়াছিল।

"শতাধিক যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মচারীগণ প্রথমেই সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালককে শ্রমণের পদে নিযুক্ত করিলেন।"—*Life of Huen-Tsing. pp. 3-4.*

চীনদেশীয় অনেকগুলি শ্রমণ তীর্থদর্শন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪৭ জনের নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল পরিব্রাজকের মধ্যে হিয়োনসাঙের ন্যায় এরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অন্য কেহই ছিলেন না। গুণানুসারে স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, শাক্যপুত্র ফা-হিয়ান ও পরিব্রাজক ই-সিং, ত্রিপিটকাচার্য্য হিয়োনসাঙের নিম্ন শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিশেষতঃ, হিয়োনসাঙের ন্যায়, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে অন্য কেহই ভিক্ষুপদ লাভ করেন নাই। সুতরাং, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার "থান-সেন-সানের" বাল্যচরিত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল হিয়োনসাঙের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের মতানুসারে "থান-সেন-সান" ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, Passing through different countries, he reached India and travelled all over its central and border provinces, in all of which he visited numerous places of pilgrimage. * * * After an absence of seventeen years of which three were spent in the return journey, he returned to China.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

সিউকি এবং হিয়োনসাঙের জীবনচরিত গ্রন্থের মতানুসারে, হিয়োনসাঙ

২৬ বৎসর বয়ঃক্রমে ভারতভ্রমণাভিলাষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনায় সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে, সুতরাং বয়ঃক্রমের এই সামান্য অসামঞ্জস্য গ্রহণযোগ্য নহে। হিয়োনসাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদনদীমকপ্রান্তরময় দূরদূরান্তরব্যাপী ভূপৃষ্ঠ পর্য্যটন পূর্ব্বক, কপিসা-রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত লমপক (লান-পো) হইতে পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত মেঘনাদের ভীষণতরঙ্গকলাপ-বিধৌত সমতট (বামপাল), অন্য দিকে প্রকৃতির বিচিত্র উদ্যানসদৃশ কাশ্মীর (কিয়া-সি-মি-লো) হইতে চোল, দ্রাবিড়, মালকূট, সিংহল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং হিয়োনসাঙের ভ্রমণ-কাল (৬২৯ হইতে ৬৪৫=১৭) সপ্তদশ বৎসর নির্ণীত হইতেছে। বিশেষতঃ, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি, হিয়োনসাঙ ব্যতীত অন্য কোনও পরিব্রাজক ভ্রমণ করেন নাই। সুতরাং উদ্ধৃত বর্ণনা কেবল হিয়োনসাঙের প্রতিই প্রযোজ্য বটে।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার বলেন,—At the noble monastery of Nalendra, he learnt the Yogacharya philosophy from one of its most learned professors, Danta Bhadra or Danta Deva, who was then in his 106th year.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ প্রধানতঃ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য "পোন-মাণের" (ব্রাহ্মণের) দেশে আসিয়াছিলেন। ইহা তিনি স্বয়ংই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত কুছা রাজ্যে উপনীত হইলে, মোক্ষ-গুপ্ত নামক জনৈক আচার্য্য হিয়োনসাঙকে বলিয়াছিলেন, "কেন তুমি পশ্চিম দেশে যাইয়া কষ্ট ভোগ করিবে? আমার নিকটে সম্যুক্তাভিধর্ম্ম, কোষ এবং বিভাস প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক সচ্ছন্দচিত্তে গৃহে চলিয়া যাও।" তদুত্তরে হিয়োনসাঙ বলিলেন, "এখানে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করা যাইতে পারে কি?"

আচার্য্য মোক্ষগুপ্ত বলিলেন;—"What need ask about such an heretical book as that? The true disciple of Buddha does not study such a work!"

হিয়োনসাঙ ইহা শুনিয়া মোক্ষগুপ্তের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন;—

"In our country too we have long had the Vibhasha and Kosha; but I have been sorry to observe their logic superficial and their language weak: they do not speak of the highest perfection.* On this account I have

* The "highest perfection" inculcated by the Yoga system of Buddhism is union with the supreme object of worship.—*Dr. S. Beal.*

come so far as this, desiring to be instructed in the Yoga Sastra belonging to the Great Vehicle. And the Yoga, what is it but the revelation of Maitreya, the Bodhisattva next to become Buddha, and to call such a book heretical. how is it you are not afraid of the bottomless pit? *—হিয়োনসাঙের জীবনচরিত, ৩৯ পৃষ্ঠা।

হিয়োনসাঙের বাক্যশ্রবণে মোক্ষগুপ্ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। উভয়ের তর্কসংগ্রাম আরম্ভ হইল, বিচারে মোক্ষগুপ্ত পরাজিত হইলেন। এ স্থলে সে সকল কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হিয়োনসাঙ যে প্রধানতঃ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের অভিপ্রায়। এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, হিয়োনসাঙ জগদ্বিখ্যাত নালন্দা সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া, তথাকার সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্রের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার শীলভদ্রকে দন্তভদ্র বা দন্তাদব লিখিয়াছেন। শীলভদ্রের প্রকৃত নাম দন্তদেব বা দন্তসেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি ভিক্ষুপদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় গুরুর নিকট শীলভদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধদিগের সদাচারগুলিকে শীল বলে। সেই সদাচারসম্পন্ন "সাধু," ইহাই শীলভদ্র আখ্যার অর্থ। মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্রের সমক্ষে হিয়োনসাঙ উপনীত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক উপবেশন করিলে, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক, হিয়োনসাঙকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কোন দেশ হইতে আসিয়াছ?" তদুত্তরে হিয়োনসাঙ বলিলেন;

I am come from the country of China, desiring to learn from your instruction the principles of Yoga-Sastra. †—হিয়োনসাঙের জীবনচরিত, ১০৭ পৃষ্ঠা।

সিউকি কিম্বা হিয়োনসাঙের জীবনচরিত গ্রন্থে, শীলভদ্রের বয়ঃক্রমের কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং, এ সম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে একজন বিশেষ বর্ষীয়ান পুরুষ ছিলেন, তাহা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার বলেন;—Some of the Indian Acharyas became his pupils in Buddhist philosophy.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

---

* নরক?

† বঙ্গের নামজাদা ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন:—"হিউএন্‌থ্‌সঙ্ পাঁচ বৎসর কাল মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।"—(ভারতকাহিনী; ১৩৭ পৃষ্ঠা।) রজনীবাবুর এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রচার করা ভাল হয় নাই। তাঁহার মত ভ্রান্ত। হিয়োনসাঙ শীলভদ্রের নিকট অন্যান্য যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

নালন্দা সঙ্ঘারামের অধ্যাপকবর্গের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা নির্ণীত হয় যে, মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্রের অধীনে ১৫১০ জন অধ্যাপক দশ সহস্র ছাত্রের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গুণ ও ক্ষমতা অনুসারে, এই সকল অধ্যাপকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ৫০০ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং এক সহস্র অধ্যাপক তৃতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর দশ জন অধ্যাপক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শীলভদ্রের প্রিয় শিষ্য হিয়োনসাঙ প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, চীনদেশীয় অন্য কোনও পরিব্রাজক ভারতীয় লীলাক্ষেত্র নালন্দা সঙ্ঘারামের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অধ্যাপকশ্রেণীতেও স্থান প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের লিখিত some of the Indian Acharyas became his pupils in Buddhist philosophy বাক্য, একমাত্র হিয়োনসাঙের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার বলেন ;—

In refutation of heresies, he wrote a work based on Mahayana principles, called "The Extinguisher of Heresy," containing 6600 slokas—the excellence of which struck all Indian wise men. " " " The people of Aryavarta gave him the name *Mahayana Deva* " " King Siladitya and Kumar and King of southern India called Dhatubhadra and several other princes treated him with great reverence.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

হিয়োনসাঙের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হিয়োনসাঙ "মহাযান" মত সমর্থন করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।

পূর্ব্বভারতের বিজয়কার্য্য সমাধা করিয়া মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য যৎকালে প্রাচীন গৌড় নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় হিয়োনসাঙ সম্রাটের সভায় উপনীত হন। অন্যান্য আলাপের পর, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, আচার্য্য হিয়োনসাঙকে বলিলেন :—

"I have heard that the Master has composed a sastra with a view to restrain wicked doctrine—where is this work ?"

আচার্য্য হিয়োনসাঙ বলিলেন ;—

"It is here," and then he caused the king to take it and look at it. Having examined it the king was much pleased, and addressing his attendants and the rest, he said : "I have heard that when the sun rises

in its splendour the light of the glow-worm is eclipsed, and when the sound of heaven's thunder is heard, then the noise of the hammer and chisel is silenced : so with regard to the doctrine which the Master defends, all the others have been destroyed, and in discussing the method of right deliverance, the priests have not dared to offer a word."—হিয়েনসাঙের জীবনচরিত, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

উক্ত গ্রন্থ এবং তাহার প্রতিপোষক হিয়েনসাঙের মত ও যুক্তিতর্ক শ্রবণে হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী মহাদেবী, বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া হিয়েনসাঙের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

The King had a sister of great intelligence who was distinguished for knowledge of the Sammatiya-school doctrine; she was sitting behind the King, and as she heard the Master of the Law extolling the doctrine of the Great Vehicle, and exposing the extreme poverty of the Little school of Doctrine, she was filled with joy, and could not cease her praises.—হিয়েনসাঙের জীবনচরিত, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

তাহার পর, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, ভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণবর্গকে আহ্বান করিয়া কান্যকুব্জনগরে এক সভা করিয়াছিলেন। সেই সভা ২১ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। সভাস্থলে হিয়েনসাঙের সেই গ্রন্থ উপস্থিত করিয়া, তৎপ্রচারিত মত খণ্ডন করিবার জন্য, বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করা হয়। হিয়েনসাঙ্গ এক খণ্ড ঘোষণাপত্র সেই সভামণ্ডপের দ্বারদেশে সংযুক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

If there is any one who can find a single word in the proposition contrary to reason, or is able to entangle (the argument), then at the request of the opponent, I offer my head as a recompense.—হিয়েনসাঙের জীবনচরিত, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

কিন্তু সভাস্থলে কেহই তাহার কোনও প্রতিবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন না। হিয়েনসাঙের বিজয়বৃত্তান্ত বিঘোষিত হইল। মহাযান সম্প্রদায়ের শ্রমণবর্গ তাঁহাকে "মহাযানদেব," এবং "হীনযান" সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ তাঁহাকে "মোক্ষদেব" আখ্যা প্রদান করিলেন।

The whole multitude were filled with joy on account of the Master's success, and all wished to fix for him a name in connection with his principles.

The congregation of the Great Vehicle called him *Mahayana Deva*, that is the Deva of the Great Vehicle, whilst the followers of the Little Vehicle called him Moksha Deva, i. e. the Deva of deliverance.—হিয়েনসাঙের জীবনচরিত, ১৮১ পৃষ্ঠা।

হিয়েনসাঙ ব্যতীত অন্য কোনও চীন পরিব্রাজক ভারতে "মহাযানদেব" আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই, এবং তিনি কিরূপে সেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

তাহাও প্রদর্শিত হইল। সুতরাং, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের লিখিত "মহাযানদেব" আখ্যাপ্রাপ্ত থান্-সেন-সান, হিয়োনসাঙ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন।

কান্যকুব্জের মহতী সভায় এবং হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রয়াগের "যজ্ঞক্ষেত্রে," "পঞ্চপরিষাদ" বা "মহামোক্ষপরিষাদ" নামক মহোৎসবে হিয়োনসাঙ মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য ও কামরূপের কুমার (ভাস্কর বর্ম্মা) এবং বল্লভীপতি (হর্ষবর্দ্ধনের জামাতা) ধ্রুবভট্ট, এবং ভারতের অন্যান্য অষ্টাদশ জন নরপতি দ্বারা যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, অন্য কোনও চীন-পরিব্রাজকের অদৃষ্টে এরূপ সম্মানলাভ ঘটে নাই। সুতরাং, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের লিখিত,—King Siladitya and Kumar and King of southern India called Dhatubhadra (ধ্রুবভট্ট হইবে) and several other princes treated him with great reverence বাক্য অক্ষরে অক্ষরে হিয়োনসাঙের প্রতি প্রয়োজ্য হইতেছে।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার বলেন ;—Among the numerous Hwashan teachers who visited India, Than-Ssan-tsan was the only one who obtained the high dignity of Pandit and enjoyed the veneration of Indian Kings.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

হিয়োনসাঙ ভারতের রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, অন্য কোনও পরিব্রাজক তাহার শতাংশও সম্মানিত হন নাই। প্রয়াগ নগরে যখন তিনি মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন, কুমাররাজ এবং ধ্রুবভট্ট প্রভৃতি সমবেত রাজন্যবর্গকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বদেশগমনাভিলাষে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন প্রবলপ্রতাপশালী এই সকল নরপতিগণ বহুদূর অবধি তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছিলেন। সেই সকল বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। ফলতঃ, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের লিখিত "মহাযানদেব"—উপাধিপ্রাপ্ত, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, কুমাররাজ এবং দক্ষিণদেশীয় নরপতি ধ্রুবভট্টের সমসাময়িক ত্রিপিটকাচার্য্য, হিয়োনসাঙ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন।

---

* মহারাজ অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ নরপতিগণ একটি পঞ্চবার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, ইহার নাম পঞ্চপরিষাদ বা মহামোক্ষপরিষাদ। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমস্থিত চিরপ্রসিদ্ধ যজ্ঞক্ষেত্রে এই পরিষাদের অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞক্ষেত্রের অনুবাদ হইয়াছে Arena of Charity। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত সেই যজ্ঞক্ষেত্রের (মহামোক্ষপরিষাদের) বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, "সন্তোষক্ষেত্রের মহোৎসব।" বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রচার করিতে হইলে, এইরূপ অনুবাদেরই প্রয়োজন বটে।

ভারতভ্রমণাভিলাষে হিয়েনসাঙ যৎকালে স্বীয় জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তৎকালে থান বা তাং বংশীয় চেং-কোয়ান চীনের রাজাসনে অভিষিক্ত ছিলেন। হিয়েনসাঙের প্রত্যাবর্ত্তনের ৫ বৎসর অন্তে, অর্থাৎ ৬৫০ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট চেং-কোযান লোকান্তরিত হয়েন। হিয়েনসাঙ স্বদেশে উপনীত হইলে, সম্রাট চেং-কোয়ান বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিযাছিলেন। হিয়েনসাঙের জীবনচরিতলেখক, শ্রমণ হুওলি এবং য়েন-সুং ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারও তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন :—

The reigning Emperor of China, Chen-ku-an received him with the greatest demonstration of reverence and respect.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

হিয়েনসাঙ ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মহাবস্তু * গ্রন্থাদি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রমণ হুওলি এবং য়েন-সুং, স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিযাছেন। তিনি বলেন,—"থান-সেন-ঘান"

presented him (সম্রাটকে) with more than 600 Volumes of Sanskrit Manuscripts written on palmyra leaves, † relics of Buddha, images, portraits and different sort of Indian articles.—*S. C. Das' Buddhism in China.*

বোধ হয়, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার, হুওলি এবং য়েন-সুং প্রণীত হিয়েনসাঙের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থলে কেবল সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়, আমাদের বিবেচনায়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিকৃতি ও শারীরিক চিহ্ন।

† Altogether 520 fasciculi, comprising 657 distinct Volumes, carried upon twenty horses.—হিয়েনসাঙের জীবনচরিত; ২১৪ পৃষ্ঠা।

কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত।

কবিকলহ বিলাতে একটা জনপ্রবাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী সাহিত্য কবিকলহের কলনিনাদে মুখরিত, কঠোর নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। চসরের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রাউনিং অবধি এ কলহকাহিনী অতি দীর্ঘায়ত। এ দেশেও এ পদার্থের একান্ত অসদ্ভাব নাই। কালিদাস ও দিঙ্‌নাগের কলহ প্রমাণসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্করের বৃত্তান্ত সুবিদিত। আধুনিক কলহের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কবিকলহ বড়ই ক্ষোভ ও পরিতাপের বস্তু। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, দেবাত্মা হইলেও কবি মানুষের উপাদানে গঠিত, মহান্ হইলেও কবি মানুষের ক্ষুদ্রত্বে সীমান্বিত।

এই প্রবন্ধে দুই জন বাঙ্গালী মনীষীর কিছু প্রসঙ্গ করিব। তাঁহারা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। কেহ না ভাবেন যে, ইহাতে আমি ঐ কবিকলহের সূচনা করিতেছি। কলহ আমার প্রকৃতির প্রতিকূল; বিশেষতঃ নারদের অপবাদ শিরে বহন করিতে আমি একান্ত অপারগ।

বাঙ্গালী পাঠক অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইল, কবিবর শ্রীনবীন বাবু 'রৈবতক' কাব্য প্রচার করেন; সম্প্রতি তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের 'নব্যভারতে' কুরুক্ষেত্রের এক সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রচারিত হয়। উহার এক স্থলে সমালোচক লিখিয়াছেন,—

"'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম বাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। * * আমরা যখন কুরুক্ষেত্র প্রথম বার পড়িলাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম কি নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না। আবার পড়িলাম, তখন দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণ রূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী।"

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কে অগ্রে, কে পশ্চাতে, এ কথার মীমাংসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আর আমরা তাঁহাদের সমসাময়িক হইয়া কখনই ইহার সুমীমাংসা করিতে পারিব না। পারিবে আমাদের ভবিষ্য-বংশীয়েরা। এ বিষয়ে কবি গিরিচূড়ার তুলনীয়। কিরাত শিখরদেশে কুটীর

বাঁধিয়া রয়; সে কখন পর্ব্বতের তুঙ্গতা উপলব্ধি করে না। কিন্তু বহুদূর হইতে দেশবাসী চাহিয়া দেখে, গিরি উচ্চ শিরে আকাশের স্পর্দ্ধা করিতেছে। কিন্তু অন্যান্য কথা কি ঠিক? তাহার ত এই মীমাংসার সময়। অতীতের কুয়াশায় ঢাকিয়া গেলে, আর ত এ সকল কথার কখনও নিষ্পত্তি হইবে না।

সংক্ষেপে নব্যভারতের মন্তব্য এই,—"বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের প্রতিপাদ্য এই যে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন কৃষ্ণের জীবন-ব্রত। নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্রেরও মৌলিক কল্পনা ঐ। অতএব নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর নিকটে সম্পূর্ণরূপে এ বিষয়ে ঋণী।"

এ কথা কি ঠিক? আমি যত দূর জানি, এ কথা ঠিক নহে। এ বিষয়ে নবীন বাবু স্বীয় কবিপ্রাতিভা ভিন্ন আর কাহারও কাছে তিলার্দ্ধও ঋণী নহেন। বোধ হয়, পাঠক এ প্রবন্ধ পড়িয়া আমারই মতে সম্পূর্ণ মত দিবেন।

এ বিষয়ে নব্যভারত ভ্রমে পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রম অসঙ্গত নহে। কাকতালীয় ন্যায়ে (পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Post hoc, ergo, propter hoc বলেন) প্রথম দৃষ্টিতে অনেকটা সত্যতার ভান হয়। ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য অনেক স্থলে কার্য্যকারণের ভ্রম উৎপাদন করে। [illegible]'পত্রে বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইবার আরম্ভের পর, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র প্রচারিত হয়; অতএব অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, মৌলিক কল্পনার জন্য নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী। নব্যভারতেরও ঐ ধারণা। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে।

অবশ্য কাহাকেও প্রমাণ ভিন্ন আমার কথা গ্রহণ করিতে বলি না। আর এ বিষয়ে প্রমাণও যথেষ্টই আছে।

বঙ্কিম বাবু এই [illegible] কৃষ্ণচরিত্র বুঝিয়াছেন। "যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—'বেদে ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম লোকহিতে'—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি" (ধর্ম্মতত্ত্ব)। রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, নব্যভারত যাহাকে কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন—রৈবতকেরও মৌলিক কল্পনা।

১২৯৭ সালের বৈশাখের সংখ্যা 'সাহিত্যে' রৈবতকের সমালোচনায় আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম,—

"নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এই মহাকীর্ত্তিপ্রসঙ্গ লইয়া রৈবতক রচিত। খণ্ড ভারতে কি উদা-

যত্ন পরার্থপরতা অলৌকিক কৌশল প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই এ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। * * তাঁহার জীবনের মহাব্রত

এক ধর্ম্ম এক জাতি
একই সাম্রাজ্য নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম
লক্ষ্য সে পুরুষ ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

* * কৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সহিত ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছিল। ইহার মূলমন্ত্র—

এক জাতি মানব সকল
এক বেদ মহা বিশ্ব অনন্ত অসীম,
একই ব্রাহ্মণ তার মানবহৃদয়,
একমাত্র মহাযজ্ঞ নিষ্কাম সাধনা।

এই কয়টি কথাতেই দুর্ব্বাসার বিশেষ আপত্তি। তাঁহার বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অঙ্কুরে উন্মূলিত না হইলে

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম এই পাপানল
গ্রাসিবে ভারত রাজ্য দাবানল মত।

এই ভয়ে তিনি বাসুকির (অনার্য্যের নেতা ও ঈশ্বরের) সহিত মহাসন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন,

আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্যশিলায়
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিশিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।"

অতএব রৈবতকের মূল কল্পনা কৃষ্ণের জীবনব্রত, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন এবং দুর্ব্বাসার অনার্য্যজাতির সহিত যোগদান করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ। এই দুই প্রবল বিপরীত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে রৈবতক কাব্য। রৈবতকের বিষয় যাহা বলিলাম, কুরুক্ষেত্রের পাঠক দেখিবেন যে, ঐ কাব্যেরও তাহাই। কারণ, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র মৌলিক কল্পনায় স্বতন্ত্র নহে। একে শ্রীকৃষ্ণের আদ্য-লীলা, অন্যে মধ্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব, কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনার জন্য যদি নবীন বাবু ঋণী হয়েন, রৈবতকের জন্যও অবশ্য ঋণী হইবেন। কিন্তু আমি দেখাইব, তিনি আদৌ ঋণী নহেন।

এ কথা প্রমাণ করিতে আমি যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিব, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য। বাহ্য;—(External) ও আন্তর (Internal evidence)। আন্তর সাক্ষ্য নবীন বাবুর ও বঙ্কিম বাবুর রচিত গ্রন্থাদি। আর বাহ্য সাক্ষ্য বাঙ্গালা

সাহিত্যের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু, প্রফুল্ল বাবু, ঈশান বাবু এবং স্বয়ং বঙ্কিম বাবু। প্রথম আন্তর সাক্ষ্য।

রৈবতক এবং কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইবার অনেক বৎসর পূর্ব্বে নবীন বাবুর রঙ্গমতী প্রকাশিত হয়। রঙ্গমতীতে আমরা কৃষ্ণের জীবনব্রত-সম্বন্ধে এই কয়টি কথা লিখিত দেখি।

এই বহ্নিশিখা
দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম,
মহাজ্ঞানী নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রাচীনা নৃপতি শোণিতপ্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।

এই কয়টি পংক্তিতে, যাহা ইতিপূর্ব্বে মহাভারতস্থাপনের—যাহা পরে বৈবতকের মৌলিক কল্পনা হইয়াছে,—বিস্পষ্ট আভাস লক্ষিত হয়।

আর এক কথা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে এক হইলেও, বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ও নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কি এক? কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম বাবু ভাগবতের ব্রজলীলা অনৈতিহাসিক বলিয়া এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর এদিও দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিম বাবু পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া ব্রজলীলার কতক ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর স্নেহের পুতুল, ইহার অধিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু নবীন বাবু প্রথম হইতেই ব্রজলীলায় বিশ্বাসবান্। আসিন্ধু হিমাচল এ ভারতে যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, নবীন বাবু কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় মুদ্রণের বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত রৈবতকের এক সর্গ, সেই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্রাঙ্কণে নিয়োজিত করিয়াছেন। অবশ্য ঐ সর্গ আরও মধুময় হইতে পারিত। কুরুক্ষেত্রে যে কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ দেখি, তাহার উদ্বেলতা ঐ সর্গে নাই। তাহার কারণ তাঁহাকে সসঙ্কোচে লিখিতে হইয়াছিল; পতিত ভূমি কর্ষণ করা বড় স্পর্দ্ধাসাধ্য! কিন্তু তথাপি নবীন বাবু সর্ব্বত্রই, ভাগবতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা ব্রজলীলার প্রেম ও কুরুক্ষেত্রলীলার, নিষ্কামতা অর্থাৎ ভাগবত ও মহাভারত এই উভয় মিশাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব, বঙ্কিম বাবুর এবং নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের ধারণা অনেক অংশে বিভিন্ন।

এ সকল আন্তর সাক্ষ্যে হয় ত অনেকের সন্দেহ মিটিবে না। সেই জন্য বাহ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি।

১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্রে (অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের আগষ্ট মাসে) লিখিত পত্রে (যাহা রৈবতকের আরম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে) নবীন বাবু ঈশান বাবুকে এই কয়টি কথা লিখেন,—

"কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আদি-তীর্থ গিরিব্রজপুর বা আধুনিক রাজগৃহে রাজকার্য্যে অবস্থান কালে, স্থানমাহাত্ম্যে উদ্বেলিত-হৃদয়ে কাব্যজগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর একবার পাঠ করি। সেই অবস্থায় তথায় দেখিলাম, গিরিব্রজপুরের সেই পঞ্চগিরি ব্যূহ, প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, বহুর উপলরাশির মধ্যে সেই ভারত খ্যাত রঙ্গভূমি, মসৃণ বৃত্তিকা পর্য্যন্ত এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। * * * মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম ভারতের গত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল উপত্যকার দুই শ্রেণীর মালার অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম তাহার সানুদেশে—সেই দৃপ্ত ভাস্বরাতীত—ভগবান্ বাসুদেব কি প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কত ভারতবাসীর, পতিত মানবজাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম—তলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে বৈবতক সূচিত এবং মধ্যভূভাগের সেই পরিবদ্ধ শৈলমালার ছায়ায় তাহার অধিকাংশ রচিত হইল।"

এই বিষয় স্বয়ং নবীন বাবুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতেছি। রাজগৃহে অবস্থিতিকালে ১৮৮২ সালে মহাভারত পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণের মহান্ জীবনব্রত—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন—প্রথম প্রতিভাত হয়। তিনি বুঝেন যে, মহাভারত অর্থে ভারত সাম্রাজ্য (Indian Empire)। সেই সাম্রাজ্য আবার ধর্ম্মসাম্রাজ্য। তাহার রাজার নাম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। উদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবু, তাহার পর কালীপ্রসন্ন বাবু, তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বৈদিক সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও বুদ্ধদেবচরিত্র বিশেষরূপে উদ্ভাসিত করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এক মহা ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তিন জনেই ক্রমান্বয়ে অস্বীকার করিলে, নবীন বাবু আপনার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া, তিন খানি মহাকাব্যের (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) সূচনা করেন। পরে তিন খানি কাব্যের গল্পাংশের (Plot) খসড়া করিয়া রৈবতক লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রফুল্ল বাবু এ কথা শুনিয়া, মহাভারতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাব্য লিখিতে নিষেধ করিয়া, নবীন বাবুকে ১৮৮২ সালে তীব্র ভাষায় এক পত্র লিখেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কাব্যসূচনার খসড়া পড়িয়া ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে নবীন বাবুকে যে পত্র লিখেন, তাহার একাংশ উদ্ধৃত হইল।

"জয়দেবপুর, ঢাকা। ৬ই ডিসেম্বর। ৮২।

আমি আপনার কাব্যসূচনার এক খোসখৎ নকল করাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেইটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়াছি। conception extraordinary grand (অত্যাশ্চর্য্য মহতী কল্পনা)। execution (চিত্রাঙ্কন) ঠিক তেমন হইবে কি না সে বিষয়ে সংশয় আছে। মহাভারতরূপ কাব্যসমুদ্রকে আবার সাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্দ্ধার কথা, প্রাণিয়ে অসাধ্য সুখের কথা। আমি গৌরব না বলিয়া সুখ বলিলাম। কারণ এখনকার দিনে বেনে ও মুদীর দোকানে যশঃ ও গৌরব খরিদ করিতে পাওয়া যায়। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন কি? * * এই কাব্যের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিব কি? এত দিন বাঁচিব কি?"

নবীন বাবু কাব্য লিখিতেছেন শুনিয়া, বঙ্কিম বাবু তিন খানি কাব্যের সূচন (plot) ও রৈবতকের যে কয় সর্গ লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সকল দেখিয়া ২০শে জানুয়ারী ১৮৮৩ সালে তিনি নবীন বাবুকে ইংরাজিতে যে পত্র লিখেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"JAGPUR. January, 20th 18

"I return your manuscripts today in a registered parcel. I have rea through them.

"You have planned a new Mahabharat indeed—an exceedingly ambi tious work, the most ambitious perhaps since the days of Haribansa an Adhatya Ramayana. It is no use against the plan that it is ambitiou Provided you can execute it with the same grandeur as you have planne you will properly justify yourself. Properly executed the poem will course take its rank as the greatest in the language.

'I warn you however not to be too confident of success. Of popu ity I can not promise you much. If executed adequately many probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth century while others will take it to be a parody of the Mahabharat and I m assure you that an inadequate execution is likely to bring it down to latter level.

"Lastly will your poem be historically and politically true. I have ad vised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are con cerned. But I am hardly bold enough to advise you to do so in the case of large national movements. Now I believe it is *not historically true either that Krisna set himself up against Brahmonical authority* (there was never a greater champion of it) or that the Brahmans ever co-alesced with the Non-aryans, in order to put down the Kshatryas.

I must also tell you that the second canto (?) (কুরুক্ষেত্র) has struck me as being a sort of parenthesis between the other two—the main action being carried on by the first and third. The action in the second canto (?) is mainly the death of Abhimanyu and the only connection it has with the action of the poem is that it brings some personal misfortune to Krisna and Arjan. But the death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage—*the estab*

lishment of the empire; and it is therefore only an episode. An episode ought not to take up one of the three cantos (?) to itself."

বঙ্কিম বাবুর এই পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

"আজ ডাকযোগে তোমার হস্তলিপি কেবত পাঠাইলাম। আমি উহা সকল পড়িয়াছি, তুমি সত্য সত্যই এক অভিনব মহাভারত সূচনা করিয়াছ—অতি দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য—হরিবংশ ও অধ্যাত্মরামায়ণ রচনার পর বুঝি আর কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য করে নাই। দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া তাহার সূচনা অবৈধ, এ কথা নহে। সূচনা যেমন মহতী, যদি রচনা তাহার অনুরূপ হয়, তবে তোমার কার্য্য সর্ব্বথা সুসংগত হইবে। যদি যথোচিত রচনা করিতে পার, তোমার কাব্য অবশ্যই ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

"কিন্তু সাবধান, কৃতকার্য্য হইবে, এ আশা বড় বাঁধিও না। আমার মতে, ইহাতে তোমার যশঃ অত্যল্পই হইবে। যদি রচনা সুচারু হয়, অনেকে হয় ত ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিবেন, আবার অন্যে ইহাকে মহাভারতের বহুস্থানুকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিবে। রচনা অযথা হইলে ঐরূপই হইবার সম্ভাবনা। শেষ কথা, তোমার কাব্য কি ইতিহাস ও রাজনীতির অনুগত হইবে? আমি ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসের সহিত কাব্য সম্পর্কহীন করিতে বলিয়াছি, কিন্তু ইতিহাসের বিপরীত করিতে বলিতে পারি না। কাব্যোক্ত চরিত্রচিত্রণে তাহাও করিতে পার। কিন্তু জাতীয় জীবনের ব্যাপক ঘটনাবলীর অপলাপ করিবার উপদেশ দিতে আমার ত সাহস কুলায় না।

আমার মতে কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিকূল করিয়া চিত্রিত করা, ইতিহাসের অনুগত নহে। কৃষ্ণের মত আর কে ব্রাহ্মণ্যের এত পরিপোষক ছিল? আর ব্রাহ্মণেরা যে অনার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়শক্তির বিলুপ্তি সাধন করিয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক নহে।

"আর এক কথা। আমার মনে হয় যে, তোমার সূচিত দ্বিতীয় কাব্য (কুরুক্ষেত্র) যেন প্রথম ও তৃতীয় কাব্যের একটা অবান্তর মাত্র। প্রথম ও তৃতীয় কাব্যেই প্রতিপাদ্য ঘটনা সংসাধিত হইতেছে। দেখ, দ্বিতীয় কাব্যের প্রধান ঘটনা অভিমন্যুর মৃত্যু। প্রতিপাদ্য ঘটনার সহিত ইহার এইমাত্র সম্বন্ধ যে, ইহা দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন কিছু শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কাব্যের প্রতিপাদ্য ঘটনা বা দ্বিতীয় ঘটনা (সাম্রাজ্যস্থাপন)—ইহাদের কি বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইল? অতএব, ইহা কেবল উপগল্প মাত্র। উপগল্পে কি তিন ভাগের এক ভাগ নিয়োজিত করা উচিত?"

উক্ত পত্র সহ রৈবতকের যে হস্তলিপি প্রত্যর্পিত হয়, তাহার প্রথম সর্গের শেষে বঙ্কিম বাবু এই মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"Remarks on Chapter I. Krisna preached, if he preached anything devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him against the Brahmins. The modern poet is of course welcome to give a new charact[illegible] which this chapter does."

ইহার ভাবার্থ এই—

"কৃষ্ণ কোনও মত [illegible] সন্দেহ। যদি কিছু করিয়া থাকেন, তবে সে ব্রাহ্মণভক্তি। [illegible] ত করা, সর্ব্ববিধ জনপ্রবাদ ও প্রচলিত প্রস্থা[illegible] মত কৃষ্ণের চরিত্র নূতন ভাবে অঙ্কিত

[illegible] সর্গকে বড় ভাব ও বর্ণনাপ্রধানদোষে [illegible] প্রশংসা করেন। সে সকল

নবীন বাবু ঐ সকল মন্তব্য পাঠে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর ঐ সকল মতের নম্রভাবে প্রতিবাদ করিলে, তিনি তদুত্তরে ১৮৮৩ সালের ১৩ই মে তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখেন,—

"I do not quite understand why you should feel any diffidence in carrying on 'Raibatak.' My own plan is never to ask the opinion of others and as I have found by experience my interference in the way of advice or criticism has spoilt many a fine work. * * Genius, even mere talent must work out its conceptions."

ইহার ভাবার্থ,—

"তুমি রৈবতক লিখিয়া শেষ করিতে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছ, বুঝিতে পারি না। আমার নিয়ম এই, আমি অপরের পক্ষে পরের মতামতের অপেক্ষা রাখি না। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, আমার উপদেশ বা সমালোচনায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। প্রতিভা, এমন কি মনীষাও, আপন মৌলিক কল্পনা আপনার মতে প্রকটিত করুক।"

তাহাই হইল। নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা আপন মৌলিক কল্পনা আপনার মতেই প্রকটিত করিল। তাহার ফল রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র। আমরা বঙ্কিম বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ঐ মৌলিক কল্পনা কি। প্রথম, কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবমত প্রচার। ইহাকেই আমরা রৈবতকের সমালোচনায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়াছি। বঙ্কিম বাবু ইহার নাম দিয়াছেন, গীতোক্ত ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ক্ষত্রিয়-শক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও অনার্য্যশক্তির মিলন। তৃতীয়, ভারতসম্রাজ্যসংস্থাপন।

রৈবতক সাহিত্য-সংসারে ১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ঈশান বাবু উহার প্রুফ দেখিবার ভার লয়েন। সম্পূর্ণ কাব্যের হস্তলিপি তখন ঈশান বাবুর নিকট ছিল। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের মধ্য-ভাগে, 'প্রচার' পত্রে বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

শুনিয়াছি, ঈশান বাবু [illegible] শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষ কার্য্যাবলীর অপলাপে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু নবপ্রচারিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে [illegible] ছেন বলিয়া, আত্মপক্ষসমর্থন করেন। কিন্তু ঈশান বাবু [illegible] নজির গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করেন।

আর সাক্ষ্য উপস্থিত [illegible] রাব [illegible] র সহিত একমত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য মাত্র মিথ্যা বা কল্পিত হইবে। [illegible] বাবু, ঈশান বাবু, প্রুফ

যদি কোথাও ভ্রম বা অনবধানক্রমে সত্যের অপলাপ ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা কৃপা করিয়া তাহার সংশোধন করিবেন।

এখন পাঠক কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করুন।

প্রচারে কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয়, ১৮৮৪ সালে। আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত কালী-প্রসন্ন বাবুর ও বঙ্কিম বাবুর পত্রে দেখি যে, ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে নবীন বাবু রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক এই কাব্যত্রয়ের সূচনা করিয়াছেন। আরও দেখি যে, ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে রৈবতকের অন্যূন তিন সর্গ লিখিত হইয়াছে। আরও দেখি যে, ঐ কাব্যত্রয়ের মৌলিক কল্পনা শ্রীকৃষ্ণের নবধর্ম্মপ্রচার ও ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন, এবং ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের মিলিত শক্তির সংঘর্ষ। আরও দেখি যে, ইহাকেই কালীপ্রসন্ন বাবু অতি মহতী কল্পনা এবং বঙ্কিম বাবু প্রতিভার আপন সূচনা বলিয়াছিলেন। আমরা আরও দেখি যে, প্রচারে কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র রৈবতক লিখিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত ছিল। কালের পৌর্ব্বাপর্য্য সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে দুই বৎসর পূর্ব্বে সূচিত রৈবতক কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা কি ঐ কালে প্রচারিত কৃষ্ণচরিত্রের অনুকরণ হইতে পারে? কিরূপেই বা নবীন বাবু ইহার জন্য বঙ্কিম বাবুর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী হইতে পারেন। যে শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলার আন্দোলনে আজ বঙ্গদেশ তরঙ্গায়িত, ১৮৮২ সালে ত তাহার প্রসঙ্গমাত্রও ছিল না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সে মৌলিক কল্পনার অবলম্বনে নবীন বাবু কাব্যরচনা করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু পূর্ব্বে তাহার অনুমোদন করেন নাই। কৃষ্ণচরিত্র ঐরূপ ভাবে চিত্রিত হওয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণে নূতন চরিত্র আরোপ করা (giving a new character) বলিতেন। তাঁহার মতে তখন উহা জন-বাদ ও প্রত্নাদির সর্ব্বথা বিপরীত বোধ হইত। শুধু তাহাই নহে, তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। (কৃষ্ণ কোন অধর্ম্মই প্রচার করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন, তবে সে ব্রাহ্মণভক্তি। ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত মিলিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণশক্তির সংঘর্ষ, ইতিহাসের অননুগত" ইত্যাদি)।

ইহার পর বোধ হয়, কেহই নব্যভারতের মত 'নবীন বাবু মৌলিক কল্পনায় সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুর কাছে ঋণী' এ কথা বলিবেন না। শেষ কথা। যদি মৌলিক কল্পনা নবীন বাবুরই নিজস্ব হইল, তিনি যদি বঙ্কিম বাবুর কাছে এ বিষয়ে আদৌ ঋণী না হইলেন, তবে জিজ্ঞাস্য, ঐ কল্পনা ইতিহাসের অনুগতা

কি না? এ কথার মীমাংসার স্থল এ নহে। কৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এখন পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও অনার্য্যশক্তির সংঘর্ষ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু সংপ্রতি কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নবীন বাবুর পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে কয়েকটি ঘটনার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—ঋষিশাপে শ্রীকৃষ্ণের অনার্য্যহস্তে অপমৃত্যু এবং যদুবংশ-ধ্বংস। তাহার অব্যবহিত পরে অনার্য্য কর্ত্তৃক যাদবপুরী ও যদুপত্নীলুণ্ঠন। নাগদংশনে পরীক্ষিতের অকালমরণ, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, জরৎকারু ঋষির নাগরাজভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ এবং তাহার গর্ভজাত আস্তিক ঋষির সর্পসত্রে নাগজাতির জীবনরক্ষা; ইত্যাদি ঘটনার অর্থ কি? অবশ্য যাঁহাদের কাছে মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কল্পনা কাব্য মাত্র, তাঁহাদের প্রবল ঐতিহাসিক তোপের সম্মুখে এ সকল ঘটনা তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারিবে না। কিন্তু অন্যের পক্ষে এ সকল গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধানের সামগ্রী।

অতএব, নব্যভারত যে দুই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নবীন বাবুর নিজস্ব—ইহাতে তিনি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অগ্রে হউন বা পশ্চাতে হউন, তিনি কাহারও কাছে অণুমাত্র ঋণী নহেন। তাঁহার ঋণ কেবল কবিপ্রতিভার নিকট। এই জন্যই আমি রৈবতকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম যে, 'কবি প্রতিভার আলোকে ভূত ইতিহাসের অন্ধকার ছায়া আলোকিত করেন। অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভাবলে পুরাতত্ত্ববিদের বহু গবেষণায় আবিষ্কৃত ইতিহাস ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।' নবীন বাবু হয় ত এ কথা মানিবেন না। তিনি বলিবেন,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"
(রৈবতকের মুখপত্র)।

ভক্তের হৃদয়ে স্বপ্রকাশ—নি আবির্ভূত হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকটিত করেন।

বঙ্কিম বাবুর কাছে বাঙ্গালা ভাষা অনেক অংশে ঋণী। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সমগ্র বাঙ্গালা দেশ উদ্ভাসিত করিয়াছে। তিনি রচনারাজ্যের রাজা। তাঁহার রাজমুকুট, বাসবের চাপের মত, 'পদ্মরাগ ত হীরা' প্রভৃতি বিবিধ রত্নে খচিত। নব্যভারত কেন তাহা ঝুঁটা মণিমুক্তা করিতে চাহেন? ইহাতে কি তাঁহার কিরীটের প্রভা মলিন হইবে না?

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমাজ।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চুল বাঁধা।

মাতা। তাই তাই তাই।
শিশু। তাই তাই তাই।
মাতা। মামার বাড়ী যাই।
শিশু। মামা বালি দাই।
মাতা। তাই তাই তাই।
শিশু। তাই তাই তাই।
মাতা। মাসীর বাড়ী যাই।
শিশু। মাতি বালি দাই।
মাতা। মাসী নেবে কোলে।
শিশু। মাতি নেবে তোলে।
মাতা। সন্দেশ দেবে গালে।
শিশু। তন্দে দেবে দালে।
মাতা। ক্ষির দেবে পাতে।
শিশু। থি দেবে পাতে।
মাতা। চিনি দেবে হাতে।
শিশু। তিনি দেবে আতে।
মাতা। বাবা আস্‌বেন ঘরে।
শিশু। বাবা আবে দলে।
মাতা। খোকা নেবে কোলে।
শিশু। গাগা নেবে তোলে।
মাতা। হার দেবে গলে।
শিশু। হা দেবে দলে।

ঠাকুরঝি। তা বাঁধে বৈ কি বোন, তবে আজ তাবিজ বাজুর বাহার কিছু বেশি রকম, তাই বল্‌ছি!

ভ্রাতৃবধূ। তা ঠাকুরঝি, মেয়েমানুষে কি গয়না পরে না?

ঠাকুরঝি। পরে বৈ কি, তবে আজ আবার সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফুলের মালারও আয়োজন দেখছি!

ভ্রাতৃবধূ। তা ঠাকুরঝি, মেয়েমানুষে কি ফুল পরে না?

ঠাকুরঝি। পরে বৈ কি, তবে আজ আবার গুন্ গুন্ করে গান হচ্ছিল, ঠোঁটে হাসি যে ধরে না লো?

ভ্রাতৃবধূ। বলি ঠাকুরঝি, যাত্রার গান দুই একটা তোমার কাছেই ত শিখেছি। আর মেয়েমানুষে কি কখনও হাসে না, সদাই কাঁদে?

ঠাকুরঝি। তা হাসে বৈ কি বোন, আনন্দ হইলে মেয়েমানুষের বুকটাও একটু ধড়াস্ ধড়াস্ করে! কেমন, ঠিক কথা বলিছি কি না?

ভ্রাতৃবধূ পরাস্ত হইলেন, লজ্জায় অভিভূতা হইলেন। রঞ্জিতমুখী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে ধরি, আর ঠাট্টা করিও না,—এই নাও চুল বাঁধা রেখে দিলাম।"

ঠাকুরঝি। বালাই! চুল বাঁধা রাখবি কেন বন? তোদের চুল বাঁধিবার ত বয়সই এই। তোরা গহনা পরিবি নি ত গহনা পরিবে কে? তোদের মুখে একটু হাসি দেখিলে আমাদের প্রাণটা জুড়ায়। আয় বোন, ভাল করিয়া বস, আমি তোর চুল বাঁধিয়া দি। এমন খোঁপা বেঁধে দিব যে হাজার টাকা মূল।

ভ্রাতৃবধূ সুধার আপত্তি সত্ত্বেও স্নেহময়ী ননদিনী কালীতারা পার্শ্বে বসিয়া সযত্নে খোঁপা বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। সে খোঁপা বাঁধিতে অনেক ক্ষণ লাগিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি খোঁপা বাঁধা শেষ হইল না। ইত্যবসরে আমরা একবার গ্রামটা পরিক্রমণ করিয়া আসি,—গ্রামের খোস গল্প দুই একটা সংগ্রহ করিয়া লই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের ব্যবস্থা।

আজ আট বৎসর সুধার বিবাহ হইয়াছে। অনেক গোলযোগের পর বিধবার

* যাঁহারা সুধার বিবাহের কথা ও পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন, তাঁহারা প্রণীত "সংসার" নামক উপন্যাস খানি পাঠ করিবেন।

বিবাহ হয়, বিবাহ হইয়াই যে গোলযোগ থামিবে, আমাদের সেরূপ সমাজ নহে। শরতের মাতা ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন, সুধার জেঠামহাশয় তারিণী বাবু দলস্থ লোকের অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, স্বদেশবৎসল শরচ্চন্দ্র গ্রামের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন, দয়ার্দ্রহৃদয়া সুধা গ্রামের গরিব দুঃখী সকলকে রোগে, শোকে, বিপদে, দুঃখে, আত্মীয়ের ন্যায়, ভগিনীর ন্যায়, সাহায্য করিতে লাগিলেন। শরৎ ও সুধার অনিন্দনীয় চরিত্র, অশেষ পরোপকার ও অকপট দেশহিতৈষিতার, সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু সদাচরণে জাতিরক্ষা, গর্হিতাচরণে জাতিধ্বংস,—এ নিয়ম আমাদের প্রাচীন কালে ছিল, এক্ষণকার সভ্য সমাজের রীতি নহে!

তালপুখুর ও নিকটস্থ গ্রামের সমাজপতিগণ বেঁকিয়া বসিলেন,—বলিলেন, বিধবাবিবাহ স্বীকার করিলে হিন্দুধর্ম্মের আর রহিল কি? সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ উচ্চারণ করিলেন, বিধবাবিবাহপ্রথা ব্যভিচারমাত্র।

ভাগ্যক্রমে হেম ও শরৎ, উক্ত সমাজপতি ও দিগ্‌গজদিগের সহিত কুটুম্বিতা পাতাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, এবং তাঁহাদিগের মতামতের জন্য অনাহারে বা অনিদ্রায় কাল কাটাইতেন না। হেমচন্দ্র নিজের সম্পত্তি হইতে যৎসামান্য আয় পাইয়াও তালপুখুর গ্রামে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পুত্র ও কন্যাটিকে সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এবং শরচ্চন্দ্র প্রফুল্লনয়না, সরলহৃদয়া, স্নেহময়ী নারীরত্ন পাইয়া, পরম সুখে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন, এবং সম্মানের সহিত একে একে কলেজের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন।

সুধার জেঠামহাশয় তারিণী বাবুর বড় বিপদ! তিনি সেকেলে লোক, সমাজপতিদিগের সহিত বিরোধ করিতে পারেন না, অথচ বিন্দু ও সুধা ভিন্ন তাঁহার আর এখন কে আছে? তাহাদেরই বা পায়ে ঠেলেন কি প্রকারে? সামাজিক বুদ্ধিমান্ লোকে যাহা করেন, বুদ্ধিমান্ তারিণী বাবুও তাহাই করিলেন। গোপনে বিন্দু ও সুধার সহিত সম্পর্ক রাখিলেন, প্রকাশ্যে তাঁহাদের একঘরে করিলেন।

সুধার বিবাহের তিন বৎসর পরে তারিণী বাবু একবার তিন মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা জমকাইয়া বসিলেন। মহাজনি, তেজারতি, লগ্নি, কৃষি, সকল প্রকার ব্যবসাতে তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বিষয়বুদ্ধি প্রচালিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বার লোকাকীর্ণ,

কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, কেহ হিসাব মিটাইতে আসিয়াছে, কেহ কর্জ্জ করিতে আসিয়াছে, কেহ সুদ দিতে আসিয়াছে, কেহ বা ক্ষেত খানি ভাগে লইবার জন্য আসিয়াছে। গ্রামের প্রধান প্রধান দলপতিগণ তাঁহার তক্তপোষে বসিয়া অনুপস্থিত বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেন, পাণ্ডিত্যাভিমানীগণ সমবেত হইয়া সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধীগণকে দণ্ডিত করিয়া হিন্দু আচার সংরক্ষণ ও নিজের উদরপূর্ত্তি করিতেন, কন্যাগ্রস্ত পিতাগণ কন্যাদায় উদ্ধাপন জন্য পরামর্শ করিতেন, এবং আদালতের কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানের নাজির মহাশয়ের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ফলতঃ, তালপুখুর গ্রামে তারিণীচরণ মল্লিকের ন্যায় জ্ঞানী, মানী ও সর্ব্বজন-সমাদৃত অন্য আর কে আছে?

কিন্তু এ সম্মান সত্ত্বেও বৃদ্ধের হৃদয় নিশ্চিন্ত ছিল না। একমাত্র কন্যার মৃত্যুশোক, সে বিষয়ী লোকের হৃদয়ে অধিক দিন স্থান পাইল না। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পর তালপুখুরের মল্লিকবংশ নির্ব্বংশ হইবে, এ ভাবনা তাঁহার অসহ্য। তাঁহার পরামর্শদাতারও অভাব ছিল না।

দলপতি ও সমাজপতিগণ সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতেন, তারিণী বাবুর এমনই কি বয়স হইয়াছে, এই ত বিবাহের পরিপক্ক বয়স। মানে বল, ধনে বল, জ্ঞানে বল, এরূপ বর কি আজকাল কন্যার ভাগ্যে সহসা জোটে? পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করুন, নববধূ ঘরে আনুন, আশু পুত্রমুখ দর্শন করিয়া শান্তি লাভ করুন। ঐ মিত্রদের বাড়ীতে নয় বৎসরের সুন্দরী কন্যা আছে, ঘটক পাঠান। কন্যা ভাগ্যবতী না হইলে কি এমন উপযুক্ত পাত্র পায়? তাহার পিতৃকুল এরূপ সম্বন্ধে উদ্ধার হইয়া যাইবে!" নয় বৎসর বয়স্কা প্রণয়িনীর মুখমধু আস্বাদন করিতে তারিণী বাবুর বিশেষ আপত্তি ছিল, এমত বোধ হয় না; গ্রামে কেহ কেহ বলিত, তারিণী বাবু সেই মনে করিয়াই ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন! যাহা হউক, এরূপ প্রস্তাবে তারিণী বাবু শীঘ্র কোনও উত্তর দিতেন না।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, "তা, এ ত ভাল কাযই, প্রথম সংসারের কোনও সন্তান নাই, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবেন, এ ত শাস্ত্রসম্মত কার্য্য। আর নয় বৎসরের কন্যা ত গৌরী-তুল্যা! পুরুষের বয়স সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও বিধান নাই, বয়স যতই হউক না, পুরুষ বিবাহ করিতে সমর্থ। আর তারিণী বাবুর এমনই কি বয়স হইয়াছে? তা, এ শুভ কার্য্যের এখনই সমস্ত আয়োজন করুন। তারিণী বাবু ধর্ম্মপরায়ণ,

জ্ঞানী, বিজ্ঞ লোক, পুত্রকামনায় ও বংশরক্ষা কামনায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাচরণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকলকে প্রদর্শন করুন।" তারিণী বাবু প্রকাশ্যে ঐ প্রস্তাবের উত্তর দিলেন না, কিন্তু নবমবর্ষীয়া বধূর কথা আলোচনা করিয়া বৃদ্ধের হৃদয়টা নাচিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সে দিন বিলক্ষণ পারিতোষিক পাইলেন।

তারিণী বাবুর বিশেষ সুহৃদ্ বন্ধুগণও এই পরামর্শ দিতেন। তারিণী বাবুর মুখে হাসি ধরিত না, তবে একটু অসম্মতির লক্ষণ দেখাইয়া বলিতেন, "কি জান ভায়া, আমার এ কাযে বড় মন নাই, তবে এই মল্লিকবংশ দীপশূন্য হইবে, তাহা ভাবিলে বড় আক্ষেপ হয়।"

বন্ধুগণ। তা বৈকি, আপনি নিজে নিঃস্বার্থ নিঃস্পৃহ লোক, তাহা তালপুখুর ও বর্দ্ধমানে কে না জানে? তবে বংশরক্ষা ধর্ম্মসঙ্গত কায, সেই জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করুন। তা আপনি বলিয়া এ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, সকলে কি এরূপ করে?

(ঘরের কোণে একটা পাড়ার দুষ্ট ছেলে বসিয়াছিল, তারিণী বাবুর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহরূপ কষ্টস্বীকারের কথাটা শুনিয়া হাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। ছোঁড়াটা নিতান্তই দুষ্ট!)

তারিণী বাবু। আর কি জান ভায়া, এই দুইটা ভাইঝিকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তাদেরও কিছু দিয়ে যাব মনে করিয়াছিলাম। তবে আজ কালের ছেলে মেয়েরা সবই বেয়াড়া, ধর্ম্মপথে ত কেহ চলে না।

বন্ধুগণ। সে কথা আর বলেন কেন? আপনি ঐ বিন্দুবাসিনীর জন্য আর সুধার জন্য যা করিয়াছেন, আমরা কি আর তাহা দেখি নাই? সে ত সেদিনকার কথা। আপনি না থাকিলে দুটো অনাথা মেয়েকে খাওয়াত কে? পরাত কে? মানুষ করিত কে? আপনার দয়ার হৃদয়, সেই জন্য এত করিলেন, সকলে কি এত করে? তা, সেই মেয়ে দুইটা কি নারী না পিশাচী? এমন দয়াবান্ গুরুর কথা না শুনিয়া, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, কি না বিধবাবিবাহ! ছি! ছি! ছি! তারিণী বাবু, তাদের আর নাম করিবেন না, পাপিষ্ঠা গুলার নাম করিলেও পাপ হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক, তাই তাহাদের এ গ্রামে থাকিতে দিয়াছেন, অন্যে হইলে তাহাদের মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিত।

তারিণী বাবু আর কি জান ভায়া,—মনের কথা তোমাদের খুলিয়া

বলি, তোমাদের না বলিলে কাহাকে বলিব? দিন দিন গৃহিণীর শরীরটা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাঁহাকেও এক জন দেখিবার শুনিবার লোক চাই। তা আমি ত সর্ব্বদা বর্দ্ধমানে থাকি, সর্ব্বদা দেখিতে পারি না, অল্পবয়স্ক আপনার লোক এক জন ঘরে থাকিলে আমার গৃহিণীরও পরিচর্য্যা করিতে পারে, গৃহিণীর উপযুক্ত সেবা সুশ্রূষা হয়, এই জন্যই আমি এ কার্য্যে মত দিতেছি,—নচেৎ আমার এ বয়সে দারপরিগ্রহে একেবারেই মন নাই। এখন বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখন পারমার্থিক বিষয়েই মন দেওয়া শ্রেয়ঃ।

বন্ধুগণ। তা সে কথা কি আর বলিতে হয়? আপনার নিঃস্পৃহ সদয় স্বভাব কি আমরা জানি না? আপনি যেরূপ গৃহিণীর প্রতি যত্ন করেন, আজ কাল কয় জন সেরূপ করে? শাস্ত্রে বলে, নারী পুত্র সন্তান প্রসব না করিলে পরিত্যজ্যা,—অর্থাৎ তাহার মাথা মুড়াইয়া, ঝাঁটা মারিয়া বাজারে বাহির করিয়া দিবে। তবে যে আপনি এত দিন তাঁহাকে সযত্নে গৃহে রাখিয়াছেন, খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন, এ আপনার দয়া। এক্ষণে যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার বিধান করিতেছেন, সেও আপনার দয়া।

পরামর্শ অনেক ক্ষণ চলিতে লাগিল। পরামর্শে কি ঠিক হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মকর্ত্তা যখন মত স্থির করিয়াই গ্রামে আসিয়াছেন, তখন পরামর্শটা বিড়ম্বনা মাত্র।

তারিণী বাবুর বাড়ীতে জ্ঞাতিরমণী যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা সর্ব্বদা উমার মার সুশ্রূষা করিতেন। বাহিরে বৈঠকখানায় যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অগোচর রহিল না। এবং তাঁহারাও অবিলম্বে নানা অলঙ্কার সহ সে কথাটি উমার মার কাণে তুলিলেন।

রোগক্লিষ্টা উমার মা এক বিন্দু চক্ষুর জল মোচন করিলেন। বলিলেন, "যখন উমাকে হারাইয়াছি, তখন এ সংসারে সমস্তই হারাইয়াছি, সংসারে আমার আর সুখ নাই। বাবুর যদি রুচি হয়, দ্বিতীয় সংসার করুন; ভরসা করি তিনি দ্বিতীয় সংসারে সুখী হইবেন।" ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য ; কণ্টেম্পোরারি রিবিউ।

সংসারের সংবাদজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, এবার আমেরিকা,—সিকাগো মহানগরে যে সার্ব্বজাতিক, সার্ব্বভৌমিক, সুপ্রসিদ্ধ মেলা হইয়াছিল, তাহা কেবল পৃথিবীর পণ্যপ্রদর্শনী মেলা নহে। সিকাগোর মেলা এক অভূতপূর্ব্ব "ভবের হাট"—রূপকের নহে, প্রকৃত প্রস্তাবেই ভবের হাট। ভবসংসারে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু থাকিতে পারে, তাহার উৎকৃষ্ট আদর্শই হউক, অথবা নিকৃষ্ট নমুনাই হউক, এই হাটে হাজির করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। চেষ্টা,—মনুষ্যচেষ্টা, (প্রবল-পুরুষারসম্পন্ন আমেরিকদের ন্যায় একটা মহাজাতির সমবেত চেষ্টা) সুদীর্ঘ আয়োজন, সুদূর শ্রম এবং অবিচলিত "প্রাণপণ" সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হওয়া যতটা সম্ভবনীয়, সে-চেষ্টা অন্ততঃ ততটা বলবতী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সত্যবাদী সাক্ষাদর্শীদিগের সাক্ষ্য প্রমাণেই প্রত্যক্ষ যে, মনুষ্যপরিজ্ঞাত পৃথিবীর মধ্যে যে কিছু জ্ঞাতব্য এবং দর্শনীয় পদার্থ ও পণ্য, বস্তু, বিষয় ও বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, জাতি ও জাতীয় ধর্ম্ম, মনুষ্য এবং দার্শনিক মতামত আছে, তাহাদের অল্পাধিক আদর্শ ও আভাস, প্রকৃতিপরিচায়ক দৃষ্টান্ত বা নমুনা, ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে এই ভবের হাটে একত্রিত ও প্রদর্শিত করা হইয়াছিল। বিশাল বিরাট ব্যাপার। বিশ্বেদর ব্যাপার। এক কথায়, এই ভবের হাটে, জড় ও প্রাণিজগতের যাহা কিছু, মূলে যে কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। সংসারের সর্ব্ববিধ বস্তুর ন্যায় সর্ব্ববিধ বিদ্যা, সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য এবং মনুষ্যের ধর্ম্মমত, সর্ব্বজাতীয় সংক্ষিপ্ত সামাজিক আচার ব্যবহার, কৃষি-বাণিজ্য, বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ শাখাপ্রশাখা, শিল্পের নূতন ও পুরাতন, স্থূল ও সূক্ষ্ম চতুঃষষ্টি কলা, সাহিত্য-পণ্য, সর্ব্বজাতীয় ভাষা এবং ভাব, এই বিশ্ববিপণির বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

সিকাগো প্রদর্শনী।

এই প্রদর্শনীতে কৃষি-বিদ্যা-বিশারদদিগকে লইয়া কৃষিসভা, শিল্পীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিল্পসভা, ভিষকদিগকে লইয়া ভিষকসভা, বিবিধ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া বিবিধ বিজ্ঞানসভা, ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে লইয়া ধর্ম্মসভা, এবং সাহিত্যসেবকদিগকে লইয়া সাহিত্যসভা,—এবম্বিধ বিবিধ বিদ্যার, বৃত্তি-বাণিজ্যের এবং বিজ্ঞানের বহুসংখ্যক সভা সংগঠিত হইয়াছিল। এই সকল সভায় নানা দিগ্দেশ হইতে নানাজাতীয় লোকের লোকযাত্রার, এবং নানাবিধ বিদ্যার পৃথক পৃথক প্রতিনিধি আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইতেও অবশ্য এই সকল সভায় সদস্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; এবং এই সকল সভার কোনও কোনও সভায় কেহ কেহ গমনও করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায়, এ দেশীয় নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধিত্ব বা নানা ধর্ম্ম প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মসভায় এ দেশীয় সভ্যদিগের মধ্যে 'নববিধান' মতাবলম্বী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রধান। ধর্ম্মসভায় কিছু কিছু

প্রদর্শনীগঠিত বিবিধ সভা।

এ দেশীয় সদস্য ; দুই প্রতাপ।

গ্রন্থকারের গরজ বা গরিবি বুঝিয়া, ওজোন পরিমাণে, সণ ধরনে,—গ্রন্থের গুণাগুণ অনুসারে পসারি প্রতি পাঁচ আনা বা পাঁচ পয়সা মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিয়া লয়। শুনিতে পাই, এ মূল্যের পয়সাও নাকি নগদ দেয় না। কমিশন কাটিয়া লইয়া কিস্তিবন্দীতে ক্রমে দিয়া থাকে।

যাউক। সিকাগো প্রদর্শনীর সাহিত্যসভা সাধারণতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। (১) সাহিত্যের সত্বাধিকার সংরক্ষণ আইন; (২) সাহিত্য-সমালোচনা, (৩) সাহিত্যকারের লাভালাভ; এই তিন বিভাগে তিন জন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; মিঃ ওয়াল্টার বেসাণ্ট তৃতীয় বিভাগে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সুতরাং, তাঁহার প্রবন্ধে অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা, তৃতীয় বিভাগের কথাই বেশী আছে, ইহা স্বাভাবিক।

সভার কার্য্য ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১ম দিনে আন্তর্জাতিক কপি-রাইট। ২য় দিনে গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থসত্বাধিকার এবং লাভালাভ; ৩য় দিনে সাহিত্য-সমালোচনা; ৪র্থ দিনে বালকবালিকাদিগের পাঠ্য সাহিত্য; এবং ৫ম দিনে আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত বহুতর প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর, তর্ক বিতর্ক ও সমালোচনা বিবেচনা হয়। সভা অবশ্য অনেক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল সিদ্ধান্ত মামুলী মন্তব্যে বা রেজোলিউশনে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এরূপ সভা য়ুরোপে ও আমেরিকায় অল্প কখনও হয় নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইংরেজী লেখক ও গ্রন্থকার সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও উল্লেখনীয় যে, ইংলণ্ডের অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থকার এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই; নিমন্ত্রণপত্রের একটা উত্তরও দেন নাই।

সভার অধিবেশন ও কার্য্য।

আমেরিকার ও ইংলণ্ড গ্রেট বৃটেনের কপিরাইট সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা হইয়াছিল। মিঃ বেসাণ্ট তাহার সকল কথার উল্লেখ করেন নাই; আমরাও তাহার কোনও কথার উত্থাপন করিব না। কেন না, ভারতবর্ষীয় কপি-রাইট আইনের সহিত তাহার সবিশেষ সম্বন্ধ নাই। এদেশীয় কপি-রাইট আইনের আংশিক সংশোধন হইবে, শুনা যাইতেছে, সে সংশোধনের প্রকৃতি কিরূপ, এখনও প্রকাশ নাই, প্রকাশিত হইলে, তখন এ বিষয়ের অন্যাধিক আলোচনা করা যাইবে।

কপিরাইট।

প্রদর্শনীর সাহিত্যসভায় যত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি মাত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা, মিঃ বেসাণ্ট করিয়াছেন। আমরা কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সাহিত্যসম্বন্ধীয় দুটি দুই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম দিতেছি।

পঠিত প্রবন্ধাবলী।

মার্কিন গ্রন্থকার মিঃ চার্লস ডুডলী ওয়রিনার কর্ত্তৃক লিখিত, এ সভায় পঠিত প্রবন্ধে আমেরিকার উৎপন্ন আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে। আমেরিকার লোক সাহিত্যের শিল্পনৈপুণ্য ও নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্ত উদাসীন; আমেরিকায় সাহিত্যের সুচারু ও স্বাস্থ্যকর সমালোচনা নাই। আমেরিকা নবাবিষ্কৃত দেশ। নূতন দেশে সবই নূতন সৃষ্টি। নূতন-সৃষ্টির অভিনব শক্তিতে সাহিত্য আপনা হইতে সুবিকাশ প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় বা অনুমানে, সাহিত্যের প্রতি লোকে যেন বড় লক্ষ্য করে না; সুতরাং, সাহিত্য শুশ্রূষা ও সৎসমালোচনার অভাবে সুবিকাশিত হইতেছে না। সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচারের নিয়ম অতীব নিকৃষ্ট। ফলে ছন্দে, কৌশলে যে সাহিত্য,—গ্রন্থ বা রচনা, তাহা বিকৃতি

মার্কিন সাহিত্য: গতি-প্রকৃতি।

লাভ করিতে পারে, লোকে তাহাকেই বলে ভাল; অথচ হয় ত তাহা কুৎসিত কদর্য্য *। লেখক বলেন,—

It is a habit of looking at literature as we look at other things—literature in national life never stands alone; if we condone crookedness in politics and in business under the head of smartness, we apply the same sort of test, that is the test of success—to literature. It is the test of late Mr. Barnum. There is in it a disregard of moral as well as of artestic values and standards. You see it in the press, in sermons even—the effort to attract attention; the look of moderation, the striving to be sensational in poetry, in the novel, to shock to advertise the performance. ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "রাজনৈতিক ব্যাপার ও বিষয়কার্য্যাদি অন্যান্য সাংসারিক বিষয় লোকে যে চক্ষে দেখে, সাহিত্যকেও দেখে ঠিক সেই চক্ষে। বিষয়কার্য্যাদির উৎকর্ষাপকর্ষের পরীক্ষা হয় যেমন তাহার কার্য্যকারিতার পরিমাণানুসারে; সাহিত্যের গুণাগুণপরীক্ষার স্থলও হইয়াছে, তেমনি তাহার পশার প্রতিপত্তির উপরে। সাহিত্য-সমালোচনার এ মাপকাটি, গতাসু মিঃ বার্ণাম প্রণীত। চটুলতা চটকদারির উপরই লোকের দৃষ্টি; তা বৈষয়িক ব্যাপারেই কি, আর সাহিত্যেই কি?

চটক-চটুলতা।

সাহিত্যে এই চটকদারি নীতির প্রাদুর্ভাববশতঃ তাহার শিল্পচাতুর্য্য ও সুনীতি-সম্পাদনের অভাব হইতেছে। লোকে আর তাহা চায় না; লেখকের লিপিচাতুর্য্যও চায় না, আরার নৈতিক সফলতাও দেখে না,—চায় কেবল চটকদারি। সুতরাং সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে, পুস্তকে এবং পত্রে, এমন কি ধর্ম্মযাজকের উপদেশে পর্য্যন্ত,—চটকদারি দেখাইয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা,—একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা, সুতরাং পরিমিততার একান্ত অভাব।"

লেখক বলেন, মার্কিন সাহিত্যের এ রোগ "অর্গ্যানিক" বা দুরারোগ্য নহে,—সাময়িক মাত্র, সময়ে এ রোগ সারিবে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিষম মার্কিন ব্যাধি কখনও সারিবে কি? লেখক বলেন, মার্কিন সাহিত্যে এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন সমালোচনার। বাঙ্গালা সাহিত্যেও বোধ করি, ঐ বস্তুটা একটু বেশী আবশ্যক। কিন্তু, সমালোচনার প্রকৃতি বিকৃত হওয়া আবশ্যক?

আমেরিকা ও ইংলণ্ড, উভয়েরই ইংরেজী সাহিত্য। অতএব ইংলণ্ডের পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সহিত আমেরিকার সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, ইহারা উভয়ে দুই সহোদর বলিলেও হয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক প্রসঙ্গক্রমে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমালোচনারও একটু আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের সাধক সমালোচনার সহিত আধুনিক আমেরিক সমালোচনা তুলনা করিয়া তিনি বলেন, Some—fault finding, some ridicule, a good deal of slashing personality, and the expression of individual prejudice, and like or dislike, which characterised so much of the British review critisism of the beginning of this century,—much of it utterly conventional and blind judgement—*but* almost no attempt to ascertain the essence and purport of our achievement and to arraign it at the bar of comparative excellence, both as to form and substance. I do not deny that there has been some ingenious and *even* just exploiting of our literature, with notes

সমালোচনা ও বিড়ম্বনা।

* এ দেশেও আজ কাল অবস্থাটা কি ঠিক এইরূপ বলিয়া বোধ হয় না?

of its defects and its excellences; but it will be scarcely claimed *for* even this that it is cosmopolitan."

অর্থাৎ, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমাবধি বিবিউ আদি পত্র পত্রিকায় সাহিত্যের সমালোচনা যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, সাধারণতঃ তাহার প্রকৃতি,—দোষ-দেখান, বিদ্রূপ করা, ব্যক্তিগত নিন্দা কুৎসার ছড়াছড়ি, এবং সমালোচকের নিজের ব্যক্তিগত কুসংস্কার এবং পছন্দ বা অপছন্দের অভিব্যক্তি। এ সমালোচনারাশির অধিকাংশই মামুলী,—চিরাগত রীতির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ,—যুক্তিহীন অন্ধ বিচার বিবেচনা। এ সমালোচনায় কখনও সাহিত্যের সারবত্তা ও উন্নতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয় নাই, এবং তাহার আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষনিরূপণের উদ্যম হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও সমালোচনায় সমালোচন-নৈপুণ্য আছে, অস্বীকার করি না; পরন্তু তাহাতে সাহিত্যের দোষগুণের কথাও না আছে, এমন নহে। তবে কি না কথা এই যে, এই সকল সমালোচনায় সার্ব্বভৌমিক সাধারণ নিয়ম দ্বারা সাহিত্যের সুবিচার করা হয় নাই।"

পক্ষান্তরে, ভূতপূর্ব্ব সমালোচক ম্যাথু আরনোল্ড প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সমালোচনার নিয়মও, ইদানীন্তন সৃষ্ট সাহিত্যের অধিকাংশেই খাটে না। ম্যাথু আর্ণোল্ড সমালোচনার সংজ্ঞা বা নিয়মের নির্ণয়কল্পে বলেন,—'A disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world' অর্থাৎ, সংসারে যাহা সুন্দর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জ্ঞাত ও চিন্তিত, তাহার শিক্ষার সুবিস্তার ও সমৃদ্ধি করাই সমালোচনা। আর্ণোল্ডের এ নিয়ম আধুনিক সাহিত্যে প্রযুক্ত না হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইত। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে উহা প্রযুক্ত হইয়া সাহিত্যে শঠতা বা কৃত্রিমতার পরিমাণই কেবল প্রভূতপরিমাণে বাড়াইয়াছে।"

মেথু আর্ণোল্ড ও সমালোচনা।

কিন্তু সমালোচনার সর্ব্ববাদিসম্মত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সার্ব্বভৌমিক সাধারণ নিয়ম কি, এবং তাহা সৃষ্ট হওয়া সম্ভবে কি না? একপ নিয়ম অদ্যাপি উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং হইবার প্রস্তাবনা সম্বন্ধেই বিলক্ষণ সন্দেহ। এ বিষয়ে আমাদের বিলাতি সমালোচকেরাই যখন ব্যতিব্যস্ত,—কিন্তু কর্ত্তব্যবিমূঢ়,—তখন আমরা আর কি বলিতে পারি। এদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রই আমাদের আশ্রয়স্থল, কিন্তু তাহা সাধারণভাবে এরূপ প্রণালিত যে, প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যাহা হউক, যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও অনেক সমালোচক জানেন না। লেখকের ন্যায় সমালোচকেরও যে স্বকার্য্যার্থে একটা নিয়মিত শিক্ষার আবশ্যক, ইহা নিশ্চয়। মিঃ বেসাণ্ট তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে এ বিষয়ে লিখেন;—

সমালোচনা ও অলঙ্কার-শাস্ত্র।

Nothing is more urgently needed than definite teaching in the canons of criticism. * * A critic is born; he can not be made, any more than a poet or a novelist; but he may at least learn the machinery and the technique of the craft.

"সমালোচনা-শক্তি স্বাভাবিক, সে শক্তি কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, ইহা সত্য বটে, কবি ও ঔপন্যাসিকের ন্যায় সমালোচকও জন্মেন, গড়ন-পিটনে প্রস্তুত হন না। কিন্তু, তাই বলিয়া সমালোচক যে সমালোচনা সম্বন্ধে কোনও শিক্ষায় শিক্ষিত হইবেন না, এমন কোনও কথা নাই। সমালোচকের সর্ব্বথা স্বকার্য্য শিক্ষা করা উচিত। অলঙ্কার বিজ্ঞানের নিয়মাবলী, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, রচনাপ্রণালীর বিবিধ রহস্য, এবং সমালোচনার শিল্পগত প্রণা-

সমালোচনা;—শক্তি ও শিক্ষা।

লীতে ইহাঁদের সবিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনকার সমালোচকদের মধ্যে এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সাহিত্যের ইতিবৃত্তটা অবধি অবগত নহেন,—"উপন্যাস কাব্য সূক্ষ্মশিল্পের (fine art) অন্তর্গত" শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হন, অথবা হাসিয়া খুন হন। অথচ, এই সকল সমালোচকের হস্তে গ্রন্থ সমালোচনা করিতেও দেওয়া হয়। এ দেশের বাজারে সমালোচকদের অনেকেরই বিদ্যাবুদ্ধি আমরা অবগত আছি, কিন্তু সে বিড়ম্বনা বিবৃত করিবার এখন অবসর নাই।

প্রদর্শনীতে পঠিত আর একটি প্রবন্ধের কথা কিছু বলিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। এই প্রবন্ধ মিঃ ট্রেলের,—নাম, "The Relation of Literature and Journalism." অর্থাৎ সাহিত্যের সহিত সংবাদপত্রত্বের সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয়, মিঃ বেসাণ্ট এ প্রবন্ধের অতি অল্পমাত্রই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই সম্বন্ধ সম্বন্ধে লেখকের সমস্ত বক্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। সাহিত্যের সহিত সংবাদপত্রপ্রস্তুতীকরণের সম্বন্ধ কি,—তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাহিত্য নিজে কি, অর্থাৎ তাহার আকার প্রকার, চলন বলন, ভাব ভঙ্গী আদি ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। লেখক তাঁহার প্রবন্ধে এ চেষ্টা কিছু করিয়াছেন।

অপর প্রবন্ধ,—সাহিত্য ও সংবাদপত্র।

সাহিত্য কাহাকে বলে?

বলিতেছেন, "কাহারও কাহারও বিবেচনায় সাহিত্যের বিস্তার বড়ই বেজায় রকম বেশী। আবার কাহারও কাহারও মতে বা খেয়ালে সাহিত্যের শরীরটি অতীব সঙ্কীর্ণ, তাহার প্রসার ইহাঁদের মনোগত পরিধি পার হইতে পারে না। অতএব, এই অতিবিস্তার ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে সাহিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" কথা ঠিক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের অত্যুদার অভিমতে, লিখিত বা মুদ্রিত অক্ষরাবলী মাত্রই সাহিত্য। পঞ্জিকা বা পোষ্ট-আপিস-ডাইরেক্টরীও সাহিত্যের অন্তর্গত। শেষোক্ত সূক্ষ্ম-ভেদজ্ঞী সমালোচকেরা নিজে যে সকল রচনা ভাল বাসেন বা ভালবাসার ভনিতা করেন, সাহিত্যকে কেবলমাত্র তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। এখন এই দুই বিপরীত ব্যাখ্যা-ভূমির কোথায় যে সাহিত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে। সম্ভবতঃ সেই শুভদিনেই ইহা নিরূপিত হইবে, যে দিন সাহিত্যের শরীর ও আত্মা, রূপ ও ভাব, কে কি পরিমাণে সাহিত্যে থাকা উচিত, এবং থাকে, এই বিতর্কিত কথা সাব্যস্ত হওয়া সম্ভাবিত হইবে। ইতিমধ্যে,—

In the mean while we must content ourselves with admitting that form is certainly, if in an undefined degree, the more important of the two. It would be dangerous to admit more than this in a day *when so many minor poets are abroad; for a considerable number of these, while particularly careful of form, have reduced the value of their matter to a vanishing point,** and any encouragement to them to carry the process yet further is to be strongly deprecated. Still this much, as I have said, must be admitted that it is primarily form rather than matter which constitutes literature."

"ইতিমধ্যে আমরা কেবল এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট হইব যে, সাহিত্যে রস

---

* আমাদের নবীন কবিদের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছায় এই কয়টি কথার "ইটালিক" আমরাই দিয়াছি।

অপেক্ষা রূপ, ভাব ও আত্মা অপেক্ষা আকার ও অবয়ব, অধিক পরিমাণে আবশ্যক। কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ইহার অধিক আপাততঃ আর কিছু একান্তই বলা যাইতে পারে না। বলিলে বিপদ বস্তুতঃই বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। কেন না, "নাবালক" কবিগণ বাহিরে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত; ইহাঁদের অনেকেই আকারের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী, রূপ ও অবয়বের নিরতিশয় পক্ষপাতী; কিন্তু সাহিত্যের আত্মা (matter) ইহাঁদের কাব্য-কবিতা হইতে এক প্রকার অন্তর্ধানই করিয়াছে। এ বিষয়ে ইহাঁদিগকে আদৌ উৎসাহিত করা উচিত নহে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাঁরা রক্ষা রাখিবেন না। তবে বস অপেক্ষা রূপ যে বেশী দরকার, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি।

Form & matter; নাবালক কবি।

প্রদর্শনীর সাহিত্য-সভায় সমাগত গ্রন্থকারদিগের শিষ্টাচার ও ভব্যতার সুখ্যাতি মিঃ বেসাণ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে ইংরেজ সাহিত্য-সেবী অপেক্ষা আমেরিকান সাহিত্যজীবীরা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাব, সহানুভূতি ও শিষ্টতা আছে; ইংরেজ গ্রন্থকারদের মধ্যে ইহা বড়ই নাকি বিরল।"

শিষ্টাচার সভ্যতা।

পরন্তু, গ্রন্থের সাহিত্যগত এবং অর্থগত মূল্য এবং গ্রন্থকারের আর্থিক উপার্জ্জন সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক অনেক কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লিখেন;—

There are * * two kinds of literary worth, quite distinct and separate. They are not essentially commensurable; very likely the one has little to do with the other; the first is the artestic, poetic dramatic value, the purely literary value, the actual worth of the deliverance of the soul. But the other is a thing quite apart; it is the commercial side. ইত্যাদি। অর্থাৎ "গ্রন্থের মূল্য দুই প্রকার; উহারা উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক এবং পরস্পরে প্রায় সম্বন্ধমাত্রবিরহিত। প্রথমতঃ গ্রন্থের সাহিত্যগত মূল্য; ইহা সম্পূর্ণরূপে খাঁটি বিশুদ্ধ অবিমিশ্র সাহিত্যঘটিত মূল্য, বা মহিমা;—শিল্পগত সৌন্দর্য্যের সহিত, কাব্যগত সম্পদের সহিত, নাট্যাংশনিহিত বৈভবের সহিত ইহার সম্বন্ধ; ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই; ইহা ক্রয়বিক্রয়বিরহিত; ক্রয়-বিক্রয়ের অতীত। মুদ্রাদির মাপে ইহার মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না, ইহা অমূল্য, ইহা গ্রন্থের সাহিত্যগত মূল্য বা মহিমা; এতদ্দ্বারা আত্মা উপকৃত হয়, চিত্তের শুদ্ধি হয়। পরন্তু গ্রন্থের অপর প্রকারের মূল্য ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উহা বাণিজ্যক্ষেত্রে গ্রন্থের বিনিময়মূল্য আর্থিক বা মৌদ্রিক মূল্য। এখন কথা এই যে, প্রথমোক্ত মূল্য সম্পন্ন বা মহিমান্বিত গ্রন্থ, সাময়িক লোকের আকাঙ্ক্ষণীয় হইলেও পারে, না হইলেও পারে। যদি আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, তবে তাহার আর্থিক বা বাণিজ্যগত মূল্য বিস্তর হইতে পারে; কিন্তু, আকাঙ্ক্ষণীয় যদি না হয়, তবে উহা আপনার উচ্চতা ও অতুল মহিমা সত্ত্বেও বাজারে বিকায় না; সুতরাং আর্থিক মূল্য অতি অল্পই হয়; অথবা হয়ই না। গ্রন্থের এইরূপ সাহিত্যগত ও বাণিজ্যগত মূল্যের প্রভেদ, অনেক সময়ে অনেক গ্রন্থকার না বুঝাতে গোলযোগ ঘটে।"

গ্রন্থের দুই প্রকার মূল্য।

"পক্ষান্তরে গ্রন্থকার বা সাহিত্যসেবীদিগের পক্ষে অর্থাকাঙ্ক্ষা সংসারে সচরাচর বড়ই লজ্জাকর, অপমানকর বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রন্থকারদিগের নিজেরও এ বিষয়ে এইরূপ বিষম ধারণা। কিন্তু বস্তুতঃ এ ধারণার আদৌ কোনও অর্থ নাই। কেন? সংসারের অন্যান্য লোকের ন্যায়, অন্যান্য বৃত্তি-অবলম্বী ও ব্যবসায়ীদের ন্যায়, সাহিত্যব্যবসায়ীদেরও কি অল্পাধিক অর্থের আবশ্যক নাই? তাঁহাদেরও কি গৃহধর্ম্ম যব সংসার নাই যে, স্বাবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা তাঁহারা

গ্রন্থকার ও অর্থাকাঙ্ক্ষা।

অর্থ উপার্জ্জনের আশা করিবেন না? উকিল অম্লানবদনে রাশি রাশি অর্থ লয়েন, তাহাতে তাঁহার অপমান হয় না; ডাক্তার দুই হাত দিয়া কি কুড়ান, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও গ্লানি হয় না; পরন্তু, পাদ্রী পুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষেও প্রভূত বেতন লওয়াও অন্যায়, অসম্ভ্রমকর ও অর্থলালসাব্যঞ্জক নহে। সকলেই স্ব স্ব মানসিক-শ্রমের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন,—তাহাতে তাঁহাদের অর্যশ বা অপমান হয় না। কেবল সাহিত্য-বৃত্তি-অবলম্বী আত্মা ও দেহ একত্র রাখিবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থের আশা করিলেই ধর্ম্মে পতিত হইবেন, অপমান ও গ্লানির বিষয়ীভূত হইবেন? এ বিচার মন্দ নহে। তবে,—There is a feeling,—very true and noble feeling—that the writer, whether preacher, poet, historian, novelist, essayist or teacher, should write because he has something to say, a message to deliver a tale to tell. তবে এরূপ সংস্কার, একপ একটি অনুভূতি আছে বটে, এবং ইহা অতি সত্য অনুভূতি, সুমহৎ সংস্কার যে, লেখক, প্রচারক, কবি, ঐতিহাসিক, উপন্যাসকার এবং সন্দর্ভকর্ত্তা,—মনুষ্যজাতির শিক্ষকমাত্রেই অর্থ-উপার্জ্জন-কামনাপ্রণোদিত হইয়া লেখেন না. অন্তঃই তাঁহাদের কিছু লিখিবার থাকে, জনসাধারণকে কিছু জানাইবার থাকে, কোনও বিশিষ্ট শিক্ষা বা মনুষ্য জাতির মঙ্গলকর কোনও সংবাদ বিশ্বসংসারে বিজ্ঞাপিত করিতে না বিলাইতে, স্বাভাবিক প্রতিভা কর্ত্তৃক তাঁহারা প্রভাবিত বা বাধিত হন, সুতরাং তাঁহারা লিখেন, বস্তুতঃ বাধ্য হইয়াই গ্রন্থকার হন, না হইয়া থাকিতে পারেন না,—ইহা সত্য এবং সুমহৎ সংস্কার। কিন্তু, এ সংস্কারের সম্বন্ধ গ্রন্থরচনার সহিত, গ্রন্থের সাহিত্যগত মহিমার সহিত, গ্রন্থবিক্রয়ের বাণিজ্যগত মূল্যের সহিত নহে। সাহিত্য-গত মহিমা ও বাণিজ্যগত মূল্য কি, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার যখন গ্রন্থ লিখেন, তখন টাকা আনা পাই হিসাব করিয়া লিখেন না। আত্মার উত্তেজনা প্রণোদিত হইয়াই লিখেন, কিন্তু তাহা যখন মুদ্রিত হইয়া সাহিত্য-বিপণিতে প্রেরিত হয়, তখন তাহা গ্রন্থ-কারের মানসিক পণ্য দ্রব্য,—তিনি সে পণ্যের সত্বাধিকারী, ব্যবসায়ী, বণিক। অতএব অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-অবলম্বীর ন্যায় তিনি যদি ক্রান্তিটির পরিবর্ত্তে কড়াটির আশা করেন, এবং স্বকীয় পণ্য সামগ্রীর সত্বাধিকারবক্ষার্থে মনোযোগী হন, তাহাতে তাঁহার অপরাধ কি, অপমানই বা কি? এ সম্বন্ধে আত্মরক্ষণরূপ কর্ত্তব্য পালন না করাই ত তাঁহার পক্ষে দূষণীয় ও নিন্দনীয়।"

উকিল, ডাক্তার এবং গ্রন্থকার।

প্রদর্শনীর সুবৃহৎ সাহিত্যসভার অধিবেশন দ্বারা পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে অনেক সুফল প্রসূত হইয়াছে, এবং আরও অনেক হইবে, লেখক আশা করেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে সকল সুফল ফলিয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তাহার আলোচনার আবশ্যক নাই। এ প্রসঙ্গে লেখক, তাঁহার স্বদেশে, আমেরিকার অনুরূপ একটি সাহিত্য-সভা (Literary congress) সংগঠিত হইয়া সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ কথা আলোচিত হয় বাসনা করেন। প্রবন্ধের উপসংহারে আলোচনীয় অনেকগুলি আবশ্যকীয় কথার তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি সাহিত্যের উৎকর্ষ-বৃদ্ধি ও সাহিত্যসেবকদিগের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি উদ্দেশেই গঠিত। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে এ দেশীয় সাহিত্য উপজীবীদিগের ব্যবহারার্থে, মিঃ বেসাণ্ট কৃত প্রস্তাবপুঞ্জ হইতে কয়েকটি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিলাম।

ফলশ্রুতি,—প্রস্তাব-পুঞ্জ।

সাহিত্যের উৎকর্ষ।

(১) সমালোচনা,—সমালোচকের শিক্ষা,—সে শিক্ষার বিষয়। (২) নব্য লেখক,—

রচনাদি শিক্ষা;—শিক্ষার কতকটা সহায়তা করিতে পারার সম্ভব। (৩) অযোগ্য ও কুৎসিৎ কদর্য্য রচনায় বার্ষিক বারিশশাশি হইতে সাহিত্য-ক্ষেত্র যথাসম্ভব পরিষ্কৃত রাখিবার উপায় কি? নিন্দা অপেক্ষা নীরবতা অধিকতর উপযোগী কি না? অপকৃষ্ট অযোগ্য পুস্তক পত্রিকাদির উল্লেখ আলোচনা না করাই কি কর্ত্তব্য নহে? (৪) সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে পরস্পরে সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার ও স্বার্থবন্ধন। বারিষ্টার ও ডাক্তারাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ বৃত্তি ব্যবসা-গত বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সাহিত্যজীবী ও সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। (৫) সাহিত্য একাডেমি সংস্থাপিত হইলে, তাহার কার্য্য, কার্য্য-প্রণালী ও কার্য্যাধিকার কিরূপ হইবে?

সাহিত্যসম্বন্ধীয় আইন।

(১) বর্ত্তমান আইনে গ্রন্থকারের গ্রন্থস্বত্বাধিকার কি পরিমাণে রক্ষিত হয়? (২) আইনের কিরূপ সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়? (৩) কপিরাইট-কাল কত বৎসর হইলে ভাল হয়? (৪) কপি-রাইট পাইয়া প্রকাশক যদৃচ্ছাক্রমে পুস্তকের ছেদ, বিচ্ছেদ, সংক্ষিপ্তসার সংযোগ বিয়োগ করিবার অধিকারী কি না? (৫) উদ্ধৃত করার অধিকার কি পরিমাণে আছে বা থাকা উচিত (৬) কপি-রাইট অধিকার হস্তান্তরিত হইতে পারে কি না (৭) লাইবেল আইন;—উহা দ্বারা সমালোচনা কি পরিমাণে অনুশাসিত হয়? এরূপ মোকদ্দমার নজিরসংগ্রহ। (৮) লেখকদিগের সহিত সংবাদপত্রাদির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদিগের অর্থগত ও অন্যান্যবিষয়ক সম্বন্ধনির্ণয়। (৯) প্রবন্ধের পর মূল্য দিবেন বলিয়া সম্পাদক যদি প্রবন্ধ গ্রহণ করেন এবং সে প্রবন্ধ অপ্রকাশ রাখিয়া মূল্য না দেন, তবে প্রবন্ধ-প্রকাশের ও প্রবন্ধের মূল্য দাবি করা যায় কি না? (১০) প্রকাশার্থে মূল্য দিয়া প্রবন্ধ লওয়ার পর সম্পাদক যদি প্রবন্ধ-প্রকাশ না করেন, তবে তাহার প্রকাশ করাইবার জন্য, আইন আমলে আসে কি না? ইত্যাদি।

ইতিবৃত্ত;—কলিকাতা রিবিউ।

বহু জাতি ও বহুজাতীয় স্বার্থ-সমষ্টি লইয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। ভারতসাম্রাজ্য বলিতে বহু-সংখ্যক জাতি ও তাহাদের জাতীয় ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ বুঝায়। পরন্তু, ইহারা সকলেই যে ভারতীয় জাতি ও ভারতভূমির আদিম বা অত্যন্ত পুরাতন অধিবাসী, তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে বিদেশীয় জাতি ও বিভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় উপনিবেশিকও অনেক আছে। স্বাধীন হিন্দু শাসনের সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক শাসনের মধ্য দিয়া, সে কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, এদেশে বিবিধ বিদেশীয় জাতির সমাগম ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের "বসুপ্রস্থ" নামডাকটা এখন আর আছে কি না, জানি না; কিন্তু পূর্ব্বে ছিল, ভারতভূমি বস্তুতই তখন রত্নপ্রসূ ছিলেন। ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর ধন-রত্নের ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হইত। ভাগ্য ফিরাইতে হইলেই বিদেশীয়েরা এ দেশে আসিত। ধনরত্নের আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যক হইলেই ভারতভাণ্ডারে হাত বাড়ান তখন বিদেশীয়দিগের রীতি ছিল। বিদেশীয়েরা ক্রমে হইয়া প্রবেশিয়া ক্রমে 'শাল' হইয়া দাঁড়াইত। এ দেশীয় দশ জনের মত, তাহারাও খুব একজন হইয়া উঠিত। সুতরাং এ দেশে বিদেশীয় স্বার্থ ও স্বত্বাধিকারের স্রোত

ভারত সাম্রাজ্য,—বিদেশীয় স্বার্থ।

ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছে। এ দেশ এখন যে কেবল বিদেশীয় জাতির শাসনাধীন, তাহা নহে, বিভিন্ন বিভিন্ন বিদেশীয় স্বার্থে ও সম্বন্ধে ইহার অষ্ট অঙ্গ বিদ্ধ।

বিষয়কার্য্যে, বাণিজ্যব্যপদেশে, বা শোষণ ও লুণ্ঠন উদ্দেশে, বহুকাল হইতে, ভারতবর্ষে বহুতর বিদেশীয় জাতির সমাগম। ইহাঁদের কেহ আছেন, কেহ যেমন ছিলেন, তেমন নাই, কেহ কতক গিয়াছেন। কিন্তু, ইঁহাদের প্রায় সকলেই ভারত-বক্ষে বিস্তর লীলা-খেলা খেলিয়াছেন; ইতিহাসে তাহা অঙ্কিত। ভারত ইতিহাসের পত্রে পত্রে ইহাঁদের সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ হয়; সাক্ষাৎ হয় না কেবল একটি বৈদেশিক ব্যবসায়ী জাতির সহিত; সে বৈদেশিক ব্যবসায়ী জাতি আরমেনী বা আরমেনিয়ান। ভারতইতিহাসে আরমেনী সম্বন্ধে সবিশেষ কোনও কথা নাই; কিন্তু বহু বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে আরমেনীর আবির্ভাব। ফরাসী-ইংরেজ পোর্ত্তুগীজ, এমন কি মুসলমানেরও পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আরমেনী জাতির সমাগম। তবে এ দেশে আরমেনী উপনিবেশীর সংখ্যা চিরকালই অতি অল্প; বিশেষতঃ তাঁহারা কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বাণিজ্যব্যপদেশে বাজারে বাজারে অবস্থিত, সুতরাং রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাদের বড় নামগন্ধ নাই। কিন্তু, ভারতবাসী আরমেনীদিগের বৈষয়িক ও সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্ত গ্রথিত করিতে পারিলে, তাহা বড় কম উপাদেয় হয় না। উপস্থিত জানুয়ারি সংখ্যা কলিকাতা রিভিউতে, মিঃ হার্বার্ট ষ্টার্ক, একটি প্রবন্ধে (Armenians in India) আরমেনীদিগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, বহু শ্রমে ও যত্নে মিঃ ষ্টার্ক যে উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অতি সামান্য মাত্র,—উপযুক্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের উপযোগী নহে। পরন্তু, তদীয় প্রবন্ধের উপসংহারে যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে তিনি সংগৃহীত স্বল্প উপকরণের সব গুলিও ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি এ দেশীয় আরমেনীদিগের সামাজিক বৃত্তান্ত ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে হইতে এ পর্য্যন্তের বাণিজ্যবৃত্তান্ত আদৌ স্পর্শ করেন নাই। তথাচ তিনি যাহা সামান্য কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা ভাবতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের উপকারে আসিবে। আমরা তাঁহার আরমেনী ইতিবৃত্তের কঙ্কাল হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপ্রিয় পাঠককে উপহার দিতেছি।

আর্ম্মেনী জাতি।

আর্ম্মেনীর আবির্ভাব।

মিঃ ষ্টার্ক; আর্ম্মেনী ইতিহাস।

এ দেশে আর্ম্মেনী জাতির প্রথম আগমন কবে? খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে আর্ম্মেনীরা এদেশে গতায়াত করিতেন কি না, মিঃ ষ্টার্কের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। ৭৮০ খৃঃ অব্দে আর্ম্মেনিয়া হইতে টমাস কেনা নামক এক আর্ম্মেনী বণিক মালাবর উপকূলে উপস্থিত হন। তখন দেশ হিন্দু রাজার শাসনাধীন। মালাবর প্রদেশের রাজা ছিলেন তখন রাজা শিববাম। ক্রইঙ্গনোর নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। স্বরাজ্যে বিদেশীয় বণিক আর্ম্মানী টমাস কেনা বা মার টমাসের,—মার টমাস নামেই কেনা। এদেশে অধিকতর অভিহিত হইতেন,—আগমনে, রাজা শিববাম প্রথমতঃ বিলক্ষণ সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হন। কিন্তু, আর্ম্মানী বণিক রাজার নিকট বিনীত ভাবে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহেন যে, কেবল মাত্র বাণিজ্যার্থেই বহু দূর হইতে তিনি এদেশে; রাজা শিববামের রাজ্যে আসিয়াছেন, মশলা ও মসলিন ক্রয় করিবেন, অতএব আশ্রয়প্রার্থী। রাজা শিব আর্ম্মেনী টমাসের আবেদন সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আদৃত করিবার অনুমতি দেন ও বাণিজ্য

আর্ম্মেনী আসিল কবে?

আর্ম্মেনী—মার টমাস,—রাজা শিববাম।

ব্যবসা চালাইবার অধিকার প্রদান করেন। টমাস অল্পকালের মধ্যে রাজার সবিশেষ বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠেন; এবং রাজানুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য করিয়া শীঘ্রই প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। ধন-বৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, এবং অব্যাহত রাজপ্রসাদে, ক্রমে কেনা আর্ম্মানীর এদেশীয়দিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও সম্মান সম্ভ্রম হয়।

দেশের উত্তর অংশে বাণিজ্যের জন্য অঙ্গমালে ও দক্ষিণাংশে ব্যবসার্থে ব্রহ্মদেশে, কেনা স্বকার্য্যের সদর দোকান করিয়াছিলেন। এই দুই দোকানেই তাঁহার মহা সমারোহ ছিল,—

আড়ত;—উত্তরে ও দক্ষিণে।

দোকান পসার কারখানা ব্যতীত, এ দুই স্থানেই তিনি নিজের বাসোপযোগী দস্তুর-মত গৃহ, হাঁসপাতালাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। টমাস কেনা বড়মানুষী জাঁকজমকে চলিতেন; ব্যয়ভূষণও যথেষ্ট করিতেন. তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল; এবং এদেশীয় বড়মানুষদের মত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরও ছিল। তিনি এ দেশীয় চালেই চলিতেন, বিদেশীয় হইলেও অনেক বিষয়ে দেশী লোকের মতই হইয়া গিয়াছিলেন।

টমাস কেনা ছিলেন আর্ম্মানী খৃষ্টান। কিন্তু তিনি খৃষ্টপন্থী হইয়াও এ দেশীয় প্রথানুসারে দুই বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার এক স্ত্রী থাকিতেন উত্তর অঙ্গমালে আলয়ে; অপরা বাস করিতেন দক্ষিণের সদর দোকান ক্রাঙ্গানোর নগরস্থ গৃহে। দূরে দূরে স্থিত দুই গৃহের দুই গৃহিণী, আর্ম্মেনী সাহেবের ইহাতে বোধ হয় বিলক্ষণ সুবিধাই হইয়াছিল। ক্রাঙ্গানোরে থাকিতেন তাঁহার প্রধানা পত্নী, তাঁহার স্বদেশীয়া আর্ম্মেণী বিবি, আর অঙ্গমালে ছিলেন তাঁহার দ্বিতীয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী এদেশীয়া। কেনা দুই দোকানের যখন যেখানে থাকিতেন, তখনই তথায় পত্নী-সহবাসসুখে সুখী হইতেন; অথচ কোনও পত্নীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইত না। কিন্তু একাধিক পত্নী খৃষ্টপন্থা বিরুদ্ধ; এ কারণ (এই কারণেই বোধ হয়) মিঃ ষ্টার্ক অনুমান করেন যে, এক পত্নীর মৃত্যুর পরে কেনা অপর পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুই পত্নী।

টমাস কেনার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই স্থানে বহুসংখ্যক সন্তান-সন্ততি হয়। দক্ষিণা পত্নীর পুত্রগণ টমাস কেনার দক্ষিণদিকস্থ ধনসম্পত্তির, এবং উত্তরা আর্ম্মেনীর গর্ভজাতেরা তাঁহার উত্তরদিকস্থ বিষয়বৈভবের উত্তরাধিকারী হয়। দেখুন কেমন সৌভাগ্য! ভাগ বাটোয়ারাতেও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে নাই।

কেনা টমাসের বহুসংখ্যক পুত্রকন্যাদিগের কল্যাণে, কেনা-বংশ অত্যল্প কাল মধ্যেই বিলক্ষণ বেশী হইয়া উঠে; ইহারাও আবার বংশবৃদ্ধিতে বাড়িয়া বাড়িয়া কেনাবংশ বিপুল হইয়া পড়ে; কেন বংশধর বংশধরীরা এ দেশীয়দিগের সহিত বিবাহপাশে বদ্ধ হইতে থাকেন। সে কালেও এ দেশীয় লোক কাথলিক-খৃষ্টপন্থী হওয়াতে, পাণিপীড়নের প্রচুর সুবিধাও হইয়াছিল। কালক্রমে এমন সময় আসিল, যখন উত্তর ও দক্ষিণের দেশীয় খৃষ্টান মাত্রেই আর্ম্মেনী কেনার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এখনও বোধ হয়, কেনাবংশের বংশধর বংশধরী বিস্তর বিদ্যমান আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে আর আর্ম্মেনী বলিয়া চেনা যায় কি না সন্দেহ, এবং এখনকার এ দেশীয় আর্ম্মেনী সমাজ তাঁহাদিগকে "জ্ঞাতিভাই" বলিয়া গ্রহণ করেন কি না, বলা যায় না।

কেনা বংশ; এখন চেনা ভার।

ইহার পরের প্রায় ৭।৮ শত বৎসরের কোনও ঘটনা মিঃ ষ্টার্কের প্রবন্ধে নাই। ইতিবৃত্ত খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সে সময়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য। মোগল-দরবারে অন্যান্য দিগ্দেশের বণিকদলের ন্যায় আরমানিরাও যাতায়ত আরম্ভ করে। মোগল

বাদসাহের আশ্রয়ে বহুদিন যাবৎ বাণিজ্য করিয়া এ দেশ হইতে বিপুল অর্থ আর্ম্মেনীয়ার লইয়া যায়। স্থলপথ ও জলপথ, দুই পথেই ইহাদের বাণিজ্য-পণ্য চলিত।

এই সময়ে খাস আর্ম্মেনীয়ায় এমনতর একটা ঘটনা ঘটে, যাহা এ দেশীয় আর্ম্মেনী ইতিহাসের খুন একটা কাণ্ড। কাণ্ডখানা বড় ছোটখাট নয়,—রাষ্ট্রবিপ্লব। আর্ম্মেনীয়া এতকাল তুরস্ক শাসনাধীনে ছিল। পারস্যের বাদসাহজাদা সা আব্বাস দিগ্বিজয়-পিপাসু হইয়া সসৈন্য ককেসস অভিমুখে গমন করেন। আরারাট পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্যনিচয় হইতে তুর্কীদিগকে তাড়ান; আর্ম্মেনীয়া আব্বাসের হস্তগত হয়। কিন্তু, আব্বাস আসল আর্ম্মেনীয়া জয় করিয়া তৃপ্ত হইলেন না। স্বদেশ পারস্যে একটি নকল আর্ম্মেনীয়া বানাইবার জন্য, আর্ম্মেনীয়া হইতে বার হাজার ঘর বাছা বাছা আর্ম্মেনী লইয়া ইস্পাহান নগরের সন্নিকটে অপর এক আর্ম্মেনীয়ার সৃষ্টি করেন। এই আর্ম্মেনীয়ার নাম হয় "নূতন জুলফা" আসল আর্ম্মেনীয়ার নাম পুরাতন জুলফা। আর্ম্মেনী জাতি অর্থ উপার্জ্জনের অব্যর্থ সন্ধান জানেন, বাণিজ্য-পটুতায় তাঁহারা পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন; বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ধূলামুঠা ধরিয়া সোনামুঠা করিয়া ছাড়েন। তুরস্কের কঠিন-শাসনেও আর্ম্মেনীরা ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছে দেখিয়া, সাহা আব্বাসের হিংসা হয়; তিনি ধনী এবং ধন-সৃষ্টিক্ষম আর্ম্মেনী জাতির অধিপ্রতি হইতে আকাঙ্ক্ষী হন, এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য, পুরাতন জুলফায় পরিতৃপ্ত না হইয়া, নিজ রাজধানীর নিকটে নূতন জুলফা বসান। জানি না, এ আকাঙ্ক্ষার নিম্নে আরও কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল কি না?

সাহ আব্বাস।

নূতন জুলফা।

আর্ম্মেনীর বাণিজ্যপটুতা;—আব্বাসের আকাঙ্ক্ষা।

অতঃপর এ দেশে যে সকল আর্ম্মেনী বণিক আসিয়াছিলেন, ইহাঁদের প্রায় সকলেই নব-জুলফার অধিবাসী।

আর্ম্মেনীদের সহিত আবার সাক্ষাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাবকালে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্টি হয়, ১৬০১ সালে। তখন জাহাঙ্গীরের বাদসাহী। ১৬১২ অব্দের মার্চ্চ মাসে সুরাটে কোম্পানী কুঠী করেন। সুরাটের কুঠীতে অনেক আর্ম্মেনী ইংরেজের সহিত মিশে। উভয়েরই উদ্দেশ্য বাণিজ্য,—আবশ্যক ধন-সংগ্রহ। উভয়ই কার্য্যকুশল, বাণিজ্যপটু; কিন্তু, তখন ইংরেজ এ দেশে আনকোরা নূতন,—"আহেলা বেল্লাত"—আর্ম্মেনী বহুকালের পুরাতন, দেশীয়ভাষাভিজ্ঞ, নেটিবের আচারব্যবহারে "ঝুনো"। সুতরাং কুঠিয়াল আর্ম্মেনীকে সাদরে গ্রহণ করে, তাহাদের দ্বারা কোম্পানীর বাণিজ্য-বিস্তার করিয়া লয়। কার্য্যসূত্রে আর্ম্মেনী ইংরেজে কার্য্যের কুটুম্বিতা ঘটে। এই কুটুম্বিতা ভাল মন্দে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এই কুটুম্বিতায় ইহারা উভয়ই লাভবান হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহতে মিলন, ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয়েরই উপকারে আসিয়াছিল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোং ও আর্ম্মেনী।

ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আর্ম্মেনী সুরাট ও গুজরাট হইতে বেনারস ও পাটনায় যায়। ইংরেজসংসর্গে থাকাতে আর্ম্মেনীর অনেক উপকার হয়। তাহারা বিলী দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করে। বাদসাহের অনুগ্রহে তাহারা বড় বড় চাকুরী পায়; সেই সঙ্গে বাণিজ্যেরও বিলক্ষণ বিস্তার করে; এমন কি,—(লেখক বলেন) আর্ম্মেনীরা তখন মুসলমান আমির ওমরাদের উপরেও প্রভুত্ব চালাইত।

আর্ম্মেনী ও ইংরেজ।

১৬৪৫ অব্দে আর্ম্মেনী দিনেমারের সঙ্গে মিশে। মিশামিশি হয় চুঁচুড়ায়।

আর্ম্মেনী চুঁচুড়ায়।

বৎসর পরে, আবঙ্গজীবের দরবার হইতে, আর্ম্মেনীর এক খণ্ড ভূমির সনন্দ পায়, এবং তথায় এক গির্জ্জা এইটিই এদেশে প্রথম আর্ম্মেনী গির্জ্জা।

কিন্তু এ সময়ে আর্ম্মেনীরা আইনের চক্ষে দুয়ের বাহির ছিলেন। আইনগত স্বত্বাধিকার না পাইতেন তাঁহাদের কিছুই ছিল না। তাঁহারা না ছিলেন মুসলমান আইনের অন্তর্গত এদেশপ্রবাসী য়ুরোপীয় খৃষ্টানদের মত সত্বাধিকার। য়ুরোপীয়ের সৈন্য-বল ছিল অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহসও ছিল তাহারা মুসলমান-সম্রাটের নিকট কোনও স্বত্বাধিকার আদায় করিতে পারিত না, কেবল সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিত। কিন্তু, একটা বাঁধাবাঁধি অধিকার নির্ব্বিঘ্নে মেলা মেশা ও মুখের প্রণয়ে কত দিন চলে? কোম্পানীর কুঠীর এলাকার নিকট বাস করিবার অধিকারের জন্য, এই সময়ে আর্ম্মেনীরা ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের নিকট এলাকার মধ্যে আবেদন গ্রাহ্য হয়। কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া নিজ কুঠী আবেদনানুসারে আর্ম্মেনী প্রবাসী-দিগকে বাস করিবার ও নিজের গির্জ্জা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার দেন। গির্জ্জাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছু কিছু টাকা দিতেও অঙ্গীকার করেন। খোজা যানুস বলিন্দার নামক তখনকার এক বিশিষ্ট আর্ম্মেনীর আগ্রহে ও যত্নে, আর্ম্মেনী সম্প্রদায়ের এই স্থানীয় খোজা সাহেব কোম্পানীর এক জন অতি বিশ্বাসী এজেণ্ট ছিলেন।

আর্ম্মেনী সম্প্রদায়ের

এই সময়ে কোম্পানীর কেল্লায় ইংরেজ ফৌজ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়। ইংলণ্ডে লোক পাওয়া ভার। ফরাশীর সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। ইস্পাহান হইতে আর্ম্মেনী আমদানি করিয়া কোম্পানীর বেজিমেণ্টে ভর্ত্তি করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল।

আর্ম্মেনী গির্জ্জা।

১৬৮৯ অব্দে জব চার্ণক কলিকাতার পত্তন করেন এবং নূতন সহরে আসিয়া বাস করিবার জন্য আর্ম্মেনীদিগকে আহ্বান করেন। তাহারা আসিয়া চার্ণক কলিকাতার উত্তরপ্রান্তে আড্ডা গাড়ে। সেই সময় হইতে আর্ম্মেনীঘাট ও আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটের উৎপত্তি। কলিকাতায় আসিয়া তাহারা ইংরেজের সবিশেষ বিশ্বাসী ও অনুগ্রহভাজন হয়। বিলাতী সাহেবের মত সামাজিক স্বত্বাধিকার উপ-ভোগ করে, এবং অল্প কাল মধ্যে অনেকে বড়মানুষ হইয়া উঠে। ১৭২০ অব্দে খোজা কানুসের পুত্র কেনানেচ যানুস কলিকাতায় আর্ম্মেনী গির্জ্জার জন্য ভূমি ক্রয় করেন। ৪ বৎসর পরে পারস্য হইতে ভাল মিস্ত্রি আনাইয়া গির্জ্জা প্রস্তুত হয়। আর্ম্মেনী সাধারণের অর্থে এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"অন্ধকূপ কাণ্ড" ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনানিচয়ে, আর্ম্মেনীরা ইংরেজ ও মুসলমান উভয় পক্ষেরই রাজনীতিতে সবিশেষ সংলিপ্ত ছিলেন। খোজা পেট্রুস ও গ্রিগারী মুসলমান পক্ষে ছিলেন।

অন্ধকূপ কাণ্ড।

আর্ম্মেনীদের কতক কতক ইংরেজ পক্ষেও ছিল। আর্ম্মেনীরা বিপুল-ধনশালী বলিয়া চিরকালই বিখ্যাত। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা-আক্রমণে আর্ম্মেনীর অনেক অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, গুপ্ত অর্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য আর্ম্মেনীরা খুব নিপীড়িতও হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের কেহ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

ভারতে আর্ম্মেনী ইতিবৃত্তের ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা, মিঃ ষ্টার্ক সবিশেষ কিছু বিবৃত করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতায় আর্ম্মেনী স্কুল, লাইব্রেরি প্রভৃতি স্থাপিত হয়;

ইবেল মুদ্রিত হয়। উহার পূর্ব্বে এক এক খানা আর্ম্মেনী বাইবেলের মূল্য ছিল ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত। এ দেশে আর্ম্মেনীর সংখ্যা কোনও কালেই তত বেশী নয়। তবে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে কলিকাতা সহরে যত আর্ম্মেনী ছিলেন, এখন আর তত ও আছেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৮১১ সালে স্ত্রীপুরুষে কলিকাতার আর্ম্মেনীর সংখ্যা ছিল ৪৮০ জন; ১৮৯১ সালের সেন্সাসে ২৩০ জন মাত্র গণিত। তবে, বাণিজ্য উপলক্ষে সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন মফস্বলের সদর বাজারে বসতি করিয়া থাকেন।

শিক্ষা;—বিবিধ।

এ দেশে আজ কাল জীবনী বা জীবনবৃত্ত লেখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। বড়ই শুভ লক্ষণ। কিন্তু জীবনী রচনার প্রকৃষ্ট প্রণালী কি? এ দেশীয় জীবনী লেখকদের কেহ কেহ উৎকৃষ্ট প্রণালী অবগত আছেন বলিয়া, আমাদের বোধ হয় না। অধিকাংশ, অধিকাংশ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত এক খানি জীবনী-পুস্তকও বাঙ্গালা ভাষায় দেখি নাই, জীবনীরচন। সম্বন্ধে এই প্রণালী ও পন্থা সম্বন্ধে এক ইংরেজ লেখক কি,—নিজে জীবনীরচয়িতা সম্প্রতি কি পরামর্শ দিয়াছেন, শুনা মন্দ নহে। লেখক বলিতেছেন,—

জীবনী-রচনা-রীতি।

জীবনী-পুস্তক ও বাঙ্গালা।

Mcclure's magazine.

"জীবনীর সুমহৎ গৌরব এবং সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণীশক্তি,—সত্যবিবৃতি। যাহা সত্য সরল ভাষায় সহিত বর্ণিত হইবে। সাহস ও সহানুভূতিপ্রবণ উদারতার সহিত বর্ণিত হইবে। কাজটা বড় সহজ নয়। জীবন দীর্ঘ। চরিত্র জটিল। জীবন স্বভাবতঃ আত্মবিরোধী,—জীবনে এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সহিত অপর এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সঙ্গতি হয় না; সঙ্গতি অন্ততঃ সুস্পষ্ট নয়। অতএব জীবনীলেখকের সবিশেষ সাবধানতা ও সুবিবেচনার প্রয়োজন। অতি সাবধানে, খুব সূক্ষ্ম বিচার করিয়া, জীবনীর ঘটনাবলী এরূপ উপযুক্ত অনুপাতে অঙ্কিত করিতে হইবে, যাহাতে করিয়া জীবনী তাহার বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তি নিজে যেমন তাঁহার অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও বন্ধু বান্ধবের নিকট আপনার চিত্তপট উন্মুক্ত করিয়া আপনাকে আপনি পরিচিত করিয়াছিলেন, জীবনীলেখককে জনসাধারণের নিকট তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। নহিলে জীবনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জীবনী লেখা গুরুশ্রম হইবে। জীবন-রচনার রীতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করা যাইতে পারে। (১) জীবনীলেখক জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির জীবনঘটনা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবেন, এবং আয়ত্ত করিবেন। (২) এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, বিদ্যমান আছে, এবং অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমস্ত একত্রে সংগ্রহ করিয়া সুচিপত্র করিয়া লইবেন। (৩) লেখক পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইবেন, পুস্তকের কোন কোন অংশে বিস্তৃত বর্ণনা করিবেন, এবং কোথায় কোথায় সংক্ষেপে সারিবেন এবং সমগ্র পুস্তকের আয়তনই বা কি হইবে। (৪) প্রশংসা বা নিন্দা একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে, ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছিল, কার্য্য যে রকমে হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ, এবং সেই রকমে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে, তদতিরিক্ত ভাল মন্দ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা অন্যায়, একান্ত অনুপযোগী। (৫) জীবনবৃত্তের যাহা কিছু এবং যত কিছু জানিবার পাঠকের আছে, তাহার এক অক্ষরও অপ্রকাশ রাখা উচিত নয়।"

শেষোক্ত দুইটা নিয়ম, এদেশীয় জীবনীলেখকদের সর্ব্বথা স্মরণ রাখা উচিত। ঘটনা অপেক্ষা সমালোচনাতেই তাঁদের বেশী ঝোঁক। অথচ জীবনীতে শেষোক্ত দ্রব্যের উপযোগিতা আদৌ নাই। বাঙ্গালা জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিরা, জীবনীলেখকের সমালোচনার, নিন্দার ও প্রশংসার প্রহারে মৃত্যুর পর আবার মারা পড়েন। চলিত কথায় ইহাকে বলে, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" এ সম্বন্ধে আপাততঃ আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না।

Educational Review. সম্পাদকীয় শিক্ষা।

এ দেশীয় সংবাদপত্র, বিশেষতঃ "ভার্ণাকুলার" সংবাদপত্র যেরূপে প্রস্তুত হয়, অভিজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। সম্পাদকীয় শিক্ষার আদৌ কোনও আবশ্যক আছে, এখানকার সম্পাদকেরা সেটা মনে করেন না। দপ্তরখানা খুলিয়া দোয়াত কলম কাগজ লইয়া সম্পাদক হইলেই হয়। এ দেশে সম্পাদকীয় শিক্ষা নাই; সংবাদপত্রও ভাল হয় না। সংবাদপত্রের সম্মানও নাই। কিন্তু সম্পাদকসিংহের বা সংবাদপত্রের সম্মান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমরা নিজ সম্প্রদায়ের গ্লানি নিজে করিতে উৎসুক নহি। কিন্তু, সংবাদপত্রের সম্মানসৃষ্টি ও সংবাদপত্রের দ্বারা সুশিক্ষাবিস্তার যদি আবশ্যক হয়, তবে সম্পাদকীয় শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। লিখন-অক্ষম, বচনা-নৈপুণ্যবিহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোক দিয়া কাগজ লিখাইলে, কোনও কালেই এ দেশে সংবাদপত্রের সম্মান হইবে না।

পাশ্চাত্যদেশে সম্পাদকীয় শিক্ষার জন্য, স্কুল কলেজে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে, এখানে সেরূপ হওয়ার আবশ্যক কি আজও হয় নাই? যে মতের, যে সম্প্রদায়ের, বা যে স্বার্থের পত্রই হউক না, সংবাদপত্র প্রস্তুত প্রণালীটা এবং সংবাদপত্রের অধিকারার্ধীন বিষয়গুলি, সম্পাদক ও সংবাদপত্রের লেখকমাত্রেরই সবিস্তারে শিক্ষানীয়। সংবাদপত্র আপিসে, সংবাদপত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষণীয়, তাহা অতি অল্প দিনেই শেখা যাইতে পারে। কিন্তু সম্পাদকীয় সাধারণ ও মৌলিক শিক্ষা তথায় হইতে পারে না। সম্পাদকীয় শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। শিক্ষালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ ও পরিপক্ক সম্পাদকদিগের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষিত করা হয়। এ সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকা আছে, এবং নূতন নূতন গ্রন্থ লিখিত হয়। সাময়িক পত্রাদিতে এ বিষয়ে রাশি রাশি প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্পাদকীয় সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে "এডুকেশনাল রিবিউর" একটা প্রবন্ধের দুই চারি লাইনের মর্ম্ম দেওয়া যাইতেছে। এ প্রবন্ধে সম্পাদকীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার অনেকগুলি সমীচীন সম্পাদক আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিউইয়র্কের ইভনিং পোষ্টের সম্পাদক লিখেন,—"সম্পাদকের পক্ষে সুবিস্তীর্ণ সাধারণ শিক্ষার অত্যন্ত আবশ্যক; বিশেষ করিয়া, ইতিহাস, অর্থনীতিবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র শিখা চাই। সম্পাদক আইনশিক্ষালয়ে কিছুকাল শিক্ষা পাইলে বড়ই ভাল হয়। সংবাদপত্রের ভাবী সম্পাদক সংবাদপত্র আফিসে যত বিলম্বে ভর্ত্তি হন, ততই ভাল। তথায় অতি অল্পই শিক্ষণীয় আছে।"

বোষ্টন অ্যাড্‌ভারটাইজারের সম্পাদক সম্পাদকীয় রচনাশিক্ষার উপর সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সম্পাদকের পক্ষে লিপি-নৈপুণ্য একান্ত অপরিহার্য্য।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের এডিটার বলেন;—সম্পাদকের সকল বিষয়ে সাধারণতঃ একটা জ্ঞান থাকা চাই। একটা বিষয়ে খুব পণ্ডিত আর গুলাতে সহামূর্খ হইলে চলে না। সম্পাদককে লেখাপড়ার চারিদিকে চৌকোস হইতে হয়, এ বিষয়ে আটপিটে লোকই উপযুক্ত সম্পাদক; সম্পাদককে সব বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়াই যে বলিতে হয়, তা নয়। তবে যে বিদ্যাসম্বন্ধীয় যে বিষয়ই হউক, হাতে পড়িলে ত সারবত্তা ও অসারত্ব বুঝিতে পারা চাই। এমনও অনেক

আহাম্মক সম্পাদক আছেন, যাঁহারা বুঝিবার ভুলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ উপেক্ষা করিয়া, অপকৃষ্ট প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করেন। বিষয়নির্ব্বাচন ও প্রবন্ধের-বিষয়গত দোষ ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি দৃষ্টিমাত্র বুঝিতে পারা, এবং তাহার কোন্ অংশ রাখিতে এবং কোন্ অংশ কাটিতে-ছাঁটিতে হইবে, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা সম্পাদকের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। সুতরাং সাধারণতঃ সকল বিষয়েই তাঁহার চলনসই জ্ঞান থাকা চাই। সুরুচি এবং সম্যক্ প্রকারে মার্জ্জিত-রুচি থাকা চাই। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বায়োলজি, সাহিত্য, ইতিহাস এবং অর্থশাস্ত্র,—সম্পাদকের সবিশেষ পঠনীয় হওয়া উচিত। মিথ্যা হইতে সত্য, এবং ভুয়ো হইতে খাঁটি নির্ব্বাচন-জ্ঞান, এবং কি বিশ্বাসযোগ্য, এবং কি অবিশ্বাস্য,—ইহা বুঝিতে পারা, সম্পাদকের একান্ত আবশ্যক। রচনায় অলঙ্কারাদির ব্যবহারশক্তি সম্পাদকের এরূপ হওয়া চাই, যাঁহাতে কবিরা বক্তব্য বিষয় ঠিক বক্তব্যকে না ছাড়াইয়া চটুল ও চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু ইহা কেবল শিক্ষা দ্বারা সাধিত হয় না। ইহা স্বাভাবিক শক্তিসাপেক্ষ।

নারায়ণ রামাবতারে হনুমান জাম্বুবান্ প্রভৃতির সহায়তায়, সমুদ্র বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু, সমুদ্র সেঁচার কল্পনা করেন নাই। দেবতারা সমুদ্র মথিয়াছিলেন মাত্র,—সেঁচেন নাই। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যাহা হয় নাই; সম্প্রতি কলিযুগে তাহা হইয়াছে।

সাগর সেঁচা।
Longman's Magazine.

সমুদ্র সেঁচার কেবল কল্পনা নহে; ব্যয়াদির বিবরণও বাহির হইয়াছে। এষ্টিমেটটা কিরূপ, পাঠক একবার দেখুন। সমুদ্রের প্রতি হাজার টন জল সেঁচিতে যদি এক পেণ্ী করিয়া ব্যয় পড়ে, তবে গোটা সাগরটা সেঁচিতে খরচ পড়িবে, ইংরেজের বাবতীয় ঋণের দশ হাজার গুণ পাউণ্ড। টাকাটা কত হয়, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজেই গণনা করিয়া লইবেন। আমরা সময়াভাবে কাতর। যদি সমুদ্রের সব জল খানির একটা গোল স্তম্ভ বানাইয়া সমুদ্রতল হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া রাখা যায়, তবে সেই স্তম্ভটার ব্যাস হইবে, মাপে ঠিক আড়াই মাইল দূর। সমুদ্রের প্রত্যেক দশ হাজার গ্যালন জল যদি এক পেনী মূল্যে বেচা যায়, তবে সাগরের সব খানি জলের দামে ১৫৫ বিলিয়ন পাউণ্ড হস্ত এক হইতে পারে। প্রতি সেকেণ্ডে যদি হাজার গ্যালন করিয়া জল সেঁচা যায়, তবে সমস্ত সাগরটা সেঁচিতে ১২ শত কোটি বৎসর লাগে!

অতএব নব প্রেমিকের পক্ষে "সাগর সেঁচে মাণিক" দেওয়াটা অগত্যাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব-সাপেক্ষ।

নিবেদন।

মাঘ মাসের সাহিত্যে, সহযোগী সাহিত্য প্রবন্ধে, রাজনীতিবিভাগে কংগ্রেসের বিবরণ সমালোচিত হইয়াছিল। সম্পাদকের অনবধানবশতঃ, তাহার ভাষা তীব্র ও অসংযত হইয়াছে, তাহা আমরা দুঃখিতহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি। আশা করি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেকে আমাদিগকে কংগ্রেসের বিরোধী মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী নহি। কংগ্রেসের নিন্দা বা বিরুদ্ধাচরণ, অথবা কংগ্রেস-পরিচালক মহাশয়দের প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন, আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কংগ্রেসের পক্ষপাতী ও হিতৈষী বলিয়াই, কংগ্রেসের ইষ্টানিষ্ট ও মতামত লইয়া অত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। যাঁহারা অন্যরূপ মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। কেন না, কোনও বিষয়ে মতান্তরের নাম "বিরোধ" নহে। ইতি।

সাহিত্য সম্পাদক।

৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রাণহীন মৃতদেহ, রাখিতে পারে না গেহ ;
তাই তাঁরে এসেছি রাখিয়া ;
জাহ্নবী তোমার তীরে, সাক্ষী রেখে বৈশ্বানরে
আসিয়াছি গৃহেতে ফিরিয়া।
ঘোর নীরবতা লয়ে' কাঁদিতেছে শূন্য গৃহ
ব্যাপিয়া প্রাণের হাহাকার।—
এক পার্শ্বে শূন্য শয্যা হৃদয় পাতিয়া কাঁদে
—যেন প্রিয় দয়িতা তাঁহার!
আশে পাশে গড়াগড়ি সুকোমল উপাধান
পিতৃহীনা বালিকারি মত ;—
হায়! জড়ে চেতনের তরে এমনি কাঁদে গো যদি,—
চেতনে বেদনা সহে কত!
পালিত বিড়ালশিশু কাঁদিতেছে ঊর্দ্ধমুখে
ঘুরিয়া ঘরের চারি ধার—
নিশি দিন ঐ শেষে, দেখিতে পাইত সে যে
দয়াময় প্রভুরে তাহার!
ধূলি মেখে মুখে চোকে, রাশি রাশি দিকে দিকে
পড়ে' আছে প্রিয় গ্রন্থগুলি ;—
প্রত্যহ যাদের সাথে মিলন নয়ন পাতে
নীরবে প্রাণের কোলাকুলি!
কোথা গেলে পাওয়া যায় এমন বান্ধব হায়
বিপুলা এ ধরণীভিতরে—
—এই শুধু ধ্বনিত অন্তরে!
কিন্তু এ বিলাপ কেন? কোথাও নাহিক যেন!
ঐ দেখ অতীত-মন্দিরে
শির-শোভা শুভ্র তাজে, সুযশ-মুকুতা রাজে,
দিব্যাঙ্গনা দুলায় চামরে!
প্রতি দিবসের মৃত্যু অমরতা দিয়ে যাঁর
জীবন করেছে বিলেপন,
—মরণে কি তাঁহার মরণ!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মাধুরী।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলডাঙ্গায় আজ মহা সমারোহ। চারিদিকে নৃত্য গীত; চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল, চারিদিকে ধন্য ধন্য শব্দ। নিতান্ত দুঃখী দরিদ্র যাহারা, তাহারাও আজ উৎসবে উন্মত্ত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে পতাকাশ্রেণী, মোড়ে মোড়ে শ্রুতিমধুর সুন্দর নহবৎ পুরবাসীদিগের কর্ণে মধুধারা ঢালিয়া দিতেছে। নগরে লোক ধরে না। কত দূর দূরান্তর হইতে লোকজন আসিয়াছে—ভিক্ষুক ভিক্ষার লোভে আসিয়াছে, ব্রাহ্মণ বিদায়প্রত্যাশায় আসিয়াছেন, পেটুক পেটের জন্য আসিয়াছে, কেহ বা কেবল উৎসব দেখিবার জন্যই ছেলে-মেয়ে সঙ্গে আনিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই যেন উৎসব লাগিয়াছে, প্রত্যেক বাড়ীই কুটুম্ব সাক্ষাতে পুরিয়া গিয়াছে। গাড়ী বোঝাই করিয়া রাজভৃত্যেরা দুই বেলা প্রতি বাড়ী বাড়ী অজস্র দ্রব্য দিয়া যাইতেছে। এই উৎসবের পর আরও ছয় মাস পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি যাহাতে না কিনিতে হয়, সময় পাইয়া অনেকে তাহারও সংস্থান করিয়া লইতেছে। এমন ধুম সে রাজ্যে কেহ কখন দেখে নাই, বা শুনে নাই।

যতই রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইবে, ধুমধাম ততই আরও বেশী। মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলঘট বসিয়াছে, কদলীতরু ও আম্রপত্রে প্রাঙ্গণ অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, অবিশ্রান্ত পূজা হোম চলিয়াছে। কোথাও সুসজ্জিত হস্তী সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শুণ্ড সঞ্চালন করিতেছে, কোথাও অশ্ব-দল বহুমূল্য ভূষণে সুশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও মল্ল মল্লক্রীড়া করিতেছে, সহস্র সহস্র দর্শক সে ক্রীড়া দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইতেছে। কোথাও নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে, কোথাও বাজিকর বাজি দেখাইতেছে, কোথাও গায়ক তাললয়ে কণ্ঠ মিশাইয়া সুমধুর গীততরঙ্গে উৎসব-ক্ষেত্র মাতাইয়া তুলিতেছে। দিকে দিকে কীর্ত্তন হইতেছে, যাত্রা বসিয়াছে, হরবোলা হাঁকিতেছে, পুতুলনাচ চলিয়াছে—কে কত দেখিবে? লোকের ভিড় ঠেলিয়া কত অগ্রসর হইবে?

স্থানে স্থানে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া দোকান বসিয়া গিয়াছে, যাহার

যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই লইতেছে, কাহারও নিকট এক পয়সা মূল্য লইতে পারিবে না, তাহার সমস্ত পাওনা রাজভাণ্ডার হইতে বুঝিয়া পাইবে। স্থানে স্থানে অন্নছত্র দানছত্র বসিয়া গিয়াছে, যে যত পারিতেছে, আহার করিতেছে ও ইচ্ছামত দান প্রাপ্ত হইতেছে। বন্দোবস্ত অতি চমৎকার, এত যে লোকারণ্য, তথাপি কিছু মাত্র বিশৃঙ্খলা নাই।

আজ ছয় দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিয়াছে, এ ছয় দিন বৃদ্ধ মুকুন্দরামের মাথা চুলকাইবার অবসর নাই। তিনি স্নানাহার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। পাছে কোথাও কোনও বন্দোবস্তের ত্রুটী হয়, এই জন্য একা যেন সহস্র হইয়া চারিদিকে অষ্টপ্রহর তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। বৃদ্ধের যেন যৌবনের বল ফিরিয়া আসিয়াছে, মুখে হাসিটুকু লাগিয়া রহিয়াছে, অতি হীন প্রজাকেও অমায়িক ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিতেছেন, বুড়া শরীরে এত মেহন্নত সয়, ইহা ভাবিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইতেছে। অগণিত কণ্ঠে অবিরত দেবীরায় ও মাধুরীর জয় উদ্ঘোষিত হইতেছে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া বুড়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া সেই শব্দে থাকিয়া থাকিয়া যোগ দিতেছে।

অন্তঃপুরে উৎসবের ঘটা আরও বাড়ারাড়ি রকমের। অত বড় প্রাসাদ, তাহাতেও লোকের স্থান কুলায় না। প্রধানা পরিচারিকাদিগের দ্বারা রাণী হৈমবতী দেশের সমস্ত স্ত্রীলোক আনিয়া সেখানে জড় করিয়াছেন। সেখানেও নাচ তামাসার স্বতন্ত্র প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাণী নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে পরিতোষের সহিত আহার করাইয়া বহুমূল্য বস্ত্রাদি বিতরণ করাইতেছেন। একই স্ত্রীলোক অমন কত বার কত রকম নূতন পরিচয় দিয়া আসিয়া দান চাহিতেছে, দু বার তিন বার দিয়া হয় ত ভাণ্ডারী একটু গরম হইয়া উঠিতেছে, তৎক্ষণাৎ রাণী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া নিজহস্তে সেই স্ত্রীলোককে তাহার ইচ্ছামত সামগ্রী আনিয়া প্রদান করিতেছেন।

পরিচারিকারা নূতন বসন ভূষণ পরিয়া দেমাকে পা ফেলিতে ফেলিতে অনাবশ্যক সত্ত্বেও এ দিক্ ও দিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া যেখানে কীর্ত্তন হইতেছে, সেই খানে গিয়া ঢং করিয়া দাঁড়াইতেছে। অষ্ট প্রহর পান চিবাইয়া চিবাইয়া মুখখানা রক্তগঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে।

মাধুরীর যাহারা সখী, তাহারা তো কেবল হাসিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িতেছে। কাজের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে শাঁখে ফু পাড়িতেছে ও উলু দিতেছে।

আর রহিয়া রহিয়া ভুবনকে গিয়া পাইয়া বসিতেছে। কত কি মাথামুণ্ড রসিকতা করিতেছে, তাহার অধিকাংশ ভুবনের বোধগম্য হইতেছিল না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া মুখ মুচকাইয়া একটু একটু হাস্য করিতেছিল। তখন কথার জবাব না পাইয়া সকলে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিল, ভুবন মুখচোরা, মেনিমুখো, অরসিক—এ নিশ্চয়ই বানরের গলায় মুক্তার হার পড়িয়াছে। একজন বলিল, "আরে না লো জানিস্ না, কথায় বলে বর না চোর।" তৎক্ষণাৎ সকলে অমনি হাততালি দিয়া 'চোর চোর' করিয়া উঠিল। কোথা হইতে কে বলিয়া উঠিল, "দেতো তবে চোরকে দেগে।" বলিতে না বলিতে এক জন এক ঘড়া হলুদ-গোলা আনিয়া হুড়হুড় করিয়া ভুবনের সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিল। ভুবনের নাকাল দেখিয়া হো হো করিয়া সকলে হাসিতে লাগিল।

যাহারা রাণী হৈমবতীর সহচরী, তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেচারা হরি-হরকে পাকড়া করিল। হরিহরের সে কয় দিন আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহার বাড়ী ঘর, পুত্র পত্নী, কোনও কথাই মনে ছিল না। সেই তাপদগ্ধ জীবনে নববর্ষার দিনে, সেই মিলনের হাসি কান্নার প্রথম সুখ মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, ভুবনকে আপনার বাহুপাশ হইতে মোচন করিয়া নয়নধারা মুছিতে মুছিতে হরিহর যখন দেবীরায়ের সহিত আসিয়া আলাপ করিলেন, তখন তাঁহার সেই সৌম্য উদার মূর্ত্তি ও ততোধিক সেই মহোদার চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শুভক্ষণে মুকুন্দরাম মাধুরীকে আনিয়া দেখাইল। বিধাতার সেই বিচিত্র ছবি দেখিয়া হরিহর বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনেকে অনেক প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইবে, এত সৌভাগ্য বিধাতা কি তাঁহার কপালে লিখিয়াছেন! সেই দিবসই পুরোহিত ডাকাইয়া দিন স্থির হইয়া গেল। সপ্তাহ পরে শুক্লসপ্তমীর রাত্রে সুতহিবুক লগ্নে বিবাহ। তৎক্ষণাৎ বড় বড় শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পর দিবস হইতে বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইল। সেই উৎসব দেখিয়া হরিহর আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। এ কয় দিন তাঁহার আহার নিদ্রা ছিল না। আহার করিবেন কি, কত কি যেন খাইয়াছেন, উদর সদাই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। নিদ্রা যাইবেন কি, সদাই কাণে সেই উৎসবরোল আসিতেছে, সেই একই কথা কেবল মনে জাগিতেছে, জাগ্রতেও সুখস্বপ্নে ভোর হইয়া রহিয়াছেন। আর কিছু মনে হয় না। মনে হয় কেবল ভুবন, আর সেই স্বর্ণপ্রতিমা-রূপিণী মাধুরী। থাকিয়া থাকিয়া আর একটি কথা মনে পড়ে—সে সেই মৃতা

পত্নী ভুবনের গর্ভধারিণী। হৃদয়ে যতই সুখের উৎস উথলিয়া উঠে, ততই মনে হয়—"অভাগিনি, এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার ভুবন কি বধূ ঘরে লইয়া যাইতেছে।" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে জল আসে, তৎক্ষণাৎ তাহা মার্জ্জনা করিয়া হরিহর পুত্রের কল্যাণকামনায় মন দেন।

আজ অন্তরাল হইতে কয়েক জন পরিচারিকা তাঁহাকে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"কি বেহাইঠাকুর, চোখে জল কেন, বল তো বেহানঠাকুরাণীকে আনিতে লোক পাঠাইতে বলি।" হরিহর অপ্রতিভ হইলেন। তাড়াতাড়ি চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আমি একটির বদলে দশটি পাইয়াছি, সে জন্য আমার দুঃখ কি?" এইরূপ আরও কত হাস্য পরিহাস হইল। সহসা বাজার সাড়া পাইয়া, সহচরীদল ত্রস্তে ছুটিয়া পলাইল। হরিহর অমনি "ধর ধর" করিয়া ছুটিলেন। হাসিতে হাসিতে রাজা আসিয়া বলিলেন, "কি বেহাই, উহারা ডাকিনী, উহাদিগকে ধরা কি আপনার আমার কাজ?" হরিহর মৃদু হাস্যে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কথাটা চাপিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, দিনের জনতা চলিয়া গিয়া, আবার রাত্রির জন্য নূতন জনতা আরম্ভ হইতেছিল। নহবতের সানাই বড় মধুরে পূরবিয়া রাগিণী ধরিয়াছিল। দীপমালা জ্বালিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটা-ছুটি করিতেছিল। অন্য কথা রাখিয়া তখন বৈবাহিকযুগল ছাদের উপর উঠিয়া উৎসব দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর, এই এত উৎসব, এত ধুমধাম যাহাকে লইয়া, সে কি করিতেছিল? সে আজ একা। মাতা নানা কার্য্যে ব্যস্ত, সখীরা সব আমোদে মত্ত—মাধুরী দিনের বেলায় কিছু করিতে পারিল না, কে জানে কেমন লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সভয়ে সন্ধান লইতে লাগিল, কোথায় কোন্ হতভাগিনী বৃদ্ধা ভিড়ের জন্য অগ্রসর হইতে না পারিয়া সারা দিন অনাহারে ধুঁকিতেছে; কোথায় কোন্ অনাথ অতুর জনতার চাপে পিষ্ট হইয়া ভগ্নহস্তপদে এক পার্শ্বে পড়িয়া রোদন করিতেছে; কোথায় কোন্ দরিদ্রাকে দুর্ব্বলা পাইয়া তাহার সঙ্গিনী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার দানপ্রাপ্ত বস্ত্রখানি কাড়িয়া লইয়াছে, আর সে অবিরলধারায় রোদন করিতেছে। একে একে সন্ধান লইয়া মাধুরী যে খাইতে পায় নাই, তাহাকে পর্য্যাপ্তপরিমাণে নানাবিধ আহারীয় আনিয়া দিল; যে

পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাকে তুলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিবিধ সামগ্রী দিয়া বিদায় করিল; যাহার বস্ত্র অপরে কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহাকে মোট বাঁধিয়া বহুমূল্য বসন প্রদান করিয়া, পাছে আবার তাহার সঙ্গীরা আক্রমণ করে, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে করিয়া অন্য পথ দিয়া রাস্তায় তুলিয়া দিয়া আসিল। বালিকা-শরীরে সেই অসামান্য দয়া দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

দূর হইতে এক জন স্ত্রীলোক সে বালিকাকে দেখিল। সে বুঝি তাহাকে চিনিত। বুঝি ভিড়ের ভিতর হইতে তাহাকেই সে খুঁজিতেছিল। পাছে তাহার দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় সে আর একবার উঁকি মারিয়া ভাল করিয়া দেখিল। তখন, সেই লোকারণ্য হইতে সরিয়া ধীরে ধীরে এক গাছতলায় বসিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সে রোদন করিতে লাগিল। সে কাতর ক্রন্দন পরদুঃখকাতরের হৃদয়ে বাজিল। দৌড়িয়া মাধুরী তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিয়া আরও অধিক কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আর্দ্রকণ্ঠে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল—"আহা, কি হয়েছে গা তোমার?"

রোরুদ্যমানা রমণী কোনও উত্তর করিল না। উত্তর করিল না, কেবল কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। দেখিয়া বালিকার প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠিল। বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি হইয়াছে, বল না, দেখি যদি কোনও প্রতিকার করিতে পারি।"

সেই কোমলকণ্ঠে সহানুভূতি-মাখান সেই কোমল কথা শুনিয়া রমণী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি আমার মাণিক হারিয়ে ফেলেছি। আমার বাছা কোথায় গেল—কে তাকে এনে দেবে? হায় হায়, আমি অভাগী কেন মরিতে এখানে এসেছিলেম গো—" কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সে আপনার গালে মুখে চড়াইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে মাধুরী বলিল, "তোমার ছেলে কি হারিয়ে গেছে—সে কত বড়টি বাছা?"

"ওগো সে আমার দুধের ছেলে। আহা! বাছা আমার আন্‌তে চায় নি, আমিই তাকে হিচ্‌ড়ে এনেছিলেম। ও গো, তাকে আমি কাকে দিয়ে গেলাম গো! হায় হায়! আমার এই সর্ব্বনাশের জন্যই কি এই পোড়া বিয়ে হয়েছিল গো!" আবার সে ডাক ছাড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কাতরোক্তি শুনিয়া বালিকার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। যেন কত

অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে বলিল—"তা, কাঁদিলে কি হবে মা? এস, বাড়ীতে এস, আমি এখনই তন্ন তন্ন করিয়া সব স্থান খুঁজিয়া তোমার ছেলে বাহির করাইতেছি।"

রমণী বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমি কে মা? তুমি কি মা রাজকন্যা?—নহিলে এমন দয়া আর কার হবে, কে এ দুঃখীর দুঃখে ব্যথা পাবে?"

মাধুরী বলিল, "হ্যাঁ আমি সেই পোড়ারমুখী, আমার জন্যই তোমার আজ এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।"

রমণী দেখিল, বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে, দুটি চক্ষু জলে টল্ টল্ করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, তাহা কেমন করিয়া উঠিল। সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "না না, অমন কথা বলিও না। হঠাৎ মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, সে জন্য কিছু মনে করিও না, মা।"

মাধুরী সে কথায় উত্তর করিলেন না। সে কথায় মনও তখন তাঁহার ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন—"হায় হায়, আমারই জন্য ইহার এই সর্ব্বনাশ! এ বিবাহ-উৎসব না হইলে ঐ স্ত্রীলোক তো এখানে আসিত না, তাহা হইলে সে পুত্রহারা হইয়া তো আজ আর এমন করিয়া ছট্ ফট্ করিত না। হা, ভগবান, কেন এমন করিলে? এ সুখের দিনে কেন এমন সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলে? এ বিবাহ কি সুখের হইবে? কি জানি, যদি সেই বালককে খুঁজিয়া না পাওয়া যায়—তাহা হইলে এ বিবাহে আমি কি কখনও সুখী হইতে পারিব? যত দিন বাঁচিব, তত দিন ঐ কথা যে শেল সমান হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকিবে।" মাধুরী যতই ভাবেন, ততই তাঁহার প্রাণ কেমন করিতে থাকে, চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসে।

তখন কতক মনকে বাঁধিয়া সেই রমণীর হাত ধরিয়া মাধুরী তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। কথাটা শীঘ্রই অন্তঃপুরময় ছড়াইয়া পড়িল। স্বয়ং রাণী হৈমবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজে তিনি সে রমণীকে বিস্তর সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুররক্ষকদিগকে ডাকিয়া সেই অপহৃত বালকের সন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। আদেশ পাইবামাত্র চারি দিকে লোক দৌড়িল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রাণী কি চিন্তা করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন।

তখনও সেই রমণী এক ধারে বসিয়া অনুচ্চস্বরে রোদন করিতেছিল। আর মাধুরী গৃহের জানালা খুলিয়া মহা ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠার সহিত কখন কে

আসিয়া কি সংবাদ দেয়, তাহা জানিবার জন্য বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুই জন পরিচারিকা আড়ালে আসিয়া গা টেপাটিপি করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল।

এক জন বলিল—"দেখ ভাই, মাগীকে যেন চেন-চেন করিতেছি।"

আর এক জন বলিল—"আমারও সেই সন্দেহ হইতেছে, কিন্তু বুঝিয়া তো উঠিতে পারিতেছি না।"

যে আগে বলিয়াছিল, সে বলিল—"কে জানে কোথায় যেন দেখেছি।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বিবাহ। মহা সমারোহ। চারিদিকে মহোল্লাস ও মহাজনতা। পরগণার লোক আসিয়া গাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই সকল লোকের কলরব, বাদ্যের কলরব ও সকলের উপর শঙ্খ ও উলুধ্বনির কলরবে সে ক্ষুদ্র নগর তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। আজ রাজা স্বয়ং হরিহর ও মুকুন্দরামকে সঙ্গে লইয়া প্রাতে একবার চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। রাণীরও প্রভাতে শুভচুনি ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আজ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ক্রমে যত বেলা হইতেছে, ততই মেয়ে আসিয়া জুটিতেছে—ইহাকে বলিতেছেন এস, উহাকে বলিতেছেন লও, তাহাকে বলিতেছেন খাও। কয় দিন এত যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম গিয়াছে, তথাপি কিছুমাত্র কষ্টবোধ নাই, একটুও বিরক্তিভাব নাই, সেই স্বভাবপ্রফুল্ল মুখ সদাই হাসি হাসি। আজ তাঁহার বড় আহ্লাদের দিন। অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া তিনি মাধুরীকে পাইয়াছিলেন, সেই মাধুরীর আজ বিবাহ—ক্ষুধাতৃষ্ণাজ্ঞান কি আজ আর থাকে? কেবল একমাত্র ভাবনা, কিসে নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, কিসে একজন প্রাণীও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে। এ কয় দিন দুই এক দণ্ড ছাড়া রাজারও তত্ত্ব লইতে তাঁহার অবসর হয় নাই।

প্রত্যূষেই সখীরা সব জলসহিয়া আসিয়াছিল। ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই তাহাদের কাজ বাড়িয়া উঠিল। কেহ মালা গাঁথিতে বসিল, কেহ বরণডালা সাজাইতে লাগিল, কেহ কন্যাচন্দনের চন্দন ঘসিতে আরম্ভ করিল, কেহ হাইআম্‌লা বাটিবার উদ্যোগ করিল, কেহ মোনামুনি ভাসাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। ছোট্ ছোট মেয়েগুলা দশ বিশটা শাঁখ একত্র করিয়া তাহা একচেটিয়া করিয়া বসিল। অনেক বিনোদিনী কোন্ কাপড়-

খানি পরিয়া বাসর জাগিবে, সিন্দুক খুলিয়া তাহারই সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইল। রসিকামহলে নিধু বাবুর শ্রাদ্ধ হইতে সুরু হইল।

পক্ষান্তরে, বেলা যখন তিনটা, স্বতন্ত্র মহলে থাকিয়া, হরিহর তখন নান্দীমুখ সারিয়া উঠিলেন। সস্নেহে পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া কপালে হোমের তিলক পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু এত যে হইতেছে, এত উৎসব, এত উল্লাস, এত সুখপ্রবাহ—যাহাকে লইয়া এই সব, সেই সদানন্দময়ী প্রফুল্লমুখী মাধুরী আজ হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদসাগরে ভাসিতেছেন। দুই দিন ধরিয়া তিনি খুব ভাল ভাল লোক দিয়া কত অনুসন্ধান করাইয়াছেন, কিন্তু কেহই তো সে অপহৃত বালকের সন্ধান আনিতে পারিল না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল খুঁজিবার জন্য যে সমস্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাও তো ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই শিশুর উদ্দেশ তো মিলে নাই। তাহাদিগের সেই নিষ্ফল বার্ত্তা শুনিয়া তিনি আরও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সেই রমণীর কথা মনে করিয়া তাঁহার কাঁদিতে ইচ্ছা গেল। আহা! বৎসহারা নিশ্চয়ই উন্মাদিনী হইয়া যাইবে। সে ভয়ে কিছু ফুটিয়া বলিতে পারে না, মাঝে মাঝে কেবল উদাস দৃষ্টে চায়, আর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ করে, সেই নিশ্বাসস্পর্শে তাঁহার প্রতি রোমকূপ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। তাহার মুখের দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হয় না। সখীরা সকলে তাঁহাকে সেই রমণীর কাছে যাইতে নিষেধ করে, বলে, উহার কট্‌মটে চাহনি দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু সখীরা বুঝে না, কেন সে অমন করিয়া চায়, কেন সে অমন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তাহার কলিজার হাড় খসিয়া গিয়াছে, সে কি আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? আহা! তাহার আর কেহই নাই। সধবা হইয়াও বিধবার অধিক। স্বামী বহু দিন হইল তাহাকে ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ঐ সন্তানটি মাত্র অবলম্বন করিয়া সে সংসারে ছিল। সেই সন্তান তাহার হারাইয়া গিয়াছে, সে যে এখনও একেবারে ক্ষেপিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আবার সে এখনই নিশ্চয় আসিবে, পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি কি উত্তর দিবেন? তাহার কাতরতা ও আকুলি ব্যাকুলি দেখিলে তাঁহার কান্না আসে, উত্তর করিতে কথা যোগায় না। তবে যত দিন আশ্বাসের সময় ছিল, দিয়াছেন, এখন কি বলিবেন? তিনি কি মিথ্যা বলিবেন? না বলিবেন, আর উপায় নাই—কোনও সন্ধানই মিলিল না! আর তখনই যদি সে দম ফাটিয়া মারা যায়?—আর ভাবিতে পারিলেন না। ছলছল চক্ষে যুক্তকরে

মনে মনে বলিলেন, "হে দয়াময় ঠাকুর, কি করিলে? কেন এ দায়ে ফেলিলে? অভাগিনীকে আর কি বুঝাই, কি বলিয়া প্রবোধ দিব? বিপদভঞ্জন, এ বিপদে রক্ষা কর।"

এ দুই দিন সে রমণী রাজবাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেছিল। তবে অষ্টপ্রহর সর্ব্বক্ষণ থাকিত না। যখন মাধুরীকে নিভৃতে একা পাইত, তখনই তাঁহার কাছে গিয়া জুটিত, আর লোক জন আসিলে, ধীরে ধীরে তথা হইতে সরিয়া যাইত। মাধুরী জানিতেন, সে তাহার বালককে নিজে খুঁজিতে যাইতেছে। তাহার অধীরতা দেখিয়া, তাঁহার স্বভাবকোমল হৃদয়খানি একেবারে গলিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত, মাধুরীও তাহাকে নিরাশার সংবাদ ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারিতেন না। রমণী কাঁদিত, দেখিয়া বালিকারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিত। মাধুরী তাহাকে এ দুই দিন কিছু খাওয়াইবার জন্য কত ক্লেশ করিয়াছেন, কিছুতেই তাহাকে এক বিন্দু জল পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ করাইতে পারেন নাই। খাইবার কথা পাড়িলেই রমণী বলিত, "আহা! বাছাকে কত কি খাওয়াইব বলিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার মুখে একটুও কিছু দিতে পারি নাই—সে আমার কোথায়? তাহাকে না পাইলে, আর কিছুই মুখে দিব না।" শুনিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিতেন। শেষ, তাঁহার জন্য স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্তও কি ঘটিবে?

এতটা যে হইয়াছে, রাণী ইহার কিছুই জানিতেন না। সখীরাও এ সব তত্ত্ব রাখিত না। তাহারা তো আমোদ লইয়াই বিব্রত, আর রাণীর তখন মাধুরী ছাড়া দেখিবার অনেক বিষয়। বস্তুতঃ, কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই সামান্য ঘটনা হইতে মাধুরীর হৃদয় এতই অধিক অস্থির ও অশান্ত হইয়া পড়িবে। মাধুরীও বোধ হয়, অন্য কাজ ও অন্য লোক জনের সঙ্গে মিশিতে পাইলে, এতটা সেই একই চিন্তায় সকল সময় আকুল হইয়া পড়িতেন না। বস্তুতঃ, একা পাইয়া সেই চিন্তা তাঁহাকে আরও এত অধিক অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। ভুবনের ভাবনা এত সে ভাল লাগিত, তাহাও যেন আর মনে আসে না। মনে আসিলেও তাহা ভাবিতে তিনি অবসর পান না। কদাচিৎ তাহা মনে উদয় হইলে অমনি সেই পুত্রশোকাতুরা রমণীর ধারাবিগলিত মুখমণ্ডল দেখিতে পান, আর হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠে। ত্রস্তে আপনার চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখেন। কখনও আপনার মনোবিকার বলিয়া বুঝিতে পারেন; কখনও বা সেই রমণীর কটমট দৃষ্টি দেখিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠেন।

দেখিতে পান, যেন সে তাহার দিকে ভীষণ দৃষ্টি করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছে। তাহার অভিশাপ ভাবিয়া ভয়ে আরও জড়সড় হইয়া পড়েন। বিধাতার রহস্য মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। যে দাতা, তিনি তাহাকে দাতৃত্বেই বদ্ধ করেন; যে ভক্ত, তাহার ভক্তিতেই তিনি তাহাকে লয় করেন; আর যে দয়াশীল, তাঁহার বিচারে সেই দয়াশীলতাই তাহার আত্মবলির কারণ হইয়া উঠে।

আজ শুক্লা সপ্তমী। সন্ধ্যার পরই আকাশের গায় সেই আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। কিন্তু আজ আর চাঁদের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ লক্ষ রংমশালের আলোকে লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। তার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে থধুপ সকল আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া লাল নীল পীত বিচিত্রবর্ণের ফুল কাটিয়া মাথার উপর অতি অপূর্ব্ব আলোক বিস্তার করিতেছে। এক বাড়ীতে অবস্থিতি করিলেও সে দিবস বর মনোহররেশে বিবিধ আলোকমালা আগে পাছে লইয়া নানা বাদ্য বাজাইয়া মহা জাঁকজমকে নগর ঘুরিয়া আসিতেছেন। সকল লোক বর দেখিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিয়া ঝুঁকিতেছে। আগে আগে হবিহর ও মুকুন্দরাম। তাঁহাদের উভয়েরই আনন্দের পরিসীমা নাই। উভয়েই মুক্তহস্তে রাশি রাশি অর্থ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। সম্মুখেই তোরণদ্বার। প্রবেশপথে মুকুন্দরাম এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঈষৎ পশ্চাৎ হটিলেন। তাঁহাদের পরস্পরে বেশ পরিচয় ছিল। সেই আগন্তুক মস্তক নত করিয়া একবার ইঙ্গিতে মুকুন্দরামকে নিকটে ডাকিল। মুকুন্দরাম বুঝিলেন, অবশ্যই কোনও বিশেষ রকমের গুরুতর আবশ্যকতা আছে; নহিলে সহস্রপরিচিত হউক, কাহার মাথার উপর মাথা যে, এমন করিয়া মুকুন্দরামকে ডাকিতে সাহস পায়? কে জানে, কেন বুড়ার মনটাও কেমন হঠাৎ অশুভ আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। পাছে হবিহর জানিতে পারেন, এই ভয়ে একবার দুই এক জন প্রহরীকে ধমক দিয়া, পশ্চাদ্ভাগ দেখিবার ছল করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সে লোকটিও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ঠিক্ গিয়া মুকুন্দরামকে ধরিল। মুকুন্দরাম তাহার অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসিলেন। সে একবার চারিদিকে চাহিয়া আরও একটু বেশি কাছে ঘেঁসিয়া, মৃদু স্বরে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া বৃদ্ধের চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইল।

অনেকক্ষণ নির্ব্বাকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মুকুন্দরাম বলিলেন, "মিথ্যা কথা।"

কথাটা খুব জোরে বলিলেন বটে, কিন্তু গলার আওয়াজটা তাঁহার স্বাভা-

বিক বলিয়া বোধ হইল না—কেমন ভাঙা ভাঙা, কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বাহির হইল।

যে সে কথা বলিয়াছিল, সে স্থিরভাবে উত্তর করিল, "আপনার সহিত অধিক কথা সম্ভবে না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এমন সময়ে আপনাকে এ ভয়ানক সংবাদ দিতে আসিতাম না।"

মুকুন্দরাম আবার বলিলেন, "না না না, ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। তোমার প্রমাণ ভুল হইয়া থাকিবে।"

সে লোক বলিল, "ভুল প্রমাণ লইয়া আপনার মনে কষ্ট দিতে আসিব, এমন মাথার উপর মাথা আমার নাই।"

বৃদ্ধা কথা কহিলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। যে বৃদ্ধ সপ্তাহ দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার তালু কেমন শুকাইয়া আসিল, পিপাসায় জিভ টানিতে লাগিল। মুখ দিয়া ক্ষণকালের জন্য একটিও কথা নির্গত হইল না।

সে ব্যক্তি বলিল, "কি করিব, প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল, নহিলে আরও কিছু পূর্ব্বে আসিলে ভাল হইত। কিন্তু দেখুন, এখনও সময় আছে, এখনও ভবিষ্যৎ শোধরাইবার উপায় আছে। এই জন্যই ভিড় ঠেলিয়া এমন সময়ে আসিয়াছি। আমার এ সংবাদের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

স্থির হইয়া মুকুন্দরাম শুনিলেন। স্থির হইয়া একবার চিন্তা করিলেন। না না, ইহা অসম্ভব—নিতান্তই অবিশ্বাস্য। সেই দেবচরিত্রে এই কলঙ্ক। এ নিশ্চয়ই কোনও শত্রুর ষড়যন্ত্র। সহসা ক্রোধে বৃদ্ধের সেই স্বভাবতঃ উজ্জ্বল দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অতি কর্কশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাবধান, মিথ্যা প্রকাশ হইলে পরে আমি নিস্তার রাখিব না। এখনও বুঝিয়া কথা কহ।"

কিন্তু সেই আরক্ত নয়ন ও কঠোর কণ্ঠের নিকট সে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র টলিল না। তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে উত্তর করিল, "না, করিবেন, আমারও নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এ সংবাদ মিথ্যা হয়; কিন্তু কি করিব, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।"

আবার সেই নিশ্চল ও নিষ্কম্প মূর্ত্তি দেখিয়া, এবং স্থির ও স্পষ্ট স্বর শুনিয়া, মুকুন্দরাম ক্ষণেকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কি বলিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। আর একবার এক মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টি

দেখিলে লোকে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত, ভয়ে মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যাইত, সেই তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে তিনি দেখিলেন, সে তেমনই স্থির ও নির্ভীক-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মাথার একগাছিও কেশ কম্পিত হইতেছে না। এ মূর্ত্তি মিথ্যাবাদীর বা কোনও ষড়যন্ত্রকারীর সম্ভবে না। লোক চিনিবা চিনিয়া তিনি মাথার চুল পাকাইয়াছেন। তাহার সে আকারেঙ্গিত দেখিয়া, তাহার কথার উপর কোনওসন্দেহ হয় না। কিন্তু মুকুন্দরামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। শূন্য নয়নে একবার আপনার চারি পার্শ্বে চাহিলেন। সেই জনস্রোত জল-স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, সেই আলোকশ্রেণী চক্ষু ঝলসিয়া উজ্জ্বল-শিখায় জ্বলিতেছে, সেই বাদ্যকর উচ্চরবে বাদ্য করিতেছে—তাঁহার নিকট মুহূর্ত্তের জন্য সমস্তই যেন ছায়াবাজি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে আমোদ-উৎসব সমস্ত তাণ্ডব বলিয়া অনুমিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বাক্‌শক্তি একেবারে হরিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন—এ কি স্বপ্ন, না তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইল? হায় হায় তাহাই কেন হইল না! তখনই সম্মুখে সেই প্রস্তরবৎ স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত কঠোর সত্য বলিয়া প্রতীত হইল। বুক পাঁজরায় পাঁজরায় গুঁড়া হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

তখন বর পুরী প্রবেশ করিয়াছিল। লোকসমূহ কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেছিল। মাথার উপর হঠাৎ কে যেন একটা লোহার ডাঙ্গশ লইয়া আঘাত করিল। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই ব্যক্তিকে প্রাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, উন্মত্তের ন্যায় মুকুন্দরাম প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দরাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন বটে, কিন্তু সহজে বেশী দূর যাইতে পারিলেন না। বর্ষাকালে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন প্রবল তেজে জলস্রোত বহিতে আরম্ভ হয়, তেমনি প্রবল তেজে তখন সেই জনস্রোত প্রাসাদ পুরোভাগ হইতে বহিয়া আসিতেছিল। সেই স্রোতে পড়িয়া মুকুন্দরাম অনেকক্ষণ হাবুডুবু খাইলেন। শান্তিরক্ষকদিগকে ইঙ্গিত করিবা মাত্রই তাহারা অবশ্য পথ করিয়া দিত, কিন্তু তখন তাঁহার মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহারাও বেশ জানিত, তিনি অবশ্যই সর্ব্বাগ্রে

পুরী প্রবেশ করিয়াছেন, এ অবস্থায় যে বাহিরে পড়িয়া থাকিবেন, তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই; সুতরাং কেহ কোনও খোঁজ খবর লইল না। বিস্তর কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া একটু একটু করিয়া বৃদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়া, শেষ মুকুন্দরাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মুকুন্দরাম কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, পাত্র সভায় নাই। তাড়াতাড়ি বিবাহমণ্ডপের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। অতি নিকটেই যে বিবাহমণ্ডপ, কিন্তু সেইটুকু যাইতেই এক ঘটি জলের তৃষ্ণা পাইল, শাল-তরুর ন্যায় সেই পদদ্বয় ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুকুন্দরাম গিয়া দেখিলেন, বর ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়া, দুই জন সিংহাসনের উপর বসাইয়া কন্যা লইয়া সাত পাক ফিরিতেছে, সখীরা চারি দিক্ বেড়িয়া আনন্দে হুলা-হুলি করিতেছে। আর চেষ্টা বৃথা। নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। সুবজন আমোদে এতই উন্মত্ত যে, কেহই তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিল না।

এক জন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে মুখ বাড়াইয়া বিবাহ ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার মুখ গম্ভীর, ললাটের শিরা সকল কুঞ্চিত, চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, আপনা আপনি কি অস্ফুট স্বরে বলিতেছে ও দন্তে দন্তে ওষ্ঠ নিপীড়িত করিতেছে—দূর হইতে সে মুকুন্দরামকে দেখিল। আরও কয়েক বার সে তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, চিনিতে পারিল। অপরের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সে বৃদ্ধের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি অমন করিতেছেন কেন, কি হইয়াছে?"

মুকুন্দরাম কোনও উত্তর করিলেন না, ক্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, "তবে কি আপনি কথাটা যথার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছেন?"

"কি কথা—কি বিশ্বাস করিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিতেছ?"—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৃদ্ধ এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন।

সে স্ত্রীলোক বলিল, "কথাটা শুনিয়া পর্য্যন্ত আমি তো আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছি, কিন্তু—"

মুকুন্দরাম তীরের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সর্ব্বনাশি, যদি শুনিয়াছিলে, তবে এতক্ষণ ইহা বাণীর কাণে তুল নাই কেন?"

সে বলিল—"আমি তুলিব! আমি কে? আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইবে কেন?"

মুকুন্দরামের কিন্তু এতই গোলমাল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাহা এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই। চাহিয়া দেখিলেন, এ রাজবাড়ীর কেহই নহে, এ সেই সন্তানহারা কাঙ্গালিনী। মুকুন্দরাম বুঝিলেন, এ সন্তান খুঁজিতে সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেরূপেই হউক, কথাটা ইহার শুনা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তবু হঠাৎ মনটার কেমন একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। কতকটা স্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শুনিয়াছ—কাহার মুখে শুনিয়াছ?"

স্বর শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, স্ত্রীলোকটি একটু থতমত খাইল; তার পর, সামলাইয়া বলিল, "আপনি আমাকে ভাঁড়াইবেন না। একটু আগে আপনার সহিত এক ব্যক্তির যে কথোপকথন হইতেছিল, আমি তাহা শুনিয়াছি। ঘটনাক্রমে আমিও সেই সময়ে সেই স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। উৎসব দেখিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, সেই জন্য অপরের সঙ্গে আমি চলিয়া যাই নাই। আপনার দুঃখে আপনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময়ে আপনাদের উভয়কে দেখিতে পাইলাম। গোপনে সব কথাই প্রায় শুনিয়াছি। কিন্তু না না, ইহা কি বিশ্বাস করিবার কথা।" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে বলিল—"তবে প্রমাণের কাছে আর বিশ্বাস অবিশ্বাস নাই।"

মুকুন্দরাম হতবুদ্ধির পর আরও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। প্রমাণ—প্রমাণ! স্ত্রীলোকেও জানে, প্রমাণের নিকট বিশ্বাস অবিশ্বাস নাই। হায় হায়, কি হইল! বিধাতার মনে এই ছিল! এই সময়ে সম্প্রদানসূচক উচ্চ শঙ্খধ্বনি হইল। মুকুন্দরামের বুকের উপর কে যেন সজোরে এক ঘা লাঠির বাড়ি মারিল। ভগ্নপ্রায় বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

আর সে রমণী? সে তাহা দেখিয়া মনের আনন্দে হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বিবাহান্তে বরকনে গাঁটছড়া বাঁধিয়া বাসরঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, পথে থামের নিকট সেই রমণীকে দেখিয়া মাধুরী চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সে বিকট ভ্রূকুটি করিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া আলেয়ার আলোর ন্যায় সেই মুখে হাসির ঈষৎ রেখা

প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহাতে তাহার মূর্ত্তি আরও ভীষণ হইতে ভীষণতর প্রতীয়মান হইতেছে, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া সে বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া কি বকিতেছে, বুঝি তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেছে—ভয়ে মাধুরীর বুক গুরগুর করিয়া উঠিল। ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সখীরা আসিয়া চারিদিক্‌ হইতে ধরিয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ছুটিয়া আসিয়া রাণী মাধুরীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। সখীরা শশব্যস্তে কেহ জল লইয়া আসিল, কেহ পাখা আনিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। অবাক্‌ হইয়া কাঠের পুতুলের ন্যায় ভুবন দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেক ক্ষণের পর একটা দমকা নিশ্বাস ফেলিয়া মাধুরী ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। মুখের উপর পড়িয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে মা আমার?"

মাধুরী কথা কহিলেন না। কথা কহিবার শক্তি তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইয়া দিলেন। সকলে সেই দিক্‌ চাহিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইল না। এই-সময়ে অদূরে এক বিকট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। সে হাসির রব শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। "ঐ—ঐ—ঐ" বলিয়া মাধুরী মাতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। এক জন ছুটিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "সেই নাগী, যাহারি ছেলে হারাইয়া গিয়াছিল, সে পাগল হইয়া গিয়াছে।" শুনিয়া রাণী অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

বালিকা মাতার ক্রোড় হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, "পাগল! আমার জন্য পাগল! ডাক—ডাক—উহাকে ডাকিয়া আন!"

রাণী বলিলেন, "কেন মা অমন করিতেছ? তোমার জন্য ও পাগল হইবে কেন? স্থির হইয়া আমার কোলের উপর শোও।"

বালিকা উত্তেজিত হইয়া—সেরূপ উত্তেজিত স্বর তাহার মুখে কেহ কখনও শুনে নাই—বলিল, "না না, তুমি জান না, আমারই জন্য পাগল। আমিই ঐ হতভাগিনীর পাগল হইবার কারণ। তোমরা আনিবে না, তবে আমিই চলিলাম—"

রাণী কন্যাকে ধরিয়া পুনরায় কোলের উপর শোয়াইলেন। মার মুখের প্রতি চাহিয়া অশ্রুসিক্তমুখে বালিকা বলিল, "আহা, ও কাঙ্গালিনী, উহার আর কেহ নাই।"

রাণীর ইঙ্গিতমাত্র দুই জন সেই স্ত্রীলোককে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া গেল। তাহারা এত খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

সেই রাত্রে প্রবল কম্প দিয়া মাধুরীর ভয়ানক জ্বর হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে দেবীরায় একাকী বহির্বারাণ্ডায় পাদচারণা করিতেছিলেন। সহসা কন্যার এরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনে তিনি যারপরনাই আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ হরিষে বিষাদ তিনি আর কখনও কাহারও হইতে শুনেন নাই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, কেবল চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া কন্যার সংবাদ লইতে, ভিষক্‌দিগের নিকট পরামর্শ জানিতে ও সুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেই কোথা দিয়া সেই রাত্রি চলিয়া গিয়াছে। প্রাতে বড় কষ্ট বোধ হওয়ায় চিন্তাভার মনে বাহিরে আসিয়া হাওয়ায় পায়চারি করিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মুকুন্দরামের কথা স্মরণ হইল। পূর্ব্ব রাত্রে কয়েক বার তিনি তাঁহার সন্ধান লইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কোনও সম্বাদ বলিতে পারে নাই। কন্যার চিন্তায় বিব্রত থাকায় আর বেশী কিছু খোঁজ লইতে পারেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, বাড়ীতে এতটা কাণ্ড হইতেছে, আর মুকুন্দরাম কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন? তিনি তো নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নন। মাধুরীকে তিনি কন্যার অপেক্ষা স্নেহ করেন, তাহার একটু কোনও অসুখ শুনিলে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কিসে তাহাকে সুস্থ করিবেন, সে জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া ভাল ভাল ডাক্তার ও ঔষধ আনয়ন করেন, ডাক্তারেরা সামান্য কোনও আশঙ্কার কথা বলিলে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া আসে, সব কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল তাহারই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়েন—সেই মুকুন্দরাম আজ মাধুরীর এই কঠিন অসুখের সময় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন—তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এক জন ভৃত্যকে দৌড়িয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য অনেক ক্ষণের পর ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মুকুন্দরামের কোনও সন্ধানই বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ রাজার দক্ষিণহস্ত ছিলেন, এ বিপদে তাঁহাকে না পাইয়া তিনি বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে এক প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি রাজদর্শন অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবীরায় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিহারীর প্রতি চাহিয়া একবার ভ্রূকুটী করিলেন। সে

ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, "আমি অনেক বলিয়াছিলাম, এখন দেখার সময় নয়, আপনি অন্য সময়ে আসিবেন। কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই শুনিল না, বলিল বিশেষ কথা আছে—বড় গুরুতর কথা—এখনই না বলিলে নয়। তা ছাড়া, সে নিভৃতে দেখা করিতে প্রার্থনা করে।"

কথা শুনিয়া, রাজা আরও অধিক বিস্মিত হইলেন। অপরিচিত লোক—বিশেষ গুরুতর কথা—এখনই না বলিলে নয়—নিভৃতে দেখা করিতে চায়! ইহার অর্থ কি? কে সে লোক? কি গুরুতর কথা? নিভৃতে দেখার আবশ্যকতা কি? যাহা হউক, দেবীরাণী কখনও কাহারও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই, বলিলেন—"ভাল, তোমরা সরিয়া যাও, ও তাহাকে পার্শ্বের গৃহে লইয়া আইস।"

অনুমতি পাইয়া সেই আগন্তুক ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। রাজা তাহার পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া বসিয়াছিলেন। সে প্রণাম করিল, দেবীরায় তাহাকে আসনে বসিতে বলিলেন। যে আসিয়াছিল, সে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই করযোড়ে বলিল, "আমি হুকুমের চাকর, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি একটি বিষম অপ্রিয় সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

রাজা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অশুভ আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। চিত্ত স্থির করিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "তোমার কোনও ভয় নাই, যাহা বলিতে তুমি আসিয়াছ, তাহা সচ্ছন্দে বলিতে পার।"

ধীরে—অতি ধীরে সেই ব্যক্তি যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিবামাত্র তীরবিদ্ধের ন্যায় রাজা লাফাইয়া উঠিলেন। "কি, এত দূর স্পর্দ্ধা।" প্রচণ্ড স্বরে মাত্র এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইল। সিংহ যেমন নায়কসহিত হইয়া একবার লাফাইয়া প্রচণ্ড হুঙ্কারে প্রচণ্ড চীৎকার ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়ে, সেইরূপ লম্ফ দিয়া চীৎকার করিয়া রাজা পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। তখনও সেই স্বর সেই ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে গর্জ্জিতেছিল, ভয়ে আগন্তুক দুই পা পশ্চাৎ সরিয়া গেল।

তার পর অনেক ক্ষণ কেহই কোনও কথা কহিল না। কথা কহিবার শক্তি তখন কাহারও ছিল না। অতি কঠোর দৃষ্টি করিয়া কঠোর স্বরে রাজা আবার বলিলেন, "এখনও সাবধান, বুঝিয়া কথা কহ।"

সেই ব্যক্তি মস্তক নত করিয়া বলিল, "আপনি অভয় দিয়াছিলেন, তাই বলিতে সাহস পাইয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইবেন না। কাল মন্ত্রী মহা-

শয়কে বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলে আর আমাকে আসিয়া আপনার রোষ-ভাজন হইতে হইত না।"

"মন্ত্রী! কে? মুকুন্দরাম?" সবিস্ময়ে রাজা তাহার প্রতি চাহিলেন।

সে সেইরূপ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৃদ্ধ মুকুন্দরাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিষাদগম্ভীর ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, তদুপরি জ্যোতিঃহীন নয়ন, সে নয়নে অর্থহীন উদাসদৃষ্টি ও সেই বজ্রাহতের ন্যায় বিকলমূর্ত্তি দেখিয়া রাজা অন্তরে শিহরিলেন। উন্মাদের ন্যায় বিকৃতকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল—"হাঁ মহারাজ, আমি—আমি মুকুন্দরাম। বিধাতঃ, ইহাই দেখিবার জন্য কি আমাকে এত দীর্ঘ পরমায়ু দিয়াছিলে?" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন—"আপনি কাল রাত্রে আমাকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া থাকিবেন। কি করিব, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলাম যে, বিধাতা নিতান্তই বিমুখ, এ বিবাহ কিছুতেই স্থগিত রহিবার নয়, তখন সেই রাত্রেই বিস্তর কষ্টে সন্ধান লইয়া সেই প্রধান সাক্ষী ভজহরির বাড়ী গিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা করিয়া ভয় বা লোভ দেখাইয়া, যেমন করিয়া পারি, তাহাকে অন্যরূপ এজেহার দেওয়াইব, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, এত করিয়াও কিছুতেই তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। তাহার মা আমার নাম শুনিয়া ভয়ে নিজে কত স্থান খুঁজিল, গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া সেই রাত্রি সে ক্ষুদ্র গ্রাম তোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু তবু কোথাও তাহার দেখা মিলিল না। কেবল এক জন বলিল, সে দেখিয়াছে অল্পক্ষণ হইল এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় গিয়াছে, কিম্বা কে সে স্ত্রীলোক, তাহার কোনও ঠিকানা হইল না। তখন হতাশ হইয়া কাজেই ফিরিয়া আসিতেছি। আমার সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, বুঝি চোখে কানেও আমি ভাল করিয়া দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি না, আর কি প্রতিবিধান করিতে পারা যায়, সে উপায় আমার মাথায় আসিতেছে না।" সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা ও গুরুতর চিন্তা এবং পরিশ্রমে বৃদ্ধ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আর দাঁড়াইতে না পারিয়া সেই মেঝের উপর দুই হাতে কপাল টিপিয়া বসিয়া পড়িল।

বিমূঢ়ের ন্যায় রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটিও কথা মুখ দিয়া নিঃসৃত হইল না। একবার ইতঃস্তত পাদচারণা করিলেন। গৃহের জানালা উন্মুক্ত

ছিল—একবার একটা জানালা দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, তত দূর লক্ষ্য করিলেন, আবার মুখ ফিরাইয়া কলের পুতুলের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃই সময় যাইতেছে দেখিয়া, সেই আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, "এখন আমার কি কর্ত্তব্য; আদেশ করুন।"

তদুত্তরে রাজা যেন স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন—"আর আদেশের অপেক্ষা কি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করিতে থাক।"

সে ব্যক্তি বিনীতভাবে বলিল—"কিন্তু আপনার জামাতা অন্তঃপুরে।"

"জামাতা!" যেন বিষাক্ত শেল গিয়া রাজার বুকে বাজিল। "আমার জামাতা! যাহাকে দুই দিন পর রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তীর্থদর্শনে যাইব ভাবিয়াছিলাম—সেই জামাতা! সে কুৎসিৎ অপরাধে অপরাধী। হা নারায়ণ কি করিলে? কেন আমার মৃত্যু লিখিলে না? কিন্তু—কিন্তু—" রাজা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কিন্তু সেই রূপ, সেই স্বভাব, তাহা যে সেরদুর্লভ—এ কথা আমি কেমন করিয়া মনে স্থান দিব? কেমন করিয়া ধারণায় আনিব?—না না, অসম্ভব—অসম্ভব—কিন্তু প্রমাণ—প্রমাণ—ওহো!" শত বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা এককালে জ্বলিয়া উঠিল। যেন কোথায়—এ পৃথিবী হইতে কত দূরে—কোন্ অন্ধতমপুরে কে তাঁহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া সজোরে ফেলিয়া দিল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই যেন কিসের করাল ছায়া, কিসের বিকট ভ্রূকুটী ও কে যেন অট্টহাসি হাসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছে, ইহাই দেখিতে পান। সেই পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল গম্ভীর মূর্ত্তি সামান্য তৃণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। সেই অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কায় অধীর হইয়া, আপনাকে সামলাইয়া, মুকুন্দরাম গিয়া রাজাকে ধরিয়া বিছানার উপর বসাইলেন। তিনি হাঁ না কিছুই বলিলেন না। কলের পুতুলের ন্যায় ধপ্ করিয়া বসিয়া শূন্যদৃষ্টে হাঁ করিয়া মুকুন্দরামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া বুড়ার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

মুকুন্দরাম বলিলেন, "একবার হরিহরকে ডাকি, তিনি কি বলেন শুনি।"

রাজা কোনও কথা কহিলেন না।

লোক দিয়া তখনই মুকুন্দরাম হরিহরকে ডাকাইলেন। হরিহর গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মুকুন্দরাম তাঁহাকে নিজে কোনও

কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, বলিলেন, "আপনি এই আগন্তুক লোকটি কি বলে শুনুন, তার পর আপনার যাহা বলিবার থাকে, আমায় বলিবেন।"

কথা শুনিয়া মুকুন্দরাম আরও অধিক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সময় বুঝিয়া সেই আগন্তুক ব্যক্তি হরিহরকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহাশয়ের নাম হরিহর চক্রবর্ত্তী ?"

হরি। হাঁ।

আগ। আপনার নিবাস মনোহরপুর ?

হরি। হাঁ।

আগ। আপনার একখানি স্বর্ণসিংহাসন কি চুরি গিয়াছিল ?

হরি। হাঁ—কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা, তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন কি ?

আগ। প্রয়োজন আছে। সে সিংহাসন এত দিনের পর পাওয়া গিয়াছে, যে চোর, সেও ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু—

হরি। বোধ হইতেছে আপনি পুলিষের লোক, চোর ধরা পড়িয়াছে, মাল পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে পুলিষে দিন ইহাতে আর কিন্তু কি ?

আগ। কিন্তু, যে চোর, সে আপনার পরম আত্মীয়।

হরি। আমার আত্মীয় ?—কে, আমার পুত্রের কথা বলিতেছেন ?—হরিহরের বিশেষ ধারণা ছিল, সে কাজ আর কাহারও নহে, অমূল্য হইতেই হইয়াছিল। অমূল্য সহস্র দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইলেও অন্য সময়ে তিনি তাহাকে পুলিষে দিতে চাহিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তখন তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়াছিলেন। সেই রাস্তার লোকের সমক্ষে পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি কত দিন মনে মনে তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছেন। ভাবিলেন, যেরূপে হয়, শোধরাইলেই মঙ্গল, কিন্তু বাড়ী থাকিলে যে শোধরায়, তাহার তো উপায় নাই—আজ নিজের চুরি করিয়াছে, কাল গিয়া অপরের ঘরে সিঁদ কাটিবে। তাহার শাসন হওয়াই ভাল। হরিহর বলিলেন, "তা, আমি কি করিব, পুত্রই যদি এ কাজ করিয়াছে এমন প্রমাণ হয়, সে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবে। তোমা[illegible]য়, কর।"

একখানি কাগজ বাহির করিয়া হরি-
না। তাহাতে লিখিত, মনোহরপুরের
কাতা সহরে হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের

দোকানে পাওয়া যায়। সে বলে, ভজহরি নামে এক ব্যক্তি তাহার নিকট তাহা বিক্রয় করে। ভজহরির সঙ্গে তখন আর একটি ভদ্রলোক ছিল, তিনি ঐ সিংহাসন তাহার পিতার সামগ্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার নাম ভুবন।

আরও তাহাতে অনেক কথা লিখিত ছিল, কিন্তু হরিহর তাহা পড়িতে পারিলেন না। 'ভুবন'—এই তিনটি অক্ষর দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। যে যেন সজোরে চুলের মুঠা ধরিয়া আছাড় মারিল। হাত হইতে কাগজখানা পড়িয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিক্ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আর সেই অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন, যেন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—ভুবন। হাঁ, করিয়া, হরিহরের সেই তারাসুন্দরীই যে সর্ব্বাগ্রে ভুবনের নামে এই কলঙ্ক দিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা স্মরণ হইল। চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া, হরিহর ক্রোধে বলিলেন, "আমি বলিতেছি, ইহা মিথ্যা কথা—ভুবনের দ্বারা কখনই এ কাজ হয় নাই, তাহা দ্বারা এ কাজ অসম্ভব।"

আগন্তুক ব্যক্তি ধীর মন্দ্রস্বরে বলিল, "কাহার দ্বারা কি কাজ সম্ভব অসম্ভব, তাহার বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। বিচার প্রমাণসাপেক্ষ। প্রমাণে আপনার পুত্র নির্দ্দোষ হন, সকলে অবশ্যই তাঁহার সুখ্যাতি গাহিবে, আর যে দোষী, সে যথোচিত দণ্ড পাইবে।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই কোনও কথা কহিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "আমি কাল সন্ধ্যার পর আসিয়াছি, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জবাব দিতে হইবে, আর বিলম্ব করিলে আমি মারা যাইব।"

মুকুন্দরাম দেখিলেন, লোকটা যাহা বলিতেছে, নিতান্ত অন্যায় নহে। স্ত্রীলোকের ন্যায় এরূপ "হা হতোস্মি" করায় এখন কোনও ফল নাই। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরাইবার নয়। তিনি যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও তো নিষ্ফল হইয়াছে, এখন হরিহর যদি কোনও উপায় করিতে পারেন, সেই জন্য উঠিয়া হরিহরকে লইয়া বাহিরে গিয়া যথাকর্ত্তব্য পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গত রাত্রির সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া হরিহর আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ভজহরি? এক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে কোথায় গিয়া[illegible] মনে উদয় হইল। সহসা ক্রোধে চক্ষু উঠিল, দন্তে দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত

উঠিতে লাগিল। অগ্নিগর্ভ ভূধরের ন্যায় সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মুকুন্দরাম অবাক্ হইয়া গেলেন। হরিহর বলিলেন—"আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ নিশ্চয় কোনও শত্রুর কাজ। বিলম্ব করিলে শত্রুকে আরও সময় দেওয়া হইবে। এস, ইনস্পেক্টার সাহেব, আমি আমার পুত্র লইয়া ছাইতেছি।"

তীরবেগে ছুটিয়া হরিহর ভুবনের গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া মুকুন্দরাম স্তম্ভিত হইয়া বোবার ন্যায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—মাঘ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের "বুদ্ধচরিত" বেশ চলিতেছে—এবার "বুদ্ধদেবের পর্য্যটন এবং শিক্ষারম্ভ" প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজচিত্র" সংস্কৃত প্রকরণ "মৃচ্ছকটিকের" একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক যেরূপ গ্রন্থ, তাহাতে অল্পের ভিতর তাহার বিবরণ দিতে গেলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া বোধ করি অসম্ভব। লেখক সমালোচনার দিকে যান নাই,—গেলে ভাল করিতেন। তাঁহার সমালোচনা করিবার শক্তি আছে, আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে মৃচ্ছকটিকের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন। লেখক উজ্জয়িনীর এইরূপ চিত্র দিয়াছেন, "উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন; নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকাননশ্রেণী, পাদমূল ধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধবিহার—পরিব্রাজকেরা সেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহা সমারোহে প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা সম্পন্ন হয়।" একটি কথা বক্তব্য যে, সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি হইতে অনেক সময়ে তখনকার সমাজের ও ইতিহাসের অনেক চিত্র পাওয়া যায় বটে, তবে, সেগুলি সংগ্রহ করিবার সময় খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমরা অসংযত সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন্দ্র বাবুর একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিব। এক স্থলে বলেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "উজ্জয়িনীর তদানীন্তন সমাজ চিত্রিত করিতে হইলে, এই বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত, এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল।" এই সিদ্ধান্ত কি মূলক? বলেন্দ্র বাবু মৃচ্ছকটিকের" আলোকে উজ্জয়িনীর যেটুকু দেখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য

খাটিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে, মৃচ্ছকটিকের কালে উজ্জয়িনীতে বিলাস ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মৃচ্ছকটিকের চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া তুলিতে যে যে উপকরণের আবশ্যক হইয়াছে, শূদ্রক কেবল তাহাই তাহার দৃশ্যকাব্যে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কেবল নির্ব্বিঘ্নে এইমাত্র সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এইরূপ বিলাসও তদানীন্তন উজ্জয়িনীর এক অংশ ছিল। কবি হয় ত সমাজের এক অংশমাত্র চিত্রিত করিয়াছেন,—তাঁহার চিত্রপটে যে সমাজের সমুদয় অংশের চিত্র থাকিবেই, এমন কোনও কথা নাই। সুতরাং, 'মৃচ্ছকটিকে' যাহার অভাব দেখিতে পাই, তখনকার সমাজেও তাহার অভাব ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই আন্দাজী অনুমান মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে লেখকদের মধ্যে এইরূপ অনুমান-মূলক সিদ্ধান্তের নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। তাই "মৃচ্ছকটিক" প্রবন্ধের উল্লেখকে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "নিহিলিষ্টতত্ত্ব" আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল. তাঁহার "সাংখ্যদর্শন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শুনিতে পাই, (এই স্থলে লেখক পৌষ-সংখ্যার "সাহিত্য" হইতে, তাঁহার "সাংখ্যদর্শনের" উপসংহারের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।) এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে, তাহা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। সন্দেহকারীগণ যদি সন্দেহের কারণ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট বিশেষ ঋণী হইব, এবং নিজের ভ্রম বুঝিলে, তাহা অকপটহৃদয়ে অঙ্গীকার করিব।" আশা করি, অতঃপর বিরুদ্ধবাদীরা অগ্রসর হইবেন। এরূপ বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা যত বেশী হয়, ততই ভাল। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জাতীর উৎপত্তি ও প্রকৃতি" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। বোধ হয়, নারায়ণ বাবু এক জন নূতন লেখক। ইঁহার বর্ত্তমান রচনা আশাপ্রদ; আমরা তাঁহার প্রবন্ধ পুনর্ব্বার পড়িয়াছি।

"দিদির অভিশাপ" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা, দুইটি মাত্র চরিত্রের বিশ্লেষের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রণালীতে রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক ও নায়িকা। এই সুন্দর নাট্যকাব্য পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বন্দনা করিয়াছি। বিস্তৃত সমালোচনার এ স্থান নহে,—দোষ ও গুণের সবিশেষ উল্লেখও অতি সল্পপরিসর স্থানে অসম্ভব। রবীন্দ্র বাবু কচের চরিত্র সহাভারত অপেক্ষা উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলাকল্পিত যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি বর্ণনা ও চিত্র, যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণশক্তিও প্রশংসনীয়, এবং উপভোগের যোগ্য। রবীন্দ্র বাবু গীতিকবিতায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি চরিত্রসৃষ্টি করিণা এখনও সফল হইতে পারেন নাই। আশা করি, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যজগতের চিত্র হইতে আমরা শিক্ষা ও সুখ লাভ করিব। 'কৃতজ্ঞতা" শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের একটি গল্প; এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। "পৌষ-পার্ব্বণ" পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ বাবুর একটি সামাজিক নক্সা। আমরা "পৌষপার্ব্বণ" বেশ উপভোগ করিলাম। পৌষ মাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন লিখিয়াছিলেন, মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দুপত্নী বিবাহ করিতেন, তাই ভারতে ৭।৮ শত বৎসর রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, বর্ত্তমান সংখ্যায় "মোগল রাজপত্নী" ইতিশীর্ষক

প্রবন্ধে কৃষ্ণবিহারী বাবুর মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। দুই পক্ষের দুই প্রবন্ধ পড়িয়া, আপাততঃ আমরা রজনীকান্ত বাবুকেই "জয়মাল্য" দিতেছি! দেখা যাউক, কৃষ্ণবিহারী বাবু আর কিছু বলেন কি না। এবার "স্বরলিপিতে" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২০ সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" অতি উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। আশা করি, বঙ্গের "রাফেল"গণ প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

ভারতী। পৌষ। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্তের "গ্রীনউইচ মানমন্দির" দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি কৌতূহলোদ্দীপক,—কিন্তু বিষয়গুণে কিছু কঠিন ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "কর্ণপ্রয়াগ" বেশ হইয়াছে। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "কে' একটি সুমিষ্ট কবিতা। আহ্লাদের বিষয় যে, এই সংখ্যায় "ফুলের মালা" উপন্যাস শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "কপোতবংশের অভ্যুত্থান' আমরা ধৈর্য্যসহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু সকলে পারিবেন কি না সন্দেহ করি। এরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা শিক্ষাপ্রদ,—কিন্তু অব্যবসায়ীর জন্য যেমন করিয়া এরূপ প্রবন্ধ লেখা উচিত, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সেরূপ নহে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "স্বপ্ন" নামক এক সংখ্যায় সমাপ্ত গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি হইল। বিষয়টি অবাস্তব, অসম্ভব, অদ্ভুত; কিন্তু এই গল্পে লেখক দক্ষতাসহকারে মানব এবং অতিমানব প্রকৃতির এমন সাবধানে অনুসরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার গল্পটি নিতান্ত আজগুবি হইয়া পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "আমাদের চাল চলন" ও তদুপরি কোনও অজ্ঞাত লেখক বা লেখিকার "মন্তব্যে" ভারতীর সুবিস্তৃত চৌদ্দটি পৃষ্ঠা পরিপূরিত হইয়াছে। এই চৌদ্দ পৃষ্ঠার আলোচনার বোধ করি সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, "সাহেবী চালটা কতখানি চালান উচিত?" এই চৌদ্দ পৃষ্ঠার অধ্যয়ন অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র। এবার স্বরলিপিতে স্বর্গীয় সাধক কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর একটি গানের সুর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কমলাকান্তের নামের আগে "শ্রী" কেন? তিনি অনেক দিন মর্ত্ত্য-ধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালীর ব্যবহারে মৃতের পূর্ব্বে "শ্রী" লেখা নিষিদ্ধ। আর একটি গান, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কে যাবি পারে।" "বাঙ্গালা একাডেমী' বোধ হয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। "একাডেমী" সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কোনও মত প্রকাশ করিলাম না।

নব্যভারত। মাঘ ও ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেনের "ভিক্ষাবৃত্তি" প্রবন্ধটি উপাদেয় ও আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "মার্শিয়েজ্ মনিবা" শেষ হইল, তিনি আবার আর একটি বিখ্যাত সঙ্গীত,—God save Ireland" আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশীয় সংগীতের এরূপ বিস্তারিত ইতিহাস বারংবার ভাল লাগে না। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধের নামটি যদিও সংক্ষিপ্ত নহে, কিন্তু প্রবন্ধটি সুপাঠ্য ও আলোচ্য বটে। "সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ মহাকাব্য" কোন্ মহাপুরুষের রচনা? ইহার এক একটা লাইন ভদ্রলোকের অপাঠ্য, এরূপ রচনা "নব্যভারতে" স্থান পায় কেন? শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "৺কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর" বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বসুর "স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ" তৃতীয় প্রস্তাব সুখপাঠ্য হইয়াছে। "পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, "বর্ত্তমান বঙ্গভাষা"র দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিয়াছেন। বিদ্যানিধি-মহাশয়ের এই বৃথা চেষ্টা দেখিয়া "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল" এই প্রবাদবচন মনে পড়ে। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার এই গুরুমহাশয়গিরি বিড়ম্বনা বলিয়া বিবেচনা করি। শ্রীযুক্ত

ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্যের "কলিকাতার ইংরাজীচর্চ্চা" অনেক অনুসন্ধানের ফল এবং পাঠকদের অধ্যয়নের বিষয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "চণ্ডীদাসের" সমালোচনায় চণ্ডীদাসের কতিপয় অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাসের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, ক্ষীরোদ বাবুর মত উপযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার আলোচনা করিলেন না কেন? চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালসম্বন্ধে রমণী বাবুর সিদ্ধান্ত প্রামাণিক কি না,—আমরা ক্ষীরোদ বাবুকে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বেদান্তরত্নাকর।—শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ বিরচিত। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি এবং বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য দর্শনাদির মতামত বিচার করিয়া, সহজে ও সরল ভাষায় এই পুস্তকে বেদান্তের যুক্তি প্রাধান্য বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া হিন্দু দার্শনিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের স্থূল মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। এরূপ পুস্তক যেরূপ ভাষায় লিখিত হইলে সহজে সাধারণের অভিগম্য হয়, গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমাদের মতে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। আশা করি, ধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন।

তত্ত্বকুসুম।—শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত। ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। আমরা পুস্তকখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্যামলাল বাবুর পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। আশা করি, তিনি অন্য পথে সাহিত্যের সেবা করিবেন।

HANDBOOK OF PROVERBS.—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। এই পুস্তকে, ইংরাজী প্রবচন ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ বা তদনুরূপ প্রবচন, একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সংগ্রহ বেশ হইয়াছে। আশা করি, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

সীতাচরিত।—শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত। সীতার জীবনচরিত অবলম্বনে লিখিত গদ্য কাব্য। বইখানি, "সীতার বনবাস" প্রভৃতির আদর্শে রচিত। ইহার বিশেষ কোনও গুণপণা দেখিলাম না। ভাষা চলনসই, কিন্তু এরূপ পুস্তকের ভাষা কেবল চলনসই হইলে চলে না, তাহার অন্য গুণও থাকা চাই। "সীতাচরিতের" ভাষার যেন প্রাণ নাই, ভাবেরও ইহাতে সম্পূর্ণ অভাব। পুস্তকখানির আমরা কোনও উপযোগিতা দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং আমরা ইহার প্রশংসা করিতে অক্ষম।

সমাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পাত্রী।

তালপুখুরের মিত্রদের আগে ভাল অবস্থা ছিল, এখন অবনতি। তালুক যাহা ছিল, তাহা অনেক দিনই গিয়াছে; দুই একটা জমা জমী ছিল, তাহা দ্বারা মিত্র মহাশয় কোনও প্রকারে সংসার চালাইতেন। যে বৎসর উমাতারার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই অনাথা বিধবা ও দুইটি সন্তান রাখিয়া মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন। একটি পুত্র সন্তান, নাম গোকুলচন্দ্র, অপরটি কন্যা সন্তান, নাম গোপবালা।

মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে অনাথা বিধবা ও সন্তান দুটি বড়ই কষ্টে পড়িল, এবং তাহাদিগের সংসার চালান ভার হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ দয়ার্দ্র লোকে কিছু কিছু সহায়তা করিলেন, এবং বিন্দু যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আইসেন, তখন মিত্রপরিবারের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। মিত্রদিগের জমা জমী যাহা ছিল, তাহা ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, পরিবারের খাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চাউল ডাল, তরি তরকারি পাঠাইতেন, বর্ষাকালে তাহাদের বাড়ীর উঠানে কতকগুলি বেগুন গাছ ও নানা প্রকার শবজি রোপণ করিয়া দিতেন, এবং শীতকালে ছেলেদের জন্য গরম জামা স্বহস্তে সেলাই করিয়া দিতেন। সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন, এবং শিশু গোপবালা সর্ব্বদা বিন্দুর বাড়ী খেলা করিতে আসিত।

গোকুলচন্দ্র গ্রামের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, কিন্তু পিতৃবিয়োগবশতঃ এখন অধ্যয়ন ত্যাগ করিল, কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের অশিক্ষিত বালকের কি কায মিলিবে? কিন্তু ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান্, ৮৲ টাকা ১০৲ টাকার বকশীগিরি বা সরকারি করিবা কিছু টাকা করিল, এবং এখন রাস্তা পথের কণ্ট্রাক্ট লইয়া বিশেষ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মাকে ও ভগিনীকে বড় কিছু পাঠাইত না; গোকুল বুদ্ধিমান্, টাকা জমাইতে জানে।

তালপুখুরে গোকুলের মা ও ভগিনী জমী হইতে সামান্য আয় পাইত, এবং

সাহায্যে কোনও প্রকারে সংসার চালাইত। বিন্দুর কন্যা সুশীলার বয়স তখন সাত বৎসর, গোপবালার বয়স তখন নয় বৎসর, সুতরাং দুই জনে সর্ব্বদাই একত্র বিন্দুর উঠানে খেলা করিত। সুশীলা শ্যামবর্ণা ও বড় ভাল মানুষ, চক্ষু দুটি মার মত সুন্দর ও বিশাল, কিন্তু মেয়েটি বিশেষ সুন্দরী নহে। গোপবালা বড় ধারাল মেয়ে, বড় সেয়ানা, বড় সুন্দরী। মুখখানি সৌন্দর্য্যে ও বুদ্ধির লক্ষণে বিভূষিত, বং যেন কাঁচা সোণা, ভ্রূলতা যেন তুলি-দিয়া আঁকা, চক্ষু দুটি কি উজ্জ্বল, কি তীক্ষ্ণ! তালপুখুর গ্রামের মধ্যে এরূপ ফুট্‌ফুটে মেয়ে আর ছিল না, গ্রামের বিস্তীর্ণ বাগানে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় মেয়েটি যখন ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত, বোধ হইত, যেন কোন দেবকন্যা-নন্দন-কাননে বিচরণ করিতেছে। কৃষকগণ মাঠে যাইবার সময় মেয়েটিকে দেখিলে ফিরে চাহিত, ঘাট থেকে মেয়েরা জল আনিবার সময় কলস নামাইয়া একবার মেয়েটিকে কোলে লইত।

গোপবালা যেমন সুন্দরী, তেমনি সেয়ানা। নয় বৎসরের মেয়ের যে পেটে পেটে বুদ্ধি, তাহা দেখিয়া গ্রামের বয়স্কাগণ বিস্মিত হইতেন। একলা ভাবিত, একলা মতলব স্থির করিত, একলা গোপনে সম্পাদন করিত। সুশীলার সহিত খেলা করিত, কিন্তু সুশীলা হাবা মেয়ে, গোপবালার মন কি বুঝিবে। সুশীলাকে তুষ্ট করিয়া তাহার খেলার সামগ্রী গুলি একে একে সংগ্রহ করিত, বিন্দু ও সুধাকে মা বলিত, ও তুষ্ট করিয়া কখন একটি খেলনা, কখন মিষ্টান্ন, কখন এক খানি ঢাকাই কাপড় সংগ্রহ করিত। বিন্দু বলিতেন, "আহা মেয়েটি কি শান্ত, কি নম্র, কি সুধীর। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।"

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবালার মার নিকট ঘটকী আসিল,—গোপীর মা গালি দিয়া বলিলেন, "বলিস কি পোড়া মুখী, আমার মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিব? ৫০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেয়ের বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে খাবে, গয়না নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে? হইলাম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই থাকিব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করিব না। ও মা, ছি! ছি! ছি! বলি বুড়ো যে আমার গোপীর ঠাকুদ্দাদার বয়সী,—বাছা উমার যদি ছেলে থাকিত, সে যে আজ প্রায় গোপীর বয়সী হইত, বিন্দুর মেয়ে যে প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই বিন্দুর জেঠা, উমার বাপ, সে কি না আমার গোপীকে বিয়ে করিতে চায়? বলি যম কি বুড়োদের ভুলে থাকে গো? আর বুড়ো গুলোই বা কি গা? নাতিনী-বয়সী ফুট্‌ফুটে মেয়ে দেখেও

মুখ দিয়ে নাম পড়ে? ছি! ছি! অমন বুড়োর মুখে আগুন। না, গো, না, অমন কথাটি মুখে এনো না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়াছিল, কি হইল দেখিলে ত? আবার সেই রকম কায করে? না, গো, না, আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, যাঁর ধন, যাঁর সংসার, তিনি আমাকে কাঁদিয়ে চলে গিয়াছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না"—বিধবা স্বামীকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী ফিরিয়া গেল,—বালিকা গোপবালা বেড়াব বাহিরে দাঁড়াইয়া সকল কথা গুলি শুনিল। মনে মনে বলিল, "আমি বড় ঘরের বৌ হব, তাতে মা আপত্তি করিতেছেন। মার আপত্তি খাটিবে না।"

তারিণী বাবু মতলব স্থির করিলে সহজে হটিবার লোক নহেন। পর দিন ঘটকী বিন্দুর নিকট আসিল, এক খানা চিঠি বিন্দুর হস্তে ছিল। চিঠি খানি বিন্দুর জেঠাইমা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই লিখা আছে;—

"মা বিন্দু,—তোমার জেঠামহাশয়ের সন্তানাদি না থাকায় আবার বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত আছে। মিত্র গোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটি মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জেঠামহাশয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটি শুনিয়াছি বড় নম্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত লোক, এবং তোমার কথা শুনেন। তাঁহার সম্মতি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া তোমার জেঠাইমার কথা রক্ষা কর।

"পুনশ্চ—বাছা উমা গিয়ে অবধি তুমিই আমার মেয়ে,—আবশ্যক হইলে তোমার ঘরে মাকে স্থান দিও।"

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছত্রটি পড়িয়া এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার জেঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে শেষ ছত্রে বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর লিখিলেন,—

"জেঠাইমা,—জেঠামহাশয় জ্ঞান হারাইয়াছেন, তুমিও কি জ্ঞান হারাইলে? কালীতারার অবস্থা চক্ষে দেখিয়াও গ্রামের আর একটি মেয়েকে জলে ভাসাইবে? জেঠাইমা, আমি ছেলেমানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দিব? তুমি বুঝিয়া দেখ, জেঠামহাশয় কি এ বিবাহে সুখী হবেন? তুমি যেরূপ শরীর মাটি করিয়া জেঠামহাশয়ের সুশ্রূষা করিতেছ, অল্পবয়স্কা স্ত্রী কি জেঠামহাশয়ের সেইরূপ পরিচর্য্যা করিবে? যদি সে স্ত্রী ক্লেশদায়িনী হয়, জেঠামহাশয়ের এই শেষাবস্থায় ক্লেশ তোমাকে আমাকে চক্ষে দেখিতে হইবে।

"জেঠাইমা, এ কাযটি হইতে দিও না, এ কাযে আমি সাহায্য করিতে পারিব না।"

বিন্দু চিঠি খানি এক বার দুই বার চেঁচিয়ে পড়িলেন। চিঠি-খানি মনোমত হইয়াছে। ঘটকীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঘটকী বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণ পরে, আর এক জন বেড়ার পাশ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। গোপবালা দাঁড়াইয়া দুই খানি চিঠি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছে, মনে মনে বলিল; "আমি বড়ঘরের বৌ হব, তাহাতে সুশীলার মা বাধা দিতেছে, বাধা খাটিবে না।"

সন্ধ্যার সময় সুধা বিন্দুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সুধাকে দেখিয়াই বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "বলি ওলো সুধা, আমাদের নূতন জেঠাইমাকে দেখেছিস্?

সুধা। না দিদি, নূতন জেঠাইমা আবার কে?

বিন্দু। ওলো তা জানিস নি, তবে জানিস কি? ঐ দেখ, বাগানে সুশীলার সঙ্গে খেলা করিতেছে।

সুধা। সে কি দিদি? ও যে গোপী, ওর সঙ্গে জেঠাইমা সম্পর্ক পাতালে না কি?

বিন্দু। ওলো আমি পাতাব কেন? সম্পর্ক পাতাবে, পাতাবে,—যার পাতা-বার সে পাতাবে।

সুধা। এ তোমার কি ঠাট্টা দিদি, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নি। তুমি যে হেসে গড়িয়ে গেলে দিদি। সত্য সত্য বল না দিদি হয়েছে কি?

বিন্দু। না হয় নি কিছু বোন, বোধ হয়, মাস খানেকের মধ্যেই হবে।

সুধা। কি হবে, কি হবে?

বিন্দু। ঐ যে বলিলাম, ঐ গোপী আমাদের নূতন জেঠাইমা হবে, জেঠা-মশাই যে ওকে বিয়ে করবার জন্য ঘটকী পাঠিয়েছেন! ও গোপী, গোপী, বলি জেঠামশাইকে বিয়ে করবি লো?

গোপী। বড়মা, ডাকছ?

বিন্দু। হাঁ ডাক্‌ছি, একবার কোলে আয়।

বিন্দু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া, সেই নম্রমুখী উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপূর্ণা ফুটফুটে মেয়েটির ঠোঁটে চুমো খেয়ে, তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণ চক্ষু দুটিতে চুমো খেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি জেঠামশাইকে দেখেছিস্?"

গোপী। হাঁ বড়মা, দেখেছি বৈ কি।

বিন্দু। কবে দেখ্‌লি লো?

গোপী। ঐ যে কাল বিকালে আমি পুখুরধারে খেলা করিতে গিয়াছিলাম, তারিণী বাবুও গিয়াছিলেন।

সুধা। ও হরি! তবে বর কনের চখোচখি হইয়া গিয়াছে! হেঁলা, জেঠামহাশয় তোকে আদর করেছিল?

গোপী। হাঁ ছোটমা, তারিণী বাবু একবার চার দিকে চেয়ে দেখিলেন। দেখিলেন, কোথাও কেউ নেই, তখন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কত চুমো খেলেন।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। উঠিয়া সুধাকে বলিলেন, "বলি শুনলি সুধা, এই কালই বর কনের মিষ্টালাপ হইয়া গিয়াছে। বলে, সে কালের বুড়োরা নাতনীদের সঙ্গে ঠাট্টা করিত, আজকাল কি সত্য সত্যই নাতনীদের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে? ছি! ছি! ছি! এ লজ্জার কথা যখন জগতে রাষ্ট্র হবে, তখন আমাদের কালামুখ লুকাব কোথায়? জেঠামহাশয় কি সত্য এ বয়সে লোক হাসাইবেন? বলি গোপী, জেঠামশাইকে তোর মনে ধরে?"

"ধরে।" এই কথাটি বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিন্দু বলিলেন, "বালিকা কি সরলা, বিয়ের কথা কিছু জানেও না, বুঝেও না, জেঠামশাই উহাকে কোলে করিয়া চুমো খেয়েছেন, সরল মেয়েটি তাহাতেই আনন্দিত হইয়াছে। ছি! ছি! জেঠামহাশয়, তুমি বিজ্ঞ, তুমি বহুদর্শী, তুমি বুদ্ধিমান্, এই সরলা বালিকাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া যাইও না।"

বিন্দু একটু ভুল করিয়াছিলেন, বালিকা নিতান্ত সরলা নহে। বিয়ের কথা কিছু কিছু জানে, ধনগৌরবের একটু লালসা রাখে, সুবর্ণ ও মণিমুক্তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এবং দারিদ্র্য হইতে উত্থান করিয়া একবার বড় ঘরের বৌ হইবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বাল্যহৃদয়ে ধাবণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির।

তারিণী বাবু একবার মতলব স্থির করিলে শীঘ্র হটিবার লোক নহেন। বর্দ্ধমানে গোকুলচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। গোকুল লোকমুখে বিশেষ কোনও কথা জানিতে পারিল না, তবে কোনও কারণে তারিণী বাবু ক্রুদ্ধ

হইয়াছেন শুনিয়া কিছু ভীত হইল। নাজির মহাশয়ের বর্দ্ধমানে প্রভুত্ব ও সাহেবদের নিকট খাতির, এ সকল বিষয় গোকুল বিশেষ জানিত, নাজির মশাই এক বার সাহেবদের নিকট তাহার বদ্‌নাম করিলে তাহার কণ্ট্রাক্টও ঘুচিবে, অন্নও ঘুচিবে। সভয়ে পরদিনই গাড়ী করিয়া তালপুখুর গ্রামে আসিয়া, ঘরে না গিয়া একেবারেই তারিণী বাবুর গৃহে উঠিয়া, নাজির মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিল।

নাজির মহাশয় বড়ই কষ্ট, মুখ ফিরাইয়া কথা কহেন না। সভয়ে ও সসম্মানে গোকুল অনেক মিষ্ট কথা দ্বারা তারিণী বাবুর মন ভিজাইয়া বলিল, "আমি চিরকালই আপনার আজ্ঞাধীন, আপনার অন্নেই পালিত, আপনার অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এ অধীনের প্রতি কি জন্য বিরক্ত এক বার বলুন, কি আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন, অধীন কি কখন আপনার অবাধ্য হইতে পারে?"

তারিণী বাবু। না হে ভায়া, (এত দিন বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এখন নূতন সম্বন্ধ) এখন আর তোমরা অধীন কৈ? এখন ঢের কণ্ট্রাক্ট পাও, ঢের টাকা রোজকার কর, এখন আমাদের কি আর মানিবে, না আমাদের কথা শুনিবে? আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে, কে সাহেবদের বলিয়া তোমাকে এত কণ্ট্রাক্ট দেওয়াইয়াছে, তাহা দেখিব, আর ভবিষ্যতে কিরূপে কণ্ট্রাক্ট পাও, তাহাও দেখিব।

গোকুল। সে কি? বলেন কি? আপনারই অনুগ্রহে, আপনারই খাতিরে আমার যথাসর্ব্বস্ব উপায়, তাহা কি আমি জানি না? বর্দ্ধমানে এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাদুকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণী বাবু। না আর আমাদের কথা কৈ খাটে? যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তোমার মা আমার কিরূপ অপমান করিয়াছেন শুন গিয়া। ঝাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদায় করিয়াছেন! মিত্রজ আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না তাঁহার বিধবা, যাহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আচ্ছা দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কাঙ্গালী, সে তালপুখুরের ধনাঢ্য মল্লিক বংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বলুন না।

তারিণী বাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছেও অপমানিত হইব? না হে ভাগা, তাহাতে কায নাই। এখন তোমরা বড়মানুষ, তোমবা বড় ঘর, আমরা ছোট লোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ যে আকাশেব চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলে সম্মানিত হয়; আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও কি হবে?

মিষ্ট কথায় দেবতারাও তুষ্ট হয়েন, তারিণী বাবুব মন একটু ভিজিল। আজ্ঞা করিলেন,—"অরে হরে! তামাক দেত। বস ভায়া বস, অনেক দূব থেকে আসিযাছ, দেখছি এখনও বাড়ী যাওয়া হয় নাই, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা, বস ভায়া বস, তোমার মত বিনীত ছেলে এ কালে দেখিলেও আনন্দ হয়।

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি দাঁড়িয়েই রহিলাম, যতক্ষণ আপনার আদেশ না পাইব, বতক্ষণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততক্ষণ আসন গ্রহণ কবিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণী বাবুব মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্‌কেতে ফুঁ দিয়া আগুনটা ধবাইয়া ভাল করিয়া তামাক টানিয়া, গলাটা সাড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"না বলছিলাম কি, তোমার পিতা মিত্রজর সহিত আমাব কিরূপ প্রণয ছিল, তাহা ত তুমি জানই।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার বিপদ আপদের সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে বড় কেহ ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসিতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মা ঠাকরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্দ্ধমানে সাহেবদের নিকট পরিচিত কবিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড় চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিত্রবংশের জন্য কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তা করিব না কেন বল? তোমাদের কুল ভাল, বংশ ভাল, আচরণ ভাল, তোমাদের জন্য করিব না ত কি আমার নাস্তিক ভাই-ঝি-জামাইদের জন্য করিব? না আমার নিজের মাতাল জামাইয়ের জন্য করিব? না হে ভায়া, এ ঘোর কলিতেও ধর্ম্ম আছেন, এখনও সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, এখনও তোমাদের ন্যায় সদ্বংশের উন্নতি অবশ্য হইবে।

গোকুল। সে আপনার অনুগ্রহ।

তারিণী বাবু। তাই মনে করিতেছিলাম, বিষয় সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছি, তালুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লগ্নি, কারবার, বাড়ী ঘর, গহনাপত্র সমস্তই আছে। এ আর কাহাকে দিয়া যাইব? কন্যা উমা ত আমাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহিণীও সেই শোকে যায়-যায় হইয়াছেন। তা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, জলপুখুর গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, সদাচরণে মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া যাই, তাহা হইলে যাহা রাখিয়া যাইব, এ সমস্তই তোমাদের,—তোমার ভগিনীরও যা, তোমারও তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান্ ছেলে, কথার আভাসে তারিণী বাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে বুদ্ধিমানের ন্যায়ই নিষ্পত্তি করিল। মেয়েছেলের আবার প্রছন্দ অপছন্দ কি? মেয়েগুলো হয়েছে পুরুষের সুখের জন্য, এবং বংশের উন্নতির জন্য, তাহাদের আবার সুখই কি, উন্নতিই কি? যদি ভগিনীটাকে মল্লিকবংশে ভাসিয়ে দিয়ে মিত্রবংশের (অর্থাৎ নিজের) কোনও উন্নতি সাধন হয়, তবে ত সে পরম মঙ্গল। প্রকাশ্যে বলিল, "মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এত আপনার অনুগ্রহ মাত্র। ইহার বাড়া কি সম্মান আর আমাদের আছে? আমরা পথের কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ!"

তারিণী বাবু। আহা তোমার মত বিনীত মিষ্টভাষী ছেলে কি আজ কাল দেখা যায়? আর দেখছ কি ভায়া, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী হউক, তোমার মাতা ঠাকুরাণী দীর্ঘজীবী হউন, এবং তোমারও ত উপার্জ্জন হইতেছে, তুমিও একটি বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরাতন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল,—আমরা ত আপনাদেরই দাস, যখন আজ্ঞা করিবেন,

আমার ভগ্নী আপনার পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমাদের অবস্থা কৈ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা বাস করি, তাহার ইট কাট নাই। তা আমাদের ঘর বজায় থাকা যে বল্‌ছেন, সে আপনারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ দীনদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতায় স্বীকার হইয়াছেন, তখন যাহাতে আমাদের ঘর বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটি সংস্কার হয়, আপনার কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি করিয়া দিবেন।

বুদ্ধিমান তারিণী বাবু দেখিলেন, বালক গোকুলচন্দ্র এত দিন বৃথা বর্দ্ধমান নগরীতে বাস করে নাই,—সেও বিষয়বুদ্ধিতে নিপুণ হইয়াছে,—ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে! টাকার কথা উত্থাপন হওয়ায় নাজির মহাশয়ের বুকটা একবার দমিয়া গেল, কিন্তু আবার সেই ফুট্‌ফুটে মেয়েটির প্রফুল্ল ওষ্ঠ (দুই দিন পূর্ব্বে যাহার মধু আস্বাদন করিয়াছিলেন) তাঁহার মনে পড়িল, বৃদ্ধের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হাস্য গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন,—"বল বল ভায়া, তোমার কি মতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসিয়াছি, তা এখনই দি, আর পরেই দি।"

গোকুল। যদি আজ্ঞা করেন ত বলি, কিন্তু আপনার নিকট বলাই বাহুল্য, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট ঘর,—যাহা আপনার পদধূলিতে পবিত্র হইবে,—সেই ঘর পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। খিড়কীর পুখুরটি,—যাহাতে আপনি পুণ্য শরীরে অবগাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোনও উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটি আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি তক্তপোষ, খাট, বিছানা, এ সমস্তই আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আপনার ন্যায় জামাতা পাইলে মাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন না করিয়া কিরূপে খাওয়াইবেন, আর মল্লিকবংশের সহিত কুটুম্বিতা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোক জন, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে—এ সমস্ত কথা কি আপনার ন্যায় বহুদর্শী লোকের নিকট আমার ন্যায় বালকের বলা সাজে? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব? (পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞা, পাঁচ হাজার টাকার কমে যে এ কার্য্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর উদরস্থ দ্রব পদার্থ সর্ব্বদাই কল্‌কল্ করিতেছে, যখন অতিশয় বাষ্পের তেজ হয়, তখনই আগ্নেয় গিরি দিয়া ফুটে বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই তারিণী বাবু উদরস্থ রাগটা একটু কল্‌কল্ করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গরিবদের হাজার টাকা কি জোর পনের শত টাকা দিয়া কন্যারত্নটি ক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আগ্নেয় গিরি কোথায় লাগে!

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"তবে রে হারামজাদা! যত বড় মুখ তত বড় কথা? বলি আমি কি তোদের বংশ চিনি না? তোর ঠাকুর্দ্দাদা গ্রামের হাড় জ্বালিয়ে গিয়েছে, তোর বাপ হাড় জ্বালিয়ে গিয়েছে, আবার তুই হাড় জ্বালাতে এসেছিস? পাঁচ হাজার টাকা? পাঁচ হাজার টাকা জলে ভেসে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিত্র বংশে দেখেছে? বলি এক রত্তি ছেলে, সে দিন হাতে করে মানুষ করেছি, আমাদের সমুখে এমন কথা বলিতে ভয় হয় না? বেরো হারামজাদা, বাড়ী থেকে বেরো,—এমন কুলাঙ্গারদের মুখ দেখলেও পাপ হয়," ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছু মাত্র অপ্রতিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া, নাজির মশাইয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজির মশাইয়ের গরম হওয়া বৃথা, বুড়ো বয়সে বালিকা-বিবাহ লালসা মনে উদয় হইলে, সে রোগ আর ছাড়ে না। আমরা তাহার উপর সেই বালিকাটিকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরধারে দেখিতে পাইতেন, উঃ কি চোক! কি ভুরু! কি ঠোঁট! বিধাতা কি তুলি দিয়া লিখিয়াছেন? টক্‌টকে রং কি আল্‌তা দিয়া আঁকিয়াছেন? কি ললিত বাহুলতা! কি ফুট্‌ফুটে পরীর ন্যায় শরীর! একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন,—টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করিয়াও এ রত্নটি লাভ করিব। বংশটা বড় হারামজাদা, কিন্তু মেয়েটাকে একবার ঘরে আনতে পারিলে হয়, টাকা সুদ শুদ্ধ আদায় কর্‌ব, মিত্রদের ঘর ভিটে যদি বিক্রয় করিয়া না লই, তবে আমার নাম তারিণী মল্লিক নয়!

আবার কয়েকদিন ঘটকী হাঁটাহাঁটি করিল, দুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা,—তিন হাজার টাকা,—উঁহু! গোকুল প্রকাশ্যে বলিল, "আমরা নিতান্ত গরিব, তারিণী বাবু অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে?" মনে

মনে বলিল, "বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরিয়াছে, টাকা দেবে না? নাকে দড়া দিয়া টাকা আদায় করিব!"

অবশেষে নাজির বাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাটী গ্রামে বসুদের বাড়ীতে যে মেয়েটি আছে, দেখতে শুনতে ভাল, বয়সও শুনেছি দশ বার বৎসর হইয়াছে, তাহাদের বাড়ী যাইও। এই মাসেই ক্রিয়া সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।

গোকুল দেখিল, নাজির মশাইয়ের নিদেন মানরক্ষার জন্যও তাঁহার কথাটা কতক রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাতেই সম্মত হইল, আর ভিক্ষা বলিয়া দেড় শত টাকা, আর চেলির কাপড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওয়ান দাওয়ান বলিয়া এক শত টাকা, আর তত্ত্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভা খরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের অন্য খরচ বলিয়া এক শত টাকা আদায় করিয়া লইল। বলা বাহুল্য যে, এই ভিক্ষা ইত্যাদি খরচেই গৃহে চুনকাম করা, পুখুর সংস্কার করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকায় গোকুল বাবুর কোম্পানির কাগজ হইল!

শ্রীবনেশচন্দ্র দত্ত।

অসভ্য জাতির সমাজনীতি।

শেষ প্রস্তাব।

এস্কিউটি-জাতীয় অসভ্যগণ, কিরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া, তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুধার সম্বল তাহাদের অভুক্ত পুত্র কন্যাকে সমর্পণ করে, এবং 'বুসম্যান' মাতা-পুত্রের জন্য কিরূপে তাহার আজন্মের স্বাধীনতা দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সম্মত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। সন্তান সন্ততির জন্য অসভ্যজাতির এইরূপ স্নেহপ্রবণতার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও জাতির মধ্যে এমনও দেখা যায়, কোনও বালক প্রাণত্যাগ করিলে তাহার মাতা কিম্বা পিতৃব্যপত্নী

পরলোকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনায়াসে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। অতএব অসভ্যজাতির মধ্যে পুত্রস্নেহের পরিমাণ, কোনও সভ্যজাতির অপেক্ষা অল্প নহে। কিন্তু ইহাদিগকেই আবার যখন শিশুহত্যাপাপে লিপ্ত দেখা যায়, তখন তাহারা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যে সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে রাজপুত জাতির মধ্যে বালিকা-হত্যাপ্রথা কিরূপ প্রবল ছিল, ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়; বঙ্গবাসীর মধ্যে এখনও এমন পলিতকেশ ব্যক্তি দুর্ল্লভ নহে, যাহারা গঙ্গাসাগরে স্বহস্তে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু সেই জন্য তাহারা যে পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহশূন্য, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। যখন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক ইয়ুরোপীয় জাতির হৃদয় হইতে শত শত কুসংস্কারের অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারে নাই, তখন এই অসভ্যজাতির, কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুহত্যাপাপে লিপ্ত হওয়া, অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের অভাব, ইহাদের শিশুহত্যার দ্বিতীয় কারণ। যে পরিবার দুই জনের উপযোগী আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে না, সেই পরিবারে যদি পাঁচটি শিশুসন্তানকে পোষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের কি বিপদ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; এই জন্যই তাহারা শিশুহত্যাপ্রথা রোধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহাতে অধিকসংখ্যক শিশু হত না হয়, সে জন্য ইহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। যে সকল শিশু ইহাদিগের মতে নিতান্ত অশুভ মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করে, ইহারা তাহাদিগকেই কেবল প্রতিপালনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে গভীর অরণ্যের ভিতর লইয়া গিয়া, শুষ্ক বৃক্ষপত্রের শয্যা বিছাইয়া, তাহার উপর শয়ন করাইয়া, অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। (১) খৃষ্টান্ পাদরী মহাশয়েরা এই সকল ক্ষুৎকাতর অসভ্যজাতির ভিতর আলোক আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আলোকের পরিবর্ত্তে পাদরী মহাশয়েরা যদি ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করেন, তাহা হইলে আশু ইহাদের অনেক উপকার সাধন করা হয়, এমন কি, শিশুহত্যাপ্রথাও অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, 'দেহ যায় যাক্, অগ্রে আত্মার ব্যবস্থা করা উচিত' পাদরীদের এই নীতি অত্যন্ত সাধারণ হইলেও, মহৎপ্রকৃতিসম্পন্ন, সহৃদয় পাদরী নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে; আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে

(১) Primitive Folk.

রুসীয় পাদরী ডেভিষা মিনক সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার ব্যবহার ধর্ম্মপ্রচারকবর্গের আদর্শস্থানীয় হইতে পারে; তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার এক খানি জীর্ণ নৌকায় খটকসাগর পার হইয়া এলিউটিদিগের মধ্যে রুটী, মৎস্য ধরিবার জন্য বড়সী ইত্যাদি বিতরণ করিতেন; এইরূপ আনুকূল্যে এলিউটি জাতির মধ্য হইতে শিশুহত্যাপ্রথা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে।

অসভ্য জাতির আর একটি গুরুতর অপরাধ বৃদ্ধহত্যা। এই পাপে ইহারা কিরূপ লিপ্ত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। শিশুহত্যা অপেক্ষা বৃদ্ধহত্যার কল্পনা অল্প বীভৎস নহে; ইউরোপীয়গণ অসভ্য জাতিতে অধিকতর পশুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগের চরিত্রে যে সকল দোষের আরোপ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ইহা একটি প্রধান। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, কোনও অসভ্যজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু যাহা আছে, পৃথিবীর সমগ্র অসভ্য জাতির তুলনায় তাহা নিতান্ত অল্প।

যাহাদের মধ্যে এই হৃদয়হীন প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাদের কথাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমে দেখা যাউক, বৃদ্ধেরা কিরূপে হত হয়। যখন একজন বৃদ্ধ 'অসভ্য' মনে করে, সে তাহার সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, (অসভ্যদেরও এ জ্ঞান আছে) যখন সে দেখে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্র এবং পৌত্রীগণ তাহাদের পিতামাতার বহু-আয়াস-লব্ধ সামান্য খাদ্য দ্রব্যের দিকে নিতান্ত লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অথচ তাহাদিগের পিতা মাতা বালক বালিকাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকেই সেই খাদ্য প্রদান করিতেছে; যখন সে দেখে, দুর্গম পর্ব্বত ও গভীর অরণ্য পদব্রজে অতিক্রম করিতে শিশুদিগের কোমল পদতল ছিন্ন হইয়া শোণিত নির্গত হইতেছে, তথাপি তাহারা পিতা মাতার স্নেহময় স্কন্ধে স্থান পাইতেছে না, কিন্তু সেই স্থান সে নিজে অধিকার করিয়া প্রিয় পৌত্র ও পৌত্রীর দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছে; তখন সেই বৃদ্ধ অসভ্য, রুসিয়াবাসী জরাজীর্ণ অক্ষম কৃষকের ন্যায় বলে, "এ জীবন আর আমার নয়, আমার যাইবার সময় হইয়াছে।" তাহার পর, তাহারা সৈনিকের ন্যায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। জীবন ভারবহ হইলে যেমন একজন সৈনিক তাহার অগ্নিগর্ভ বন্দুক অকম্পিত হস্তে বন্ধুর নিকট সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে গুলি করিতে বলে, বৃদ্ধ অসভ্যগণও সেইরূপ বীরোচিত মৃত্যু প্রার্থনা করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহারা নিজের সমাধি প্রস্তুত করিয়া রাখে, এবং দলস্থ সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহার করাইয়া স্নেহগদ্গদ স্বরে তাহাদের

দেবতার সহিত তুলনীয়, যাঁহাদের পুত্রস্নেহ অসীম গভীর, এবং যাঁহারা এতই অতিরিক্ত পরিমাণে সহৃদয় যে, রঙ্গালয়ে কোনও শোচনীয় ঘটনার অভিনয় দেখিলেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, সেই সভ্যতম মানবগণের সমুন্নত হর্ম্ম্যরাজির বহির্দ্দেশে শত শত শিশু আহারাভাবে দেহত্যাগ করিতেছে, কিম্বা প্রচণ্ড শীতে মস্তক রাখিবার স্থানটুকুর অভাবে কত অনাথ নিদারুণ নৈশ তুষারপাত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতেছে, অথচ তাহাদের নিকট হইতে দুই হস্ত অন্তরে সেই উচ্চ অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রচুর নির্জ্জন কক্ষ দ্বারবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, এবং গৃহস্বামীর ভাণ্ডারগৃহে অন্নবস্ত্র স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই অসভ্য ব্যক্তি কখনও বুঝিবে না, এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধীয় একটি পুরাতন গল্প আমাদের মনে পড়িল।

বোনাপার্টি একবার আফ্রিকাদেশস্থ কোনও অসভ্য রাজার রাজ্যে উপস্থিত হন; রাজা, একজন মহা সম্ভ্রান্ত, সুসভ্য অতিথি উপস্থিত দেখিয়া, বোনাপার্টিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জলযোগের সময় তাঁহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত ফল আহারার্থ প্রদান করা হইল,—খেজুর, আতা, পেয়ারা, এমন কি রুটি পর্য্যন্ত স্বর্ণনির্ম্মিত। বোনাপার্টি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি, তোমরা কি সোনা খাইয়া থাক?" রাজা সবিনয় উত্তর করিলেন, "আমরা খাই না, আপনারা খান—এই অনুমানেই এ সমস্ত আপনার জলযোগের জন্য আয়োজন করা গিয়াছে।" বোনাপার্টি অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এমন গুরুতর অনুমানের কারণ কি?" রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নতুবা আপনার এত রাজ্য দেশ থাকিতে আমার এই ক্ষুদ্র জমী টুকুর উপর আপনার নজর পড়িবে কেন?" বোনাপার্টি ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের রাজ্য অধিকার করা আমার অভিপ্রায় নহে, শুদ্ধ তোমাদের রীতি নীতি এবং বিচারপ্রণালী দেখিতে আসিয়াছি।"

এমন সময় সেই অসভ্য রাজার নিকট এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। মোকদ্দমাটি এই:—এক জন লোক দ্বিতীয় এক ব্যক্তির নিকট কিয়দংশ জমী বিক্রয় করে; দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই জমী খনন করিতে করিতে এক দিন একটি পাত্রে বহুসংখ্যক মুদ্রা দেখিতে পাইল। এই সমস্ত মুদ্রায় তাহার কোনও অধিকার নাই স্থির করিয়া, সে বিক্রেতাকে তাহা অর্পণ করিতে যায়;

কিন্তু জমীর পূর্ব্ব স্বামী এই অর্থগ্রহণে অস্বীকার করিয়া বলিল যে, সে যখন জমী বিক্রয় করিয়াছে, তখন সে জমীসংক্রান্ত সমস্ত সত্বই ত্যাগ করিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে তর্ক আরম্ভ করিল, "আমি কেবল জমীই কিনিয়াছি, ইহার ভিতর যে ধনরত্নাদি নিহিত থাকিবে তাহাতে আমার অধিকার কি ?"—তাহারা উভয়ে কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে রাজার দ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতেছে। রাজা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কন্যা আছে ?"—সে বলিল "আছে।" অনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পুত্র আছে ?" সে উত্তর দিল, "আছে।" তখন রাজা মীমাংসার্থী দুই জনকে বলিলেন, "তোমাদের এই পুত্র ও কন্যার পরস্পরের সহিত বিবাহ দেও, এবং এই অর্থ বর কনের হস্তে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ দান কর।"

বিবাদ মিটিয়া গেল, বিচার দেখিয়া বোনাপার্টি অবাক্; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি অন্যায় বিচার করিয়াছি ?"

বোনাপার্টি। না, আমরা কিন্তু অন্য রকম বিচার করিতাম।

রাজা। কি রকম ?

বোনাপার্টি। দুই জনকেই তাড়াইয়া এই ধন রাজকোষে তুলিতে আদেশ দিতাম।

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি এই প্রকার বিচার করেন ?"

বোনাপার্টি। সর্ব্বদাই।

রাজা। (অধিকতর বিস্ময়ের সহিত) আপনাদের দেশে সূর্য্য উঠে ? মেঘ বারি বর্ষণ করে ?

বোনাপার্টি। ঠিক এই দেশের মত।

রাজা। আপনাদের দেশের মাঠে ঘাস জন্মে ? সেখানে গরু বাছুর চরিয়া বেড়ায় ?

বোনাপার্টি। কেন চরিবে না ?

রাজা। তাহা হইলে তাহাদের জন্যই সূর্য্য উঠে এবং বৃষ্টি হয়, আপনাদের জন্য কদাচ নহে।

অসভ্য রাজা সভ্য দেশের নীতি বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সুসভ্য জাতিও অনেক সময় অসভ্য জাতির নীতি বুঝিতে পারেন না, কিন্তু

ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক যদি অন্নহীন, গৃহহীন, বর্ব্বর জাতির সহিত কিছু কাল একত্র বাস করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমাজনীতি বুঝিয়া, তাহাদের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সে সকল ভিন্ন অসভ্য জাতির আর একটি মহদ্দোষ, ইহারা নরমাংসভোজী। কিন্তু ইহারা যে রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যই এরূপ করিয়া থাকে, ইহাদের আভ্যন্তরিক বিবরণ পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অভাবই ইহাদিগকে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করে। কত বার আমরা পাঠ করিয়াছি, যে সকল ইয়ুরোপীয় নাবিক আপনাদিগের জীবন তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য চিরহিমানীসমাচ্ছন্ন দুর্গম মেরুপ্রদেশে পোত পরিচালন করিয়াছেন, বিপন্ন অবস্থায় খাদ্য দ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের কেহ কেহ সঙ্গীগণের মৃত দেহ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও অসভ্যজাতি দুর্ভিক্ষের সময় বাধ্য হইয়া গলিত মৃত মাংসও ভক্ষণ করে। বাধ্য হইয়া নরমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে এই প্রথা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মেক্সিকো প্রদেশের এবং ফিজি দ্বীপের অসভ্যজাতি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নরহত্যা করে। ফিজি দ্বীপের রাজা তাহার যে কোনও প্রজাকে মারিয়া খাইতে পারে। (২)

অসভ্য জাতির নিদারুণ প্রতিশোধস্পৃহার উল্লেখ করিয়া ইয়ুরোপীয়গণ নাসিকা কুঞ্চিত করেন। প্রায় সমস্ত অসভ্য জাতিরই সংস্কার,—কেহ কাহারো রক্তপাত করিলে রক্তপাত দ্বারা তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। কেহ কাহাকেও নিহত করিলে, প্রতিফলে হন্তাকেও নিহত করিতে হইবে, ইহাই অসভ্য জাতির ন্যায়পরতার মূলমন্ত্র। বর্ত্তমান কালেও পশ্চিম-ইয়ুরোপে এই নীতির প্রাবল্য অনুভূত হয়। এমন কি, ইয়ুরোপের সভ্যতম অংশেও উদার খৃষ্ট-শিষ্যগণের মধ্যে প্রকারান্তরে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে; খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিবে, তাহাকে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দাও"—কিন্তু সেই খৃষ্টের শিষ্যগণই কি কোমল গণ্ডে একটি চপেটাঘাত পাইলে আঘাতকারীকে সুদ্ সমেত তাহা প্রত্যর্পণ করেন না? সুসভ্য জাতি বিচারাসনে বসিয়া দণ্ডবিধি আইনের বলে নরহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড করেন, কিন্তু এই দণ্ডনীতির মূলেও কি অসভ্য জাতির "রক্তপাত দ্বারা রক্তপাতের

(২) W. T. Pitchard, Polynesian Reminiscences. p. 363.

প্রতিশোধ গ্রহণের" (blood revenge) অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই ? এই সকল অসভ্য জাতির "পিনাল কোর্ড" নাই, কিন্তু তাহাদের সমাজ আছে ; অতি হীনতম ব্যক্তির জন্যও সম্প্রদায়স্থ সকলেই বিশেষ আয়াস স্বীকার করে। যদি দলস্থ কোনও লোক সেই দলের কাহারও প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে সমাজ সেই অনিষ্টকারীর দণ্ডবিধান করে, এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে, উৎপীড়িত ব্যক্তির দলস্থ সমস্ত ব্যক্তি, অত্যাচারকারীর সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া থাকে ; কিন্তু লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইবা যাহাতে আবার নূতন বিবাদের সূত্রপাত না হয়, সে জন্য ইহাদের মধ্যে প্রতিহিংসাগ্রহণ সম্বন্ধে ইহাদের আদিম ব্যবস্থাপকগণ "চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু" কিম্বা "দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত" উন্মূলিত করিয়া প্রতিশোধগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। (৩)

যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,-অসভ্য জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কার্য্যতঃ সেরূপ ঘটিতে দেখা যায় না। অবশ্য এ কথা যে সমস্ত অসভ্য জাতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। যে সকল পার্ব্বত্য জাতি অন্য কোনও জাতি কর্ত্তৃক নিজ নিজ আবাসস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতের কোনও দুর্গম প্রদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই বিবাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। উদাহরণস্বরূপ ককেশিয়ার পার্ব্বত্য জাতি এবং বর্ণিয়ো দ্বীপের ডাইয়াক্‌দিগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাইয়াক্‌দিগের মধ্যে বৈরাচরণ এত অধিক পরিমাণে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, কোনও যুবক যত দিন পর্য্যন্ত কোনও শত্রুর মস্তকচ্ছেদ করিতে সক্ষম না হয়, তত দিন সে সাবালক কিম্বা বিবাহের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না। অল্প দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী পুস্তকে এই ভয়ানক প্রথার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (৪) কিন্তু এই নির্দ্দয় প্রথা যে কেবল হিংসাবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়, এরূপ নহে; এই বৃত্তি ইহাদের সামাজিক জীবনের একটি নৈতিক আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অনেক সময়, ইহাদিগকে আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতেও দেখা যায় ; অতএব এরূপ বিবেচনা করা অযৌক্তিক নহে যে, বিচারক যেমন আইনের দ্বারা বাধ্য হইয়া একজন হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কিন্তু এজন্য তাঁহার কষ্ট হৃদয়ের অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকে, সেই

(৩) Prof. M. kovalevsky's Modern custom and Ancient Law. vol II.
(৪) Carl bock's The Head Hunter of Borneo. p. p. 209, 210.

কষ্ট অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ এক জন ডাইকস্ তাহাদের সমাজ-নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই বৈরাচরণের দ্বারা অপরের প্রাণ-হরণ করিতে বাধ্য, এজন্য তাহাকে দোষী কবা যায় না; যদি কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা তাহাদের সমাজনীতিব। কিন্তু সে কথা তুলিলে অনেক দূর যায়; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতির সমাজনীতি হইতেও অনেক গুরুতব দোষ বাহির হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ না কবিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ডাইকস্ জাতির এই দোষ সত্ত্বেও, ইহাদেব দোষেব সমালোচক কার্‌ল্ সাহেব বলিতেছেন, "সত্যেব অনুরোধে আমাকে স্বীকাব করিতে হইতেছে যে, নৈতিক জ্ঞানে ইহাবা সভ্যতাব প্রতি উচ্চ সোপান অধিকার করিয়াছে; চৌর্য্যবৃত্তি এবং দস্যুতা ইহাদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহারা অত্যন্ত সত্যবাদী।" (৫)

ইভা পেইফার নামক জনৈক জর্ম্মাণ লেখিকা কার্‌ল্ বকের এই উক্তির সমর্থন করিয়া লিখিযাছেন, "ইহাদেব মধ্যে আরো দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিতে পারিলে বিশেষ আনন্দলাভ কবিতাম। আমি তাহাদিগকে বিশ্বস্তচিত্ত, সৎ এবং গম্ভীরপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই জানি।" ডাইক্‌সরা একটিমাত্র রমণী বিবাহ করে, এবং স্ত্রীর প্রতি অতি সদ্ব্যবহার করে। ইহাবা অত্যন্ত সামাজিক, প্রত্যহ প্রভাতে মৎস্য ধরিতে, শিকার করিতে, কিম্বা এই প্রকার কোনও সাধারণ কাজে বাহির হইয়া যায়। ইহাদের গ্রাম কয়েকখানি বৃহৎ পর্ণকুটীরের সমষ্টিমাত্র, এই সকল কুটীরের প্রত্যেক খানিতে অনেকগুলি গৃহস্থ বাস করে। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে শতাধিক লোক বাস করিয়াও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধায় না। ইহারা স্ত্রীব অত্যন্ত সম্মান এবং পুত্রকন্যাগণের যথেষ্ট আদর করে। বালকবালিকাগণের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে, তাহাব সুস্থ না হওবা পর্য্যন্ত, পবিবারস্থ প্রত্যেক রমণী যথাক্রমে তাহার পরিচর্য্যা কবে। পানাহার-বিষয়ে উহারা সম্পূর্ণ পবিমিত।"

এইরূপ প্রায় সকল অসভ্য জাতির সামাজিক জীবনেব ঘটনাবলী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ গুণ তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ, এবং নিজ নিজ সমাজের প্রতি তাহাদের অনুরাগ যৎপরোনাস্তি অধিক। বর্ত্তমান ছাড়িয়া তমসাচ্ছন্ন অতীত কালের দিকে নয়ন প্রসাবিত করিলে, সভ্যতার প্রদীপ্ত সূর্য্য পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিবাব বহু পূর্ব্বেও,

(৫) Carl bock's The Head Hunters of Borneo. p. p. 209. 210.

তাৎকালিক অসভ্য জাতির মধ্যে স্ব স্ব সমাজের প্রতি এই আশ্চর্য্য অনুরাগ এবং পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যই বোধ হয় সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডারউইন সাহেব মনুষ্যের সামাজিক গুণগুলিকে (social qualities) তাহার ক্রমাভিব্যক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৬)

গত শতাব্দীতে 'অসভ্য জাতি' এবং তাহাদের 'আরণ্য জীবন' ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অনেকেই ইহাদের 'পশুত্ব' প্রমাণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহবান্। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'পশুত্ব' আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পশুত্বের মধ্যে যে সামাজিক জীবনের এক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। অসভ্য জাতি কখনই ধর্ম্ম এবং নৈতিক জীবনের আদর্শস্থানীয় নহে, কিন্তু ইহারা পশুত্বেরও 'পরিণতি' নহে। যাহাই হউক, ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা প্রত্যেকেই ইহাদের সমাজের অবিকল প্রতিকৃতি। মনুষ্য জাতির সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন।

এই সমস্ত অসভ্য জাতির প্রত্যেকেই তাহাদের সমাজের অবিকল প্রতিকৃতি বলিয়া, কোনও ব্যক্তির জীবনের অতি সামান্য ঘটনাও তাহাদের সামাজিক ঘটনা। ইহাদের কোনও লিখিত ব্যবস্থাপ্রণালী না থাকিলেও, পুরুষানুক্রমে ইহারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা দ্বারাই ভাল-মন্দ অর্থাৎ সমাজের উপকারী ও অপকারী সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়। ইহাদের অনেক যুক্তি যে ভ্রান্তিমূলক ও অনেক প্রথা কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং বর্ত্তমান ফলের উপর নির্ভর করিয়াই ইহারা কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক কার্য্যেরই যে এক সুদূর ভবিষ্যৎ ফল আছে, সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু এই অজ্ঞতা কেবলমাত্র অসভ্য জাতির মধ্যেই আবদ্ধ নহে; সুপ্রসিদ্ধ বেন্থাম সাহেব অনেক সুসভ্য দেশের ব্যবস্থাপককেও এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সামাজিক

(৬) The small strength and speed of man, his want of natural weapons &c. are more than counter balanced, firstly by his intellectual faculties; and secondly by his social qualities which led him to give and receive aid from his fellowmen &c.

Darwins Descent of man, Second Edition p. p, 63, 64.

নিয়মপালনে অসভ্যগণ অত্যন্ত যত্নপর, এজন্য তাহারা কোনও প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতেই পরাঙ্মুখ নহে; যদি কোনও অসভ্য সামান্য একটি সামাজিক অথবা নৈতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণীবর্গের নিকটও উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সেই সুতীব্র উপহাস অল্প দণ্ড নহে। কোনও গুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধী তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণকে কি দারুণ দৈব বিপদ সহ্য করিতে হইবে, এই উদ্বেগপূর্ণ চিন্তায় আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। দৈবাৎ যদি কেহ কাহাকেও আহত করে, তবে সে তাহার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, নিতান্ত পক্ষে নিজের দেহ হইতে রক্তপাত না করিয়া আপনাকে দোষমুক্ত বলিয়া কিছুতেই বিবেচনা করে না। কিন্তু আমরা পরের মস্তক চূর্ণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষীর বলে 'শেসন' আদালত হইতে নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসি, এবং বন্ধুবান্ধববর্গের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করি। প্রায় সকল অসভ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বদাই অন্নকষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াও যদি সামান্য আহার সংগ্রহ করিতে পারে, তবে তাহা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ না করিয়া কেহ একাকী ভক্ষণ করে না, এবং অরণ্যের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা আইনের সাহায্যে ভ্রাতার মুষ্টিমেয় অন্ন তাহার দুর্ব্বল কবল হইতে কাড়িয়া লইয়া পদতলে মর্দ্দন পূর্ব্বক নিজের জিদ বজায় রাখি, এবং পাঁচ জনে আমাদের বাহাদুরী দেখিয়া প্রশংসা করে। আমরা সভ্য!

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, কেহ মনে না করেন, আমরা এই প্রবন্ধে অসভ্যজাতির শিশুহত্যা, বৃদ্ধদিগের নির্ব্বাসন প্রভৃতি ঘৃণিত মতের সমর্থন করিয়াছি; ইহারা যে বাধ্য হইয়া এই সকল দোষের প্রশ্রয় প্রদান করে, আমরা তাহাই উল্লেখ করিয়াছি, এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মনুষ্যের হৃদয় লইয়াই ইহারা পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বিবিধ কুসংস্কারের বাহুল্যবশতঃ, ইহারা সময়ে সময়ে এমন সকল কাজ করিয়া থাকে, যে জন্য সুসভ্য মানব সমাজ ইহাদিগকে মনুষ্যের সীমার মধ্যে স্থান প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা ঘৃণা অপেক্ষা করুণার পাত্র।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পৃচ্ছা।

প্রশ্ন—আর্য্য-কন্যার বিবাহ কোন্ সময়ে অ কি প্রশস্ত, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, না তৎপরে?

কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ের আন্দোলনে বঙ্গবাসী,—কেবল বঙ্গবাসী কেন,—প্রায় সমগ্র ভারতবাসী উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। সে সময়ে এ প্রশ্নের যথাশাস্ত্র বিচার করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছিল। এক্ষণে সে ঝটিকার অনেক অবসান হইয়াছে, অতএব বুধমণ্ডলীর নিকট ইহার যথাতত্ত্ব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করায়, কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; এই বিশ্বাসেই শীর্ষলিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা একত্র সংগৃহীত হইলে সুধীগণের সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত সে বিষয়ে যথাশক্তি প্রয়াস করিতেছি। বস্তুতঃ, এ বিষয় বিচারের অধিকার আমাদের নাই, ক্ষমতাও নাই।

নবদ্বীপের চরমোন্নতিকালে, স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাবধি বঙ্গদেশে অনেকের অনুমোদিত, সুতরাং তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। তৎকৃত উদ্বাহতত্ত্বে এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত হইতেছে।

অঙ্গিরাঃ— "আবৃত্তে তাবিগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি।
কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে॥
অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥"

যমঃ— "কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং॥"

মহাভারতে— "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নাগ্নিকাম্।
অতোঽপ্রবৃত্তে বজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥
মহাদোষঃ স্পৃশেদেনমস্মাৎ বৈ বিধিঃ সতাম্।
নাগ্নিকাঽনাগতার্ত্তবা, অন্যথা প্রবৃত্তে রজসি।

অত্রিকাশ্যপৌ— "পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলীপতিম্॥"

যত্তু মনুবচনং 'কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥'
ইতি মনুক্তগুণহীনসম্ভাবমাত্রবিষয়ং। অতএব গুণবতেঽষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনুঃ—
"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্যথাবিধি॥"
অপ্রাপ্তানপ্রাপ্তবিবাহপ্রশস্তকালাম্। স্মৃতিঃ
"সপ্তনংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নস্মৃথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥"

এ সম্বন্ধে রঘুনন্দনের এই অবধি।

সামগাচার্য্যপ্রবর শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী, 'উষায়', মনুবচন ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অপর শ্লোকগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তৎসম্বন্ধে স্বীয় প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—

"এই শ্লোকগুলির মধ্যে 'স্মৃতি' বলিয়া উল্লিখিত শ্লোকটি কোন্ ঋষির উক্ত, তাহা নির্ণীত হইতে না পারায়, কোনরূপেই প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। অত্রি, অঙ্গিরা ও যমের উক্ত বলিয়া উল্লিখিত শ্লোক কয়টি তত্তৎ সংহিতায় দেখা যায় না। বরং অত্রিসংহিতায় 'দেবদত্তা কন্যার গ্রহণে দোষ হয় না' থাকায়, দৃষ্টরজস্কাকন্যার বিবাহই অত্রির অনুমোদিত জানা যায়, সুতরাং ঐ গুলিও রঘু-নন্দনের বা তৎপূর্ব্বর্ত্তন কোন সামাজিক ব্যক্তির করিত, তাহাতে সংশয় থাকিতেছে না। মহাভারতের শ্লোকটীর মধ্যে ত ষোড়শবর্ষা স্পষ্টই রহিয়াছে; তদনুসারে 'অনগ্নিকা' পাঠই যে সঙ্গত, তাহাও পূর্ব্বে বোধিত হইয়াছে; এতাবতা বাল্যবিবাহের অনুমোদনার্থই যে 'নগ্নিকা' পাঠ কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাও অপ্রকাশ থাকিতেছে না। কাশ্যপ ঋষির কোন গ্রন্থই ইদানীং পাওয়া যায় না; পরং অত্রি, অঙ্গিরা ও যমের সংহিতাগুলিতে যখন সেই সেই বচন নাই, তখন কাশ্যপের গ্রন্থেও যে ঐ বচন ছিল, তাহাও সম্ভাবিত নহে। ফলে অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত হইলেই যদি প্রমাণ হইত, তবে প্রমাণান্বেষণের প্রয়াসই অনাবশ্যক হইত।"

সামশ্রমী মহাশয় যখন বলিয়াছেন, 'উল্লিখিত শ্লোক কয়টি তত্তৎসংহিতার মধ্যে দেখা যায় না', তখন যে, পুনরায়, আমাদের তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোনও ফলই হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও আমরা সে বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি। কৃতকার্য্য হই নাই, ইহা বলা বাহুল্য। কেবল যমসংহিতায়, রঘুনন্দনের যমবচন বলিয়া উদ্ধৃত বচনটির কথঞ্চিৎ সদৃশ, কয়েক পঙ্‌ক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

১

"প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো সদমোহিতঃ।

অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥
বন্ধ্যা তু বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী তু মৃতপ্রজা।
শূদ্রী তু বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী তু রজস্বলা॥
যৎ কব্যোত্যকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্ দ্বিজঃ।
ভঙ্‌ক্ত্বেভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥
সবৃষং বা পরিত্যজ্যাস্তবৃষেণোপগচ্ছতি।
বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ॥
বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাশ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে।"

হস্তলিখিত গ্রন্থে, বা ইদানীন্তন মুদ্রিত অপর সংহিতার মধ্যে, রঘুনন্দনের মতের পোষক যে কোনও অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিষ্ণুসংহিতা,—"ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদূষ্যতি॥"

চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে বৌধায়ন হইতে উদ্ধৃত বলিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

"দদ্যাদ্গুণবতে কন্যাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণে।
অপি বা গুণহীনায় নোপরুন্ধ্যাদ্রজস্বলাম্॥"

ব্যাসসংহিতা— "যদি না দাতুরৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥"

বসিষ্ঠসংহিতা— "প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥"

সংবর্ত্তসংহিতা,—"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥"

পারাশরে,— "অষ্টবর্ষা" ইতি শ্লোকটি পূর্ব্ববৎ, তদনন্তর—
"প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥

অতঃপর, "মাতা চৈব" ইতি শ্লোকটি অবিকল পূর্ব্ববৎ, তদনন্তর দুটি শ্লোক; যথা,—

"যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥

যঃ কবোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ,
স ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্বিশুধ্যতি ॥"

শেষোক্ত স্মৃতিবচনগুলি সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে যে, রঘুনন্দনের সময়ে নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জনপূর্ণ জনপদে ঐ সকল স্মৃতিগ্রন্থ যেরূপে পঠিত হইত, তাহাতে সম্ভবতঃ সে বচনগুলি ছিল না, অথবা অন্যবিধ পাঠবিশিষ্ট ছিল। যে হেতু, তাহা না হইলে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব যে, সেগুলি রঘুনন্দনের ন্যায় অনাধারণ মেধাবী ও অনন্তশাস্ত্রদর্শী ব্যক্তির অগোচর ছিল। দেখিতে পাইলে যে তিনি, সে বচনগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, অনির্দ্দিষ্টনাম "স্মৃতি"-বচন বলিয়া অন্ধ প্রমাণ তুলিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য, বিশেষতঃ পরাশরবাক্যগুলি; কারণ, তদীয় সংহিতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে ইহাই অধিকতর প্রামাণিক।

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

পাঠান্তরসম্ভবকল্পনা যে হেতুমূলক, এবং রঘুনন্দনের মতবিরোধী বচনও যে তত্তৎ সংহিতাতেই পাওয়া যায়, এবং অপর মনুবচন দৃষ্টে রঘুনন্দনোক্ত মনূক্ত বচনগুলির অর্থান্তর সম্ভাবনা—ইত্যাদি বিষয় পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

২

অতঃপর প্রাপ্তরজস্কা কন্যার বিবাহে প্রশস্ততাজ্ঞাপক শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। পাণিগ্রহণের একটি শ্রৌতমন্ত্র এই, (ঋ, সং ৮।৩।২৭।৫।)

"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥"

সামশ্রমী মহাশয় ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। (উষা ; ১ম ভাগ।)

"হে কন্যে! সোমদেবতা তোমাকে প্রথমে লাভ করে; তদনন্তর গন্ধর্ব্বদেবতা লাভ করেন; অগ্নিদেবতা তোমার তৃতীয় পতি হএন, মনুষ্যকুলোদ্ভব আমি চতুর্থ হইতেছি।"

আর একটি মন্ত্র, (ঋঃ সং ৮।৩।২৮।১) মন্ত্রব্রাহ্মণে ১প্রঃ ১খঃ ৭।

"সোমো দদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্॥"

ইহার সামশ্রমী-প্রকাশিত অর্থ, (উষা ; ১ম ভাগ)—

"সোমদেবতা গন্ধর্ব্বদেবতার করে সমর্পণ করেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বদেবতা ইহাকে অগ্নির আশ্রিতা করেন। অগ্নিদেবতা ধনধান্য পুত্রাদি লাভের হেতুভূতা এই কন্যাকে অদ্য আমাকে দিলেন। (এ মন্ত্রটি সামবেদে ও অথর্ব্ববেদেও আছে)।"

এক্ষণে সোমাদি দেবতাদের পতিত্বের তাৎপর্য্য বুঝাইতে, গোভিলাচার্য্যপুত্র, গৃহ্যসংগ্রহ নামক গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রপরিশিষ্টে, (২ প্রঃ ১৭—২০) যাহা বলিয়া-

ছেন, তাহা দেখা যাউক। নগ্নিকা, অনগ্নিকা, গৌরী, রোহিণী, কন্যা প্রভৃতি শব্দেরও অর্থবাদ তাহাতে আছে, এবং বিবাহের প্রশস্ত কালও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"নগ্নিকান্তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্তনগ্নিকাম্॥
অপ্রাপ্তা রসনো গৌরী প্রাপ্তে বসসি রোহিণী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা তু নগ্নিকা॥
ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঙ্ক্তে তু কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বো বসনাগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজামপয়োধরাম্।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকান্ন প্রশস্যতে॥"

ইহার অর্থ, কন্যা যাবৎ ঋতুমতী না হয়, তাবৎ তাহাকে "নগ্নিকা" বলে; ঋতুমতী হইলে "অনগ্নিকা" বলে, সেই অনগ্নিকাকেই প্রদান করিবে। বস্ত্রাদৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে "গৌরী" সংজ্ঞা, তদনন্তর "রোহিণী" সংজ্ঞা হয়। কন্যার যুবত্বব্যঞ্জক লোমাদি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইলেই উহাকে সোমদেবতা ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। পরে স্তনাদি স্ত্রীচিহ্ন প্রকাশ হইলে উহাকে গন্ধর্ব্বদেবতা ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। অনন্তর ঋতু হইতে আরম্ভ হইলেই অগ্নিদেবতা ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। অতএব অব্যঞ্জনোপেতা, অরজা, অপয়োধরা, সোমাদি দেবতা কর্ত্তৃক অভুক্তা কন্যা প্রশস্তা নহে।"

এখন পূর্ব্বোক্ত বৈবাহিক বৈদিক মন্ত্রের অর্থ, এবং কোন প্রকার কন্যার পাণিগ্রহণে সেই দুই মন্ত্র যথার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না।

অতঃপর, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকগণ কি বলেন, দেখা যাউক।

মনুঃ,—"দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।" ৯ অঃ ৯৫।

প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন,

সোমোঽদদদিত্যাদিমন্ত্রার্থবাদেভ্যো দেবতানাং দাতৃত্বং প্রতীয়তে।"

উপরি-উক্ত সেই বৈদিক মন্ত্রই মনু উল্লেখ করিতেছেন, অতএব ইহার পুনরায় অর্থবাদ অনাবশ্যক।

অত্রিসংহিতায় দেখা যায়,—

'পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চান্নতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যঞ্চ মেধ্যং বৈ যোষিতাং সদা॥"

ইহাতে যে "সোমঃ প্রথমো বিবিদ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রেরই অনুবাদ,

ও তজ্জনিত সোমাদি প্রদত্ত শৌচাদির বর্ণন মাত্র উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও তাহাই আছে, (১ অঃ ৭১)

"সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥"

সংবর্ত্তসংহিতায় স্পষ্টই গোভিলপুত্রের গৃহ্যসংগ্রহের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির অর্থান্তর মাত্র দেখা যায়,

"সোমদর্শনসংপ্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তেঽথ কন্যকাম্।
কুচৌ দৃষ্টা তু গন্ধর্ব্বঃ রজো দৃষ্টা তু পাবকঃ॥"

এক্ষণে অন্যোন্যবিরোধী বাক্যগুলির কি প্রকারে সমন্বয় হয়? যে মনু সোম-গন্ধর্ব্বাগ্নিপ্রদত্তা, অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা ও যুবত্বচিহ্নবিশিষ্টা ভার্য্যাগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনিই কি ষড়বর্ষা অষ্টবর্ষা কন্যার বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? না মতান্তরপক্ষপাতী টীকাকারগণ ও সংগ্রহকর্ত্তারাই আপন আপন অভিপ্রেত অর্থ মনুবচনে আরোপিত করিয়া এই বিরোধ ঘটাইয়াছেন? "অপ্রাপ্তামপিতাং" এই শব্দে রঘুনন্দন যে অর্থ লাগাইয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "অতএব গুণবতেঽষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনুঃ উৎকৃষ্টায়েত্যাদি।" একটিমাত্র শ্লোকাপেক্ষা অবিচ্ছিন্ন চারিটি শ্লোক পাঠ করিলে অর্থবোধ আরও সুলভ হইবে। (৯ অঃ ৮৮—৯১।)

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি॥
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥"

অর্থ—কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর (পিত্রাদি গুরুজনের) অপেক্ষা করিবে, তিন বৎসর অতীত হইলে আপনি স্বসদৃশ পতিকে বরণ করিতে পারে। এইরূপে স্বয়ং বিবাহিতা কন্যার, এবং তাহাকে যিনি বিবাহ করেন—তাঁহারও, কোনও পাপ হয় না। বরং কন্যা মরণকাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাচ কখনই তাহাকে গুণহীন ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না। উৎকৃষ্ট, অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে, অপ্রাপ্তকালেও তাহাকে যথাবিধি কন্যাদান করিতে পারিবে।

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋতুকাল ব্যতীত অন্য কোনও কালের উল্লেখই

নাই, অতএব অপ্রাপ্তকাল বলিলে অপ্রাপ্তরজোদৃষ্টিকাল বুঝাইবে, না "অষ্ট-বর্ষন্যূনা" বুঝাইবে, তাহা সুধীগণ নির্ণয় করুন।

যে অত্রিসংহিতায় "পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ" ইত্যাদি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কি রঘুনন্দনোক্ত "পিতুর্গেহে" ইত্যাদি বচন থাকিবার সম্ভাবনা? না, থাকিলেই সুসঙ্গত হয়, তাহাও বুধমণ্ডলী বিবেচনা করুন।

পরন্তু যে সংবর্ত্তসংহিতায় "রোমদর্শনসংপ্রাপ্তা" ইত্যাদি বচন পাওয়া যায়, তাহাতে পুনরায় "অষ্টবর্ষেত্যাদি" বচন থাকা কি সঙ্গত হয়, তাহাও সুধীগণ বিবেচনা করুন। সংবর্ত্তাদিধৃত এই বচনগুলি রঘুনন্দন-স্বীয় উদ্বাহতত্ত্বে প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ ইদানীন্তন মুদ্রিত তত্তৎসংহিতা-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

পুনশ্চ, অষ্টবর্ষেত্যাদি একই বচন বাল্যবিবাহসমর্থনপক্ষে ভিন্ন-ভিন্ন সংহিতায় দেখা যায়। অথচ, গোভিলপুত্রের গৃহ্যসংগ্রহে "অপ্রাপ্তরজসা গৌরী-ত্যাদি" বচনের সহিত তাহার ঐক্য করিলে, দেখা যায় যে, গৌরী, রোহিণী, কন্যা প্রভৃতি কতিপয় সংজ্ঞার বিভিন্ন অর্থবাদ, এবং কোনও কোনওটির বিরোধী অর্থবাদও করা হইয়াছে। এ স্থলে বেদমূলক, মন্বাদি প্রামাণিক স্মৃতির অবিরোধী গৃহ্যসংগ্রহের বচন অধিক প্রামাণিক, না প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দিগ্ধ অষ্টবর্ষেত্যাদি বচন অধিক প্রামাণিক, তাহাও বিবেচনার বিষয়। গৃহ্য-সংগ্রহবচনের কতিপয় শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া, বাল্যবিবাহপক্ষসমর্থনকারী-দের দ্বারা, অষ্টবর্ষেত্যাদি বচনটি রচনা করা নিতান্ত অসম্ভব কি না, তাহাও সুধীগণ বিবেচনা করুন।

সন্দেহের অপনয়নার্থে আরও ভূরি ভূরি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

গোভিলীয়গৃহ্যসূত্রগ্রন্থে—"মাতুরসপিণ্ডানগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা।"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণে অনগ্নিকাই (ঋতুমতী) প্রশংসনীয়া। এই স্থলে প্রকৃত পাঠ 'অনগ্নিকা' কি 'নগ্নিকা', যদি কাহারও এই সন্দেহ হয়, তন্নিরাকরণার্থে গোভিলাচার্য্যের অপর কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"তাবুভৌ তৎপ্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহ শয়ীয়াতাম্।"

"ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভব ইত্যেকে, যদর্ত্তুমতী ভবত্যপরতশোণিতা, তদা সম্ভবকালঃ।"

'নাঞ্জাতলোম্ন্যোপহাসমিচ্ছেৎ।"

আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রেও তাহাই দৃষ্ট হয়।

"অত ঊর্দ্ধমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণাবলঙ্কৃতাবধঃশায়িনৌ ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রং সংবৎসরং বা।

"প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেযাৎ।"

কাত্যায়নসংহিতা—"অজ্ঞাতব্যঞ্জনা লোম্নী ন তযা সহ সংবিশেৎ।"

এই সকল সূত্রে যখন রজঃপ্রাপ্তিকালের পূর্ব্বে সহবাস নিষিদ্ধ, অথচ পাণি-গ্রহণের পর দিবসত্রয় ইত্যাদি মাত্র কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সহবাসবিধি দেখা যাইতেছে, তখন কি উপরি-উক্ত গোভিলসূত্রে 'নগ্নিকা' পাঠ যোজনা করা সম্ভবপর হয়?

মহাভারতীয় শ্লোকে রঘুনন্দনোক্ত নগ্নিকা পাঠও তদনুরূপ।

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
অতোঽপ্রবৃত্তে বজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥
মহাদোষঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈষ বিধিঃ সতাম্।"

রঘুনন্দনোক্ত এই পাঠ, কি "বিন্দেদনগ্নিকাম্" * * * "অতঃপ্রবৃত্তে" এই পাঠ, সাধীয়ান্, তাহা বুধমণ্ডলীর বিবেচ্য। 'অন্যথা' শব্দের রঘুনন্দনোক্ত ব্যাখ্যা 'প্রবৃত্তে রজসি' এটিও ঠিক হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

খুঁজিলে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা আপস্তম্বসংহিতায়,

"বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ॥
স্থাপয়িত্বা তদা কন্যামন্যৈর্ব্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনঃ প্রত্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

ভরদেবভট্টকৃত সম্বন্ধবিবেক নামক গ্রন্থে "মঞ্জরী" হইতে (ক) এবং চতুর্ব্বিংশতি স্মৃতিব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে "স্মৃত্যর্থসার" (খ) হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই বচনেরই পাঠান্তর মাত্র। যথা,

(ক)

"বিবাহে বিততে তন্ত্রে হোমকালে উপস্থিতে।
কন্যায়া ঋতুরাগচ্ছেৎ কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ॥
স্থাপয়িত্বা ততঃ কন্যামর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
অঞ্জলীমাহুতিং হুত্বা ততস্তন্ত্রং প্রবর্ত্ততে॥"

(খ)

"বিবাহে বিততে তন্ত্রে হোমকাল উপস্থিতে।
কন্যামৃতুমতীং দৃষ্ট্বা কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ॥
স্থাপয়িত্বা তু তাং কন্যামর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
যুঞ্জানামাহুতিং হুত্বা ততঃ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥"

রজঃপ্রাপ্তিকালের পর বিবাহবিধি না থাকিলে, এরূপ প্রশ্নই অসম্ভব হইত।

মহাভারতোক্ত ষোড়শবর্ষার বিবাহে প্রশস্ততা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা সুশ্রুতস্য সূত্রস্থানে,

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারীং তু ষোড়শে।

সনস্থাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীযাৎ কুশলো ভিষক্ ॥'

শারীরস্থানেও—

'ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥"

বোধ হয়, "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী" মনুবচনেরও অভিপ্রায় ষোড়শবর্ষবয়ঃপ্রাপ্তি। বসিষ্ঠসংহিতায়ও তাহাই আছে; "কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপারীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যঃ বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্।" পরন্তু, বিষ্ণুসংহিতায় কেমন তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে ঋতুত্রয় প্রবিষ্ট হইয়াছে, দেখুন;—"ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরমিতি।" নিম্নে উদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণোক্ত শ্লোকদ্বয়ও বয়স্কাকন্যাবিবাহপক্ষে।

"দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।
লব্ধা তদা তু স্থাতব্যং ষড়াব্দং সংযতেন তু ॥
বিংশত্যব্দা যদা কন্যা লব্ধব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্।
অত ঊর্দ্ধমহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন বৈ ॥"

এ সকল স্থলে কন্যা শব্দে যে দশবার্ষিকী বুঝাইবে না, অবিবাহিতা স্ত্রীজাতীয়া মাত্র বুঝাইবে, তাহাও স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত আছে। যথা—

স্মৃতিশিরোমণিব্যাখ্যায়াম্,—"যদ্যপি যমেন দশবর্ষায়াঃ কন্যাশব্দঃ পরিভাষিতঃ, তথাপীহ বিবাহার্হস্ত্রীমাত্রপরো বোধ্যঃ। তথা চৌশনসেহপ্যবসংবাদে, ঋতুস্নাতা তু যা কন্যা সা কন্যেত্যভিধীয়তে।" ইতি।

এখন অপ্রাপ্তরজস্কা ও প্রাপ্তরজস্কা, উভয় পক্ষে বিবাহবিধি দৃষ্টি করিয়া, এবং অন্যোন্যবিরোধী প্রমাণ সকল সমন্বয় করিয়া বুধমণ্ডলী কি মীমাংসা করিবেন? অথবা ভাষায় যাহাকে কাজির বিচার বলে, তাহাই অবলম্বন করিবেন? বহুদিনের একটি কথা স্মরণ হইতেছে, তাহাই এস্থলে অনুকরণীয়। একদা কোনও খ্যাতনামা আয়ুর্ব্বেদী ভিষকবর্য্যকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল পথ্যের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি আধুনিক সমাজে অখাদ্য; ইহার কি সিদ্ধান্ত? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, ঐ সকল পথ্য ম্লেচ্ছদিগের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং অন্যবিধ পবিত্র পথ্য অস্মদীয় সামাজিকের জন্য। তদনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাপ্তরজস্কার বিবাহবিধান বঙ্গদেশীয় বাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিশেষ সাম্প্রদায়িকদিগের জন্যই করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের সাধারণ জনসমূহের জন্য অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহই প্রশস্ত। এ সিদ্ধান্ত সকলের অনুমোদিত হইবে কি না, বলা যায় না। কিন্তু অধুনা

অস্মদীয় সমাজে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির নিকট যে ইহা আদৃত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহা না হইলে আমাদের অবস্থা এরূপ কেন হইবে, কেনই বা এত দীর্ঘকাল যাবৎ এরূপ থাকিবে!!

পরস্পরবিরোধী বচনগুলির কোন্‌টি আদরণীয়, এবং কোন্‌টি অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষণীয় হইবে, তাহারও বিধিব্যবস্থা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥
সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥
অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥"

পরোক্ত শ্লোকটীকায় কুল্লুকভট্টধৃত,

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥" জাবালঃ।
'শ্রুত্যা সহ বিরোধে তু বাধ্যতে বিষয়ং বিনা।' ভবিষ্যপুরাণে।
'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।' জৈমিনিঃ।

শ্রুতিবিরোধে স্মৃতি বাক্যমনপেক্ষং অপ্রমাণং অনাদরণীয়ং, অসতি বিরোধে মূলবেদানুমানস্যিতার্থঃ।' ইতি কুল্লুকটীকা।

হারীতসংহিতা—শ্রুতিস্মৃত্যাদিকং ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ॥"

ব্যাসসংহিতা—"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

আর্য্যগণের মাননীয় পূর্ব্বোক্ত বেদাদি শাস্ত্রদর্শনে যাঁহারা পরিতৃপ্ত না হইয়া দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাঁহাদের জন্য মনুসংহিতা হইতে অনুকরণোপযোগি সদাচারের লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

এই শ্লোকের মেধাতিথিকৃতা ব্যাখ্যা এই,

'এতেষু দেশেষু কুরুক্ষেত্রাদিষু প্রসূতস্যাগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্য সকাশাৎ স্বং স্বং চরিত্রমাচারং শিক্ষেরন্ জিজ্ঞাসেরন্।"

কুল্লুকের ব্যাখ্যা,—"কুরুক্ষেত্রাদিদেশজাতস্য ব্রাহ্মণস্য সকাশাৎ সর্ব্বমনুষ্যা আত্মীয়মাত্মীয়-মাচারং শিক্ষেরন্।"

বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠদ্বিজবরগণ যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশোদ্ভব, তাহা প্রসিদ্ধ; কান্যকুব্জও কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্তর্ভূত। পঞ্চব্রাহ্মণবংশোদ্ভূতগণের মধ্যে, আচারাদিনবগুণবিশিষ্ট, কুলীন মহোদয়েরাই শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহাদের নিকট হইতেই সদাচারশিক্ষা করা বিধেয়। এক্ষণে এ প্রদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, বারেন্দ্র বৈদিকাদি শ্রেণী অপেক্ষা, সংখ্যায় অধিক এবং সাধারণ জনসমাজে তাঁহাদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ বিধায় রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের আচারই যে অনুকরণীয়, তাহা কি প্রমাণী-কৃত হইল না? অতএব রাঢ়ীয়া উৎকৃষ্টা কুলীনব্রাহ্মণতনয়ারা, রজঃপ্রাপ্তিকালের পূর্ব্বেই সকলে বিবাহিতা হয়েন কি না, তাহা দেখিলেই অনুকরণীয় আচার কি, তাহা সাব্যস্ত হইবে।

পক্ষান্তরে, যদি এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ কুলীনব্রাহ্মণকুলে চিরপ্রচলিত সাধ্বাচার উপেক্ষা করিয়া, রঘুনন্দনের ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য মনে করা যায়, তাহা হইলে ত ঐ সকল প্রধান কুলীনবংশধরগণ বহুকাল হইতে অপাঙ্‌ক্তেয়, অশ্রাদ্ধেয় ও অসম্ভাষ্য হইয়াছেন, ইহা বলিতে হইবে। তাঁহাদের সহিত সংস্রবদোষে কি সমস্ত বঙ্গীয় ভদ্রসমাজকে পতিত মনে করিতে হইবে না? রঘুনন্দনের মুখাপেক্ষী হইলে এই সকলই স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্তচূড়ামণি, আপন মতের স্থাপনার্থে, অত্রি ও কাশ্যপের বলিয়া যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদবলম্বনে এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

"অষ্ট বর্ষাং ভবেৎ কন্যাং যো ন দদ্যাৎ ত্রিলোচনঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্ বৃষলীপতিম্॥"

পরন্তু রজক, নাপিত, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতির মধ্যেই ছয় সাত বৎসরের, অথবা তদপেক্ষাও ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ অধিক প্রচলিত দেখা যায়। তাহাই কি সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজে অনুকরণীয় হইবে? এই কি উচ্চশিক্ষার ফল ফলিতেছে?

কস্যচিদনুসন্ধিৎসোরিয়ম্।

গর্জ্জন ও বর্ষণ।

মেঘ ডাকিলে আমরা সাধারণতঃ মেঘের অস্তিত্ব ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া থাকি,—কিন্তু বর্ষণের সহিত ইহার যে আর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হঠাৎ আমাদের চক্ষে পড়ে না। বৃষ্টিবর্ষণের সময় মেঘগর্জ্জন হইলে, গর্জ্জনের অব্যবহিত পরে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি পড়িতে দেখা যায়—এইটি বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার কারণ কি,—গর্জ্জন দ্বারা বর্ষণ হয়?—না, বর্ষণ গর্জ্জন করায়?

এই প্রশ্নটি লইয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে মহা বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছিল। * ঠিক সেই সময়ে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক, জেনারল্ ডাইরেণ ফর্থ (Dyren furth) শব্দ উৎপন্ন করিয়া বৃষ্টিবর্ষণে কৃতকার্য্য হওয়ায়, অধিকাংশ লোকেই গর্জ্জনকে বর্ষণের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মতে—জলীয়-বাষ্পপূর্ণ আকাশে কোনও কারণে মহাশব্দ হইলে নিকটস্থ বায়ুস্তর আন্দোলিত হইয়া এক প্রকার শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এবং এই তরঙ্গের ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণে ভাসমান জলকণা সকল একত্রীভূত ও পরক্ষণে জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়।

যাহা হউক, ডাইনামাইট বারুদ এবং অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ দ্বারা কৃত্রিম-শব্দ করিয়া, ডাইরেণ ফর্থের বর্ষণে কৃতকার্য্য হওয়া ব্যাপারটা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে কিছু দিন নির্ভুল বলিয়া চালাইয়াছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক নিউকুম্ব প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ডাইরেণ ফর্থের সিদ্ধান্তের ভ্রম বাহির করিতে লাগিলেন,—তখন আবার বর্ষণ গর্জ্জন ব্যাপারটির উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে এক দল মার্কিণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া ফেলিলেন—"বর্ষণই গর্জ্জনের কারণ, গর্জ্জন বর্ষণের কারণ হইতে পারে না; আর যদি পুরাতন সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত ধরিয়া গর্জ্জনকে বর্ষণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মেঘ ডাকিবার অব্যবহিত পরে বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি না হইয়া অনেক পরে হইত; কারণ, বারিবিন্দুর গড়ের (Average) গতি অপেক্ষা শব্দের গতি অনেক অধিক।" মেঘের সাধারণ উচ্চতা ধরিয়া ও ভূমধ্যাকর্ষণজনিত বারিবিন্দুপতনের গতি হিসাব করিয়া, ইহাঁরা পূর্ব্বোক্ত কথা কয়েকটির সত্যতা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন।

* ১৮৯১ সালের Scientific American এবং North American Review পত্রিকা।

বর্ষণই যে গর্জ্জনের কারণ, তাহা প্রমাণ করিতে তাড়িতশক্তিপূর্ণ (Electrified) পদার্থের যে কয়েকটি সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে,—এই সিদ্ধান্তটি বুঝিতে হইলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। তাড়িতশক্তিপূর্ণ এক খণ্ড মেঘ ইহার নিকটস্থ বিরুদ্ধশক্তিপূর্ণ (oppositely electrified) মেঘখণ্ডে স্বীয় তাড়িত প্রেরণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে—এইটি পরস্পর বিরুদ্ধশক্তিপূর্ণ পদার্থদ্বয়ের সাধারণ ধর্ম্ম, এবং যদি উভয় পদার্থের মধ্যে অল্প ব্যবধান থাকে, কিম্বা তাড়িত শক্তি যদি উপযুক্তরূপে প্রবল হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাড়িতদ্বয়, আলোক ও তাপ উৎপাদন করিয়া মিলিত হইয়া উভয় শক্তির বিনাশ সাধন করে; ঐ আলোককেই আমরা বিদ্যুৎ বলিয়া জানি, এবং তাড়িতদ্বয়ের সম্মিলনকালীন বায়ুরাশির পরস্পর সংঘর্ষণ ও আলোড়ন জনিত শব্দকেই আমরা মেঘগর্জ্জন বলি।

পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি অবলম্বন করিয়া, এই দলের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, শীতল বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনাদি বৃষ্টির সাধারণ কারণের ন্যূনাধিক্যের উপরই বর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে, ইহাতে গর্জ্জনের কোনও প্রভাবই নাই। এবং যখন কোনও এক তাড়িতশক্তিপূর্ণ মেঘখণ্ড হইতে বৃষ্টিধারা পড়িতে থাকে, তখন এই মেঘ বহুদূরবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও, ইহার তাড়িত, বৃষ্টিধারার সহিত আসিয়া, অল্পদূরবর্ত্তী অপর মেঘখণ্ডের তাড়িতের সহিত মহাশব্দে ও আলোক সহকারে মিলিত হইয়া থাকে, এবং যদি বারিধারার পথের অন্তর্বর্ত্তী কোনও মেঘ না থাকে, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ইহার তাড়িৎ বজ্ররূপে মহাশব্দে পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়। বৃষ্টিধারা ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটবর্ত্তী হইলে এই বৈদ্যুতিক ঘটনা হয় বলিয়া এবং শব্দের গতি বৃষ্টিপতনের গতি অপেক্ষা অধিক বলিয়া, গর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই বৃষ্টিধারা ভূতলে আসিতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা নূতন সিদ্ধান্তটির সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া আরও কয়েকটি সুন্দর যুক্তি দেখাইয়াছেন, সাধারণ পাঠকদিগের নিকট সেগুলি প্রীতিকর হইবে।

যাহা হউক, এ প্রশ্নটির আজও উত্তমরূপ মীমাংসা হয় নাই—তবে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে বিষয়টি লইয়া যে প্রকার তর্কবিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, অভ্রান্ত সিদ্ধান্তটি শীঘ্রই স্থিরীকৃত হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বাদপ্রতিবাদ।

গ্রহণ।

গত ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" '১৮৯৬ সনের সূর্য্যগ্রহণ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"এক বৎসরে কিছুতেই সাতটির অধিক গ্রহণ হইতে পারে না, এবং ২টির অধিক চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না।"

শেষোক্ত প্রতিজ্ঞাটিতে কিছু গোলযোগ আছে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যদি একবার সূর্য্য প্রথম কক্ষপাতে (node) আসিবার দুই দিবস পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, তবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী উভয় অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ ঘটিতে পারে, কারণ উভয় গ্রহণই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া থাকে। * দ্বিতীয় কক্ষপাতে আসিবার দুই দিবস পরে আবার চন্দ্রগ্রহণ হইবে, এবং সেখানেও সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি গ্রহণ হইতে পারে। তৎপরে সূর্য্যের গতি আবার প্রথম কক্ষপাতের দিকে হইবে, এবং সূর্য্য প্রথম পাত অতিক্রম করিবার ছয় দিবস পরে আবার চন্দ্রগ্রহণ হইবে। এই দ্বিতীয় বার প্রথম কক্ষপাত অতিক্রম করিবার সময় দুইটির বেশী গ্রহণ হইতে পারে না, তন্মধ্যে একটি পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রগ্রহণ, অপরটি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ; ইহার পরবর্ত্তী অমাবস্যায় সূর্য্য গ্রহণের সীমানহির্ভূত হইয়া যায়। এই সূর্য্যগ্রহণটি প্রথমপাত প্রথমবার অতিক্রমণের সময় সর্ব্বপ্রথমে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহারই ১২ চান্দ্রমাস অর্থাৎ ৩৫৪ দিন পরে হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটি গ্রহণের কথা বলা হইল, এবং এই আটটি গ্রহণে ১২½ চান্দ্রমাস অর্থাৎ ৩৬৮½ দিন লাগে; কিন্তু প্রথম ৭টি অথবা প্রথমটি ছাড়িয়া অবশিষ্ট ৭টিতে ১২ চান্দ্রমাস অর্থাৎ ৩৫৪ দিবস লাগিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, এক বৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫½ দিনে ৭টির অধিক গ্রহণ হইতে পারে না, ৫টি সূর্য্যগ্রহণ ও দুইটি চন্দ্রগ্রহণ, অথবা ৪টি সূর্য্যগ্রহণ ও ৩টি চন্দ্রগ্রহণ।

তাহা হইলেই দেখা গেল, বৎসরে চন্দ্রগ্রহণের উর্দ্ধ সংখ্যা তিন, অর্থাৎ তিনটি পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার বেশী হইতে পারে না।

তার পরে আর একটা কথা। প্রতি অমাবস্যায় যদি সূর্য্যগ্রহণ হইত, এবং প্রতি পূর্ণিমায় যদি চন্দ্রগ্রহণ হইত, তাহা হইলে অপূর্ব্ব বাবু যে মহাবিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন, সে আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন। কারণ সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর অতি অল্প পরিমিত স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, † এবং অধিকাংশ স্থানেই সে সময়ে আংশিক গ্রহণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহা দেখান যাইতে পারে যে, সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল কখনই ৪ মিনিটের অধিক হইতে পারে না। অতএব, যদি সূর্য্যগ্রহণের সময় অমাবস্যার আশঙ্কা করিতে হয়, তাহা কিছুতেই ৪ মিনিটের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না, এবং বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। পুনশ্চ, চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণগ্রাসাবস্থা কখনও ২ ঘণ্টা ৪ মিনিটের অধিক-

* সাহিত্য ৮৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

† পূর্ণগ্রাসের সময় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের ছায়া (umbra) দ্বারা আবৃত থাকে, সেই অংশেই শুধু পূর্ণগ্রাস দেখা যায়। এই অংশটি বৃত্তাকার, এবং ইহার ব্যাস প্রায় ২০ মাইল।

কাল স্থায়ী হইতে পারে না, এবং বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে যে জগতের কবিত্ব বড় একটা শুষ্ক হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরঞ্চ সূর্য্যগ্রহণের সময় যে অতি বিস্ময়কর এবং সুন্দর দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়,—তাহাতে কবিত্ববৃদ্ধিরই অধিক সম্ভাবনা, তবে একটা কথা, যদি সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা হইলে ততটা বিস্ময় আর থাকিবে কি না সন্দেহ।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে যাকে Conjunction এবং opposition অথবা এক কথায় syzygies বলে, অপূর্ব্ব বাবু তাহারই বাঙ্গলায় "সমসূত্রস্থ" বলিয়াছেন। কথাটা তিনি সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে লইয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু কথাটা ঠিক হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। ইংরাজীতে conjunction বলিলে বুঝিতে হইবে, সূর্য্য ও চন্দ্রের longitude এক, এবং opposition তাহাদের longitudeএর প্রভেদ ১৮০। কিন্তু "সমসূত্রস্থ" কথায় ঠিক তাহা বুঝায় না। সমসূত্রস্থ বলিলে ইহাই বুঝি যে, সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরল রেখায় অবস্থান করে; কিন্তু সচরাচর গ্রহণের সময় তাহারা ঠিক এক রেখায় থাকে না, তাহার কারণ চন্দ্র ও পৃথিবীর ভ্রমণকক্ষ একই সমতলে অবস্থিত নয়। যাহা হউক, ঠিক প্রতিশব্দটি কি, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন, ইহাই লেখকের অনুরোধ।

শ্রীমুরলীধর রায়-চৌধুরী, বি-এ।

উত্তর।

যদিও আপাততঃ দেখিতে গেলে ইহাই মনে করা যায় যে, প্রথম পাতের চন্দ্রগ্রহণ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করিলে ৮টি গ্রহণ পূর্ণ করিয়া ঐ পাতে পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ এক বৎসরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের বিচার করিতে গেলে আমাকে প্রস্তাবের অতিরেকে যাইতে হইত, এবং এমন সকল দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করিতে হইত, যাহা এক প্রবন্ধে কুলাইত না। তাই আমি কথাগুলি অতি সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু মুরলী বাবু যখন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তখন উত্তর দিতে বাধ্য হইতেছি।) চন্দ্রের কক্ষের সহিত ধরাকক্ষের বক্রত্ব প্রায় ৫°১০′ এবং চন্দ্রের পাত ক্রমশঃ প্রশ্চাদপসরণ করিতে করিতে ১৮½ বৎসরে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে; চন্দ্রকক্ষ বৃত্তাভাস হওয়াতে এবং তাহার 'কেন্দ্রব্যবচ্ছেদ' পৃথিবীর কক্ষের কেন্দ্রব্যবচ্ছেদের তিনগুণেরও অধিক হওয়াতে, তাহার দূরত্ব নিয়তই অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সূর্য্য স্থির কক্ষের অবস্থিতিও ঠিক এইরূপ থাকিতেছে না, তাহা নিয়ত স্বীয় অক্ষরেখার আবর্ত্তনবশে ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহা প্রায় ২ বৎসরে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে।

অতএব সকল সময়ে এক পাতেতে চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব একরূপ থাকে না। যদি ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে দৃষ্ট হইবে যে, চন্দ্রপাত যেমন ১৮½ বৎসরে একবার ক্রান্তিবৃত্ত পরিভ্রমণ করে, তেমন আবার ৯ বৎসরে একবার চন্দ্রকক্ষ আবর্ত্তন করে; এই হেতু এক বৎসরে তাহা চন্দ্রকক্ষে প্রায় ৪০ অংশ অগ্রসর হয়, অতএব কেন্দ্র হইতে পাতের দূরত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ দিকে আবার গ্রহণ সংঘটন সীমা দূরত্বাদির অনুক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে সকল গ্রহণের সম্ভাব্যতা বিচার করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল গ্রহণের

উর্দ্ধসীমা ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে, কিন্তু বৎসরে দূরত্বের তারতম্য ঘটাতে গ্রহণের সীমা সঙ্কীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভবপর হয় না। ইহা নিয়ম। কিন্তু নিয়মের বিকল্পত্ব আছে;—ইয়ুরোপখণ্ডে গত দুই সহস্র বৎসরে যে সকল গ্রহণ পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তাহা পর্য্যালোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ৩রা জানুয়ারী, ৩০শে জুন ও ২৪শে ডিসেম্বর, যথাক্রমে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ ঘটা দূরে থাকুক, শ্রুতিগোচর জ্ঞানেরও অগোচর বলিয়া সাধারণের নিয়মের অন্তর্ভূত করা হয় না।

যে ঘটনা সচরাচর ঘটে, তাহার বর্ণনাতে কবিত্ব রস অনুভব করা আমাদের ন্যায় একান্ত গদ্যপরায়ণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সূর্য্যগ্রহণ ৪ মিনিটের অধিক (১৮০৬ খৃঃ অঃ ১৬ই জুন নিউইয়র্কে একটি সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে পূর্ণগ্রাস ৪৷৷০ মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল।) স্থায়ী না হইলেও চন্দ্রগ্রহণ প্রায় ১০ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছে, এবং সময় সময়ে চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস প্রায় পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ হইতে যুগপৎ দৃষ্ট হয়। এক গ্রীষ্মকালীয় রজনীতে এইরূপ একটি গ্রহণ ঘটিলে সমস্ত রজনী অন্ধকারে কাটাইতে হইবে; যদি প্রতি পূর্ণিমায় এইরূপ ঘটে, তবে গ্রহণের কবিত্ব বাড়িলেও জ্যোৎস্নার কবিত্ব যায় পাইবে বোধ হয়। যাহা হউক, মুরলীবাবুর টীকাটি একান্ত ভ্রমাত্মক হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্র যখন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে, তখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার দূরত্ব ২১৭৬৫০ মাইল; কিন্তু ঐ স্থলে সূর্য্য হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক, এই হেতু চন্দ্রের যে 'ছায়ামঠ' বিস্তারিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ ২৩৬০৫০ মাইল হইয়া থাকে। অতএব তাহা ধরাপৃষ্ঠে প্রতিহত হইলে (যখন তাহারা শীর্ষে অবস্থিতি করে তখন) যে বৃত্ত দ্বারা ছায়াপরিসর সূচিত হয়, তাহার ব্যাস ১৬৭ মাইল হইবে। কিন্তু সূর্য্যগ্রহণকালে যদি চন্দ্র পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে থাকে, তখন তাহার দূরত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে ২৪৯০০০ মাইল হয়, কিন্তু তখন 'ছায়ামঠের' দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন, অর্থাৎ ২২৮৩০০ মাইল হইয়া থাকে। অতএব ঐ মঠের চূড়দেশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২১৭০০ মাইল উর্দ্ধে থাকিয়া যায়।। এরূপ অবস্থায় সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্রের 'ছায়া' না পড়িয়া পৃথিবীর উপর তাহার একটি 'উপছায়া' পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহারও পরিসর প্রায় ২৩০ মাইলের উপর হয়। ইহা জানা আবশ্যক যে, এই সকল গণনাতে মধ্যাহ্নকালকে গ্রহণসময় বলিয়া ধরা হইতেছে। যদি তাহা না হয়, (সচরাচর তাহা ঘটা সম্ভব নহে) তবে ধরাপৃষ্ঠ কর্ত্তৃক মঠের ছেদন তির্য্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হওয়াতে তাহার পরিসর আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে মুরলী বাবু গ্রহণদর্শনের সীমা যত সঙ্কীর্ণ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা তত সঙ্কীর্ণ হয় না।

আমি 'সমসূত্রস্থ' শব্দে Conjunction কিম্বা opposition, কিছুই বুঝাই নাই; কেবল সূর্য্য ও পৃথিবী যে কোন না কোন অংশে সমসূত্রস্থ হয়, ইহাই বুঝাইয়াছি। মুরলী বাবু যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কেবল উক্ত গোলকত্রয়ের কেন্দ্র সম্বন্ধেই খাটে, কিন্তু যদি তাহাদের কোন অংশই পরস্পর সমসূত্রস্থ না হয়, তবে গ্রহণ ঘটিতে পারে না। সংস্কৃতে গ্রহদিগের পরস্পর Conjunctionকে 'গ্রহযুক্তি', এবং সূর্য্যের সহিত Conjunctionকে 'শীঘ্রোচ্চস্থিতি' বলা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল সূর্য্যের অপর পার্শ্বে পৃথিবীর বিপরীত দিকে অবস্থিতি বুঝায়, অতএব চন্দ্রপক্ষে ঐ নাম অপ্রযোজ্য। চন্দ্রপক্ষে Conjunctionকে 'অমাবস্যা' ও oppositionকে 'পূর্ণিমা' বলা যায়। আমি যে স্থলে তিনটি গোলকের সমসূত্রস্থ হওয়ার কথা বলিয়াছি, সে স্থলে ইহাই বুঝাইয়াছি যে, সচরাচর গ্রহণসময়ে তাহাদের কোন না কোন অংশ অবশ্যই এক সরলরেখায় নিবদ্ধ হইবে। তিনটি গোলক এক সরলরেখায় নিবদ্ধ

হইলে এবং তাহাদের মধ্যে একটি জ্যোতিঃসম্পন্ন হইলে, অপর দুইটির মধ্যে একের ছায়া অপরের উপর পতিত হইবে, এই সাধারণ অর্থেই আমি 'সমসূত্রস্থ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কারণ, এই সকল কথা আমার প্রবন্ধের উপাঙ্গ মাত্র ছিল, অতএব কথার বৈচিত্র্য দ্বারা পাঠকদিগের চিত্তবিভ্রাট উৎপাদন করিতে আদৌ ইচ্ছা করি নাই।

উপসংহারে সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মুরলী বাবুর ন্যায় পাঠকের প্রতিবাদ অতিশয় আশাপ্রদ হইয়া থাকে; ইহাতে এক দিকে যেমন প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পঠিত হইতেছে বলিয়া আনন্দ অনুভূত হয়, অপর দিকে আবার বাদপ্রতিবাদ দ্বারা আলোচনার বৃদ্ধি ও বিষয়জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান করা হয়।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে "শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে"।

গত ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,—"কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত" প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্রের আবির্ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে প্রতিবাদযোগ্য বিবেচনা করি।

কথাটি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে, কিন্তু এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, প্রবন্ধে যে সকল সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যস্বরূপ পত্রাদি উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ঘটনার কিছুই নিষ্পত্তি হইবে না। বঙ্কিম বাবু বা নবীন বাবু কেহই এ কথা লইয়া তর্ক করিতে আসিবেন না, বঙ্কিম বাবু এমন কথা কখনই বলিবেন না যে, নবীন বাবু আমার কৃষ্ণচরিত্রের ছায়া লইয়া বা অনুকরণ করিয়া, তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নবীন বাবু নিজের কৈফিয়ৎ—যাহা রৈবতকের আরম্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পর ঘটনাস্থলে তাঁহাকে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই,—"নব্যভারত" লেখকেরও নহে, হীরেন্দ্র বাবুরও নহে।

কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে গুটিকতক গুরুতর কথা মীমাংসা করিবার জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথার পুনরুল্লেখ করিলাম। দিন কতক হইল, বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের ঢেউ এমনই উঠিয়াছিল যে, তাহাকে নিতান্ত অসাময়িক ও অস্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গুটিকতক ছাড়া, বাঙ্গালার প্রায় সকল নামজাদা লেখকই এই "ধর্ম্মরোগে" আক্রান্ত হইয়াছিলেন; তরুণ বঙ্গসাহিত্য ধর্ম্মের সে অপরিণত বার্দ্ধক্যের মধ্যে নিজের ভরণপোষণ বজায় রাখিতে পারিয়াছিল অতি অল্পই। সেই সময়কার সাহিত্যে "নবজীবন" মনে করুন। আবার "নবজীবনে" বঙ্কিম বাবু, রমেশ বাবু, অক্ষয় বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও মনে করুন। "নবজীবনের" অধঃপতনের সময় 'প্রচারের' আবির্ভাব, বঙ্কিম বাবুই "প্রচারের" প্রাণ ছিলেন সত্য, কিন্তু নব্যবঙ্গের নূতন "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" যে প্রথমে "প্রচারেই" প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা নহে; সেই সময়কার "প্রচার" ও "ভারতীতে" প্রকাশিত, বঙ্কিম বাবু ও রবীন্দ্র বাবুর বাদপ্রতিবাদ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা জানেন।

আরও কয়েক বৎসর পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন যে, যে "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার সহযোগী লেখকেরা "নবজীবনে" ব্যাখ্যাত করিতেছিলেন, তাহার প্রথম সূত্রপাত

ঠিক 'নবজীবনে" নয়, "বঙ্গদর্শনে" "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে দেখুন যে, সেই "আমি নূতন নহি, বহুবার আসিয়াছি' ইত্যাদিতে "কৃষ্ণচরিত্রের" মূল মতলবটা মোটামুটি নিহিত আছে। অতএব, "কৃষ্ণচরিত্র" প্রচার সম্বন্ধে নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর পরবর্ত্তী। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, নবীন বাবু, বঙ্কিম বাবুরই "কৃষ্ণচরিত্র" অবলম্বন করিয়া 'রৈবতক' বা 'কুরুক্ষেত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে 'রৈবতকের' প্রারম্ভে উদ্ধৃত পত্রখানিই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে যে সকল নূতন নূতন তত্ত্ব এখন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার মূল বঙ্কিম বাবু।—তা সে সকল নূতন তত্ত্ব নবীন বাবুই আবিষ্কার করুন, বা আর কেহই করুন। উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহা প্রমাণের জন্য জীবিত বা মৃত কোনও লেখককে টানিয়া আনিতে হইবে না, বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠকেরা অবশ্যই সহজে এ কথা বুঝিবেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি বঙ্কিম বাবুর পক্ষ হইয়া এ সকল কথার প্রতিবাদ করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি প্রধান অঙ্ক, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সাহিত্যের উপর বঙ্কিম বাবুর কত দূর আধিপত্য, এই ঘটনাটিতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। তাহাই আমি সংক্ষেপে সকল কথা বিবৃত করিলাম।

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যামোহন বাবুর প্রতিবাদ পড়িয়া "নব্যভারত ও কুরুক্ষেত্র" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন,—

'কামাখ্যা বাবুর প্রবন্ধ পড়িলাম, উহাতে ত আমার প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ দেখিলাম না। লেখক স্বয়ং লিখিতেছেন,—'আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, নবীন-বাবু বঙ্কিম বাবুরই কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।' লেখক না বলুন, নব্যভারত বলিয়াছিলেন, আর আমার প্রবন্ধ তাহারই প্রতিবাদ।"

মাধুরী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন পূর্ব্বের কথা কিছু বলিতেছি।

তারাসুন্দরী প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন, হরিহর বিছানায় নাই। একবার এ দিক্ ও দিক্ অন্বেষণ করিলেন, বাহিরেও এক জন ঝি পাঠাইয়া দিলেন, কোথাও তাঁহার দেখা মিলিল না। শেষ, বাবুর খাস খানসামা দেলসুখের

তলব হইল। দেলসুখ নাই। দেউড়িতে যে দরোয়ান থাকিত, সেও কিছু বলিতে পারিল না। সারারাত্রি রামটহলের মার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কোনও খবরই রাখিত না। তারাসুন্দরীর কাছে ধমকানি খাইয়া আমতা আমতা করিল।

তখন তারাসুন্দরী বুঝিলেন, হরিহর দেলসুখকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই ভুবনের সন্ধানে গিয়াছেন। মনে মনে বলিলেন, "বটে বঁধু বটে, আমাকে বলিয়া যাইতেও তোমার বিশ্বাস হইল না!" তারাসুন্দরী ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "মূর্খ, মনে করিয়াছিলে, আমি তোমাকে যাইতে দিব না?—তুমি এখন আমার চক্ষুর অন্তর হও, ইহাই তো আমি চাই। আমার কত কাজ।—তুমি না থাকিলে নিঃশঙ্কচিত্তে করিতে পারিব। কিন্তু—" সহসা মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, ওষ্ঠের হাসি মিলাইয়া গিয়া মৃদু মৃদু কাঁপিয়া উঠিল, তারাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু মনে করিয়াছ, পুত্রের বিবাহ দিয়া ঘটা করিয়া বৌ আনিবে, তারাসুন্দরীর শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে সে আশা করিও না।"

তার পর গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে তারাসুন্দরী কি সঙ্কল্প আঁটিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্কল্পটা বুঝি আগেই স্থির হইয়াছিল, এখন তাহা সাধন করিবার উপায় ঠাহরিতে লাগিলেন। একবার উঠিয়া অমূল্যকে ডাকিলেন। ঝি বলিল, অমূল্য কাল রাত্রে বাড়ী আসেন নাই। রাগে দুঃখে পুত্রের উদ্দেশে গালি দিতে দিতে তারাসুন্দরী আবার গিয়া বিছানার উপর বসিলেন। ঝি চাকর সবাই শুনিল, গৃহিণীর শিরঃপীড়া সে দিন বড়ই প্রবল হইয়াছে। কোনও মতে শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। এই শিরঃপীড়ার কথাটা শুনিয়া শুনিয়া তাহা বড়ই ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছিল, তবে কথাটা নূতন না হইলেও খিটখিটিনীর প্রাবল্যের ভয়ে সকলে বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িল।

এগারটার সময় অমূল্য বাড়ী আসিলেন। ইয়ারকিতে পেট তো ভরে না, কাজেই দুবেলা দুবার না আসিলে চলে না। অমূল্য আসিয়াই শুনিলেন, মার বড় অসুখ, অনেকবার তাঁহার খোঁজ হইয়াছে। অমূল্যের একটু মনে ভয় হইল। মাতার গৃহের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ঢুকিতে সাহস কুলায় না। তারাসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, অমূল্য। কিছু মন্দ কথা না বলিয়া নিকটে ডাকিলেন। অমূল্য দেখিল, স্নেহের ডাক। তাহাতে আরও অধিক ভয় হইল। যাহা হউক, মার ডাক অবহেলা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাঁহার অসাক্ষাতে সে যতই লম্ফ ঝম্প করুক, কাছে গেলেই ভয়ে

এতটুকু হইয়া পড়িত। ধীরে ধীরে অমূল্য নিকটে গিয়া খাটের বাজুর উপর ঝোঁক দিয়া বসিল।

ধীরভাবে তারাসুন্দরী বলিলেন, "দেখ, আমি যাহা বলিব, সত্য বলিও, মিথ্যা কহিও না।"

অমূল্য বলিল, "কি বল?"

তারা। সেই সোনার সিংহাসনখানি লইয়া তুমি কি করিয়াছ?

প্রশ্ন শুনিয়া অমূল্যের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সহসা কোনও কথা বলিতে পারিল না। বোকার মত মুখ তুলিয়া একবার চাহিল।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ঠিক্ কথা বলিও। আমি জানি, তাহা তুমিই লইয়াছ। ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিও না।"

খুব জোরের সহিত অমূল্য বলিল, "মিথ্যা কথা।"

তারাসুন্দরী ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন—"কার মিথ্যা কথা? তোমার না আমার? কেন অকারণ সময় নষ্ট করিতেছ, তাহা আছে না খোয়াইয়াছ, ঠিক্ করিয়া বল।"

অমূল্য আরও দুই একবার কথাটা উল্টাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শেষ অগত্যা, আপনার চুরির কথা স্বীকার করিল; এবং তাহা যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিল।

"কি—তাহা একেবারে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে!" তীরবিদ্ধের ন্যায় তারাসুন্দরী লাফাইয়া উঠিলেন। "মূর্খ—কুলাঙ্গার, কাহাকে তাহা বিক্রয় করিছিস, শীঘ্র বল্।" ভ্রুকুটী করিয়া তারাসুন্দরী পুত্রের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ভয়ে অমূল্য কাঁপিয়া উঠিল। আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আপনার অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিল। ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু সম্মুখেই সেই তারাসুন্দরী তীব্র দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অমূল্য ভয়ে চক্ষু নত করিয়া কি বলিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু এতো যে সে নয় যে, যাহা হয় তাই বলিয়া বুঝাইবে। অগত্যা অমূল্য সব কথা খুলিয়া বলিয়া বলিল, "কে কিনিয়াছে, তাহা জানি না, আমি নিজে বিক্রয় করি নাই, আমার বন্ধু ভূষণ ইহা বেচিয়া আসিয়াছে।"

"ভূষণ!—কে ভূষণ!" তারাসুন্দরী যেন একটা কি নষ্ট সামগ্রী ফুড়াইয়া পাইলেন। তৎক্ষণাৎ মুখে একটু হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। মাতার আদেশে

তখনই অমূল্য একজন লোককে ভূষণকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইয়াবের ডাক পৌঁছিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভূষণ সহস্র কাজ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেল। পীড়াপীড়ি দেখিয়া ভূষণ সত্য বলিল। বলিল, কলিকাতার লাল-বাজারের হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের দোকানে তাহা সে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। কত মূল্যে তাহা বেচিয়া আসিয়াছে, তারাসুন্দরী তাহা জিজ্ঞাসিলেন। ভূষণ যাহাতে বেচিয়াছিল, অমূল্যকে আনিয়া তাহার অর্দ্ধেক বলিয়াছিল, একটু গোলে পড়িল। একটু ভাবিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া বলিল, "যাহাতে বেচিয়াছি এখন তো আর সে দামে সে ছাড়িবে না। অবশ্য অনেক বেশি দর হাঁকিবে, তবে—"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "শোন, তোমরা আমাকে যেমন ভাঁড়াইলে না, আমিও তেমনি তোমাদিগকে ভাঁড়াইব না। আমি সেই সিংহাসন ফিরিয়া চাই। তা যত দাম-চাম দিবে, তাহা যেমন করিয়া হয় আনিয়া দিতে হইবে। কেন চাই, তাহাও বলি শোন। এই মামলা লইয়া গুলিতে ভূষণের নামে চুরির দাবি দিতে হইবে। খাতায় ভূষণের নামে অবশ্য খরিদ লেখা আছে, "ভূষণ" কাটিয়া "ভুবন" সহজেই হইবে। কেন এ কাজ করিতেছি, তাহা পরে বলিব, এখন যাহা বলিলাম, তাহা পারিবে কি না?"

এতক্ষণের পর অমূল্যকুমারের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সেই ভয় ও চিন্তার গ্রন্থিমুক্তে আনন্দ দেখে কে? ভূষণকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া দিবেন, ইহার অপেক্ষা আনন্দ অধিক আর কি হইতে পারে? আর যেন এ অমূল্য সে অমূল্য নয়—একেবারে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ভূষণের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কি ভূষণ, এটা আর পারবি না?"

ভূষণ কিন্তু কাজটা তত সোজা ও সুবিধাজনক বোধ করিল না; তবে সুমুখে বড়াই করিতে ছাড়িবে কেন? বলিল "এটা কি আর একটা ভারি কাজ হ্যাঁ?"

কি জানি, পাছে পরে কোনও ঝোঁক পড়ে, এই ভাবিয়া ভূষণ বলিল, "কিন্তু মুখ খাড়া প্রমাণ না হইয়া আর একটা সাক্ষী হইলে ভাল হইত।"

তারাসুন্দরী দেখিলেন, ভূষণের এ সব বিষয়ে মাথা খেলে ভাল। বলিলেন, "এমন লোক কোনও সন্ধানে আছে কি?"

ভূষণ একবার আপনাদের দলের মধ্যে দুই এক জনের নাম করিবে মনে

ভাবিল, কিন্তু কি জানি যদি ইহার পর গোল দেখিয়া তাহারা শেষ তাঁহার নাম করিয়াই বসে। ভূষণ চাপিয়া গেল। বলিল, "তাইত, তেমন লোক তো দেখিতেছি না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "আচ্ছা আমিই ভাবিয়া স্থির করিব। এখন স্নানাহার করিবে চল।"

অমূল্য ও ভূষণ মহা উৎসাহে এক সঙ্গে স্নান করিয়া আসিল। নিজে শিখা তারাসুন্দরী তাহাদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন। পরিচারিকারা আজিকার শিরঃপীড়ার এই অপূর্ব্ব পরিণাম দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

আহারাদির পর সে দিবস সমস্ত দিন ঐ কথারই আন্দোলন আলোচনা চলিল। লোক কিন্তু ঠিক্ হইয়া উঠিল না। তারাসুন্দরী ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বদিনের কথা অনুসারে বৈকালে ভজহরি বাটীতে আসিল। চাকরের মুখে সংবাদ পাইয়া সাগ্রহে তারাসুন্দরী তাহাকে সেইখানে লইয়া আসিতে বলিলেন। ভজহরি আসিবা মাত্রই তারাসুন্দরী বসিতে বলিয়া উঠিয়া গিয়া একখানি দশটাকার নোট তাহার হাতে দিলেন। দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "দেখ, তুমি বড় সজ্জন। জাতিতে ছোট হইলেও তোমার ব্যবহার বড় ভাল। কাল তুমি যে খবর আনিয়া দিয়াছ, সে জন্য আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট তো হইয়াছিই, তবে আর একটি যদি উপকার কর, তাহা হইলে আমাকে কিনিয়া রাখ।"

গরিব ভজহরি—একে দশটাকা, তার উপর এইরূপ কথাবার্ত্তা—একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেল।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—"বেশি কিছু নয়, আমরা একটা কাজ করিব, তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আর আবশ্যক হয় তো একটা সাক্ষ্য দিতে হইবে।" ভজহরি কিছুই বুঝিতে পারিল না। হক্‌চকিয়া গেল।

তারাসুন্দরী খুলিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ভজহরি বলিল—"আমি তাহা পারিব না।" তারাসুন্দরী এক কথায় একশত টাকা হাঁকিলেন। ভজহরি কিছু দম খাইয়া গেল। তারাসুন্দরী আর কিছু না বলিয়া আর দুই খানি নোট আনিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে চারি জন কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কলিকাতা টাপা-

তথায় তারাসুন্দরীর সম্পর্কে এক মাসী থাকিতেন। একেবারে তাঁহারই বাড়ী গিয়া উঠিলেন। মাসী বিধবা। একটি পুরাতন ছোট একতালা বাড়ী—তাহার দুটি ঘর ভাড়া দেন, আর দুটি ঘরে নিজে ছেঁড়া মাদুর বিছানা ও একটা রোগা বিড়াল লইয়া বাস করেন। তিনি তারাসুন্দরীর ধনৈশ্বর্য্যের কথা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং বোনঝির খুব আদর পড়িয়া গেল। কর্পূরকুন্দধবল শয্যায় শুইয়াও যে তারাসুন্দরী অসুখ বোধ করিতেন, তিনি এখন আপনার কার্য্যের জন্য এমনই ব্যস্ত ও তদ্গতপ্রাণ যে, সেই ময়লা বিছানায় শুইতেও একটু মাত্র ঘৃণা বোধ করিলেন না।

এখন দৈবের কি বিচিত্র গতি, তারাসুন্দরীর মাসীর বাড়ী যে ভাড়াটীয়া থাকিত, সে সেই হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের দোকানে মুহুরিগিরি করিত। সে লোক ভূষণকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। ভূষণ গিয়া তারাসুন্দরীকে তাহার পরিচয় দিলেন। শুনিয়া তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। বিধাতা কি তাঁহার জন্য নিজেই সব বোঝাবোঝি করিতেছেন? নহিলে এমন সংযোগ কার ঘটে? আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অমূল্যকে দিয়া তারাসুন্দরী তাহাকে নিভৃতে ডাকিলেন।

সে লোকটা খাঁটি বাঙ্গাল, বাড়ী খাস বিক্রমপুরে। কাল রঙ্গ, পুরুপুরু ঠোঁট, মোটাসোটা আগা-ছাঁটা গোঁপ—নাম তার রামমাণিক্য। বাঙ্গাল বড় সেয়ান। সব শুনিয়া সে একেবারে বলিয়া বসিল, "সে সিংহাসন আর নাই, গালাই হইয়া গিয়াছে।" শুনিয়া তারাসুন্দরী হতাশায় মুষড়িয়া পড়িলেন।

বাঙ্গাল দেখিল, দাঁও বুঝি ফস্কিয়া যায়। বলিল, "এমনই তো মনে লয়, তবে খাঁড়া দেহিলে না ঠিক্ কইতে পারি। আর হরেকিষ্ট পোদ্দার—ওই পুরির পুৎ, ওঁক ঠিক্ বলবে? কখন না।"

অমূল্য বলিল, "কেন, টাকা দেব, দুটাকার জিনিষটা পাঁচ টাকা দেব, তবু বলবে না?"

রামমাণিক্য বলিল, "আবে মুশয় আপুনি তো নাবালোক দেহি। চৌরাই মাল, দরা পরিলে জ্যালে না ঠ্যালবে?"

অমূল্য বলিল, "তবে কি হবে? সে তো না কবুল দিলে চোর গ্রেপ্তার হল না।"

রাম। না হইবে ক্যান? ও হালার ভাই হালা হরেকিষ্টকে লইয়া আমাদের লভ্য কি? হরেকিষ্ট সাজাইতে পারিমু না?

তারাসুন্দরী আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। এতক্ষণে একটু দিক্

পাইলেন। বলিলেন—"দেখ, মোকদ্দমায় যত খরচ হবে, সব তার আমার। তোমাকে দুই শত টাকা দিব, যদি কাহাকেও হবেকৃষ্ণ সাজাইতে পার।"

রাম। আর সিংহাসনের মূল্য বাবত?

তারা। আরও দুই শত দিব।

রাম। তাঁর খাতা নি চাই?

তারা। তার জন্য আরও দুই শ।

রাম। হাজার টাকায় কোম হইবার পারে না।

তারাসুন্দরী অনেক ধস্তাধস্তির পর তাহাই স্বীকার করিলেন। সেই দিন রাত্রি দশটার পর হবেকৃষ্ণ পোদ্দারের খাতা ও সেই সিংহাসন তারাসুন্দরী আপন হস্তে পাইয়া মহা আনন্দের সহিত যত্নে তোরঙ্গের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া দিলেন।

পর দিন সকলে দেখিল, বৌবাজারের মোড়ের নিকট একখান পোড়ো খোলার ঘরে একখানি নূতন রোকড়ের দোকান হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ নামে এক বাঙ্গাল পোদ্দার আসিয়া সেই দোকান খুলিয়াছে। দুই দিনের পর লোকে দেখিল, সেই দোকানের সম্মুখে মহা ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। এক জন পুলিসের লোক আসিয়া সেই হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের খাতাপত্র তদারক করিতেছে। তারপর সেই খাতা ও একখানি দিব্য সোনার সিংহাসন লইয়া পুলিষ সেই দোকানী ও অন্য এক ব্যক্তিকে থানায় লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে আরও দুই ব্যক্তি যাইতেছিল, রাস্তার লোক সকলে গিয়া তাহাদিগকে ব্যাপার খানা কি, তাহা বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলে শুনিল, সেই লোকদিগের ঐ সিংহাসন খানি চুরি করিয়া কে আসিয়া এই দোকানে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে, তাহাই ধরা পড়িয়াছে।

পর দিবস হরেকৃষ্ণ ওরফে রামমাণিক্য ও ভজহরির এজেহার লইয়া কলিকাতা পুলিষ মনোহরপুর যে থানার এলাকাভুক্ত, সেখানকার পুলিসে তাহাদিগকে চালান দিল, এবং স্থানীয় তদারকের জন্য লিখিয়া পাঠাইল। মহা আহ্লাদে অমূল্য বাসায় গিয়া মাতাকে সব খুলিয়া বলিল। তারাসুন্দরী সেই দেশের ইনস্পেক্টারকে ঘুস দিবার জন্য এক শত টাকা হাতে দিয়া অমূল্য ও ভূষণকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে একবার বেলডাঙ্গা হইয়া রাজবাটীর খবরটা জানিয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল—যদি কার্য্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা করিয়া ভূষণকে প্রথমতঃ

জামিন হইয়া রামমাণিক্য ও ভজহরিকে খালাস করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার সহিত বেলডাঙ্গার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখা করিবার কথা বলিয়া দিলেন। অমূল্য ও ভূষণ চলিয়া গেল।

তারাসুন্দরী পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময় অমূল্যকে ডাকিয়া চুপি চুপি একটা ঔষধ আনিবার কথা বলিয়াছিলেন। অমূল্য তাহা গোপনে আনিয়া দিয়াছিল। তারাসুন্দরী তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে চলিয়া গেলে একবার সেই শিশিটি বাহির করিলেন। অতি যত্নে তাহা বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া, মাসীর আন্‌লা হইতে খানকতক ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় লইয়া, মাসীর হাতে কিছু টাকা দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মাসী বহিনঝিকে পুনরায় আসিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন। গাড়ী বরাবর বেলডাঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিল।

এত তাড়াতাড়ি করিলেও কলিকাতায় সপ্তাহের উপর বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তারাসুন্দরী যখন বেলডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানে মহা সমারোহ চলিতেছে, বিবাহের আর ৪ দিন মাত্র বাকি। তিনি শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। অবশ্য অমূল্য পুলিব লইয়া আর দুই দিনের কমে কিছুতে আসিতে পারিবে না। তাই যে হয় তার বিশ্বাস কি? তিনি শুনিয়াছিলেন, পাড়াগেঁয়ে পুলিব কলিকাতার পুলিবের মত সে প্রকার নয়—তাহাদের চাল বড়ই গদাইনস্করি। উপায় কি? রাগে আপনার হাত আপনি কামড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। যাহা হউক, আর বিলম্ব অকর্ত্তব্য। তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, যদি বিবাহ কোনও মতে কিছুদিন স্থগিত রাখিতে পারেন, আর একান্ত তাহা না হয়, শেষ ব্যবস্থা তো তাঁহার ঠিক্‌ই আছে।

তারাসুন্দরীর তখন প্রথম চিন্তা হইল, কিসে মাধুরীর সঙ্গে একবার দেখা হয়। কিন্তু সে তো সহজ নয়। সে ভাবিয়া ভাবিয়া সেই মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া, মাথার চুলগুলায় ধূলা মাখাইয়া তাহার কতক একটা কাপড়ের ফালি দিয়া জড়াইয়া, অতিথিশালা ও রুগ্নাশ্রমের ধারে ধারে ওৎ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়াইয়াও কোনও সন্ধান করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসায় জানিল, আজ কাল আর মাধুরী সে দিকে আসেন না। তবে এক জন বলিয়া দিল যে, যদি সে রাজকুমারীকে একান্ত দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে রাজান্তঃপুরের দিকে গেলে দেখা হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। আজকাল সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কাঙ্গাল দুঃখী কাহারও যে নিষেধ

নাই, তাহাও তিনি শুনিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া, গুটিগুটি অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সেই যে দুঃখিনী, যে পুত্র হারাইয়াছে বলিয়া রোদন করিতেছিল, সে আর কেহ নহে, তারাসুন্দরী। যে কৌশলে সোনার হরিণী ব্যাধের ফাঁদে পড়ে, সেই কৌশলে মাধুরীও তারাসুন্দরীর ফাঁদে পড়িলেন।

তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছি।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রহর বাজিয়া গিয়াছিল। সকাল সকাল আহারাদির পর হরিহর বাবুর শয়ন-গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া ঝিমহলে জমাট রকমের গল্প চলিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ কেহই বাড়ী নাই—কর্ত্তা তো অনেক দিন হইল বাড়ীছাড়া, তার পর তাঁহার পত্র পাইয়া গৃহিণীও অমূল্যকে লইয়া ভুবনের বিবাহ দেওয়াইতে গিয়াছেন, মধ্যে অমূল্য দুই দিনের জন্য আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গিয়াছে,—আজকাল ঝিঠাকুরাণীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। সকলেই আঠার আনা রকমের গৃহিণী হইয়া বসিয়াছেন। কাজকর্ম্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—ইচ্ছা গেল তো একটা কাজ করিলেন, না গেল তো তাহা পড়িয়া রহিল। আর অবসরই বা কখন? খাইতে, শুইতে, গাড়া বেড়াইতে, আর গল্প করিতেই যেন কোথা দিয়া দিনটা দেখিতে না দেখিতে চলিয়া যায়। বামনদিদিরই কিছু মুস্কিল। কাজ কর আর না কর, আহারটি দু সন্ধ্যা না হইলে পেট তো বুঝে না—কাজেই তাঁহার হান্‌শালে না গেলে আর চলে না। তবে, তিনিও নেহাত নেকা নন। তরকারির সংখ্যা খুবই কমাইয়া দিয়াছেন, আর কোনও কোনও দিন এক সন্ধ্যার রান্নাতেই দুই বেলার কাজ সারিতেছেন। কাহারও কিছু বলিবার যো নাই। এক দিন বিধু বলিয়াছিল, "রোজ রোজ ভিজাভাত কি খাওয়া যায় গা?" বামনদিদি অমনি সাফ বলিলেন, "না পারিস্, কাল থেকে রেঁধে খাস্।" বিধু নিজের দোষ জানিত, আর কিছু না বলিয়া চাপিয়া গেল।

এই কয় দিনেই বাড়ীঘর জঞ্জালে পুরিয়া উঠিয়াছিল। বাসনগুলায় ছাতা ধরিয়া গিয়াছিল, খাট বিছানার উপর এক হাঁটু করিয়া ধুলা জমিয়াছিল। ঝিঠাকুরাণীরা কেবল পান খাইতেছেন, দাঁতে মিসি ঘষিতেছেন, কখনও বা আরসির কাছে দাঁড়াইয়া ঠোঁট দুখানি ধরিয়া দেখিতেছেন, আবার কখনও বা গৃহিণীর কাপড়গুলি পরিয়া বাহার দিয়া বেড়াইতেছেন। যাহার মাদুর ভিন্ন জুটিত না, তাহারও আজ গদির উপর না শুইলে ঘুম হয় না। বড় সাধ করিয়া এক দিন

বামনদিদি কর্ত্তার সেই ভাল স্প্রিঙ্গের গদীর উপর শুইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি বিপত্তি! তাহাতে কি ভূতের বাসা আছে, নহিলে বসিতে না বসিতে অমন আপনা-আপনি হুস্ করিয়া নামিয়া পড়ে কেন? তাহা ফেলিয়া তিনি খাটের উপর গিয়া শুইলেন। সে রাত্রি বড় সুখে নিদ্রা হইল। কিন্তু সকাল বেলা উঠিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! তাঁহার মাথার তেলে ও গালের নালে অমন যে বকের পালকের মত ধব্‌ধবে বিছানা, তাহা একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। তখন চুপি চুপি অপরের অজ্ঞাতসারে ভয়ে ভয়ে তাহা কাচিয়া ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও তেমন কাজ করিবেন না।

চাকরমহলেও ঐরূপ ব্যবস্থা। সকাল সকাল স্নান, সকাল সকাল আহার, আর বিকাল পর্য্যন্ত নিদ্রা। নিদ্রা ভাঙ্গিল তো অমনি-মুখ-হাত ধুইয়া কেহ অমূল্যের ঘরে গিয়া ব্রস দিয়া মাথা আঁচড়াইতে বসিল, কেহ বাবুর কোঁচান কাপড় খানি পরিয়া বাবু সাজিল; কেহ টিলা আস্তিন পিরাণটি গায়ে দিয়া একগাছি সৌখীন ষ্টিক লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; কেহ বা ফুলবাগানে ঢুকিয়া বড় বড় ফুল ছিঁড়িয়া কানে গুঁজিতে আরম্ভ করিল। কেহ গল্প করিতে লাগিল, কেহ তামাকু খাইতে লাগিল, কেহ বা নিবালায় বসিয়া কাহারে যে তাহারই চিন্তায়-তন্ময় হইয়া পড়িল। এ দিকে অন বিনা হুঁকার নলিচাগুলা ফাটিতে লাগিল, গাড়ুর জলে আরসুলা প্রবেশ করিবার পথ দেখিতে আরম্ভ করিল। চাকর বাবুরা যে কখন কে-কোথায় থাকেন, তাহার খোঁজ খবর করিয়া উঠাও সহজে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কেবল যে বেচারা নূতন ভর্ত্তি হইয়াছিল, সকলের ফরমাস খাটিতে খাটিতে তাহারই প্রাণান্ত হইয়া গেল।

রোগটা ক্রমে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল। দেখা দেখি, স্বভাবতঃ নিষ্কর্ম্মার ঘরে দোরে চোরে বংশও ক্রমে ক্রমে কাজকর্ম্ম সব ছাড়িয়া দিয়াছিল। সকাল বেলা রাস্তার উপর গোটা লইয়া ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া দাঁতন করা, তার পর হাটুর উপর বেলি রাখিয়া এক একটি করিয়া অবহর দাল 'বিন্‌বিন্‌কে' বাছাইকরা, আর বৈকালে প্রকাণ্ড উদুখলে ফেলিয়া প্রকাণ্ড নিমের ঘোটনা দিয়া সিদ্ধি ঘোঁটা ছাড়া আর কোনও কাজ করে না। যখন সন্ধ্যার সময় এক এক অব্‌পোরা ভাঙ্ খাইয়া বড় ফুর্ত্তিতে খাটিয়ার উপর পড়িয়া বেপরোয়ায় পিলু রাগিণীর পিতৃমাতৃ উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই পথ দিয়া কোনও কুলকামিনীর যাতায়াত বিষম দুরূহ হইয়া উঠে।

এহেন সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের দিনে বিধু সিধু হাবাণী পরাণী শ্যামা বামা সকলে মিলিয়া ভরা-পেটে খোস-পোশাকে বারাণ্ডায় গিয়া মজলিস করিয়া বসিয়াছে। এ-ও-তা সাত সতর কত কথাই হইল। ও পাড়ার নারাণ ঘোষ নাকি তার বুড়া মাকে ভাত দেয় না। পদ্মমণি নাকি বৌকাঁটকী। বৌটাও তার খুব ঠেঁটা, দশ দিন সহিয়া এক দিন শাশুড়ীর গালে আচ্ছা করিয়া ঠোনা মারিয়াছিল। হর হালদারের বিধবা মেয়েটা বেহায়ার বেহদ্দ, রীত চরিত্তিরও যার পর নাই মন্দ। দত্তদের কনে বৌ নাকি খৃষ্টানের মেয়ে—সে বই পড়ে, চিটি লেখে, ঠাকুর দেবতা মানে না—আবার ঘোমটা খুলিয়া শ্বশুর ভাশুরের সঙ্গে কথা কয়। মোনার মা বড় আমুদে মানুষ। তারা ঝাওরা, জাতে ছোট বটে, কিন্তু তার গলাখানি বড় মিষ্ট। গোবিন্দ অধিকারীর দূতীগিরি দেখিবার জন্য এক দিন নাকি লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মানুষের বেশে আসিয়া যাত্রা শুনিতে বসিয়াছিলেন। একমনের দলে মিশিলে ভূতের ভয় থাকে না। নীলু গোঁসাই এক জন ঈশ্বরজানিত মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি একে একে কত কথাই হইল। কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। বুঝি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল। দ্বারবানদের কিচিমিচি থামিয়া আসিয়াছিল। সপ্তমীর চাঁদ ডুবিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। তখনও তেমনি গল্প সমভাবেই চলিতেছিল।

বলা বাহুল্য, যখন সকলেই আসিয়া সে মজলিসে যোগ দিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে সেই পশ্চিমে ঝি মাহারিণও ছিল। সে এ সকল কথা বুঝিতে পারিতেছিল না বলিয়াই হউক, বা ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই হউক, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। শেষ উঠিল। একজন বলিল, "কি মাহারিণ, উঠিলে যে?"

মাহারিণ ইদানীং একটু একটু বাঙ্গালা শিখিতেছিল। বলিল, "ঘুম লাগ্‌ছে ভাই।" একটা হাই তুলিয়া সে একটু হাসিল।

পরাণী বলিল, "আর যদি তোর মা-জী আসিয়া পড়ে?"

মাহারিণ বলিল, "আরে আজ তো সাদিকা দিন, আজ কি আস্‌তে পারে? কাল বহু লিয়ে আস্‌বে।"

ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একবার তারাসুন্দরীর কথা লইয়া আন্দোলন হইয়া গিয়াছিল। আবার যখন পাকে চক্রে সেই কথা পড়িল, তখন কাজেই সব কথা ত্যাগ করিয়া সেই কথাই আরম্ভ হইল।

হারাণী। আচ্ছা, বৌ এলে তুই কি করবি?

মাহারিণ। আরে হাগি আর কি করবে? হাগিলোককে কি ও পুছবে? ও রাজাকা লেড়কী, উহার সাৎ আউর কত ঝি আস্‌বে।

বামনদিদি। তা, মাহারিণ বড় মিছে বলে নি। কিন্তু তা বলে আমার হাতে খেতে হবেই হবে। তিনি তো আর আলাদা হাঁড়ি কাড়তে পার্বেন না। দেখিস্, তখন কত ভাল ভাল রান্না রেঁধে খাওয়াব, আর পেট খালাস ক'রে তাকে সব ভাল ভাল রূপকথা শোনাব।

বামা। আর আমরাই বুঝি ছাড়বো? হোক রাজার মেয়ে, আসুক হাজারো ঝি চাকর, তা বলে এখানে আমাদেরই জোর বেশি। চুলবাঁধা, গা রগড়ান, আল্‌তা পরান এ সব আমরাই করবো।

সিধু। আরে তোরা যে মনে মনে লঙ্কা ভাগ কর্ত্তে বস্‌লি। দাঁড়া আগে বিয়েই হউক।

বামনদিদি। বে হবে না কি লা? তোর ও কি কথার শ্রী?

সিধু। দেখলি না, কি কাণ্ডটা হয়ে গেল। এ যে এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা ভেবেই তো আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

সহচরী। যা বল্লি দিদি। কি সর্ব্বনেশে কথা—ভুবন দাদা চোর! এ কথা একগলা গঙ্গা জলে উলে বল্লেও আমি বিশ্বেস করি নে। ভুবন চোর, আর অমূল্যকুমার সাধু! তিনি এলেন কি না বড়ভাইকে পুলিষের হাত থেকে রক্ষা কর্ত্তে। আবার বলে, ভুবন কি কর্ত্তা ঐ কথা কেহই জানে না, গিন্নি শুনতে পেয়ে চুপি চুপি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে। মরি মরি, কি সতীর বেটা সৎ গো!

বলে—যার হাতে খাই নি সেই বড় রাঁধুনী।
আর—যার সঙ্গে ঘর করি নি সেই বড় ঘরণী॥

বিধু। আমারও মনে হয়, ঐ যে রাজবাড়ী বে দিতে যাওয়া, ও সব মিছে। নিশ্চয়ই ওরা মায় পোয় বেচারা দাদা বাবুকে একটা বিষম বিপদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে।

সিধু। তা, এ ষড়যন্ত্র যে হচ্চে তা আমি অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছি। সেই যে সেদিন বাবু চলে গেল, আর ওঁর মাথা ধর্‌লো। তারপর যেই গুণের ছেলে বাড়ী এল, তার ইয়ারকে ডেকে আনা হ'লো—কি সুড়ুর সুড়ুর চল্লো, আর মাথা ধরা ভাল হয়ে গেল। তার পর—

বিধু। ঠিক্ বলেছ ভাই। তার পর সেই ছোঁড়াটা এল, তার সঙ্গে কি

কথাবার্ত্তা হলো, আর রাভ না পোহাতেই সকলে চলে গেল। বল্লে কি না, সেই ছোঁড়া বেলডাঙ্গা থেকে পত্র নিয়ে এসেছে, ভুবনের বিয়ে, রাজার অনুরোধে পড়ে বাবু তাদের যেতে লিখেছে। আহা, রাজার তো সেই ভাবনায় মাথা ব্যথা পড়ে গিছলো।

হাবাণী। আচ্ছা তবে গেল কোথায়?

রিধু। নে, তোর জ্যাকপিনা দেখে আর বাঁচিনে। সে সব পাহাড়ে মেয়ে মানুষ, তারা আবার না যেতে পারে কোথায় লা?

বামনদিদি। ও মা, তোদের কথা শুনে যে আমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁধোবার যো হয়েছে। সেই যে রূপকথায় আছে—

বামনদিদির উপমাটা আর বলা হইল না। সহসা বহির্দরজায় একখানা গাড়ীর শব্দ ও হাঁকাহাঁকি শুনা গেল। তখন কটক খোলার শব্দ, লোক জনের ছুটাছুটির শব্দ ও যে দরোয়ান বেশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে তাহার অনর্থক চেঁচামেচির শব্দ—খুব একটা গোল উঠিল। কান খাড়া করিয়া সকলে তাহা শুনিল। অমূল্যের আওয়াজ পাইয়া তখনি হুড়মুড় করিয়া সকলে নীচে নামিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া সকলে দেখিল, আগে অমূল্য ও তার পর তারাসুন্দরী আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অমূল্য ফিরিয়া গিয়া আর দুই জনকে সঙ্গে লইয়া উপরের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। যে অপর দুই জন আসিল, তাহার এক জন ভূষণ, আর এক জন ভজহরি। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

সহচরীর বোধ হইল, কে যেন থামের আড়াল হইতে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। সে পাশ কাটাইয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

* * * * *

তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল। সকলে যে যাহার শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতি গম্ভীর। নীরব, নির্জ্জন, সুষুপ্ত। তারাসুন্দরী প্রভৃতি চারি জনে তখনও জাগিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল। পরামর্শটা খুব চাপা স্বরেই হইতেছিল। অনেক কথার পর, ভজহরি একটা মোড়া দিয়া বসিল। তারাসুন্দরী পঞ্চাশ টাকা হাঁকিলেন। তবু সে স্বীকার হয় না। তখন অমূল্য চোখ রাঙ্গাইয়া উঠিল। ভজহরি বলিল, "আমি একবার বলিয়াছি, আর বলিতে পারিব না। কেন আমাকে ধরিয়া আনিলে?"

তারাসুন্দরী একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"তুমি একবার যাহা

বলিয়াছ, আর তাহা না বলিলে কি পার পাইবে ঠাহরিয়াছ? কেন অকারণ মরিবে? বুদ্ধির দোষে এ টাকা কেন খোয়াইবে?"

তারাসুন্দরী এক তীব্রদৃষ্টি করিলেন। অমূল্যের সে চোখরাঙ্গানিখ অপেক্ষা সে দৃষ্টিতে ভজহরি চমকিয়া উঠিল। অল্পদিন মাত্র তারাসুন্দরীর সহিত তাহার পরিচয়—ইহারই মধ্যে সে বুঝিয়াছিল, তাহার অকার্য্য কিছুই নাই। সে যাহা বলে, তাহাই করে। ভজহরি ভয় পাইল। কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া হেঁট হইয়া বসিয়া রহিল।

এই সময়ে বাহির হইতে কে সাড়া দিল। সকলে বুঝি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অমূল্য তাড়াতাড়ি নিজে নীচে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। যে আসিল, সে রামমাণিক্য। তারাসুন্দরী তাহাকে বলিলেন, "কেমন গো, তোমার কথার তো আর নড় চড় নাই?"

রামমাণিক্য বলিল, "ঠিক না থাহে আর করি কি? ছার-দ্যান কৈ? তরে ভাবছি—"

অমূল্য। আবার ভাবনা কি?

রাম। আরে না কন্ ক্যান্? আমি তো রামমাণিক্য, পিতার নাম হরমাণিক্য, পিতামহের নাম গোবিন্দমাণিক্য—হরেকিষ্ট তো আমার কোনও পুরুষে না। আপনারা আনাবে জোর করে হরেকিষ্ট সাজাইলেন। জাল দলা পবলে হইবে কি?

অমূল্য। আমরা ভেবেছিলাম, তোমরা বাঙ্গাল বড় গামলাবাজ, তা তোমরাও এত ভরতরাসে! ছি!

রাম। আরে মুশয়, দ্যাশ হলে তো বুঝিয়া লইতাম। এহানে পিষ্ঠোপর আছে কে? এক জনও না।

অমূল্য। কেন, আমরা রয়েছি, ভয় কি?

রাম। ভয় তো নাই। কিন্তু আর কাহারে হরেকিষ্ট সাজাইলে তো হইতো। বুবা হরেকিষ্টর এত দিন নরিয়া যে লবণ খাইলাম, এই কি তার ধর্ম্ম পালন কল্লাম?

অমূল্যের হাসি আসিল। বলিল, "রামমাণিক্য, আর ধর্ম্মের বক্তৃতায় কাজ নাই।"

রামমাণিক্য গম্ভীর হইয়া বলিল, "শাস্তোরে আছে, ধর্ম্ম মূল্যেন ওধ্যতি। ধর্ম্ম বিকাইতে পারি, যদি উচিত মূল্য পাই।"

অমূল্য বলিল, "তাও তো দিতেছি। আর কিছু চাও, তাও না হয় বল।"

রামমাণিক্যের কথার অপেক্ষা না করিয়া, তারাসুন্দরী ৫০৲ টাকা গণিয়া দিলেন। রামমাণিক্য নোট কয়খানি কাপড়ের খুঁটে গিরা দিয়া বাঁধিল। একটু হাসিয়া বলিল, "আমাগোর শাস্তোরে কিসের বিদান নাই?"

তখন আরও অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল। হতভাগ্য ভুবন তখনও জানিত না যে, তাহার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক চক্রান্ত চলিতেছিল। ক্রমে চারিটা বাজিল। তারাসুন্দরী ব্যতীত আর-আর সকলে কোথায় চলিয়া গেল।

তারাসুন্দরী উঠিয়া একবার খাটের উপর বসিলেন। বড় বুঝি আলস্য বোধ হইয়াছিল—একবার বসিয়া বসিয়াই আড় হইয়া তাকিয়ার উপর ঠেস দিলেন। তত্রাপি শয়নে প্রবৃত্তি হইল না; সেই অবস্থায় কত কি চিন্তা করিলেন। তারাসুন্দরীর আজ আনন্দ ধরে না। কাল ভুবন জেলে যাইবে। সেইখানেই তার উপযুক্ত বাসর হইবে। মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলেন। সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তখনই আবার সহসা ক্রোধে চোখ মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। নাসাগ্রভাগ স্ফীত হইয়া উঠিল; ভ্রূকুটীকুটিল মুখে স্ফুরিতাধর দন্তে চাপিয়া বলিলেন, "আমি তারাসুন্দরী—আমার অবহেলা! আমার সঙ্গে প্রতারণা!—কেন? আমি মেয়েমানুষ তাই? একা মেয়েমানুষ হইয়া যাহা করিয়াছি, দেখি দেখি এখন কোন্ পুরুষের ক্ষমতা তাহা রক্ষা করে?" মনের আবেগে তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পায়ের দুটা বুড়া আঙ্গুল মট্ মট্ করিয়া উঠিল।

তখন শেষ রাত্রির অন্ধকার স্তরে স্তরে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। সেই অন্ধকারে বোধ হইল, মানুষের মত কিসের একটা অস্পষ্ট ছায়া বারাণ্ডা হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া দুর্য্যোধন খুড়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। আচম্‌কা কেমন দম আটকাইয়া কাসিতে কাসিতে উঠিয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখিলেন, ফরসা হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, দূরে যবনদিগের গৃহপ্রাঙ্গন হইতে কুক্কুট উচ্চরব করিতেছে। তখন দম সামলাইয়া, চক্‌মকি ঠুকিয়া কলিকায় তামাকু চড়াইলেন। অচিরাৎ হুঁকা অতি মধুর বলিতে লাগিল।

হন্ হন্ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া একে-

বারে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া পড়িল। অন্য দিন হইলে দুর্য্যোধন খুড়া অবশ্যই যার পর নাই ভীত ও বিস্মিত হইতেন, কিন্তু আজ বুঝি ঐ লোক যে আসিবে তাহা তাঁহার জানা ছিল, দুর্য্যোধন তেমনই হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন, "এস, অমন করিয়া হাঁপাইতেছ কেন?"

যে আসিয়াছিল সে বলিল—"হাঁপাইতেছি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি যে তাই এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, অন্য লোক হইলে দেখিয়া শুনিয়া তাহার দাঁতকপাটী লাগিত।"

"কি—কি—দেখলে কি—বুঝলে কি না—বল না।" আগ্রহের সহিত দুর্য্যোধন ইহা বলিলেন, কিন্তু তবু হুঁকা ছাড়িলেন না। টানের পর টান তেমনই গমকে গমকে চলিতে লাগিল।

দেখিয়া ক্ষেমার বড় রাগ হইল—যে আসিয়াছিল সে ক্ষেমা—রাগিয়া ক্ষেমা বলিল, "তুমি যদি হুঁকা না ছাড় তাহা হইলে কোন কথাই বলিব না। তারা সুন্দরী মিছা বলে না। একটা মেয়ে মানুষে যা পারে দশটা পুরুষে তার কিছুই পারে না। অত হুঁকায় মুখ থুবড়িয়া যাহারা পড়িয়া থাকিবে তাহারা কাজ করিবে কখন?"

কথাটায় দুর্য্যোধনের বড় হাসি আসিল। একটা টান টানিয়া হুঁকাটা হাতে করিয়া, হাসিতে হাসিতে দুর্য্যোধন বলিলেন—"কি বলিলে? তারাসুন্দরী কি বলে? বলতো বলতো অ্যাঁ—"

ক্ষেমা বলিল—"তা সে বলিতে পারে। সে একা যাহা করিয়াছে আমরা দুজনে তার কি করিতে পারিয়াছি? তবু তুমি তো পুরুষ মানুষ।"

কি? ক্ষেমা এত বড় কথা বলে? দুর্য্যোধন রাগিল। দেশ বিদেশে তাঁহাকে লোকে ডরায়; চতুর, কূটবুদ্ধি ও ফন্দিবাজ বলিয়া সকলে তাঁহাকে মান্য করে; যার শলা পরামর্শের দরকার সে আগে ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসে;—আর ক্ষেমা বলে কি না একটা মেয়ে মানুষ যাহা করিয়াছে তিনি তাহা পারেন নাই! রাগে দুর্য্যোধন আছড়াইয়া হুঁকাটা রাখিয়া দিলেন। দুষ্ট ক্ষেমা তাহা দেখিয়া একটু টীপি টীপি হাসিল। সে জানিত, মাঝে মাঝে এমন মন্ত্র না ঝাড়িলে তাঁহাকে উত্তেজিত করা যাইত না। অবসর বুঝিয়া, ক্ষেমা বলিল,—"তা যাহাই বলি, ঠাকুরদাদা, তোমার মতলবের কাছে সকলকেই হারি মানিতে হয়।"

কথা শুনিয়া তবু কতকটা রাগ পড়িল। দুর্য্যোধন বলিলেন—"তাবা-

সুন্দরী। সে কত বড় তারাসুন্দরী? সে জানে না যে, সে যেমন পাখী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে, তেমনি কালসর্প তাহাকে লুকাইয়া দংশন করিবার জন্য ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। আমার উপর টেক্কা! ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার অভিলাষ! সে জানে না যে, যে তীর ছুড়িয়া আস্ফালন করিতেছে এখনই আর এক তীরে তাহা ফিরাইয়া দিয়া তাহারই বুকে তাহা বিঁধিয়া দিতে পারি? একে আমি দুর্য্যোধন, তায় আমার সহায় তুমি ক্ষেমা—অর্জ্জুনের সারথি সুভদ্রা—মনে করিলে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারি, তা তারাসুন্দরী কোন্ ছার?" কথাগুলা দুর্য্যোধন এতই উত্তেজনার সহিত বলিলেন যে, তাহা বলিতে মাঝে মাঝে তাঁহার সেই চিরপ্রিয় "বুঝলে কিনার" বুক্‌নি দিতেও ভুলিয়া গেলেন।

মুচকিয়া হাসিয়া ক্ষেমা বলিল—"না, ঠাকুরদাদা, সারথির কাজ আমা হইতে হইবে না। ইচ্ছা হয় আর কাহাকেও দেখিয়া শুনিয়া তাহার হাতে লাগাম তুলিয়া দিও। তবে, দূতের কাজ যাহা করিয়া আসিয়াছি, শোন।"

বলা বাহুল্য, সেই যে থামের আড়াল হইতে একজন সহচরীকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল, আর সেই যে অন্ধকারে বারণ্ডা হইতে ছায়ারূপিণী যাহাকে সরিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, সে আর কেহ নহে, ক্ষেমা।

ক্ষেমা ইদানীং তারাসুন্দরী কখন কি করে লুকাইয়া লুকাইয়া সর্ব্বদা তাহার সম্বাদ লইত। হঠাৎ একদিন শুনিল, তারাসুন্দরী বাড়ী নাই—কোথায় গিয়াছেন—সঙ্গে অমূল্যও গিয়াছে। ক্ষেমার বড়ই কৌতূহল হইল; কিন্তু কোন প্রকৃত কথা জানিতে পারিল না। দিন কতক পরে একদিন অমূল্যকে ফিরিয়া আসিতে দেখিল। তাহার সঙ্গে ভজহরি ও আর একজন নূতন লোক দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তার পরই গ্রামে একটা গোল পড়িয়া গেল। সেই সিংহাসন—ক্ষেমা আপনার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—শুনিল, সেই সিংহাসন যাহা সে স্বচক্ষে অমূল্যকে চুরি করিতে দেখিয়াছিল, তাহা নাকি ভুবন চুরি করিয়াছে। তার প্রমাণ হইয়াছে। ভজহরিকে লইয়া ভুবন নাকি তাহা কলিকাতায় হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের দোকানে বেচিয়া আসিয়াছিল। হরেকৃষ্ণ ও ভজহরি উভয়েই তাহা স্বীকার করিতেছে। তাই ইন্‌স্পেক্টার সুরথালে আসিয়াছে। সংবাদ পাইয়া অমূল্য তাই তাড়াতাড়ি গোপনে পুলিষকে হাত করিয়া মোকদ্দমা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় আসিয়াছে। কি ভয়ানক! ভজহরির হাত দিয়া ভুবন তাহা বিক্রয় করিল—ভজহরিই বা কোথায় আর ভুবনই

বা কোথায়? চুরি করিলই বা কে, আর চোর বলিয়া অপবাদ রটিলই বা কার? যে অমূল্য ভুবনকে নথে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচে, সে আসিল কি না ভুবনের পক্ষ হইয়া তাহাকে বাচাইতে? এ কি রহস্য? ভাবিতে ভাবিতে ক্ষেমা আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই জন্যই কি তারাসুন্দরী বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল? এতো তারই কাজ। সে কি মেয়ে মানুষ? না পিশাচী? ক্ষেমা প্রতিজ্ঞা করিল, যদি সে যে যথার্থ চোর তাহা ধরাইয়া দিতে পারে তবেই সে কৈবর্ত্তের মেয়ে; নহিলে এ মুখ আর কাহাকেও সে দেখাইবে না। সে জাতিতে দুর্য্যোধন ঠাকুর এ সব বিষয়ে খুব পাকা। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। দুর্য্যোধন যে এত ধড়িবাজ, তিনিও সমস্ত শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তারপর পরামর্শ করিয়া, ভজহরিকে ভাল্‌ইবার জন্য ক্ষেমাকে তাহার সইয়ের বাড়ী যাইতে বলিয়া, তিনি নিজে কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আস্ফালন করিয়া বলিলেন—"আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ঐ বাঙ্গাল মিন্সে কখনই হরেকৃষ্ণ পোদ্দার নয়। আমরা হরেকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তবে বাড়ি ফিরিব।" ক্ষেমা তখন দুর্য্যোধনের উৎসাহ দেখিয়া খুসী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তবু হরেকৃষ্ণের উপর তাহার ততটা সন্দেহ হয় নাই। রাত্রে রামমাণিক্যের কথা শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাই অত হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

ক্ষেমা তাহার সইয়ের বাড়ী গিয়াছিল, দুর্য্যোধনও কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাহাদের উভয়ের অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দুই জনেরই ফিরিবার কথা ছিল। তাই দুর্য্যোধন ক্ষেমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুর্য্যোধনের আগ্রহ দেখিয়া, ক্ষেমা এ কয়দিন যাহা করিয়াছিল, তাহা বলিতে লাগিল। "রাজবাড়ীতে আমার প্রবেশ করা হয় নাই। একদিন গিয়াছিলাম, কিন্তু রাণীর একটা সখী আমার দিকে এমনই কট্‌মট্ করিয়া চাহিল যে বড় ভয় পাইলাম। আর একবার তারাসুন্দরীর সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলাম, বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছিল। তখন, রাস্তায় রাস্তায় অনেক বেড়াইলাম, তারাসুন্দরীর কোন খবরই পাইলাম না। একদিন ঠিক্ তারাসুন্দরীর মুখের মত মুখ একটা মাগীকে দেখিলাম, অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার সেই ভিখারিণী অপেক্ষা হীনবেশ দেখিয়া কিছুতেই প্রত্যয় হইল না। তবু তার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ছাড়িলাম না। হঠাৎ কাল রাত্রি এক প্রহরের

সময় যখন বর দেখিয়া সইয়ের বাটী ফিরিতেছি, দেখিলাম হন্ হন্ করিয়া ভজহরি কোথায় চলিয়াছে। দুই দিন আগে ভজহরি যে জামিনে খালাস হইয়া বাড়ী আসিয়াছিল তাহা জানিতাম। কিন্তু এমন সময়ে এত ব্যস্ত হইয়া সে কোথায় যায় তাহা দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল। আড়ালে থাকিয়া তাহার সঙ্গ লইলাম। দেখিলাম সেই স্ত্রীলোক—তবে বেশ অনেক পরিবর্ত্তিত—একটা গাছিতলায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভজহরি গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উভয়ে কি কথাবার্ত্তা হইল বুঝিতে পারিলাম না। এই সময়ে দূরে আর একজনকে দেখিতে পাইলাম। চিনিলাম অমূল্য। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না ঐ স্ত্রীলোক কে। আমি তো একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু পরেই দেখি, পুলিষের সেই ইনস্পেক্টারও সেইখানে আসিয়া জুটিল। আর দাঁড়াইতে সাহস করিলাম না। ছুটিয়া সইয়ের বাটী ফিরিয়া গেলাম।"

ক্ষেমা এক নিশ্বাসে বলিতেছিল, দুর্য্যোধনও নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। বলিলেন—"তার পর—তার পর?"

ক্ষেমা আবার বলিতে লাগিল—"তারপর, সেখানে গিয়া দেখি মস্ত গোল। নিজে মুকুন্দরাম ভজহরির তল্লাসে আসিয়াছেন। গ্রামশুদ্ধ সকলে মিলিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমি একজনের কাণে কাণে তাহাকে যেখানে দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। কি জানি যদি মিছা হয় এই জন্য সে সহসা বলিতে সাহস করিল না। আবার নিজে দৌড়িয়া তাহা দেখিতে গেল। তখন তাহারা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে আসিয়া মুকুন্দরামকে সে কথা বলিল। তৎক্ষণাৎ খোঁজ পড়িয়া গেল; কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বুড়া মন্ত্রী চলিয়া গেলে আমি সইকে ভয় দেখাইয়া সব বলিলাম। শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ঘুণাক্ষরে এ কথা প্রকাশ হইলে মন্ত্রী তখনই তাহার বাস উঠাইয়া দিবেন এই আশঙ্কায় সে আকুল হইয়া পড়িল। সে নিজেই ভজহরিকে বিস্তর গালি দিয়া, তাহাকে কোথায় দেখিতে পাইবে সেই জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তাহাকে বাড়ী রাখিয়া একবার তারাসুন্দরী ফিরিয়াছে কিনা দেখিতে গেলাম। সবে মাত্র তখন তাহার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বোধ হয় পথে আরও কোথাও গিয়াছিল, নহিলে আমাদিগের পশ্চাতে আসিবে কেন? যাহা হউক, তখন দরজা খোলা ছিল। লোকজন ছুটাছুটি

করিতেছিল। সচ্ছন্দে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। গৃহিণীর সঙ্গে আসিয়াছি ভাবিয়া কেহই কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না।"

আগ্রহে পুনরায় দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর—তারপর?"

তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ক্ষেমা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল—"তুমি ঠিক্ ঠাহরিয়াছিলে। সে মিন্সে হরেকৃষ্ণ নয়। এখন আসল হরেকৃষ্ণের কি হইল বল।"

দুর্য্যোধন একটু হাসিয়া বলিলেন—আমরা তাঁহার "বুঝলে কিনা" গুলা বাদ দিয়া বলিতেছি—বলিলেন—"আরে আমার অনুমান কি মিথ্যা হইবার যো আছে? ক্ষেমা, অন্য কোন কোন বিষয়ে তোমরা আমাদের কাণে ধরিয়া শিখাইতে পার বটে, কিন্তু এ সব বিষয়ে আমরা তোমাদের অপেক্ষা ঢের বেশি বুঝি। তা যাক, এখন আমার কথা শোন। আমি তো কলিকাতায় গিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া আসল হরেকৃষ্ণকে বাহির করিলাম। সে কিন্তু আসল ছাঁটা বদ্‌মায়েস। কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। বলিল আর কোন হরেকৃষ্ণ হইবে, এ দোকান নয়। কিন্তু আমরা হলেম মানুষের বেনে—তিনি আমায় কথায় কি ভুলাইবেন? সে যত কথা চাপা দিতে যায়, আমার ততই সন্দেহ বাড়িতে থাকে। শেষ ভয় দেখাইলাম, রামাল ধরা পড়িয়াছে, এখন আসল চোর ধরা-ইয়া দিতে না পারিলে তাহাকেই পুলিবে যাইতে হইবে। কথা শুনিয়া লোকটা ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সেই সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার খাতা ধরা পড়িবার কথা বলিলাম, অমনি একেবারে বোকা বনিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে খাতা খুঁজিল, দেখিতে পাইল না। সিন্দুক খুলিয়া সেই সিংহাসন দেখিতে গেল, সিংহাসন নাই। বুড়া দোকানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে তখন ফোটাকতক জলও দেখিতে পাইলাম। তখন সে একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল। 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। লোকটার কাকুতি মিনতি দেখিয়া তখন আসল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। হরেকৃষ্ণ বলিয়া যে আর একজন পরিচয় দিয়াছে, তাহা কেবল বলিলাম না; কি জানি যদি তাহা হইলে বুড়া আবার উল্টাইয়া বাঁকিয়া বসে। তখন সে আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল—"এ নিশ্চয় সে নিমকহারাম রামমাণিক্যের কাজ। ঐ জন্যই সে সেদিন সিংহাসন খানা গালাইবার জন্য বাহির করিতে অত জেদ করিয়াছিল। ঐ জন্যই সে খাতায় কি একটা জমাখরচের গোল আছে বলিয়া তাহা একবার দেখিতে লইয়াছিল। আর ঐ জন্যই হঠাৎ

অসুখ হইয়াছে বলিয়া খবর পাঠাইয়া আর এ কয়দিন আসে নাই।" বুড়া যেন পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পাছে রাস্তায় লোক দেখিয়া কিছু মনে করে এই ভাবিয়া তাহাকে দোকানের এক কোণে লইয়া গিয়া বিস্তর বুঝাইলাম। সে সেই বাঙ্গালের বাসা জানে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। বুড়া তাহা জানিত, তখনই আমাকে লইয়া সেই বাসার দিকে চলিল। দেখিলাম, সেখানে কেবল মাত্র বিধবা থাকে, আর কেহ নাই। জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম সে ভাড়াটীয়া পরিবার লইয়া কোথায় উঠিয়া গিয়াছে তাহা সে জানে না। অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম। বুড়াকে তখন বলিলাম—"দেখ, সে কোথায় গিয়াছে তাহা আমি জানি। এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনিলে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি।" হরেকৃষ্ণ বলিল—আর অভিপ্রায় কি? সেই বাঙ্গাল বেটাকে জেলে পুরিব, ঘানি টানাইব, পাথর ভাঙ্গাইব ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

আমি হাঁ করিয়া সব শুনিতেছিল। বলিল—"তারপর? তারপর?"

দুর্য্যোধন বলিলেন—"আমি বলিলাম তাহাকে যেন জেলে দিলে, কিন্তু তাহার উপায় কি করিবে?" সে বলিল—"এক ভরসা আছে। যে দামেই কিনি, খাতায় তাহার উচিত মূল্য লেখা আছে তাহাতে সহজে আমায় কায়দা করিতে পারিবে না।" আমি তখন বলিলাম—"আরও এক উপায় আমি বলিয়া দিই। আমি একটি লোককে দেখাইয়া দিব, যদি তুমি বল সেই লোকটি গিয়া তোমার দোকানে তাহা বেচিয়া আসিয়াছে তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকে না। তার নাম অমূল্য। হরিহর বাবু—যাঁর সিংহাসন—সে তাঁহার পুত্র।" কথাটা বুড়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। তার বুঝি কি সন্দেহ হইল। একবার আমার মুখের প্রতি বিস্মিত নেত্রে চাহিল। আমি বলিলাম—"দেখ, তোমার ভালর জন্যই বলিলাম। ছেলের নিকট ইহা কিনিয়াছ জানিতে পারিলে, হয়ত হরিহর তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারেন। আর হাকিমও দোষটা তত গুরুতর মনে না করিতে পারেন।" হরেকৃষ্ণ আর একবার আমার দিকে চাহিল। বলিল—"জানি না, আপনার উদ্দেশ্য কি? কিন্তু আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।" তখন আর এক দিন থাকিয়া বুড়াকে লইয়া চলিয়া আসিলাম।

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া ক্ষেমার বড়ই আনন্দ হইল। বলিল—"কৈ, হরেকৃষ্ণ কোথায়?"

নাম করিতে না করিতে হরেকৃষ্ণ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুর্য্যোধন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। কথায় কথায় তখন বেশ বেলা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ তামাকু খাওয়া হয় নাই, দুর্য্যোধন হুঁকায় জল ফিরাইয়া একবার তামাকু খাইলেন। হরেকৃষ্ণ প্রসাদ পাইল। ক্ষেমা তখন তাহার সইকে আনিবার জন্য গৃহে প্রস্থান করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুন্সীগঞ্জের ফৌজদারী আদালত বহুকাল ধরিয়া প্রসিদ্ধ। ঢাকায় মুন্সিদের যখন বড় প্রাদুর্ভাব, তখন হইতে এই আদালতের সৃষ্টি। কোন মুন্সী হায়দার হোসেন বলিয়া একজন ফৌজদার এখানে থাকিতেন। তিনিই এই স্থানের মুন্সীগঞ্জ নাম রক্ষা করেন। এখন সে ফৌজদারও নাই, খড়ের ছাউনি কাছারি ঘরও নাই। ফৌজদারের বদলে হইয়াছেন ডিপুটী, আর সে বকেয়া খড়ো ঘরের পরিবর্ত্তে হইয়াছে বারাণ্ডা বাহির করা অট্টালিকা। সে আলবোলা-পিক্‌দানি-তাকিয়া-সম্ভূষিত আধ-ময়লা কার্পেট জাজিমের পরিবর্ত্তে টানাপাখার নীচে বেতের ছাউনি একখানি কাঠের ধর্ম্মাসনরূপে শোভা পাইতেছে। সে ফারসি আরবি কথা মাঝে মাঝে আছে বটে, কিন্তু তাহার বানান ও উচ্চারণ বিষম বেয়াড়া রকম হইয়া গিয়াছে। আইন কানুনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা খুটাইয়া লেখা দুঃসাধ্য। ফলতঃ মুন্সীগঞ্জ এখন খুব বড় মহকুমা—বিস্তর গ্রাম ইহার এলাকাধীন।

দশটার পর আজ যতই বেলা বাড়িতেছে, ততই সেই আদালত-প্রাঙ্গন লোকে পুরিয়া যাইতেছে। চারিদিকে বট, অশ্বত্থ, আম, ঝাউ প্রভৃতি বড় বড় গাছ। পথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া দূরাগত কত লোক এক হাঁটু ধূলা শুদ্ধ তাহার তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িতেছে। মিঠাইওয়ালা সময় বুঝিয়া দোকান খুলিয়াছে। তাহার মিষ্টান্নের চারি দিকে রাশি রাশি মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে, আর তদধিক রাশি রাশি বুভুক্ষিত লোক জমিয়া একটা গণ্ডগোল করিতেছে। যে খাইয়া আসিয়াছিল, সে তাম্বূলরক্তমুখে পানওয়ালীর স্বহস্তরচিত তামাকু খাইতে খাইতে তাহারি সহিত মিঠা আলাপ করিতেছে। পানওয়ালী কিন্তু আপনার কাজ ছাড়িতেছে না—যত পারিতেছে ঝেলো পানের ভিতর পচা সুপারি চালাইতেছে। দালালের দল কালীঘাটের পাণ্ডার মত মক্কেলের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহাদিগের উদ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন

ও চোখের দেখা ঘটে নাই, তাহাদের হইয়া সনাক্ত করিবার জন্য কত লোক সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। কোথাও কোন উকীল তাঁহার সাক্ষীদিগকে জল-জীয়ন্ত মিথ্যাগুলা কি করিয়া হুবহু সত্য ঘটনা বলিয়া এজেহার দিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিতেছেন। হেটো ব্যাপারির ন্যায় এক একখানি দোচালার ভিতর মোক্তারের দল তীর্থের কাকের মত বসিয়া রহিয়াছেন, আর পার্শ্বে দপ্তর খুলিয়া মুহুরি ও তায়েদনবিশগুলা বসিয়া বসিয়া কার্য্যান্তর অভাবে কবল শ্রীদুর্গা ফাঁদিয়া কাগজ পুরাইতেছে। একজন উকীল উহার মধ্যে বড় শি সেয়ানা;—তিনি একখানা নথি হাতে করিয়া একবার ঘরে ঢুকিতেছেন, ছুটিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া ঘড়ি খুলিয়া ছেন—যেন কত কাজেই ব্যস্ত। লোকে বুঝিতেছে, ইনি এ আদা-সরা উকীল।

ম এগারটা বাজিল। দূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। একটা হৈ হৈ শব্দ গল। সবাই বুঝিল, হাকিম আসিতেছেন। হাকিম কি রকম জীব, কখন দেখে নাই, সে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। তখনই দুই দিক হইতে হারাওয়ালা "হট্ যা, হট্ যা" করিয়া রুল ঘুরাইয়া রুখিয়া আসিল। যার ছেলে ভয়ে সাত হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে াহুর ডিপুটী বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। যে উকীল এতক্ষণ সরফরাজি বেড়াইতেছিলেন, তিনি অমনি ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিলেন। ডিপুটী বাবু একটু ঘাড় হেঁট করিয়া গম্ভীরভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। উকীল বাবু তখন হাকিমের আরদালির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতে গিলেন। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে গোপনে কি একটা বন্দোবস্ত ছিল। চাষা মক্কেলেরা ইহা দেখিয়া বুঝিত, এই উকীল বাবুর সঙ্গে হাকিমের খুব আলাপ, ইঁহাকে ধরিলে নিশ্চয়ই মামলা জিত হইবে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতির সহিত পাশ করিয়া অপরে যাহা করিয়া উঠিতে না পারিত, এক বুদ্ধির জোরে ইনি তাহা অক্লেশে সমাধা করিতেন।

আধ ঘণ্টা ধরিয়া খাস কামরায় টানাপাখার হাওয়া খাইয়া ধর্ম্মাবতার গিয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্তেকে এজলাস্ গম্ গম্ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য কাগজের খড়খড়ানি, কলমের চড়চড়ানি, টানা-পাখার খস্‌খসানি আর উকীলদিগের কানে কানে ফুসফুস কিছুই শ্রুত হইল না। তার পর, সে দিনকার আর্জিপত্র লিখিত

গুলির দিন ধার্য্য করিয়া, নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। বেলা ৯টা হইতে তাহার যতদূর সাধ্য লোকের নামের উপর অত্যাচার করিয়া "আসামী সিধা-শরী বেওয়া হাজির" "ফরিয়াদী ভবি সমাকর ভটাচায হাজির" ইত্যাদি নানা সুরে নানা নাম ধরিয়া চীৎকার ছাড়িতে লাগিল। ঘর জ্বালানি, বাঁহাজানি, গরুছিনানি প্রভৃতি কয়েকটা মোকদ্দমা হইয়া গেল। বেলা যখন ২টা, তখন সেই সিংহাসন চুরির মোকদ্দমা উঠিল। সে দিন সে মোকদ্দমা দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া জমিয়াছিল। হরিহরের নাম সে অঞ্চলের অনেকেই জানিত—তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি রাজার জামাতা হইয়াছেন, তিনি নাকি অপরাধে অপরাধী—সে মোকদ্দমা দেখিবার জন্য অনেকেরই বার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। অনেক স্কুলের ছেলে পর্য্যন্ত সে দিন স্কুল পালাই বেলডাঙ্গা হইতেও বহুতর লোক আসিয়া সেদিন সেই ক্ষুদ্র আদা করিয়া ফেলিয়াছিল।

সম্মুখে কাঠগড়ায় বেল ধরিয়া অবনত মস্তকে ভুবন দাঁড়াইয়া। ক্রোটা করিয়া চোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তখনও স্থা সে বরবিভূতির চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই, তখন হাতের সূতা তেমনি রা য়াছে—সে তখন আপনাতে আপনি ছিল না, সে দিকে লক্ষ্যই হয় সে সব মোচন করিবে কৈ? কেবল মনে হইতেছিল, হে ভগবন্ কি কি অপরাধে এ কলঙ্ক রটাইলে? যদি কলঙ্কই রটিল, তবে ইহার পূ ঘাতে কেন মৃত্যু হইল না? কেন পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল না? এ কলঙ্কময় জীবন আর কি জন্য? থাকিয়া থাকিয়া পিতার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে—কাছেই সেই ছদ্মমূর্ত্তি ভ্রষ্টশ্রী রোরুদ্যমান হরিহর দাঁড়াইয়া ছিলেন—সেই দণ্ডে নখাঘাতে প্রাণ বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছা যাইতেছে। কখন বা মাধুরীর কথা মনে আসিতেছে, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ তাড়িত ছুটিয়া যাইতেছে। সেই হঠাৎ মূর্চ্ছান্ত প্রবল জ্বর, তার উপর এই নিদারুণ সংবাদ—সে কোমলপ্রাণা এখনও কি জীবিতা আছে? আশঙ্কায় বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যুকামনা বিস্মৃত হইয়া একবার ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার তৎক্ষণাৎ আপনার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুই চক্ষু ফাটিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। ভুবনের দিকে চাহিয়া, হরি ণ করিতে পারিতেছেন না। আজ দুই দিন তাঁহারা মুন্সী-এই দুই দিন পিতা পুত্রের মধ্যে কেহই একবিন্দু জলগ্রহণ